MONOBIGNAN

OR

PSYCHOLOGY

BY

CHARU CHANDRA SINHA, M. A.,

Professor of Philosophy, Patna College;
Author of "Religion in Modern
Light"; "The Problems of
Hindu Philosophy"
&c. &c.

Price Rs. 3.

Messrs Gurudas Chatterjee & Sons,
201, Cornwallis Street,
CALCUTTA.

মনোবিজ্ঞান

পাটনা কলেজের দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক

শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ, এম এ,

প্রণীত।

মূল্য তিন টাকা মাত্র

প্রকাশক :—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার — শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

মধ্যম দাদার

চরণ-কমলে।

সূচীপত্র।

উপক্রমণিকা

প্রথম অধ্যায়

মন ও মনোবিজ্ঞান

দ্বিতীয় অধ্যায়

চিন্তানুসন্ধান প্রণালী

তৃতীয় অধ্যায়

অবধান

চতুর্থ অধ্যায়

স্বার্থ

(৪৯—৫৭)

পঞ্চম অধ্যায়

মনের অবস্থা

(৫৮—৭০)

ষষ্ঠ অধ্যায়

মনের বিকাশ

(৭১—৭৮)

সপ্তম অধ্যায়

মন ও শরীর

অষ্টম অধ্যায়

সংবিত্তি

নবম অধ্যায়

রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়

দশম অধ্যায়

শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়

একাদশ অধ্যায়

ত্বগিন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রত্যক্ষ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রত্যক্ষ বিষয়

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

বস্তু প্রত্যক্ষ

পঞ্চদশ অধ্যায়

আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ ও মায়িক প্রত্যক্ষ

ষোড়শ অধ্যায়

সংজ্ঞা

সপ্তদশ অধ্যায়

মেধাশক্তি

অষ্টাদশ অধ্যায়

কল্পনা

ঊনবিংশ অধ্যায়

চিন্তা

বিংশ অধ্যায়

অনুভূতি

একবিংশ অধ্যায়

আত্মসম্পৃক্তানুভূতি

দ্বাবিংশ অধ্যায়

পরানুসন্ধায়ী ভাব

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বুদ্ধিবিষয়ক রস

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

সৌন্দর্য্যরস

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শীলরস

ষড়বিংশ অধ্যায়

ইচ্ছা

মনোবিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

মন ও মনোবিজ্ঞান।

"মনের মাঝে সবার সেরা মন্দির থাকতে খাড়া
তন্দ্রা-আতুর পূজক কেন বাইরে মাথা খোঁড়া" ? *

তুমি একটি ঘড়ি ক্রয় করিলে। যখন তুমি ঘড়িটি ক্রয় করিলে, তখন উহা বেশ চলিতেছিল; কিন্তু আজ উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঘড়ির যন্ত্রসম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই। ঘড়ি কিরূপে নির্ম্মিত, তাহা তুমি জান না। কেনই বা উহা এতক্ষণ চলিতেছিল, আবার কেনই বা বন্ধ হইয়া গেল, তাহাও তুমি জান না। তুমি ঘড়িটি চালাইবার জন্য চেষ্টা করিলে। তোমার চেষ্টা বিফল হইল। হয় ত ঘড়িটি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। তোমার মনে তখন বড়ই দুঃখ হইল। কিন্তু তুমি যদি জানিতে, ঘড়িতে কেমন করিয়া দম দিতে হয়, তাহা হইলে ঘড়িটি আবার চালাইতে পারিতে; তোমার জিনিষটি অত শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইত না। আবার, যদি তুমি ঘড়ির যন্ত্রাবলির বিষয় জানিতে—কোন্ যন্ত্রটির সাহায্যে কোন্ ক্রিয়া হইতেছে, যন্ত্রগুলি কিরূপভাবে সজ্জিত, কেমন করিয়া একটি আর একটির সহায়তা করিতেছে—ইত্যাদি জ্ঞান যদি তোমার থাকিত, তাহা হইলে তুমি ঘড়ির আরও সদ্ব্যবহার করিতে পারিতে। উহা আরও অধিক দিন স্থায়ী হইত। নষ্ট হইলেও তোমাকে কোন বিশেষজ্ঞের আশ্রয় লইতে

যন্ত্র পরিচালকের যন্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উপকারিতা।

হইত না। তুমি নিজেই উহার দোষ সংশোধন করিয়া লইতে পারিতে।

আমরা প্রত্যেকেই এক একটি যন্ত্রের পরিচালক। ঐ যন্ত্রটি ঘড়ি কিংবা অন্য কোন যন্ত্র অপেক্ষা অনেক বেশী জটিল। এ যন্ত্রের নির্ম্মাণ-প্রণালী আমরা জানি বা না জানি, যন্ত্রটিকে আমরা অহরহঃ চালাইতেছি। তবে সুখের বিষয় এই যে, ইহা অনেক পরিমাণে আপনা-আপনি চলিতেছে। বিশেষ মনোযোগের অভাব হইলেও ইহার ক্রিয়া বন্ধ হয় না। আমাদের অজ্ঞাতসারেও ইহা ক্রিয়াশীল। কিন্তু তাহা হইলেও, যন্ত্রটীকে যদি পরিচালকের তত্ত্বাবধানে না রাখা যায়, তবে ইহা বিকল হইতে পারে এবং বিপথগামী হইয়া অনেক বিপদের সৃষ্টি করিতে পারে। এই যন্ত্রটী আমাদের মন। ইহাকে সুপরিচালিত করিতে হইলে, ইহার সবিশেষ তথ্য অবগত হওয়া আবশ্যক।

মনোবিজ্ঞানের উপকারিতা।

"মনের কুহু,—মনের কেকা, অনাদি তার মূর্চ্ছনা,
গোপন তার প্রচার, তবু, তুচ্ছ না সে তুচ্ছ না।"

আমি এখন মনোবিজ্ঞানের উপক্রমণিকা লিখিতেছি; কিন্তু এ সময় আমার গোলাপ ফুলের কথা মনে হইল কেন? সম্মুখে ত আমি গোলাপ ফুল দেখিতেছি না; তবে গোলাপের কথা আমার মনে হয় কেন? ইহা এতক্ষণ কোথায় ছিল? ইহা কোথা হইতে আসিতেছে? কোন্ শক্তি ইহাকে আকর্ষণ করিল? ইহা কি আপনা-আপনি আমার মনে উদয় হইল? মানুষের মন একটি ক্রীড়াক্ষেত্র। এখানে কত ভাবের, কত চিন্তার, কত ইচ্ছার উদয় হইতেছে, আবার লয় হইতেছে। ইহাদের অনেকেই আপনা-আপনি আসিতেছে, আবার আপনা-আপনি যাইতেছে।

আজ্ মম হৃদ্ মাঝে,
এ কোন্ আলোক রাজে,
দিশি দিশি আনন্দ উজোরা।

কি নব পুলক রাশি,
চিত্তে উঠিছে ভাসি,
হৃদি নব ভাব বিভোরা।"

ইহাদের উন্মেষ, বিকাশ এবং লয়, কোনটিই অকারণ-সম্ভূত নহে, কোনটিই নিয়ম-বহির্ভূত নহে। আমরা যদি এই সকল কারণ, এই সকল নিয়ম অবগত হই, তাহা হইলে আমাদের কত সুবিধা হয়! মনোরাজ্যে যেখানে বিশৃঙ্খলা, সেখানে শৃঙ্খলা আনিতে পারি; যেখানে স্বেচ্ছাচারিতা, সেখানে শান্তিস্থাপন করিতে পারি। তুমি পাঠাগারে বসিয়া পাঠ-অভ্যাস করিতেছ, এমন সময়ে, তোমার চাকরের প্রয়োজন হইল। তুমি একবার দুইবার, বারংবার ঘণ্টাধ্বনি করিলে; কিন্তু তোমার নিকট একটি চাকরও আসিল না। কেন তোমার নিকট কোন চাকর আসিতেছে না, ইহা তোমার জানা উচিত নয় কি? তোমার মন সম্বন্ধেও তদ্রূপ। তুমি কোন একটী জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছ; কিন্তু তোমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও মীমাংসার সাহায্যকারী কোন চিন্তারই উদয় হইতেছে না—পরন্তু অনেক অবান্তর ভাবের উদয় হইতেছে। কেন এমন হইতেছে? কেন তুমি তোমার মনকে নির্দ্দিষ্ট পথে চালাইতে অক্ষম?

শিক্ষা এবং মনোবিজ্ঞান।

আমরা আমাদের পুত্র-কন্যাগণকে জ্ঞান-উপার্জ্জনের নিমিত্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকি। শিক্ষক মহাশয়েরাও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিয়া থাকেন। কিন্তু চেষ্টানুরূপ ফল হয় না কেন? শিক্ষার্থীদের কত শক্তির অপব্যবহার হইতেছে, কত উৎসাহ মন্দীভূত হইতেছে। মনের গঠন সম্বন্ধে—বিশেষতঃ শিশুদের মনের গঠন সম্বন্ধে—শিক্ষকদের অনভিজ্ঞতাই এরূপ অপচয় এবং অপব্যবহারের কারণ। আমার দান

করিবার ক্ষমতা আছে—আমি তোমাকে দান করিতে পারি, সত্য; কিন্তু তুমি দানের প্রকৃত পাত্র কি না, তাহা আমার জানা উচিত নয় কি? তোমার কোন্ জিনিষের অভাব এবং এই অভাবের মাত্রা কতটুকু,—ইহা কি আমার জানা উচিত নয়? তোমার অভাব থাকিতে পারে; কিন্তু কি উপায়ে তোমার অভাব পূরণ করিলে তোমার বাস্তবিক উপকার হইবে, আমার তাহা জানা উচিত। বিদ্যাদান শিক্ষকের কর্ত্তব্য, কিন্তু দান করিবার পূর্ব্বে গ্রহীতার ক্ষমতা কতটুকু, তাহা জানা আবশ্যক। যেখানে সেখানে বীজ বপন করিলে, সে বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। পৃথক-পৃথক বীজের পৃথক-পৃথক ক্ষেত্র; সুতরাং ক্ষেত্র বুঝিয়া বীজ বপন করা উচিত। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলেই যে সে বীজের পূর্ণবিকাশ হইবে, এমন নহে। জল, বাতাস এবং উত্তাপের সাহায্যে ইহার বিকাশের সহায়তা করিতে হইবে এবং আরও দেখিতে হইবে যে, ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা-শক্তি যেন কমিয়া না যায়; বরং যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। বিদ্যার ক্ষেত্র মন। সকলের মন এক প্রকার নহে; সুতরাং সকলেই এক বিদ্যার অধিকারী হইতে পারে না। শিক্ষককে ক্ষেত্র বাছিয়া লইতে হইবে। ক্ষেত্র-বিশেষে বীজ বপন করিতে হইবে; উপ্ত বীজের স্ফুরণে সহায়তা করিতে হইবে। মনের স্ফূর্ত্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য যাহাতে নষ্ট না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু এই সকল কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে, মন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন।

মানুষ পদে-পদে ভুল করিতেছে। কিন্তু এ ভুলের মূল কি? তুমি তোমার অন্তঃপ্রকৃতির বিষয় কিছুই জান না; তুমি তোমার মনের প্রকৃতি

ভ্রান্তির হেতু।

এবং প্রবৃত্তির বিষয় অনুধাবন করিতে চেষ্টা কর নাই। সেই জন্য তোমার এত ভ্রান্তি; সেই জন্য আত্মশক্তি-বোধ-বিমূঢ় হইয়া মোহান্ধকারে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছ।

"খোল অধীনতা ডোর; চিত্ত মোর, চিত্ত মোর—
তুই যে রে স্বতই স্বাধীন!
তবে অনভ্যাস ভীত! আত্ম-শক্তি বোধ মূঢ়!
রহিবি কি নিত্য পরাধীন?"

তুমি যাহা তোমার পক্ষে ভাল মনে করিয়াছিলে, এখন তাহা মন্দে পরিণত হইল; তুমি যাহা মন্দ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলে, এখন দেখিতেছ, তাহাই তোমার পক্ষে মঙ্গলকর ছিল। এইরূপে না তুমি কতবার—

"যে প্রদীপ আলো দিবে তাহে ফেল শ্বাস,
যারে ভালবাস তারে করিছ বিনাশ"।

তুমি যাহাকে শত্রু মনে করিতেছ, হয় ত সে তোমার পরম মিত্র; এবং যাহাকে মিত্র মনে করিতেছ, হয় ত সে তোমার শত্রু। তুমি উপযুক্ত হইয়াও নিজেকে অনুপযুক্ত মনে করিতেছ; আবার কখনও বা অনুপযুক্ত হইয়াও নিজেকে উপযুক্ত মনে করিতেছ। এইরূপে নিজের নিরয়ের পথ নিজেই পরিষ্কার করিতেছ। তুমি তোমার ঘরের সংবাদ রাখ না বলিয়াই তোমার এত প্রমাদ। তুমি তোমার নিজের মনের ভাষা বুঝিতে পার না; তাই তোমার এত বিড়ম্বনা, তাই তোমার কর্ত্তব্য তুমি স্থির করিতে পার না। যদি তুমি তোমার ইচ্ছাবৃত্তিকে সংযত করিতে চাও, যদি জীবনকে উপযুক্ত কর্ত্তব্যপথে চালাইয়া সুখী হইতে চাও, তবে নিজের মনকে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ কর। মনের গতিবিধি, কার্য্যকলাপ, বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখ। তখন তুমি তোমার মনের উপর আধিপত্য গ্রহণ করিতে পারিবে, বুঝিতে পারিবে—কোন্ পথ তোমার অবলম্বনীয় এবং কোন্ পথ পরিহার্য্য। গন্তব্য পথ স্থির হইলে, প্রলোভন সহজেই পরাভূত হইবে, প্রমাদ অন্তর্হিত হইবে, বাসনার তৃপ্তি হইবে, এবং কৃতকার্য্যতা পুরস্কার হইবে।

"মনোবিজ্ঞান" কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে "মন" এবং "বিজ্ঞান" এই দুইটী বিষয়ের পৃথক আলোচনা আবশ্যক। প্রথমতঃ মন বলিতে আমরা কি বুঝি?

অনুভূতি, চিন্তা এবং ইচ্ছা।

তুমি যখন কোন পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হও, তখন তোমার মনে একটি ভাবের উদয় হয়; তোমার মন তখন অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। তুমি এই ভাবকে, মনের এই অবস্থাকে সুখ বল। আবার তুমি যখন তোমার প্রিয়বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শুনিলে, তখন তোমার মনে অন্য ভাবের উদয় হইল, তোমার মনের অবস্থা আর এক প্রকার হইয়া গেল। তুমি এই ভাবকে, মনের এই অবস্থাকে, দুঃখ বল। সুখ এবং দুঃখ মনের অবস্থাবিশেষ। এই অবস্থাবিশেষের নাম অনুভূতি। মনের আরও একটি অবস্থা আছে। তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, প্রথমোক্ত অবস্থাটি সুখ এবং দ্বিতীয়টী দুঃখ। প্রথমটি দ্বিতীয়টি হইতে পৃথক। এই প্রকারে, আমার মনে যখন যে ভাবটির উদয় হইতেছে; তখনই আমি সেই ভাবটির বিষয় অবগত হইতেছি। একটি অবস্থা অন্য অবস্থা হইতে পৃথক, এ জ্ঞানও আমার হইতেছে। শোককে শান্তি বলিয়া, ভয়কে ভালবাসা বলিয়া, দ্বেষকে দয়া বলিয়া, পাপকে পুণ্য বলিয়া, স্বার্থকে সহানুভূতি বলিয়া আমার ভুল হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মনের বিবিধ অবস্থার পার্থক্য-জ্ঞান আমার আছে। এই পার্থক্য-জ্ঞানের নাম চিন্তা। মনের আরও একটি অবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুখকর বস্তু অর্জ্জনে এবং দুঃখকর বস্তু বর্জ্জনে তুমি প্রয়াস পাও। প্রয়াসে শক্তির প্রয়োজন। তোমার মন এ শক্তি-প্রয়োগে সমর্থ। তুমি একটি গোলাপ ফুল দেখিলে, এবং হস্ত-প্রসারণপূর্ব্বক সেটিকে গ্রহণ করিলে। অদূরে একটী সর্প দেখিলে এবং দ্রুতপদবিক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করিলে। হস্ত-সঞ্চালনে

এবং পদ-ক্ষেপণে শক্তির প্রয়োজন। মনই এ শক্তির নিয়ন্তা। প্রলোভনকে পরাজয় করিতে, রিপুর দৌরাত্ম্য দমন করিতে, স্বার্থের চিন্তা নির্ম্মূল করিতে, পরহিতব্রতে আত্মসমর্পণ করিতে, সুন্দর, সৌম্য, শুদ্ধ আদর্শের অনুসরণ করিতে—মানসিক শক্তির প্রয়োজন। এইরূপ সংযমনে, এইরূপ আত্ম-সম্বরণে, এইরূপ মহাসাধনায় মহাশক্তির প্রয়োজন। এই শক্তির নাম ইচ্ছা। অতএব, প্রধানতঃ মনের এই তিনটি অবস্থা—একটি ভাবের অবস্থা, একটি জ্ঞানের অবস্থা এবং আর একটি শক্তি বা ক্রিয়ার অবস্থা। মনের সুখ-দুঃখের অবস্থা অনুভূতি। মনের বিবিধ অবস্থার পার্থক্য-জ্ঞান ভাবনা বা চিন্তা। মনের ক্রিয়াশক্তির নাম ইচ্ছা। মনের যাবতীয় অবস্থাকে এই তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। ভয়, ভক্তি, ভালবাসা, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি অনুভূতির অন্তর্গত। ধ্যান, ধারণা স্মরণ মনন ইত্যাদি ভাবনার অন্তর্গত। বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, অধ্যবসায় ইত্যাদি ইচ্ছার অন্তর্গত।

অনুভূতি, ভাবনা এবং ইচ্ছা প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক অবস্থা-নিচয়ের সমষ্টির নাম 'মন' বলা যাইতে পারে। আমাদের মনে কত ভাবের উদয় হইয়াছিল এবং হইতেছে; কত চিন্তার উদ্রেক হইয়াছিল এবং হইতেছে; কত প্রকারের ইচ্ছা করিয়াছি এবং করিতেছি। এইরূপে কত ভাব-ভাবনার আবির্ভাব এবং তিরোভাব হইতেছে। এখন যাহা অন্তর্হিত মনে করিতেছি, তাহার পুনরভ্যুত্থান অসম্ভব নহে। এখন যাহা বিস্মৃত হইয়াছি মনে হইতেছে, পুনরায় তাহা স্মৃতিপটে উদিত হইতে পারে। অতএব মন বলিতে কেবল বর্ত্তমান অবস্থা বুঝায় না, অতীত অবস্থাও বুঝায়। অতীত এবং বর্ত্তমান যাবতীয় মানসিক অবস্থা-সমষ্টির নাম মন।

আনুভাবিক মনের অর্থ।

কিন্তু মনের এমন অর্থ করিলে যেন মনের প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হইল

না মনে হইতেছে। বস্তু ব্যতীত বর্ণ থাকিতে পারে না ; অবস্থাও থাকিতে পারে না। অনুভূতি, ভাবনা, ইচ্ছা ইহারা অবস্থা মাত্র। কিন্তু কিসের অবস্থা ? যেখানে অনুভূতি আছে, ভাবনা আছে, ইচ্ছা আছে, সেখানে এমন "কিছু" আছে যাহা অনুভব করে, ভাবনা করে, ইচ্ছা করে। অবস্থার অন্তরালে কিছু আছে বলিয়াই অবস্থার স্থিতি সম্ভব। এই "কিছু"টি বাদ দাও, অবস্থাও বাদ পড়িবে। মানষিক অবস্থাও কোন "কিছুর" অবস্থা। সুতরাং মানসিক অবস্থা-সমষ্টিকে মন না বলিয়া, ইহারা যাহার অবস্থা তাহাকেই মন বলা উচিত। আমি অনুভব করিতে পারি, চিন্তা করিতে পারি। আমার 'যাহা' অনুভব করে, চিন্তা করে, ইচ্ছা করে, তাহাই মন। ইচ্ছা, অনুভূতি এবং জ্ঞানের ব্যাপারে 'যাহার' প্রকাশ হয়, তাহাই মন।

মনের আধ্যাত্মিক অর্থ।

বস্তু ব্যতীত যেমন অবস্থা থাকিতে পারে না, তেমনি অবস্থা ব্যতীত বস্তুও থাকিতে পারে না ; অবস্থাতেই বস্তুর বিকাশ এবং প্রকাশ হয় ; এবং বস্তুই অবস্থার আধার, বস্তুই বিবিধ অবস্থার সামঞ্জস্য এবং সম্বন্ধ স্থাপন করে। সুতরাং মন বলিতে "অবস্থা" এবং "বস্তু" দুই-ই বুঝিতে হইবে। "বস্তু" এবং "অবস্থা" একই জিনেষের দুই দিক মাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উপরিউক্ত দুইটি অর্থই অসম্পূর্ণ; কিন্তু একত্র দুইটিই আবার সম্পূর্ণ। সুতরাং যাবতীয় মানসিক ব্যাপার এবং এই ব্যাপারে যাহার প্রকাশ হয়, তাহাই মন। অতএব তিন প্রকারের মনোবিজ্ঞান আছে—আনুভাবিক মনোবিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান, দার্শনিক মনোবিজ্ঞান।

মনের দার্শনিক অর্থ।

এখন দেখা যাউক, "বিজ্ঞান" কাহাকে বলে। বহু দূরে একটী পদার্থ দেখিতেছি। পদার্থটী সচল বোধ হইতেছে। মনে হইতেছে, ইহা ক্রমশঃ

আমাদের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। প্রথমতঃ বুঝিতে পারিলাম না, পদার্থটি সজীব কি নির্জীব। কিয়ৎক্ষণ পরে যাহা হউক ঠিক করিলাম যে, এটি সজীব পদার্থ; কিন্তু এখনও বলিতে পারি না, ইহা পশু কি মানুষ। পরে যখন ইহা আরও নিকটবর্ত্তী হইল, তখন বুঝিলাম যে, ইহা একটি চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ; অবশেষে স্থির করিলাম যে, এই চতুষ্পদ জন্তুটি অশ্ব। অভিজ্ঞতার সাহায্যে যাহা অস্পষ্ট ছিল, তাহা এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল, সংশয় সত্যে পরিণত হইল। এই প্রকারেই জ্ঞানের বিকাশ এবং বিস্তৃতি হয়। কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেরই এই একই প্রণালীতে জ্ঞানোন্মেষ হয়; প্রথমতঃ, আমাদের জ্ঞান অপরিস্ফুট, অস্পষ্ট, অসংলগ্ন এবং সঙ্কীর্ণ থাকে; এবং যতই আমাদের অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হয়, ততই আমাদের জ্ঞান পরিস্ফুট, স্পষ্ট, সুশৃঙ্খল এবং বিস্তৃত হয়। সকলেই জানেন, জল এক প্রকার তরল পদার্থ এবং ইহা দ্বারা আমাদের তৃষ্ণার শান্তি হয়। কিন্তু এ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান, সম্যক্ জ্ঞান নহে। জল সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জানিতে হইবে জলের উপাদান কি? কোন্ উপাদানটির পরিমাণ কত? কোন্ উপাদানটির কি কার্য্য? যখন অভিজ্ঞতার সাহায্যে জলসম্বন্ধে এই তিন প্রকার জ্ঞানলাভে সমর্থ হইলাম, তখন আমাদের জ্ঞান সম্যক হইল। এই সম্যক জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলে। কোন জিনিষের "মোটামুটি" জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে না; কিন্তু ঐ জ্ঞান যখন পরিবর্দ্ধিত এবং পরিমার্জ্জিত হয়, তখনই বিজ্ঞানে পরিণত হয়। একজন ভাস্কর একটি প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ-মানসে একখণ্ড প্রস্তর-ফলক লইয়া কল্পিত মূর্ত্তির আয়তন অনুসারে প্রস্তরখানি অস্ত্রের সাহায্যে গমনোপযোগী করিল। এখন এই প্রস্তর-ফলকে দৃষ্টিপাত করিলে কেবল কল্পিত মূর্ত্তির আভাসমাত্র মনে হয়। এখন কোন অঙ্গই বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। পরে ভাস্কর একটি একটি

বিজ্ঞানের অর্থ।

করিয়া সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিই ফুটাইয়া তুলিল—যেখানে যেটি যেমনভাবে আবশ্যক, তেমনি করিয়াই গঠন করিল। এখন তুমি আর একবার ঐ প্রস্তরফলকে দৃষ্টিপাত কর—দেখিবে, বুঝিবে, এটি কোন্ মূর্ত্তি এবং কেমন মূর্ত্তি। আমাদের অনেক জিনিষেরই আভাস-জ্ঞান আছে, কিন্তু এরূপ আভাস-জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায় না। কোন জিনিষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, ঐ প্রস্তর-মূর্ত্তির মত সেই জিনিষের প্রত্যেক অংশের প্রত্যেক উপাদানের বিষয় জানিতে হইবে; এবং আরও জানিতে হইবে, ঐ উপাদানগুলি কেমনভাবে সজ্জিত এবং কি নিয়মে সমন্বিত। প্রস্তর-মূর্ত্তির অঙ্গগুলির একত্র সমাবেশ যদি না দেখা যায়, তবে মূর্ত্তিটির সম্বন্ধে ধারণা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তেমনি, কোন বস্তুর প্রত্যেক অংশের কেবল পৃথক-পৃথক জ্ঞান লাভ করিলেই হইবে না, কেমনভাবে সেই সকল অংশের একত্র সমাবেশ হইয়াছে, ইহাও দেখিতে হইবে। বস্তুবিশেষের উপাদান-নির্ণয়, উপাদানাবলীর কার্য্য-নির্ণয় এবং তাহাদের সম্বন্ধ নিরূপণ—বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানের ন্যায় মনোবিজ্ঞানের করণীয় আছে। মন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জানিতে হয় মনের উপাদান কি? উপাদানবলির কার্য্য কি? উপাদান সমূহের সম্বন্ধ কি? এবং মনের বিকাশ প্রণালী কিরূপ? অতএব মনোবিজ্ঞানের—

উদ্দেশ্য {
- মানস ব্যাপারের বিশ্লেষণ
- মানস ব্যাপারের কার্য্যাবলি নির্দ্ধারণ
- শরীর ও মনের সম্বন্ধ নিরূপণ
- মনের বিকাশ বিধি নির্ণয়

মনসম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মনের ব্যাপার সমূহের বিভাগ করা প্রয়োজন; ব্যাপার সমূহের কার্য্যাবলি নির্ণয় করা প্রয়োজন; শরীরাবয়বের সহিত মানস ব্যাপারের সম্বন্ধ-নির্ণয় প্রয়োজন; মাত্র সম্বন্ধ-

নির্ণয় করিলেই হইবে না, বহু ঈক্ষণ পরীক্ষণের সাহায্যে উহাদের পরিমাণগত সম্বন্ধ নির্ণয় করাও বিশেষ প্রয়োজন। উদ্বোধকের মাত্রার সহিত উদ্বুদ্ধ মানস ব্যাঁপারের মাত্রার সম্বন্ধ নির্ণয় প্রয়োজন। আবার কি প্রণালীতে মনের বিকাশ হইতেছে, না জানিলে মন সম্বন্ধে জ্ঞান সম্যক হয় না কিন্তু বিকাশ প্রণালী জানিতে হইলে শিশুদের মন সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক; জাতির এবং সমাজের মানসিক উন্নতি ও অবনতির বিষয় জানা আবশ্যক; শিশুর মনের সহিত যুবকের মনের এবং মানব মনের সহিত পশুর মনের তারতম্য জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আবার সুস্থ মনের বিষয় জানিতে হইলে বিকৃত মনের অবস্থাও জানা দরকার। অতএব একই মনোবিজ্ঞান বহু প্রকারের হইতে পারে। যথা—

১। বিভাগময় মনোবিজ্ঞান (মনের বিশ্লেষণ)

২। দৈহিক মনোবিজ্ঞান (দেহ ও মনের সম্বন্ধ)

৩। পরীক্ষাময় মনোবিজ্ঞান (দেহ ও মনের পরিমাণগত সম্বন্ধ)

৪। অপসীমক মনোবিজ্ঞান (বিকৃত মনের বিজ্ঞান)

৫। বিকাশময় মনোবিজ্ঞান (মনের বিকাশ প্রণালীর বিজ্ঞান)

(ক) বাল মনোবিজ্ঞান (বালকের মনের বিজ্ঞান)

(খ) জাতি মনোবিজ্ঞান (জাতীয় মনের বিজ্ঞান)

(গ) সামাজিক মনোবিজ্ঞান (সামাজিক মনের বিজ্ঞান)

(ঘ) তারতম্যাত্মক মনোবিজ্ঞান (এক মনের সহিত অপর মনের তুলনা)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চিত্তানুসন্ধান প্রণালী।

"বল তবে তুই বুঝিলি কেমনে,
সুভদ্রার অনুরাগ ?"
"বুঝ তুমি কিসে বীণায় আমার
বাজে কি রাগিণীরাগ ?"

অন্তর্দ্দর্শন প্রণালী।

আমি উপন্যাস পড়িতেছি। আমার মনে কত ভাবের, কত চিন্তার উদয় হইতেছে। কখনও হর্ষ, কখনও বিষাদ, কখনও বিরক্তি, কখনও ক্রোধ, কখনও সংশয় ইত্যাদি কত ভাবের উদয় হইতেছে; কিন্তু যখনই যেটি আমার মনে আসিতেছে, সেইটিকেই আমি চিনিতে পারিতেছি। তুমি আমাকে দুইটি ফল দিলে; ফল দুইটি আমি খাইয়া ফেলিলাম এবং বলিলাম একটি আর একটি অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু। এখানে আমি ফলের দিকে—বাহ্যবস্তুর দিকে—দৃষ্টিপাত করিতেছি না। এখন আমার দৃষ্টি বাহিরে নয়—অন্তরে; এখন আমার দৃষ্টি ফলে নয়—মনে। ফল খাইয়া ফেলিয়াছি। ফল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি না—পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি আমার মন। ফলের আস্বাদন এখন ফলে খুঁজিতেছি না, জিহ্বাতেও খুঁজিতেছি না—খুঁজিতেছি আমার মনে। যখন একটি ফল খাইলাম, তখন জিহ্বার আস্বাদনহেতু আমার মনে এক ভাবের উদয় হইল; পরে আর একটি খাইলাম, আর এক ভাবের উদয় হইল। এক্ষণে মনের এই ভাব দুইটির

পার্থক্য লক্ষ্য করিলাম এবং বুঝিতে পারিলাম, একটি আর একটি অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু। সুতরাং আমি যে কেবল বাহিরের বস্তুই দেখিতে পাই তাহা নহে,—আমি আমার মনের বিষয়ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি। আমার মনে যখনই যে ব্যাপার ঘটিতেছে, আমি তাহারই সংবাদ রাখিতেছি। এ সংবাদ রাখিবার শক্তি আমার আছে। মনের চাঞ্চল্য, হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য, প্রাণের আবেগ, চিত্তের আকর্ষণ, চেষ্টার প্রয়োগ, মনের সুখ দুঃখ প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক ব্যাপারগুলির উৎপত্তি, স্থিতি এবং পরিণতির বিষয় অবগত হইয়া থাকি। এক কথায়, অন্তর্দ্দর্শন সম্ভব। অন্তর্দ্দর্শন সম্ভব বলিয়াই বলিতে পারি—

"কেন আজি প্রাণ মোর হতেছে চঞ্চল ?
যেন কিছু ভাল নাহি লাগে,
কি জানি কি যেন মনে হয় !
চুম্বকের আকর্ষণ, লৌহ যথা
কোন মতে নাহি পারে হেলা করিবারে,
সেই মত শত চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল মোর,
প্রাণ মোর নারিনু ফিরাতে।"

আমি যে কেবল আমার মনের কথাই জানিতে পারি, তাহা নহে,—অপরের মনের কথাও জানিতে পারি। কিন্তু যে উপায়ে আমার মন জানিতে পারি, অপরের মন সে প্রণালীতে জানা যায় না। আমার মন আমাতেই আছে ; সুতরাং অন্তর্দ্দর্শনের সাহায্যে আমার মন আমি জানিতে পারি। কিন্তু অপরের মন আমার বাহিরে—সুতরাং এখানে বহির্দ্দর্শন আবশ্যক। আমি একখানি পুস্তক পড়িয়া বলিলাম পুস্তককর্ত্তা একজন 'জ্ঞানী' লোক ; তুমি তোমার ভৃত্যকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেছ, দেখিয়া বুঝিলাম তুমি 'নিষ্ঠুর' ; পাচক

বহির্দ্দর্শন প্রণালী।

আজ তোমার ভাত দিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়াছে, তুমি ভাতের থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলে; আমি বুঝিলাম তুমি 'ক্রোধপরায়ণ।'

এই প্রকারে অপরের মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়, ইচ্ছা করিলে আমি তাহা বুঝিতে পারি। অতএব আমি যে কেবল নিজের চিত্তই অনুসন্ধান করিতে পারি, তাহা নহে, অপরের চিত্ত অনুসন্ধান করিবার শক্তিও আমার আছে। তোমার তারায়, তোমার নয়নে, তোমার অধর-কোণে, তোমার গণ্ডে আমি তোমার মনের ভাষা বুঝিতে পারি।

"কি তারায়, কি নয়নে, শান্ত স্থির সে বদনে,
ক্ষুদ্র সেই অধর কোণায়,
কি ত্রিদিব-কোমলতা, কি ত্রিদিব-স্নেহকথা
হৃদয়ের ভাসিতেছে হায়!"

আবার দেখ—

"লাবণ্য-মণ্ডিত গণ্ড—দন্তের ছটায়
চিত্ত প্রতিবিম্ব যেন প্রজ্জ্বলিত এবে
সর্ব্ব অঙ্গে, অবয়বে, ললাটে, গ্রীবায়!"

সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ না হইলে নিজের চিত্তই হউক বা অপরের চিত্তই হউক, সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিতে পারা যায় না। পূর্ব্ব হইতে কোন ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনুসন্ধানকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে প্রমাদ ঘটীবার সম্ভাবনা। তুমি যাহাকে মন্দ বলিয়া জান, সে ভাল কাজ করিলেও তুমি তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবে; তাহার ব্যবহার ভাল হইলেও তুমি তাহার অভিপ্রায় মন্দ মনে করিতে পার। তুমি যাহাকে তোমার শত্রু বলিয়া জান, সে তোমাকে সৎ পরামর্শ দিলেও তুমি তাহার উদ্দেশ্য মন্দ মনে

চিন্তানুসন্ধান প্রণালীর সম্বন্ধ।

করিয়া তাহার পরামর্শ উপেক্ষা করিতে পার। এইরূপে সন্দেহ, ভ্রান্তি, অলীক কল্পনা প্রভৃতি নানা বিপত্তির উৎপত্তি হইতে পারে।

অতএব কোন পূর্ব্ব ধারণা হইতে মনকে একেবারে বিনির্ম্মুক্ত করিতে না পারিলে পরচিত্তানুসন্ধান-কার্য্য নির্দ্দোষ হইতে পারে না। সকলেই নিজের নিজের পক্ষপাতী; সেই জন্য নিজের মনও আমরা অনেক সময় বুঝিতে পারি না। আমি অপরকে কুটিল, স্বার্থপর এবং সঙ্কীর্ণমনা বলি এবং সময় সময় তাহার নিন্দাবাদ করিতেও কুণ্ঠিত হই না। আমিও হয় ত কুটিল, আমিও হয় ত স্বার্থপর, হয় ত আমার মনও সঙ্কীর্ণ; কিন্তু আমি আমার কুটিলতা, আমার স্বার্থপরতা, আমার সঙ্কীর্ণতার কথা মনে করিতে পারি না। আমি আমার পক্ষপাতী; তাই আমি—

"আপন জনায় চিনতে নার
জীবন ভরব—অভিমানে",

আমার নিজের দোষ নিজে দেখিতে পাই না—দোষকেও হয় ত গুণ মনে করি। যদি আমার পক্ষপাতিত্ব দোষ না থাকিত, তাহা হইলে মনের গতিবিধি ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতাম, দোষ-গুণের বিচার করিতে পারিতাম, চরিত্রের উন্নতি করিতাম। নিরপেক্ষতার অভাব বলিয়াই আমি আমাকে চিনিতে পারি না, অপরকেও বুঝিতে পারি না। নিজেকে চিনিতে পারি না বলিয়া নিজের প্রতি আমার কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে পারি না; অপরকেও চিনিতে পারি না বলিয়া অপরের প্রতিও আমার কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। নিরপেক্ষতার অভাবহেতু অনেক সময় আমরা সত্যের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাই না। ইহার অভাবে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং ভ্রান্তি অনেক স্থলে নৈরাশ্যের মূল। আবার যখন ভ্রান্তির মেঘ কাটিয়া যায়, প্রত্যেক জ্যোতিঃ প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন আবার আক্ষেপ বা অনুতাপের সৃষ্টি হয়। নিরপেক্ষতার অভাব

হইতে যেমন সময় সময় নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়, তেমনই আবার অলীক আশার সৃষ্টি হইয়াও সত্যকে মিথ্যায় এবং মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করে।

"হয়োনা উন্মত্ত তুমি আশার নেশায়!
রঙিল স্ফটিক যথা, মানব নয়নে
সৌন্দর্য্য মাথায়ে দেয়,
শোভাহীন ধরণীর বুকে,
সেই মত আশা কুহকিনী,
ছাঁকিয়ে সুষমাখনি
মনের মতন করি মিথ্যারে সাজায়।"

মনের গতি-বিধি, মনের কার্য্যকলাপ সুন্দররূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে মনোযোগের আবশ্যক। যদি তুমি মনকে স্থির করিতে না পার, যদি তুমি মনকে সংযত করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মিবে। বাহিরের বস্তু সর্ব্বদাই আমাদের চিত্তের চঞ্চলতা উৎপাদন করিতেছে।

"অন্তর সে ধীরে বুকে আনিবারে চায়,
বাহির সে কোলাহলে তোমারে তাড়ায়।"

শিশুর ক্রন্দনে, পক্ষীর কূজনে, অশ্বের পদধ্বনিতে আমাদের চিত্ত সর্ব্বদাই আকৃষ্ট হইতেছে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতেছে। মন যতক্ষণ এরূপ ভাবে বিক্ষিপ্ত থাকিবে, ততক্ষণ মানসিক ব্যাপারের পর্য্যালোচনা সম্ভব হইবে না। চিত্তের স্থৈর্য্য ব্যতীত চিন্তানুসন্ধান অসম্ভব। অবধান ব্যতীত চিত্তের স্থৈর্য্য-সম্পাদন করিতে পারা যায় না; এবং বাহিরের উপদ্রব যতক্ষণ চিত্তকে আলোড়িত করিবে, ততক্ষণ কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ সম্ভবপর হইবে না। মনঃসংযোগ ব্যতীত অনুসন্ধান

অসম্ভব। শরীর এবং মনের সুখ-স্বচ্ছন্দতা ও চিন্তানুসন্ধানের বিশেষ সহায়। আমার শরীর যখন অবসন্ন, মন যখন অশান্তিপূর্ণ, তখন কোন নির্দ্দিষ্ট মানসব্যাপারে চিত্তসন্নিবেশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন অবস্থায় মানস-ব্যাপারের পর্য্যালোচনা এবং পর্য্যবেক্ষণ সূক্ষ্ম হওয়া ত দূরের কথা, বরং ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হইবে। অতএব—

"বিরাম কাজেরই অঙ্গ একসাথে গাঁথা,
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।"

আমার মন আমাতেই সত্য, কিন্তু তথাপি ইহার তথ্য নিরূপণ বিশেষ সহজ-সাধ্য নহে। কারণ—

"সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর।
বড় কঠিন সাধনা যার
বড় সহজ সুর।"

সকল মনুষ্যেরই মন আছে; কিন্তু সকলেই নিজের মন বুঝিতে পারে না। অন্তর্দ্দর্শন সকলেরই সম্ভব নহে—শিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই পক্ষে সম্ভব। শিশুর মনে এবং নিরক্ষর ব্যক্তির মনে কত চিন্তা, কত ভাবের উদয় হইতেছে; কিন্তু তাহারা কি সেই সকল ভাবের বা চিন্তার স্বরূপ-নির্ণয়ে সমর্থ হয়? বালক হউক, যুবা হউক, বৃদ্ধ হউক—প্রবাস-প্রত্যাগত ব্যক্তি মাত্রেরই দূর হইতে নিজ গৃহ দেখিতে পাইলে হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে; কিন্তু চন্দ্রশেখরের মত কয়জন এই আনন্দের কারণ-নির্ণয়ে লিপ্ত হয়? চন্দ্রশেখর তত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্বজিজ্ঞাসু। আপনা-আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, বিদেশ হইতে আগমনকালে স্বগৃহ দেখিয়া হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হয় কেন? আমি কি এতদিন আহার-নিদ্রার কষ্ট পাইয়াছি? গৃহে গেলে বিদেশ অপেক্ষা কি সুখী

অন্তর্দ্দর্শনে অন্তরায়।

হইব ?" অন্তর্দ্দর্শনকালে দৃষ্ট বস্তুর রূপান্তর ঘটিয়া থাকে; সুতরাং প্রকৃত বস্তুর দর্শনলাভ হয় না। তোমার মনে ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে; এখন তোমার মনে অনুভূতির প্রাধান্য। তুমি অন্তর্দ্দর্শনে প্রবৃত্ত হইলে। ক্রোধের উপাদান, ক্রোধের স্বরূপ-নির্ণয়ার্থ চিত্ত সংযোগ করিলে; কিন্তু ঐ দেখ, তোমার ক্রোধের রূপান্তর হইয়া গেল, অনুভূতির প্রাবল্য কমিয়া গেল, চিন্তার স্থির আলোকে ক্রোধের রক্তিমা অপহৃত হইয়া গেল! পুনশ্চ মনের ব্যাপারগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট—বড়ই জটিল; সুতরাং কোন একটি ব্যাপারের বিশেষ পরিচয় লওয়া কষ্টসাধ্য। একের ছায়া অন্যটির উপর পড়িতেছে, একের সঙ্গে অন্যটি মিশিতেছে।

"পুরুষ হৃদয়ে নিরন্তর ফুটিতেছে
সহস্র বাসনা, তৃপ্ত সাধ অতৃপ্তের
সনে একস্রোতে যেতেছে ভাসিয়ে
নব আকাঙ্ক্ষার পুন হতেছে উদয়।"

'ভয়' একটি মানসিক ব্যাপার,—কিন্তু ইহা একটি ব্যাপার হইলেও ইহা জটিল—ইহাতে অনুভূতি আছে, ভাবনা আছে। আবার যাহাকে তুমি অনুভূতি বলিতেছ, তাহাতে ভাবনা আছে এবং ইচ্ছা আছে; যাহা ভাবনা বলিতেছ, তাহাতে অনুভূতি আছে এবং ইচ্ছা আছে; এবং যাহা ইচ্ছা বলিতেছ, তাহাতে ভাবনা আছে এবং অনুভূতি আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অন্তর্দ্দর্শনে মনোনিবেশ প্রয়োজন। কিন্তু ঐ দেখ—

"পলে পলে সুখ দুখ,
ভরিয়া যাইছে বুক,
ক্ষণে রোষ, ক্ষণে হর্ষ, ক্ষণে অভিমান
উপজিছে মনে।"

মানসিক ব্যাপারগুলি আদৌ স্থিতিশীল নহে—একটির পর একটি

আসিতেছে, একটির পর একটি যাইতেছে;—সুতরাং ইহাদের কোন একটিকে অবধান করিতে হইলে সেটিকে অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও মানসপটে ধরিয়া রাখিতে হইবে। অতএব যদি আবির্ভাবমাত্রই ইহার তিরোভাব হয়, তবে অবধান করিবার সময় পাইলাম কৈ? মনের কোন একটি অবস্থাকে স্থায়ী করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন—সাধনার আবশ্যক।

"অনন্ত অদ্ভুত তোর লীলার বিভঙ্গ,
ক্ষণকাল নহ ক্ষান্ত মুহুর্ত্তেক নহ শ্রান্ত
মানব হৃদয় তটে খেলায়ে তরঙ্গ—
বহুরূপী-রূপ ধরি করিতেছ রঙ্গ।"

অন্তর্দ্দর্শনের সাহায্যে আমি আমার নিজের মনের বিষয় সাক্ষাৎভাবে অবগত হইতে পারি; কারণ, আমার মন আমাতেই আছে। কিন্তু বহির্দ্দর্শনকালে সেরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব নহে। আমার মনে যখন যে ভাবটির উদয় হইতেছে, অবধান করিলে তখনই সে ভাবটির বিষয় অবগত হইতেছি। কিন্তু এরূপ সোজাসুজিভাবে পরচিত্ত অনুসন্ধান করিবার উপায় নাই। চিন্তাভিব্যঞ্জক লক্ষণসমূহের সাহায্যেই পরচিত্ততত্ত্ব নিরূপিত হয়।

বহির্দ্দর্শনের অন্তরায়।

"সদা চিন্তাকুল সীতা, সদা অন্যমনা,
চাহে চারিদিকে মুগ্ধ কুরঙ্গ-নয়না
সপ্রশ্ন বিস্ময়ে; সদা আতঙ্ক-বিহ্বল।"

মনের ভাব মনেই থাকিয়া যায় না, বাহিরেও প্রকটিত হয়। সীতা অন্তঃপুরের মহিলাদিগের সহিত প্রাণ ঢালিয়া কথোপকথন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার "হাব ভাবে" তাঁহার মনের ব্যথা কাহারও অগোচর থাকিতেছে না। আবার দেখ—

*   *   "এই কতিপয় ছত্র।
কতিপয় ছত্র, পত্রে ;—বটে সত্য—
কিন্তু কি বিকাশ, কি চরিত্র-মহত্ত্ব,
কি কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, কি নিগূঢ় ব্যথা,
কি সংযম, ধৈর্য্য স্তব্ধ বিশালতা,
এই ক্ষুদ্র পত্রে।"

ক্ষুদ্র পত্রের সামান্য কয়েকটি ছত্র হইতে "চরিত্র-মহত্ত্ব", "কর্ত্তব্যনিষ্ঠা" "নিগূঢ় ব্যথা" "সংযম" "ধৈর্য্য" "বিশালতা" ইত্যাদি মানসিক ব্যাপারের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আবার শারীরিক গঠন প্রণালীতেও মনের চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। অন্তর্জগতের ভাষা বাহ্যজগতে ব্যক্ত হইতেছে। তোমার যদি এই ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা থাকে, তুমি অন্তর্জগতের যাবতীয় তথ্য-নির্ণয়ে সমর্থ হইবে। কবির মনের ভাষা শিল্প ; কর্ম্মীর মনের ভাষা কার্য্য ; রাজার মনের ভাষা শাসনপ্রণালী ; সমাজের মনের ভাষা ইতিহাস। তুমি এই সকল ভাষার আলোচনা কর—অপরের চিত্তে প্রবেশলাভ করিতে পারিবে। অন্তর্জগতে যখন যে ভাবটির উদয় হইতেছে, বহির্জ্জগতে—শরীরে হউক, ভাষায় হউক, কর্ম্মে হউক, তখনই সে ভাবটির প্রতিবিম্ব পড়িতেছে। এই বাহ্য প্রতিবিম্ব হইতে আন্তরিক মানসব্যাপারের বিষয় অনুমান করিতে হইবে। শরীর, ভাষা এবং কর্ম্ম, মানস ব্যাপারের অভিব্যঞ্জক। আমার শারীর-যন্ত্রের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কর, আমার কথিত বা লিখিত ভাষার অর্থ হৃদয়ঙ্গম কর, আমার কর্ম্মের আলোচনা কর, আমার মনের গতিবিধি তোমার অগোচর থাকিবে না।

"মরম যে গোপ্য মন্ত্র চাহিল লুকাতে
চীৎকারি প্রকাশ তাহা করিল বদন।

আত্মা যাহা বাঁধিবারে চাহে আপনাতে,
ইন্দ্রিয়-প্রহরী তার কাটিল বাঁধন।"

আমার মন তোমার মনে প্রবেশ করিতে পারে না; সুতরাং তুমি আমার মন সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করিতেও পার না। কিন্তু আমি তোমার শরীরে, তোমার ভাষায়, তোমার কর্ম্মে, তোমার মনের কথা বুঝিতে পারি। তোমার চক্ষু যখন রক্তবর্ণ হয়, শরীর কাঁপিতে থাকে, হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হয়, যখন তুমি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ কর, তখন আমি অনুমান করি তুমি ক্রোধপরবশ হইয়াছ। কারণ আমি যখন ক্রোধান্বিত হইয়াছি, তখন আমাতেও ঐ সকল বাহ্য-লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। বিজ্ঞান এবং ভাষা বুদ্ধিবৃত্তির, সমাজনীতি এবং রাজনীতি ইচ্ছাবৃত্তির, কলাবিদ্যা অনুভূতির এবং ধর্ম্ম ত্রিবিধ বৃত্তির প্রকাশক। এই সকল প্রকাশকের সাহায্যে অপরের মন পরীক্ষা করা যাইতে পারে। অনেক সময় আমরা কৃত্রিম বাহ্য লক্ষণের দ্বারা প্রকৃত মনের ভাবকে গোপন রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকি;

"ওহো বুঝিয়াছি!
পাছে তব মনোভাব
প্রতিবিম্ব ফেলে তব নয়ন-দর্পণে,
সেই হেতু আনন্দের দিনে,
বহুকষ্টে মুখভাব ক'রেছ গম্ভীর।"

সুতরাং এই সকল বাহ্য-লক্ষণ যদি কৃত্রিম হয়, যদি সযত্ন সিদ্ধ হয়, তবে আমাদের অনুমান ব্যর্থ হইতে পারে। আমি ক্রোধান্বিত না হইলেও ক্রোধের লক্ষণ দেখাইতে পারি; শোকান্বিত না হইলেও চক্ষের জলে এবং দীর্ঘশ্বাসে শোকপ্রকাশ করিতে পারি; হৃদয় আনন্দাপ্লুত হইলেও হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিতে পারি; কপট হইয়াও সাধুতার ভাণ

করিতে পারি; নাস্তিক হইয়াও সময়-বিশেষে দেবদেবীকে প্রণাম করিতে পারি।

"বক্তিয়ার! বক্তিয়ার! এখনও কি বুঝ
নাই রিজিয়ার মন? ভস্মাছন্ন বহ্নি
যথা পাংশু আবরণে রাখে লুকাইয়ে
আপন দাহিকা শক্তি, স্পর্শ মাত্রে ভস্ম
করে সব; রিজিয়াও—সেইরূপ, হাসি
দিয়ে রেখেছে ঢাকিয়ে হৃদয়ের তেজ।

অতএব মনে রাখিও—

"মুখ হাসে, নাহি হাসে চোক,
তার নাম নয় হাসি,
বুক না কাঁদিলে হয় না কান্না,
চোখে সুধু জলরাশি;
কণ্ঠ গাহিলে হয়নাক গান,
নাহি গাহে যদি প্রাণ;
আত্মা না দিলে, হাতে ক'রে দেওয়া,
নহে তাহা কভু দান।

আমরা নিজের মন দিয়াই পরের মন বুঝিয়া থাকি। অন্তর্দ্দর্শনের সাহায্যেই বহির্দ্দর্শন সম্ভব। কিন্তু যিনি দয়ালু, তিনি অপরকেও দয়ালু মনে করিতে পারেন; যিনি স্বভাবতঃ কুটিল, তিনি অপরকেও ঐ স্বভাব-বিশিষ্ট মনে করিয়া থাকেন।

* * * "যজ্ঞব্যবসায়ী—
কাপুরুষ তুমি ঋষি; বীরত্ব তোমার
অশ্বমেধ, নরমেধ; এই বীরত্বের

কেমনে বুঝিবে তুমি অতুল মহিমা,
মুষিকে বুঝিবে কি সে সিংহের গৌরব ?"

চিত্তাভিব্যঞ্জক ভাষাসমূহ সম্যক প্রকারে উপলব্ধি করিতে হইলে অনেক সময় কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়, কিন্তু কল্পনা অসংযত হইলে বা মাত্র অনুভূতি প্রণোদিত হইলে অবাস্তবের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কল্পনার অলীক আলোকে দৃষ্ট বস্তু রূপান্তরিত হইয়া যায়। স্নেহময়ী জননী তাঁহার ক্ষুদ্র শিশুটিকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতেছেন আর তাহার নয়নের আভায়, অধরের কোণে, প্রতিভার লক্ষণ দেখিতে পাইতেছেন। মানুষ সংস্কারের দাস কিন্তু সংস্কার অনেক সময়েই আমাদের পর্য্যবেক্ষণ প্রণালীকে দুষিত করিয়া দেয়। রাম আমার মিত্র কিন্তু তোমার শত্রু সুতরাং তাহার কার্য্যকলাপ, তাহার হাবভাব আমাদের উভয়ের নিকট একরকম প্রতীয়মান হইতে পারে না। তুমি যাহা ঘৃণার লক্ষণ মনে করিতেছ, আমি হয়ত তাহা প্রেমের পরিচায়ক মনে করিতেছি; তুমি যেখানে বিরাগ দেখিতেছ, আমি হয়ত সেখানে অনুরাগ দেখিতেছি। আবার, ইন্দ্রিয় সাহায্যেই আমরা বাহ্যিক লক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয় সকল সময়েই সত্যসমাচার সংগ্রহ করিতে পারে না। অনেক সময়েই যাহা দেখি নাই তাহা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়; যাহা শুনি নাই তাহা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয়। একবার আদালত গৃহে যাইয়া সাক্ষীদের জবানবন্দি শ্রবণ কর দেখিবে যে কোন দুইটি সাক্ষীর কথায় ঐক্য নাই। এখানে যে সকলেই সত্যের অপলাপ করিতেছে।তাহা নহে, অনেকেই তাহাদের ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কল্পনা, সংস্কার এবং ইন্দ্রিয় প্রবঞ্চনা এই তিনটি বহির্দর্শনের প্রধান অন্তরায়।

যদিও এই প্রণালীদ্বয় প্রমাদশূন্য নহে, কিন্তু ভূয়োদর্শন এবং অভিজ্ঞতার

সাহায্যে অনেক তথ্যের জ্ঞান লাভ হইতে পারে। এই প্রণালীদ্বয় পরস্পর সাপেক্ষ—একটি অপরটি ব্যতীত অসম্পূর্ণ। অন্তর্দ্দর্শন অত্যাবশ্যক। অন্তর্দ্দর্শনের দ্বারাই আমরা মন ও মানসিক ব্যাপারের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি।

উভয় প্রণালীই আবশ্যক।

মন জানিবার অন্য উপায় নাই। পরদর্শনও তদনুরূপ আবশ্যক। আত্মদর্শনে আমি আমার মনের বিষয় জানিতে পারি, তুমি তোমার মনের বিষয় জানিতে পার, সে তাহার মনের বিষয় জানিতে পারে। অতএব অন্তর্দ্দর্শনে তুমি একটি মনের বিষয় জানিতে পার, আমি একটি মনের বিষয় জানিতে পারি। কিন্তু একটি মনের জ্ঞান হইতে সার্ব্বজনিক সত্য নিরূপিত হয় না। একটি মনের পক্ষে যাহা সত্য, বহু মনের পক্ষে তাহা সত্য না হইতে পারে। অতএব সর্ব্ববাদিসম্মত মনস্তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে বহু মনের পরীক্ষা আবশ্যক এবং আত্মেতর মনের পরীক্ষা করিতে হইলেই বহির্দ্দর্শন প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আপনার মন না জানিলে পরের মন জানা যায় না। আপনার মন দিয়াই পরের মন জানা যায়। বাহ্যবস্তুর স্থিতি মনের বাহিরে হইলেও ইহার পরিচয় মনের ভিতর দিয়াই হইয়া থাকে।

"আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি,
পরের মন নিয়ে কি হবে ?
আপন মন যদি বুঝিতে নারি,
পরের মন বুঝে কে কবে।"

অবধান
চিত্তসংযোগাবস্থা

তৃতীয় অধ্যায়।

অবধান

মানুষের মন প্রায়ই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—নানা বিষয়ে, নানা কার্য্যে ব্যাপৃত। কখনও স্পর্শ, কখনও শ্রবণ, কখনও দর্শন, কখনও আস্বাদন ইত্যাদি নানাকার্য্যে মন সতত লিপ্ত। বাহিরের কোলাহলে এবং অন্তরের ভাবসমূহের ঘাতপ্রতিঘাতে অনবরত চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট হইতেছে।

অবধান কাহাকে বলে।

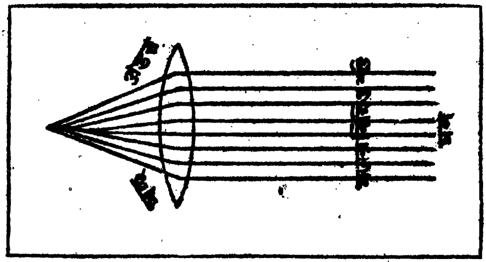
"অন্তরে দুর্দ্দান্ত হৃদি পড়িছে উঠিছে,
বাহিরে চৌদিক হতে ঝটিকা ছুটিছে;
যা কিছু ধরিতে চাই, কিছুই খুঁজে না পাই,
স্রোতোমুখে ছুটিয়াছি বিদ্যুতের মত
দিগ্বিদিক হারাইয়া হয়ে জ্ঞান-হত।"

মন যতক্ষণ এইরূপ বিক্ষিপ্ত এবং অসংযত থাকে, ততক্ষণ মনের কোন কার্য্য স্থায়ী হয় না, ফলদায়ক হয় না। সুতরাং, মনকে সংযত এবং কেন্দ্রীভূত করা আবশ্যক। মনের প্রসার চিত্তসংযমের দ্বারা সঙ্কীর্ণ করা যাইতে পারে। অপরাপর সাধারণ বস্তু হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া, কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর উপর নিয়োজিত করাই চিত্তসংযোগ বা অবধান।

"মানবের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি এই সৃষ্টির পাথারে
অস্থির হইয়া, শেষে শ্রান্ত, আপনারে
কোথায় হারায়ে ফেলে! তাই, সে নীরবে, ধীরে-ধীরে,

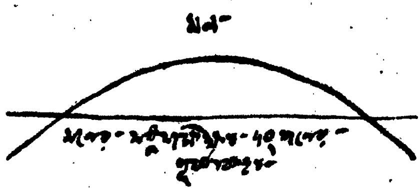
চিত্তেরে করিয়া স্থির, পশিয়া মন্দিরে,
প্রতিমারে করে পূজা ভাবিয়া বিশ্বের মূলাধার।"

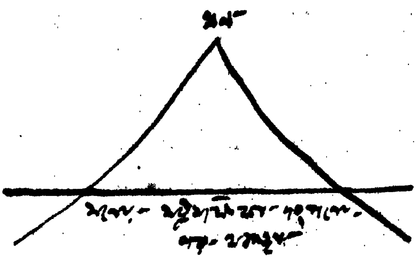
কোন একটি সূক্ষ্ম বস্তু দেখিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছি, কিন্তু আলোকের অপ্রাচুর্য্য হেতু সেটিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না। আমার চক্ষু এবং সেই বস্তুটির মধ্যে একখণ্ড স্বচ্ছ প্রস্তর রাখিয়া বিক্ষিপ্ত আলোককে একত্রীভূত করিলাম। আলো ঘনীভূত হইল, তেজ বৃদ্ধি পাইল এবং জিনিসটি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। তেমনি আলোকের



মত মনের বিক্ষিপ্ত শক্তিকে যত কেন্দ্রীভূত করিতে পারা যায়, মনের গ্রহণ-শক্তিও তত বৃদ্ধি পায়। আমি একখানি পুস্তক পড়িতেছি। একটি অস্পষ্ট শব্দ আমার কাণে আসিতেছে। কিন্তু সে শব্দে আমার পড়ার ব্যাঘাত হইতেছে না। প্রথমতঃ সে শব্দটি কিসের এবং কোথা হইতে আসিতেছে, বুঝিতে পারিলাম না। পুস্তকের বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া শব্দের দিকে লক্ষ্য করিলাম। শব্দটি ক্রমশঃই স্পষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে শব্দের কারণ এবং স্থান নির্ণয়ে সমর্থ হইলাম। গঙ্গার উপকূলে বসিয়া সান্ধ্যসমীরণ উপভোগ করিতেছি। কোন বিশেষ বিষয় ভাবিতেছি না, কোন বিশেষ বস্তু দেখিতেছি না।

কথনও বাড়ীর কথা, কথনও বিদ্যালয়ের কথা, কথনও আমার বন্ধুর কথা, ইত্যাদি কত কথাই মনে হইতেছে। এমন সময়ে হঠাৎ একটি মৌমাছি আসিয়া আমাকে দংশন করিল। চিন্তা এখন বহুমুখী নহে—ইহা এখন একদিকে, সেই মধুমক্ষিকা-দংশনজনিত যন্ত্রণার দিকে ধাবিত হইল। এখন আর ঘরবাড়ীর কথা, বন্ধুবান্ধবের কথা ভাবিতেছি না। মনঃ এখন অন্য বিষয়ে অনাসক্ত—মাত্র একটি বিষয়ে আসক্ত। মনের এই প্রকার একনিষ্ঠতাই অবধান।





অবধান ব্যতীত পরিস্ফুট চিন্তা, সুস্পষ্ট অনুভূতি এবং সুবিচারসঙ্গত ইচ্ছা থাকিতে পারে না। অবধান মনের একটী বিশেষ অবস্থা নহে। মানসিক ব্যাপারমাত্রেই ইহার প্রয়োজন আছে।

বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিতেছি। একটি বিকট শব্দ হইল।

আমরা উভয়েই চমকিত হইলাম। কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। আমরা ইচ্ছা করিয়া চমকিত হইনাই, ইচ্ছা করিয়া কথোপকথন বন্ধ করি নাই—ইহা ইচ্ছা ব্যতীত আপনা-আপনি হইয়া গেল। বাহিরের শব্দ আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিল। এরূপ চিত্ত-সংযোগে আয়াসের প্রয়োজন হইল না—ইহা অনিচ্ছা-প্রসূত।

অবধান দুই প্রকার—সচেষ্ট এবং নিশ্চেষ্ট।

"আপনা আপনি উঠে আঁখি মোর
সেই জানালার পানে,
আনমন হ'য়ে রহি দাঁড়াইয়া
কিছুক্ষণ সেইখানে"।

এবম্বিধ চিত্তসংযোগের নাম নিশ্চেষ্টাবধান। ইহার উত্তেজক বাহ্যিক—বাহিরের শক্তি-প্রভাবেই আমাদের মন আকৃষ্ট হইতেছে। এই শক্তির উপর আমাদের কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব নাই—আমরা ইচ্ছা করি, বা না করি—এ শব্দ আমাদিগকে শুনিতেই হইবে—ইহা আমাদের মন আকর্ষণ করিবেই।

"এক দিন অকস্মাৎ জলধির বাঁশরী কোথায়
আকুল-আহ্বান সুরে বাজিয়া উঠিল 'আয়' 'আয়'!
ভেঙ্গে গেল সুখ-স্বপ্ন, ভেঙ্গে গেল প্রেম-কারাগার,
* * * *
আমার সকল চেষ্টা, শত বাধা, সহস্র ক্রন্দন,
তোমার উত্তাল স্রোতে ভেসে গেল তৃণের মতন!"

এরূপ অবধান ক্ষণস্থায়ী—যতক্ষণ বাহ্যশক্তির স্থিতি, ততক্ষণ ইহার স্থিতি। তৎপরে শব্দটির কারণ এবং স্থান নির্ণয়ার্থ মনোনিবেশ করিলাম। কেন এমন শব্দ হইল? এ শব্দটি কিসের? কোথা হইতে আসিতেছে? ইত্যাদি নিরাকরণের নিমিত্ত অবধানের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এরূপ

অবধান আমরা না করিলেও পারিতাম। ইহার কারণ নির্ণয় করা না করা আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। এখানে চিত্তসংযোগ ইচ্ছাপ্রসূত—ইহা সচেষ্টাবধান। এখানে চেষ্টা করিতে হইতেছে, যত্ন করিতে হইতেছে। এখানে কোন বাহ্য শক্তির দ্বারা আমরা আকৃষ্ট হইতেছি না—ভিতর হইতে কোন শক্তি মনকে একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের দিকে চালাইয়া দিতেছে;—এ শক্তির উপর আমাদের যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব আছে—এ শক্তির উদ্বোধন বা সংগোপন আমাদের ইচ্ছাধীন। এরূপ অবধানের ফল স্থায়ী। যতক্ষণ ইচ্ছা, ততক্ষণ অবধান করিতে পারি।

"এখনও যুবতী বসি চাহি পথ-পানে
বিবশা, আপনাহারা, না দেখে নয়নে
রণক্ষেত্র; বনক্ষেত্রে না শুনে কাকলী।
কিছুক্ষণ ভ্রমি ঋষি অজ্ঞাতে পশ্চাতে
ডাকিলা—"মনসে"! বামা শুনিল না কাণে,
বিচিত্র প্রতিমা মত রহিল বসিয়া।
"পাপীয়সি"! স্বপ্নোত্থিতা, চমকিয়া বামা
দেখিল ফিরিয়া ঋষি।"

এখানে বামা সচেষ্টাবধানে তন্ময় ছিল; কিন্তু যখন "পাপীয়সী" আহ্বানে "স্বপ্নোত্থিতা, চমকিয়া বামা দেখিল ফিরিয়া ঋষি" তখন নিশ্চেষ্টাবধানের উৎপত্তি হইল। একজন শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুবীক্ষণ-যন্ত্র-সাহায্যে একবিন্দু নর-শোণিত পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। অদূরে একটি গর্দ্দভ চীৎকার করিতেছে। কিন্তু সে চীৎকারে পণ্ডিতের চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে না। শোণিতবিন্দুর ত কোন স্বাভাবিক আকর্ষণী-শক্তি নাই,—কিন্তু সে শক্তি গর্দ্দভের চীৎকারে যথেষ্ট পরিমাণে আছে; তবে গর্দ্দভের চীৎকারে তাঁহার চিত্ত কেন আকৃষ্ট হইতেছে না? তুমি-আমি

কত সময়ে কত রক্ত দেখিয়াছি, কিন্তু কৈ, আমাদের মনে ত উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কৌতূহল জন্মে নাই! কিন্তু গর্দ্দভের চীৎকার ত সকল সময়েই আমাদের মন আকর্ষণ করিয়াছে! কেন ঐ পণ্ডিত, যেটি অবধান করা অতি সহজ সেটিকে অবধান না করিয়া, অন্যটিতে তন্ময় হইয়াছেন? যেটি অন্য সময়ে তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিত, এখন তাহা কিসে এত নিস্তেজ হইল? প্রশ্নটি জটিল হইলেও, ইহার উত্তর সহজ। পণ্ডিতবর যখন শারীরবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রথম প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহাকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল,—অনেক যত্ন, অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ক্রমশঃই তাঁহার শারীর-বিজ্ঞানে আস্থা জন্মিল, অবধান-কার্য্য সহজ হইল—আর তত যত্ন করিতে হইল না—আর তত বেগ পাইতে হইল না। অবশেষে এমন হইল যে, অবধান করা অপেক্ষা অবধান না করা অসম্ভব হইল। ইহা অভ্যাসজনিত নিশ্চেষ্টাবধান।

"ধ্যানমগ্ন হে ঋষি তোমার, অকলঙ্ক শুভ্র পদতলে
ভক্ত আসি' নৈবেদ্য সম্ভার দিয়া গেছে তপ্ত অশ্রুজলে;
তবু তব ধ্যান ভাঙে নাই, কি গভীর, হে চির-কুমার,
কি গভীর ধ্যানযোগ তব, কি অটল প্রতিজ্ঞা তোমার!"

গৃহের একদিকে একটি তৈলবর্ত্তিকা, এবং অপর-দিকে একটি বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে। অবশ্য বৈদ্যুতিক আলোকেই আমাদের চিত্ত অধিক আকৃষ্ট হইবে। উজ্জ্বল আলোক বা উচ্চ শব্দে আমাদের চিত্ত যত সহজে আকৃষ্ট হয়, ক্ষীণ আলোকে বা মৃদু শব্দে তত সহজে হয় না। উদ্বোধকের শক্তি অধিক হইলেই অবধান-কার্য্য সহজ হয়। অতএব অবধান উদ্বোধকের শক্তির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। একই উত্তেজকের উপর মন

অবধান উদ্বোধকের পরিমাণ, প্রকার এবং প্রকৃতি অনুযায়ী।

অধিকক্ষণ নিবিষ্ট থাকিতে পারে না, পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমার সম্মুখের ঘড়িটি অনবরত টিক্-টিক্ করিতেছে, সে শব্দের দিকে আমার মন আকৃষ্ট নয়; কিন্তু যেই ঘড়িটি বন্ধ হইয়া যায় ও তাহার শব্দ থামিয়া যায়, আমার চিত্তও অমনি সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। গৃহে আলো জ্বলিতেছে, ক্ষুদ্র শিশুটি কাঁদিতেছে;—আলোটি নিবাইয়া দাও, শিশুর ক্রন্দন থামিয়া যাইবে। অন্ধকার গৃহে শিশু ক্রন্দন করিতেছে, বাতিটি জ্বালিয়া ফেল, শিশুটি অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য আর কাঁদিবে না। বক্তা একই রকম স্বরে বক্তৃতা করিলে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত তেমন আকর্ষণ করিতে পারেন না—তাঁহাকে তাঁহার স্বরের হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে হয়।

"সংসার যদি সমান চলিত
একটানা একঘেয়ে,
কত না তত্ত্ব গুমরি' মরিত
প্রকাশের পথ চেয়ে;
তপনের ছটা যদি না ফুরাত
ফুরালে দিনের নাট,
তা' হ'লে কি কভু ফুটিত প্রদোষে
ফুল্ল-তারার হাট।"

অতএব একই প্রকার উদ্বোধকে চিত্তসংযোগ স্থায়ী হয় না। উদ্বোধকের প্রকারভেদ হওয়া আবশ্যক। আবার উদ্বোধকের সহিত জড়িত সুখ-দুঃখের দ্বারাও চিত্তসংযোগ নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্ষুদ্র একটি বালক আঙ্গিনায় ক্রীড়া করিতেছে। একদিকে একজন অপরিচিতা আর একদিকে তাহার মাতা কথোপকথন করিতেছে। এরূপ স্থলে বালকের চিত্ত তাহার মায়ের স্বরের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইবে, কারণ মায়ের স্বরের সহিত তাহার সুখ-স্মৃতি জড়িত। কেহ-কেহ মনে করেন যে, ধন-যশ-মান প্রভৃতি পার্থিব বস্তু

হইতেই সুখলাভ হয়; সুতরাং ঐ সকল বস্তু সহজেই তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। আবার কেহ-কেহ ঈশ্বর-আরাধনায় হৃদয়ের শান্তি আছে ভাবিয়া, ঐ পার্থিব বস্তু সকলকে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন।

"আশে-পাশে কত ছড়ান রতন,
সে সব কিছু না চাই,
দেব-সেবা মোর ছিল পুণ্যকাজ,
শান্তি তাহাতে পাই"।

এবং সেই জন্যই

"সব ভেসে গেল রতন মাণিক
কিছু না দেখিনু চেয়ে,
আত্মহারা হয়ে ভুলে গেনু সব
দেবতা হৃদয়ে লয়ে।"

অতএব স্বার্থ-বিজড়িত উদ্বোধকই আমাদের চিত্তকে সহজে আকর্ষণ করে। উদ্বোধকের প্রকৃতি অনুসারে অবধানের প্রকৃতিও নির্ণীত হইয়া থাকে।

আমি যাহা অবধান করিব, তাহা যত সুস্পষ্ট হইবে, অবধান-কার্য্যও তত সহজ হইবে। অবধান-শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য উদ্বোধক আবশ্যক। উদ্বোধক একবারে নিস্তেজ এবং নিষ্প্রভ হইলে, অবধান-শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিতে অক্ষম হইবে। যে শক্তি ইন্দ্রিয়-স্পন্দন সম্পাদনে সক্ষম নয়, কিংবা সক্ষম হইলেও যে স্পন্দন মন পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না, সে শক্তি কেমন করিয়া আমাদের মন আকর্ষণ করিবে? একজন স্পষ্ট, আর একজন অস্পষ্ট স্বরে কথা কহিতেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা প্রথম ব্যক্তির কথা অবধান

অবধানের বাহ্য সহায়।

করা কি অধিক সহজ নহে? অবধানের বিষয় যত সুস্পষ্ট হয়, অবধানকার্য্যও তত সহজ হয়। উদ্বোধকের শক্তি-প্রাচুর্য্য অবধান-কার্য্যের পরম সহায়।

"অকস্মাৎ গীতপূর্ণ নির্জ্জন গহ্বরে
ভাসিল চীৎকার-ধ্বনি; ভৈরব গর্জ্জনে
কাঁপিল পর্ব্বত-রাজ্য; ভাঙ্গিল হঠাৎ
গীতমুগ্ধ যুবকের জাগ্রত স্বপন।"

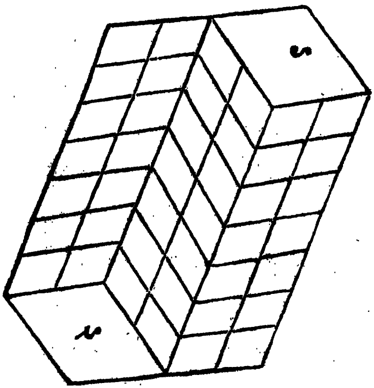
এক সেকেণ্ডের নিমিত্ত তোমার সম্মুখে একখানি ছবি ধরিলাম। উহা কিসের প্রতিকৃতি, তুমি বুঝিতে পারিলে না। আবার ধরিলাম, এখনও বুঝিতে পারিলে না। আবার ধরিলাম, আবার ধরিলাম,—এইরূপে বারংবার ধরিতে-ধরিতে তুমি ছবিটার সকল অংশে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইলে, এবং অবশেষে কিসের প্রতিকৃতি, বুঝিতে পারিলে। অতএব অবধান যে কেবল উদ্বোধকের শক্তির উপর নির্ভর করে, তাহা নহে। উদ্বোধক যদি স্থায়ী না হয়, যদি প্রকাশমাত্রেই অন্তর্হিত হয়, তবে অবধান-কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অবধান-কার্য্য সময়সাপেক্ষ, সুতরাং অবধান বিষয়ের স্থায়িত্ব আবশ্যক। যদি উদ্বোধক একান্তই ক্ষণস্থায়ী হয়, তবে ইহার পুনঃ-পুনঃ সংঘটন আবশ্যক। পুরাতন জিনিস অপেক্ষা নূতন জিনিসে আমরা অধিক আকৃষ্ট হই।

"জগতের কোন কাজে করি নাই মনোযোগ
চাহি নাই কিছুই জানিতে;—
সুচারু বদন তব তারে হেন অভিনব
সাজায়েছে আমার আঁখিতে।"

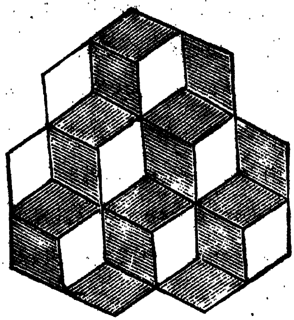
নূতন জিনিস সহজেই আমাদের মন আকর্ষণ করে। বালকেরা নূতন ছবি, নূতন পুস্তক বড়ই ভালবাসে। কিছুদিন পরে সেই ছবি, সেই পুস্তক পুরাতন হইয়া গেলে, আর সে দিকে মন দেয় না।

"পুরাতনের মাঝে হেরিলে নূতন
নূতনে হয় কিন্তু চিত্ত মগন।"
আবার— "নূতন রহে না চির নূতন—
প্রথা ইহা চির চিরন্তন।"

সুতরাং উদ্বোধকের নূতনত্বও অবধান-বিষয়ে বিশেষ সহায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব অবধান-কার্য্যের আর একটী সহায়। যদি একটী উদ্বোধকের আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী উদ্বোধক না থাকে, তবে চিত্তসন্নিবেশ করা সহজ হয়। কিন্তু একসঙ্গে যদি কতকগুলি উদ্বোধক উপস্থিত হয়, তবে চিত্তস্থৈর্য্য নষ্ট হইয়া যায়।



এই চিত্রটির প্রতি ক্ষণেকের নিমিত্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে—এখানে অবধান সচঞ্চল—কোন একটীতে স্থির থাকিতেছে না—একটী হইতে আর একটিতে আসিতেছে—আবার সেটি হইতে অন্যটিতে যাইতেছে। চিত্রখানি একচক্ষু দ্বারা দেখিলে কিংবা কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া দেখিলে অবধানের চাঞ্চল্য আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।



প্রতিদ্বন্দ্বী উদ্বোধকের সান্নিধ্য হেতু আমাদের অবধান একটি চিত্র হইতে অন্যটিতে অতি সহজেই চলিয়া যাইতেছে। অবধানের চাঞ্চল্য হেতু এই সমগ্র চিত্রটি ৬ কিংবা ৭টি ক্ষুদ্র চিত্রের সমন্বয় বলা তত সহজ হইতেছে না। একসঙ্গে চারিটি বালক চারি রকমে নৃত্য করিতেছে। তোমার চারি-জনেরই নৃত্য দেখিবার ইচ্ছা। তোমার মন একটি হইতে আর একটিতে ধাবিত হইতেছে—কোন একটিতে স্থির থাকিতেছে না। চিত্তমধ্যে পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান একই সময়ে উদিত হইতে পারে না।

"মন যে আমার পড়েছে সই, উভয়-সঙ্কটে।
এক কর্ণ বলে আমি কৃষ্ণ-নাম শুনিব
আর এক কর্ণ বলে আমি বধির হ'য়ে র'ব।
এক করে সাধ করে' ধরে কৃষ্ণ করে
আর এক করে করে নিষেধ করে তারে।
এক পদে কৃষ্ণপদে যাইবারে চায়
আর এক পদে, পদে পদে বারণ করে তায়।"

পরামর্শাতিশয্য (শক্তি-প্রাচুর্য্য), পৌনঃপুন্য, স্থায়িত্ব, নূতনত্ব এবং

প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব—এই কয়টি অবধানকার্য্যের বিশেষ সহায়। এই সহায়গুলি বাহ্যিক, কারণ ইহারা অবধানের বিষয় বা উদ্বোধক সংক্রান্ত। উদ্বোধকের প্রকৃতি অনুসারেই যে অবধান-কার্য্য পরিচালিত হয়, এমন নহে; অবধান-কর্ত্তার শক্তি দ্বারাও ইহা নিয়ন্ত্রিত। আত্ম-শক্তির উপর চিত্তসংযোগ-ক্ষমতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। যখন শরীরে স্ফূর্ত্তি থাকে না, মনে প্রফুল্লতা থাকে না, যখন নৈরাশ্যের পদাঘাতে হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, যখন—

অবধানের আন্তর সহায়।

"রোগে, শোকে, নৈরাশ্য-পীড়নে,
অপমানে,—শত নির্য্যাতনে
নিরন্তর ক্লিষ্ট হ'য়ে, হায়
জীব সবে যবে ঊর্দ্ধে চায়
সজল নয়ন মেলি"

তখন কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে অবধান-কার্য্যও সুসম্পন্ন হয় না। যখন শরীর ক্লান্ত, মন অবসন্ন,—তখন চিত্তসংযোগের ক্ষমতাও ক্ষীণ। যখন তুমি নিতান্ত নিদ্রাক্লিষ্ট, তখন তুমি তোমার আসন্ন বিপদের কথাও ভাবিতে পার না। স্বার্থ ব্যতীতও অবধান অসম্ভব। যখন যে দিকে, যে বিষয়ে চিত্তনিবেশ কর না কেন, দেখিবে, তাহার মূলে স্বার্থ। বস্তু বা বিষয় আমরা অবধান করি সত্য, কিন্তু সে অবধান বস্তু বা বিষয়ের খাতিরে নহে। সেই বস্তু বা বিষয়ের সহিত স্বার্থের, সুখ দুঃখের সংস্রব আছে বলিয়া, উহা আমাদের অবধানান্তর্গত। স্বার্থের আকর্ষণেই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়া থাকি।

"প্রভাতে রহিতে অধ্যয়নে, আমি আসি
শূন্য সাজি হাতে লয়ে দাঁড়াতেম হাসি,

তুমি কেন গ্রন্থ রাখি উঠিয়া আসিতে,
প্রফুল্ল শিশিরসিক্ত কুসুমরাশিতে,
করিতে আমার পূজা ?"

অবশ্য স্বার্থের জন্য। মধুমক্ষিকা-দংশনে যদি যন্ত্রণা না থাকিত, অর্থ-লাভে যদি সুখ না থাকিত, তবে কি উহারা আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিত ? স্বার্থ ব্যতীত উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না ; উদ্দেশ্য ব্যতীত সচেষ্টাবধান থাকিতে পারে না। সংসারে বীতশ্রদ্ধ মহাপুরুষ স্বার্থের জন্যই ধ্যানস্তিমিত-লোচনে তাঁহার ইষ্টবস্তুতে চিত্তবিশ্বাস করিয়া থাকেন।

"সৌম্য-শান্ত কেশব ভারতী আঁখি মেলি চাহি দেখে,
পদতলে তাঁর বসি করযোড়ে কিশোর নিমাই ভাসে আঁখিজলে,
সুন্দর তনু স্মর-সুকুমার তরুণ মূরতি এ কে ?
সে যে ভুলে গেল সব ধ্যান ;—
চাহিয়া রহিল নিমাইয়ের মুখে—ফিরিল না সে নয়ন।"

এখানে নিমাইয়ের সুন্দর মূর্ত্তি হইতে স্বার্থের উদ্রেক হইল ; সুতরাং চিত্তও আকৃষ্ট হইল। অবধানের আর একটি সহায়—প্রতীক্ষা। যদি নিশীথ রাত্রিতে সহসা করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাই, তখন সেই ধ্বনিতে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইলেও, সে ধ্বনি কিসের এবং কোথা হইতে আসিতেছে, ইত্যাদি জ্ঞান লাভ করিতে সময় আবশ্যক, চেষ্টা আবশ্যক হয়। শব্দ শ্রুত হইবামাত্র চিত্তসংযোগ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু ঐরূপ শব্দ শুনিবার জন্য যদি আমি পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকিতাম, তাহা হইলে শব্দটি শুনিবামাত্র উহা পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইত। কিসের শব্দ, কোথা হইতে আসিতেছে ইত্যাদি সমস্তই যুগপৎ বুঝিতে পারিতাম। রাত্রি প্রায় আটটার সময় আমরা দুইজনে গল্প করিতেছি। রোজ আটটার সময় তোপধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। আজ আমার ঘড়িটি তোপের সহিত

মিলাইব। বন্ধুর সহিত গল্প করিতেছি এবং তোপের শব্দেরও প্রতীক্ষা করিতেছি। কিয়ৎক্ষণ পরে শব্দ হইল। আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, আমার বন্ধু হয় ত শুনিতে পাইল না; তাহার কারণ, আমি ঐ শব্দের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

"সতিমির রজনী, সচকিত সজনি
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য!
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ-বিষণ্ণ।
নীল আকাশে, তারক ভাসে
যমুনা গাওত গান,
পাদপ মরমর, নির্ঝর ঝরঝর
কুসুমিত বল্লিবিতান।
তৃষিত নয়নে, বনপথ পানে
নিরখে ব্যাকুল বালা,
দেখ ন পাওয়ে, আঁখ ফিরাওয়ে
গাঁথে বনফুলমালা।
সহসা রাধা চাহিল সচকিত
দূরে খেপল মালা,
কহল "সজনি শুন, বাঁশরি বাজে
কুঞ্জে আওয়ল কালা"।"

অতএব আত্মশক্তি, স্বার্থ এবং প্রতীক্ষা—ইহারাও অবধান কার্য্যের সহায়। এ সহায়গুলি মনঃসম্বন্ধীয়।

আমি একখানি পুস্তক খুলিলাম। পুস্তকখানি আরব্য ভাষায় লিখিত। আমি আরব্য ভাষা জানি না। পুস্তকের কোন একটি পত্রে

চক্ষুসংযোগ করিলাম। পরে চিত্ত সংযোগের নিমিত্ত চেষ্টা করিলাম। চিত্তসংযোগ করিতে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিলাম। অবশেষে আমার শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িল। মন অবসন্ন হইয়া আসিল। পুস্তকের অক্ষরগুলি হইতে আমার কোন ভাবেরই উদয় হইল না। কোন সুখ-দুঃখের স্মৃতি জাগরিত হইল না। শেষে হতাশ হইয়া পুস্তকখানি নিক্ষেপ করিলাম। পুস্তকের লিখিত বিষয় বুঝিতে পারিলাম না। পুস্তকে কোন স্বার্থ দৃষ্ট হইল না, সুতরাং চিত্তসংযোগ অসম্ভব হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে বিষয়ে কোন স্বার্থচিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না, যে বিষয় হইতে মনে কোন ভাবেরই উদয় হয় না, ইচ্ছাশক্তি সে বিষয়ে মন আকর্ষণ করিতে অক্ষম। কেবল ইচ্ছাপ্রভাবেই বস্তুর সহিত মনের মিলন হইতে পারে না—স্বার্থের প্রয়োজন। স্বার্থ ই মিলন-রজ্জু।

ইচ্ছা এবং অবধান।

"শোনো নিবেদন—
এ নহে পুতুল খেলা ; ল'য়ে প্রাণ-মন
আপন খেয়ালে কেহ—ইচ্ছা হ'ল ব'লে'—
পারে না সঁপিতে অন্যে খেলিবার ছলে
এতই সহজে। প্রাণ দিতে নাহি হয়,—
প্রেমের উদ্ভবে তাহা আপন আলয়
আপনিই লহে খুঁজি।"

যখন আমি আমার সঙ্গীদের মধ্যে থাকি, তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করি ; যখন ছাত্রদের মধ্যে—তখন কাব্য-বিষয়ে আলোচনা করি ; যখন ভৃত্যগণের মধ্যে—তখন বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি। যখন কোন একটি বিষয়ে চিত্তনিবেশ করি, তখন অপর বিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণ করি। যখন দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করি, তখন কাব্যশাস্ত্রের বিষয় ভাবি না ;

এবং যখন কাব্যশাস্ত্রের বিষয় ভাবি, তখন গণিতশাস্ত্রের কথা মনে স্থান দিই না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইচ্ছাশক্তি সাহায্যে আমরা চিত্তকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে চালিত করিতে পারি। বিষয় এবং স্থানবিশেষে স্বার্থের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এক-এক স্বার্থ এক-এক সময় কার্য্যকর। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই সময়বিশেষের স্বার্থের প্রতি আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। ঘণ্টা বাজিল, আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। চাকরের হাত হইতে থালাখানি পড়িয়া গেল, আমার দৃষ্টি সেই দিকে গেল। অদূরে পিয়ানো বাজিল, আমার মন সেই দিকে ধাবিত হইল। এই সকল ব্যাপারে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে আমি বাধ্য হই। এরূপ স্থলে চিত্ত সংযত করিবার ক্ষমতা সকল সময় থাকে না। সুতরাং নিশ্চেষ্টাবধান অনেক সময় আমাদের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা হরণ করিয়া থাকে।

"আঁকিতেছে চিত্র, কিন্তু চিত্রকর কি আঁকে না জানে,—আপন হারা।
মিশিল বীণার কণ্ঠ উত্তরার, বীণার জীবন্ত বীণার লয়!

"ওই যা! আঁকিলাম কি আঁকিতে কি?"
কহে অভিমন্যু।"

অবধান এবং শরীরের সম্বন্ধ।

অবধান সময়ে শরীরের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যখন কোন বিষয়ে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করি, তখন আমাদের শরীর যেন নিশ্চল হয়, মাংসপেশী সজাগ হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস সংযত হয় এবং হৃদয় দ্রুতবেগে, সজোরে স্পন্দিত হয়। শরীর-ক্রিয়ার স্থৈর্য্য-সম্পাদন করিতে পারিলে, অবধান-কার্য্য সহজ হয়।

"একটি তরুতে যুবা পার্শ্ব হেলাইয়া
সঙ্গীত শুনিতেছিল—অপলক নেত্র,

অনিশ্বাস নাসা, প্রাণযন্ত্র অচঞ্চল,
বিশ্রামে বঙ্কিম গ্রীবা তরু পরশিয়া।"

হৃদয়-স্পন্দন আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হইলেও, শিক্ষা এবং অভ্যাসের বলে আমাদের পেশীসমূহ এবং শ্বাস-প্রশ্বাস সংযত হইতে পারে। এই জন্য আসন এবং প্রাণায়াম শিক্ষার প্রয়োজন। শরীর চঞ্চল থাকিলে মনও চঞ্চল থাকিবে। মানুষ শৈশবাবস্থায় বড়ই চঞ্চল থাকে। ক্রমে-ক্রমে এ চঞ্চলতা নষ্ট করা উচিত।

আমরা বহুক্ষণ ব্যাপিয়া কোন বিষয় অবধান করিতে পারি না। অবধান-তরঙ্গের উত্থান-পতন, হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। সময় নিরূপণ যন্ত্রের দোলকের ন্যায় ইহা অবিরত দুলিতেছে—আসিতেছে এবং যাইতেছে। ত্রিশ সেকেণ্ডের অধিক বোধ হয় মনকে কোন একটি বিষয়ে এককালে নিবিষ্ট রাখিতে পারা যায় না। সাধারণতঃ মনোযোগ ৫ হইতে ৬ সেকেণ্ড স্থায়ী হয়। একটি বিষয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ মনোনিবেশ করিতে দেখা যায় সত্য, কিন্তু বাস্তবিক সে বিষয়টি এক নহে—তাহার পৃথক-পৃথক অংশ আছে, পৃথক-পৃথক অবস্থা আছে। অবধান এক অংশ হইতে অন্য অংশে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় ধাবিত হইতেছে। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া এই ছবিটি দেখিতেছি সত্য, কিন্তু ইহার কোন এক অংশে আমার চিত্ত অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতেছে না। কখনও ইহার নয়নে, কখনও ইহার অধরে আমার দৃষ্টি স্থাপিত হইতেছে—কিন্তু কোন একটিতেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতেছে না। ঐ দেখ, একজন হতভাগ্য নিতান্ত অভিনিবেশ সহকারে তাঁহার উপেক্ষিতা স্ত্রীর বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এখানে চিন্তার বস্তু এক হইলেও তাঁহার মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতেছে।

অবধানের স্থায়িত্ব।

"ওই টুকু বক্ষে গুণ-সমুদ্রের এ প্লাবন

কেমনে—কি ভাবে এল ? ও জীবন-মাঝে, আহা—
এত বুদ্ধি, এত সহ্য, এত পবিত্রতা, যাহা
আমাদেরো এ জীবনে হ'ল নাক সঞ্চারিত—
কেমনে ও হিয়ামাঝে হ'ল তাহা বিকসিত !
করিয়াছি অবহেলা,—সত্য, বিনা দোষে, মরি—
তোমারে গো এতকাল নিয়তই তুচ্ছ করি' !
এত গুণ তব ! তবে, করিবে না কি গো ক্ষমা—
আমার সে শত দোষ দেবি ?
চির মনোরমা সত্যই এ নারী-জাতি !
রূপে ?—তাহা নহে !
অতুল গুণেরি প্রভা নিত্য দীপ্ত হ'য়ে রহে
ওই পুণ্য তনু' পরে ; স্বচ্ছ ঐ দেহ যেন
করিতেছে বিকীরণ অন্তরের আভা হেন।
তাই তুমি মধুময়ী—অপরূপ রূপবতী !
তাই বিশ্বে নানা ভাবে ওঠে নিত্য এ আরতি
তোমাদের হে সুন্দরি !"

আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া একখানি পুস্তক পড়িতেছি। একই বিষয়ে নানা বিষয়ের সমন্বয় আছে—আমার মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইতেছে। এক পুস্তকে নানা ভাবের সমাবেশ আছে—আমার মন ভাব হইতে ভাবান্তরে যাইতেছে। বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইতেছে, ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে। বিষয়ের মধ্যে ব্যবধান আছে,—ভাবের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই সামান্য—অতি সামান্য ব্যবধানের মধ্যেই অবধানের বিশ্রামলাভ ঘটিতেছে ; সুতরাং অবধানশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে না।

লোকে বলে একসঙ্গে একাধিক কাজ করা যায় না ; কিন্তু ইহা সকল সময়ে সত্য নহে। চিত্রকর অঙ্কন করিতেছে, ধূমপান করিতেছে এবং কথোপকথন করিতেছে। অভ্যাসের বলে এক-সঙ্গে এক সময়ে ৪।৫ প্রকার কাজ করিতে পারা যায়। কিন্তু একই সময়ে একের অধিক বস্তু কি অবধান করা যায় ? তোমার সম্মুখে ক খ গ এই তিনটি অক্ষর লিখিলাম। তুমি কি তিনটিকেই একসঙ্গে দেখিতেছ ? না, প্রথমে ক, পরে খ— এই প্রকারে এক-একটি করিয়া তিনটি ক্রমান্বয়ে দেখিতেছ। কেহ-কেহ বলেন যে,আমরা এক সময়ে একের অধিক বস্তু অবধান করিতে পারি না। এখানে প্রথমে ক, পরে খ, পরে গ অবধান করিতেছি। তিনটিকে একসঙ্গে অবধান করিতেছি না—এক-একটি করিয়া তিনটিকে অবধান করিতেছি। এই তিনটি অবধানের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত কম বলিয়া আমাদের ইহা বোধগম্য হইতেছে না ;—সেই জন্য মনে হইতেছে যে, তিনটিই আমরা এক সময়ে অবধান করিতেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আবার কেহ-কেহ বলেন যে, আমরা ৪।৫টি বস্তু এক সময়ে অবধান করিতে পারি। এই দুই মতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, তাহা স্থির করা কঠিন।

অবধানের ব্যাপকতা।

একাধিক বস্তুতে এক সময়ে চিত্তসন্নিবেশ করিতে পারিলেও, সকলেই একসঙ্গে সমান ভাবে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে না। সকলেরই ছায়া সমানভাবে চিত্তফলকে প্রতিফলিত হয় না। সম্মুখের চিত্রখানিতে দৃষ্টি-নিক্ষেপ কর। ইহার সকল অংশই কি সমানভাবে, অতি পরিষ্কার রূপে তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে ? সম্পূর্ণ ছবিখানি দেখিতেছ সত্য, কিন্তু ইহার প্রত্যেক অংশেই সমান মনোযোগ দিতে পারিতেছ না। যখন ছবিটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ, তখন সমস্ত ছবিটি তোমার

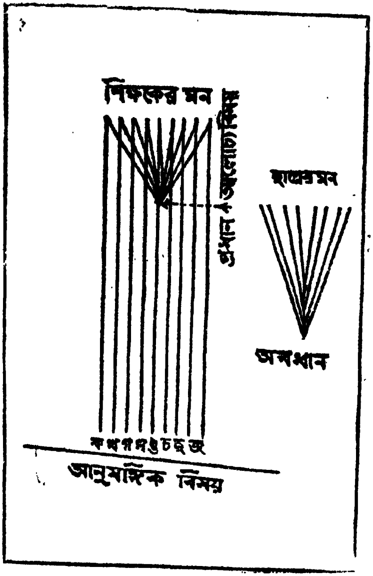
অবধানের পরিমাণ বা মাত্রা।

দৃষ্টিগোচর হইলেও—ইহার কোন একটি অংশ তোমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই, এবং সেই অংশটি অপর অংশ অপেক্ষা অধিকতর সুস্পষ্ট দেখাইবে। যখন ইহার চক্ষুতে তোমার বিশেষ দৃষ্টি ন্যস্ত হইবে, তখন নাসিকা, কপোল, ওষ্ঠ প্রভৃতি তোমার দৃষ্টির অগোচর হইবে না; কিন্তু চক্ষু যত সুস্পষ্ট বোধ হইবে, উহারা তত সুস্পষ্ট বোধ হইবে না। বহুদর্শী শিক্ষককে শিক্ষাদানকালে এককালে অনেক বিষয়ে মনোযোগ দিতে হয়। তাঁহার বক্তব্যের মূল বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়—সঙ্গে সঙ্গে বক্তব্য বিষয়ের আনুষঙ্গিক বিষয়েও মনঃসংযোগ করিতে হয়। বক্তব্য বিষয়টি কেমন করিয়া বলিতে হইবে, কোন্‌টির পর কোন্‌টি বলিতে হইবে, কোন্ উদাহরণটি কোন্ সময়ে বলিতে হইবে—ইত্যাদি নানাবিষয়ে চিত্তসন্নিবেশ প্রয়োজন। বক্তৃতার সময়ে শিক্ষক বুঝিতে পারেন—কোন্ ছাত্রটি মনোযোগী এবং কোন্‌টি অমনোযোগী; কে চঞ্চল এবং কে স্থির। সুতরাং এই প্রকার বাহ্যিক বিষয়েও তাঁহাকে মনঃসংযোগ করিতে হয়। এইরূপে শিক্ষককে একসঙ্গে বহু বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে হইতেছে সত্য, তথাপি তাঁহার মন মূল আলোচ্য বিষয়ে বিশেষভাবে নিবিষ্ট।

"সংসারের নানা কাজে কর আত্ম-নিবেদন
যতনে রাখি হৃদয়ে বিভু-চিন্তা অনুক্ষণ।"

মনকে এইরূপে একসঙ্গে সংযত এবং বিক্ষিপ্ত রাখিতে অভ্যাস এবং সাধনার প্রয়োজন। শিক্ষকের মন সংযত এবং বিক্ষিপ্ত, কিন্তু ছাত্রের মন বিক্ষিপ্ত নহে—ইহা সংযত। শিক্ষককে বহু বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হয়—ছাত্রকে মাত্র একটি বিষয়ে—শিক্ষকের কথিত বিষয়ে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অবধানের মাত্রা আছে। সকল বিষয়ে বা সকল সময়ে সমানভাবে মনোনিবেশ করা যায় না। বালক-বালিকাদিগকে

অন্য সময় অপেক্ষা প্রাতঃকালে অধিক মনোযোগী দেখা যায়। শিক্ষা-বর্ষের প্রারম্ভে ছাত্রগণকে যত মনোযোগী দেখা যায়, পরে আর ততটা দেখা



যায় না। নিস্পৃহ ছাত্র অপেক্ষা স্পৃহাবান্ ছাত্রই অধিক মনোযোগী হয়।

অবধানের অন্তরায়।

শারীরিক দুর্ব্বলতা অবধানের অন্তরায়। যাহার শরীর দুর্ব্বল, যে ব্যাধিগ্রস্ত, সে অবধান-কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না। শারীরিক অপটুতা বংশানুগত হইতে পারে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে কিংবা দূষিত বায়ু সেবনেও শরীর অপটু হইয়া পড়ে। যে কারণেই হউক, অপটু শরীরে মন পদ্ম-পত্রের জলের ন্যায় চঞ্চল থাকে। এরূপ মনের অবধান-

ক্রিয়াও চঞ্চল এবং ক্ষণস্থায়ী হইবে। গমনশীল শটকযানে বসিয়া একখণ্ড কাগজে যেমন কোন অক্ষর সুন্দর ভাবে লিখিতে পারা যায় না, তেমনি এবম্বিধ মনের উপর কোন ভাবেরই সুন্দর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। পারিপার্শ্বিক বাহ্যিক অবস্থাও আমাদের অবধান-কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে, বাহিরের গোলমাল এবং উপদ্রব আমাদের চিত্তস্থৈর্য্য নষ্ট করিয়া থাকে।

"বিক্ষিপ্ত হৃদয়-অণু
বাহিরের শত কাজে,
আপনা হারা'য়ে ফেলি
চঞ্চল বিশ্বের মাঝে।"

এই সকল উপদ্রব হইতে মনকে নিরোধ করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে সুবিমল বায়ু-সঞ্চালনের পথ নিরুদ্ধ, সেই স্থানে অবধান-কার্য্য ভাল হয় না। নির্ম্মল বায়ুর অভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের অবাধগতির প্রতিবন্ধকতা হয়, শরীরে অবসাদ উপস্থিত হয়—মনের শক্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। মানসিক ক্রিয়ার জন্য শরীরক্রিয়াও আবশ্যক! শরীর নিষ্ক্রিয় রাখ, মনও নিষ্ক্রিয় হইবে। সকলেরই মন এক রকম নহে। তুমি যাহা সহজে অবধান করিতে পার, আমি হয় ত তাহা বহু কষ্টেও অবধান করিতে পারি না। সেইজন্যই একজন দার্শনিক, আর একজন বৈজ্ঞানিক হইতেছেন। সেই জন্যই কেহ যুদ্ধবিদ্যায়, কেহ কলাবিদ্যায়, কেহ চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেছেন। অতএব মনের গ্রাহিকা শক্তি অবধানের অন্তরায়ও বটে, সহায়ও বটে—উপযুক্ত বিষয়ে সহায়, অনুপযুক্ত বিষয়ে অন্তরায়। কোন্ বিষয়টি কোন্ মনের অনুরূপ, ইহার বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। কখন-কখন মানুষের অতিবিশ্বাস হইতেও অনবধানতা আসিয়া পড়ে।

"বাছা রে! করিস্ রণ।
না করিস্ তুচ্ছ, হয় যদি শত্রু
অতি ক্ষুদ্র তৃণোপম।"

এ বিষয়টি আমার পক্ষে অতি সহজ, ইহাতে আমার আয়াসের প্রয়োজন হইবে না, যত্ন আবশ্যক হইবে না, যখন ইচ্ছা ইহাকে আয়ত্ত করিয়া লইব—এই প্রকার বিশ্বাস হইতে অনবধানতা আসিয়া পড়ে। চিত্তের অশান্তি এবং অপ্রসন্নতা অনবধানতার আর একটি হেতু।

"পতি-সঙ্গহীনা
বনবিহঙ্গিনী মত করিছে নবীনা
ছট্ ফট্ শিবিরেতে উঠিয়া-বসিয়া।
এবার বসিল বামা বীণাটি লইয়া।
গাহিতে লাগিল, কণ্ঠ হয় না মধুর।
এত যত্ন তবু বীণা বাজিছে বেসুর।
আবার বাঁধিতে বীণা ছিঁড়ে গেল তার।"

শৈশবকালের অবধান সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট অবধান। অবধান-ক্রিয়াকে ইচ্ছামত সংযত এবং সঞ্চালিত করিবার শক্তি শিশুদের থাকে না।

অবধানের বিকাশ।

ইহাদের অবধান এক্ষণে বাহ্যশক্তির দাস। যাহা দেখিতেছে, যাহা শুনিতেছে, তাহাতেই ইহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে। একটি শব্দ হইল, শিশুর চিত্ত সেই দিকেই ধাবিত হইল। বাহ্যশক্তিই শিশুর চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে; কিন্তু উদ্বোধক যদি ক্ষীণ হয়, যদি অস্পষ্ট হয়—তাহা হইলে শিশুর মন তাহাতে আকৃষ্ট হইবে না। শিশুর মনকে আকর্ষণ করিতে হইলে, উদ্বোধকের যথেষ্ট শক্তি-প্রাচুর্য্য থাকা আবশ্যক। একটি ক্ষুদ্র শিশুর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আস্তে-আস্তে করতালি

দিতে থাক, দেখিবে, সে উহা শুনিতে পাইতেছে না। একটি উচ্চ শব্দ কর, অচিরাৎ শিশুর চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। কিছু দিন পরে দেখিবে, সমান্য শব্দেও শিশুর চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে যে শব্দ শিশু লক্ষ্য করিত না, এখন তাহা লক্ষ্য করিতেছে। এখন আর উদ্বোধকের তত শক্তি-প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন হয় না, এই হইল অবধানের প্রথম অবস্থা। এই অবস্থায় যদি শিশুটির সম্মুখে একটি বাতি জ্বাল, শিশুর দৃষ্টি সেই দিকে যাইবে। আবার সেই সময়ে যদি একটি শব্দ কর, শিশুর মন সেই দিকে যাইবে। এখন ইহার মন চঞ্চল—অতি সহজে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে ধাবিত হয়। অবধানের দ্বিতীয় অবস্থায় এই চাঞ্চল্যের উপশম হইতে আরম্ভ হয়। শিশুর মন আর তত সহজে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে যায় না। এখন শিশুটীর সম্মুখে একটি বাতি জ্বাল, দেখিবে, সে উহার দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া আছে। এখন তুমি তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া করতালি দিতে থাক—দেখিবে শিশুটি আলোর দিকেই তাকাইয়া আছে—তোমার কৃত শব্দে তাহার মন যাইতেছে না। এখন সে আকৃষ্ট বস্তুতে মনকে কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারে। এখনও ইহার অবধান নিশ্চেষ্ট—এখনও বাহ্যবস্তুই মন আকর্ষণ করিতেছে। তবে যাহাতে মন আকৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে কিয়ৎকাল স্থায়ী হইতেছে। মনকে একটি বিষয়ে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট রাখিবার শক্তি হইয়াছে। এ শক্তি বাহিরের নয়—ভিতরের; এ শক্তি বাহ্যবস্তুর নয়—মনের। এই শক্তিই সচেষ্টাবধানের প্রথম সূচনা। নিশ্চেষ্টাবধান সচেষ্টাবধানে পরিণত হইবার এই প্রথম উপক্রম। এই অবস্থাটিকে অবধানের দ্বিতীয় অবস্থা বলা যাইতে পারে। তার পর ক্রমে-ক্রমে সচেষ্টাবধানের পূর্ণ বিকাশ হইতে লাগিল। ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃই প্রবল হইতে লাগিল। শিশু মনকে সংযত করিতে সমর্থ হইল। ইহাই অবধানের তৃতীয় অবস্থা।

ঐ দেখ, শিশুটি কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। মায়ের আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার পদধ্বনি শ্রবণে কিঞ্চিৎকাল প্রয়াস পাইল। মা আসিলেন না। বালক পুনরায় ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। পদধ্বনি শ্রবণে আয়াসের প্রয়োজন। ক্রন্দন বন্ধ করিতে এবং আরম্ভ করিতেও আয়াসের প্রয়োজন। সুতরাং এ সকল কার্য্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অবধান সচেষ্টাবধান।

চতুর্থ অধ্যায়।

স্বার্থ।

স্বার্থ-বিজড়িত উদ্বোধক চিত্ত-সংযোগের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। কোন বস্তু বা বিষয় হইতে উৎপন্ন সুখ বা দুঃখের অনুভূতিকেই স্বার্থ বলা যায়।

স্বার্থ কাহাকে বলে।

যে জিনিস হইতে সুখের আশা বা দুঃখের আশঙ্কা করি না, সে জিনিসে আমরা স্বভাবতঃই নির্লিপ্ত—আমাদের নিকট সে জিনিসের অস্তিত্ব নাই বলিলেও বিশেষ কোনও ক্রটি হয় না।

সাদৃশ্য, সুখ বা দুঃখের সংস্রব, এবং ঔৎসুক্য—এই তিনটি স্বার্থের হেতু। যে জিনিসটি একবারে নূতন, যাহা একবারে অননুভূতপূর্ব্ব সে

স্বার্থের হেতু।

জিনিসে স্বার্থ থাকিতে পারে না—সে জিনিস হইতে সুখের আশা বা দুঃখের আশঙ্কার উদ্রেক হইতে পারে না। বর্ত্তমান বিষয়ের সহিত যদি অতীত কোন জ্ঞাত

বিষয়ের কোন প্রকার সাদৃশ্য না থাকে, তবে সে বিষয় হইতে স্বার্থের উৎপত্তি হয় না, সে বিষয় মনকে আকর্ষণ করে না।

"সে মায়া-মূরতি কি কহিছে বাণী!
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি!
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি, রহস্যে নিমগন।"

আমি যাহা একেবারেই বুঝি না, জানি না, যাহা কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই, তুমি যদি আমার সহিত সেই বিষয়ের আলাপ কর, তোমার কথায় আমার মন দেওয়া অসম্ভব হইবে।

"হায়! একবিন্দু বারি দেখিলে না যেই জন,
সে কেমনে বুঝিবেক মহাপারাবার?"

যে শিক্ষক তাঁহার শিষ্যকে কোন একটী সম্পূর্ণ নূতন তথ্য একেবারেই শিখাইবার প্রয়াস পান, তাঁহার চেষ্টা নিশ্চয়ই নিষ্ফল হয়; কারণ তিনি শিষ্যের মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে অক্ষম হন। শিক্ষকের কথিত বিষয়ের সহিত শিষ্য তাহার পূর্ব্ব-পরিচিত বিষয়ের কোনরূপ সাদৃশ্য দেখিতে পায় না; সুতরাং সে বিষয়ে কোন স্বার্থ উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া, চিত্ত সন্নিবেশ করিতেও অক্ষম হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, সাদৃশ্য স্বার্থের সহায় হইলেও, সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আবার ইহার সংহারক। যে কথা আমরা বারংবার শুনি, সে কথা আমাদিগের আর ভাল লাগে না—সে দিকে মনও যায় না। যে জিনিস আমরা পুনঃপুনঃ দেখি, তাহার আর মোহিনী শক্তি থাকে না। যে গীত আমরা বারংবার শুনি, তাহা আর ভাল লাগে না

"পারি না শুনিতে আর, একই গান।
কখন থামবি তুই, বল মোরে—বল প্রাণ।"

"মাতা"——এবং——"ঘাকা"

এই দুইটি শব্দের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, তোমার মন প্রথমটির প্রতি

অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছে। প্রথম কথাটি হইতে তোমার মাতার আকৃতি-প্রকৃতি মনে হইতেছে, এবং তৎসঙ্গে কত সুখ-দুঃখের কথা মনে আসিতেছে। কিন্তু দ্বিতীয় কথাটি হইতে তোমার কিছুই মনে আসিতেছে না—কোন ভাবেরই সঞ্চার হইতেছে না—উহাতে কেবল দুইটি অক্ষরের একত্র সমাবেশ হইতেছে মাত্র। প্রথম শব্দটির সহিত তোমার অতীত জীবনের কাহিনী যেন সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত; কিন্তু দ্বিতীয়টির সহিত এরূপ কোন সম্বন্ধ নাই। প্রথমটিতে সুখ-দুঃখের সংস্রব আছে, দ্বিতীয়টী যেন সকল সংস্রব-বর্জ্জিত। স্বার্থের মাত্রা সুখ-দুঃখের মাত্রার উপর নির্ভর করে। যে জিনিসটীর সহিত সুখ বা দুঃখ অধিক মাত্রায় বিজড়িত, সেই জিনিসটীতে স্বার্থও অধিক। ছাত্রগণ শিক্ষকের সাহচর্য্য অপেক্ষা ছাত্র-বন্ধুগণের সাহচর্য্য অধিক পছন্দ করে। ঔৎসুক্য স্বার্থের আর একটী হেতু। কোন অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাকে ঔৎসুক্য বলে। আকাঙ্ক্ষা মনের পিপাসামাত্র—ব্যাকুলতামাত্র।

"চারিদিকে কি মহা বিস্ময়
প্রগাঢ় রহস্যে ঢাকা! যত ভাবি এ ক্ষুদ্র হৃদয়
ততই ব্যাকুল ভাবে গুমরিয়া কেঁদে হয় সারা।"

এই পিপাসা হইতে স্বার্থের সৃষ্টি হয়। গণিতশাস্ত্র কি—আমি জানি না; সুতরাং এই শাস্ত্রে আমার কোন স্বার্থও দেখিনা। পরে, এই শাস্ত্রের বিষয় অবগত হইবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা হইল; আকাঙ্ক্ষা হইতে চেষ্টা এবং চেষ্টা হইতে ক্রমশঃ স্বার্থের সৃষ্টি হইল;—তখন ঐ শাস্ত্রের আলোচনায় আমি আনন্দ পাইতে লাগিলাম। ছাত্রদিগের মধ্যে ঔৎসুক্যের বীজ বপন করা শিক্ষকের প্রধান কর্ত্তব্য। একজন শিক্ষক ছাত্রদিগকে কোন কথা না বলিয়া একটী জলপূর্ণ গেলাস লইলেন; গেলাসের মুখটী এক টুকরা কাগজ দিয়া বেশ করিয়া আচ্ছাদিত করিলেন।

ছাত্রেরা জানে না—শিক্ষকের উদ্দেশ্য কি। সকলেই নিবিষ্ট-চিত্তে, উৎসুক-চিত্তে শিক্ষকের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। তৎপরে শিক্ষক গেলাসটী উল্টাইয়া ধরিলেন। কাগজ খসিয়া গেল না; বিন্দুমাত্র জল পড়িল না। ছাত্রেরা স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঔৎসুক্যের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইল। এখন—

"আকুলতা এসে ধরেছে আঁকড়ি,'
করিয়াছে মাতোয়ারা।"

"কেন এমন হইল," জানিবার জন্য সকলেই বিশেষ উৎসুক হইল। অপর একটী শিক্ষক প্রথমেই বলিয়া বসিলেন যে, বায়ুর চাপ ঊর্দ্ধদিকে, তৎপরে তিনি যথাশক্তি তাহার ব্যাখ্যা করিলেন; এবং কি উপায়ে তাহা প্রমাণ করিবেন, সেটুকু বলিবারও লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি উক্ত উপায়ে তাঁহার কথিত বিষয় প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহার কার্য্যে ছাত্রদের তত কৌতূহল জন্মিল না: তাহারা বিশেষ স্বার্থও দেখিতে পাইল না; সুতরাং তাহাদের সম্যক প্রকার মনঃসংযোগও হইল না। কৌতূহল হইতে স্বার্থ এবং স্বার্থ হইতে অবধান প্রকাশ হইতেছে। কৌতূহলী বৃত্তির উচ্ছেদ কর, অপর দুইটি ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইবে।

স্বার্থ দুই প্রকার—সহজলব্ধ এবং শিক্ষালব্ধ। ছোট ছোট ছেলেরা টুকটুকে রং দেখিতে ভালবাসে। এখানে স্বার্থ সহজলব্ধ—স্বাভাবিক।

স্বার্থের প্রকার।

"ইঙ্গিতে সৈনিক এক লয়ে এল রাজ-সভামাঝে
লজ্জিতা যুবতী;
নিমিষে নিস্তব্ধ সভা, বিস্মিত বিমুগ্ধ নেত্র যত
হেরি সে মূরতি।

যেন এ সৌন্দর্য্য স্বপ্ন—বিধাতার মানবী কল্পনা
চিত্রপটে আঁকা !
শিবাজি কহিলা ধীরে—ক্ষণকাল দেখি সেইরূপ
পতিব্রতা-মাখা ;—
"মাতঃ, তোর গর্ভে যদি জন্মিতাম, আমরাও বুঝি
হতেম সুন্দর !"

এখানে শিবাজির স্বার্থ সহজ স্বার্থ। দার্শনিক তর্কবিজ্ঞানআলোচনায় আনন্দ উপভোগ করেন। হিন্দু বিধবা সর্ব্ব আশা, সর্ব্ব ইচ্ছা, সর্ব্ব মান-অভিমান একবারে ত্যাগ করিয়া আত্মহারা হইয়া, অনন্ত ধৈর্য্যের ভরে পরহিত-ব্রতে মন-প্রাণ সমর্পণ করেন। এখানে স্বার্থ শিক্ষালব্ধ।

"অন্তহীন ক্ষমাভরে তুচ্ছ করি' সে সকলি
—হে মোর জননি
করুণা করিয়া সবে অসীম স্নেহেতে শুধু
সেবিতেছ সুখে।
এত যে দুঃসহ , ঘোর অবিচার ; তবু, মাগো,
কথা নাহি মুখে !
আপনারে বিস্মরিয়া—রাখি' কোন্ অন্তরালে ;
পর-হিত-তরে।
মৌন কর্ম্মে রত সদা,—পালিছ নিষ্কাম ধর্ম্ম
অনন্ত অন্তরে।"

মিষ্ট দ্রব্য সকলেরই ভাল লাগে—ইহা দ্রব্যের গুণ। আবার কাহারও নিকট তিক্ত দ্রব্যও মধুর বোধ হয়—ইহা দ্রব্যের গুণ নহে—অভ্যাসের ফল। সুতরাং একটির স্বার্থ স্বভাবজ এবং অপরটির স্বার্থ অভ্যাসজ।

প্রথম অবস্থায় স্বার্থ স্বোপার্জ্জিত নহে। এই অবস্থায় মানুষ নিজের স্বার্থ নিজে সৃজন করে না—বাহিরের বস্তুই স্বার্থের উদ্রেক করিয়া দেয়। শৈশব অবস্থায় স্বার্থ স্বভাবজ। বালক-বালিকাদের মনে যে জিনিসে সহজেই স্বার্থের উদ্রেক হয়, যাহাতে সহজেই প্রীতির সঞ্চার হয়, এরূপ বস্তু তাহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে দেওয়া উচিত।

স্বার্থ হইতে অবধানের উন্মেষ হয়। স্বার্থের মাত্রা বৃদ্ধি হইলে অবধানশক্তিও প্রবল হয়। কিন্তু অবধানের মাত্রা অধিক হইলে স্বার্থের মাত্রা অধিক হইবে—মনে করিও না। একটি বালককে তৈলপূর্ণ ভাণ্ডটি আনিতে আদেশ করিয়াছ। যাহাতে বিন্দুমাত্র তৈল নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছ। ভাণ্ডটি সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ। সামান্য অমনোযোগী হইলেই তৈল পড়িয়া যাইবে। বালকটি অতি সাবধানে ভাণ্ডটি আনয়ন করিতেছে—তাহার সমস্ত অবধান-শক্তি তৈলপূর্ণ ভাণ্ডে প্রয়োগ করিয়াছে। এখানে তাহার অবধানের মাত্রা অধিক, কিন্তু বালকটি কি বিন্দুমাত্রও স্বার্থ অনুভব করিতেছে?

স্বার্থ এবং অবধান।

সকল মনুষ্যেরই স্বার্থ একপ্রকার নহে—সকলেই এক স্বার্থে অনুপ্রাণিত নহে। মনের প্রকৃতির উপর স্বার্থের প্রকৃতি নির্ভর করে। একই বস্তুতে কাহারও বা অনুরাগের সৃষ্টি হয়, আবার কাহার বা বিরাগের সৃষ্টি হয়।

রুচির পার্থক্য স্বার্থ-পার্থক্যের হেতু।

"সুন্দরতর বদন তব
করিয়া নিতে আপনা;
সুন্দরতর প্রকৃতি মম
নিয়ত করি কামনা।"

অতএব নিজের প্রকৃতিই নিজের স্বার্থ সৃষ্টি করে। মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, সুতরাং স্বার্থও বিভিন্ন।

"স্তন্য-সুধাপায়ী শিশু হাসে 'মা মা' বলে ;
চুমিছে সে মুখ মাতা ভাসি আঁখি-জলে।
দার্শনিক হেরি' তাহে কহে—"এ যে ভুল !"
মুগ্ধ কবি কাঁদি কহে—"অতুল, অতুল' !"

এখানে মাতা, দার্শনিক এবং কবির স্বার্থ পৃথক্। আবার দেখ—

"কবি আপনার গানে যত কথা কহে,
নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি।"

স্বার্থের ঔৎকর্ষ-সাধন।

যদি বালক-বালিকাগণের অবধান-ক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধন করিতে চাও, যদি উহাদের অবধান-শক্তিকে সংযত করিতে চাও, তবে যে জিনিসে সহজেই তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, সেই জিনিস তাহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে দাও। এইরূপে যখন উহাদের অবধান-শক্তি কিঞ্চিৎ দৃঢ় ও সংযত হইবে, তখন অপেক্ষাকৃত জটিল এবং দুরূহ ব্যাপারে তাহাদের অবধান আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। যে বিষয় স্বভাবতঃ বিরক্তিকর, যাহাতে প্রথমে কোন স্বার্থচিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না, সে বিষয়ে চিত্ত আকর্ষণ করিতে হইলে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয়। বালকগণ 'নামতা' অভ্যাস করিতে কখনই আমোদ পায় না—এরূপ স্থলে পুরস্কারের লোভ দেখাইতে হয় ; আবার কখন কখন শাস্তির ভয় দেখাইতে হয়। যে বিষয় স্বার্থোৎপাদনশক্তি-বিরহিত, সে বিষয়ে চিত্ত আকর্ষণ করিতে হইলে অন্য স্বার্থের আশ্রয় লইতে হয়। যে কাজে আমি স্বভাবতঃই বীতশ্রদ্ধ, সে কাজ সম্পন্ন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমি যদি বুঝি যে, ঐ কাজে পারদর্শিতা লাভ করিলে আমার সুখ-সমৃদ্ধি

যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে, তখন সে কার্য্যের কঠোরতা, সে কার্য্যে আমার স্বভাবসুলভ বিরাগ আমার চেষ্টার বিশেষ অন্তরায় হইবে না। কথিত কার্য্যে আমার স্ফূর্ত্তির অভাব থাকিলেও অন্য চিন্তা হইতে আমার স্ফূর্ত্তির উদয় হইবে, এবং সেই স্ফূর্ত্তির বলে, যাহা এখন অসাধ্য মনে হইতেছে, তাহা অচিরে সুসাধ্য হইবে।

বুঝিলাম এতক্ষণে—
অবস্থায় মতিগতি বিবর্ত্তিত হয়,
অবস্থায় সর্ব্বমূল।
নহে কালিকার চিত্তভার মোর
আজি কেন বিপরীত?
কালি আমি কি বলিনু
সর্দ্দারগণেরে?—
মহারাণা বিক্রমজিতেরে
সিংহাসনচ্যুত করা সমুচিত নহে,
বিক্রমের সিংহাসন কৈলে অধিকার
মহাপাপ হইবে আমার।
কি আশ্চর্য্য!
আজি সেই মহাপাপে করি আলিঙ্গন,
বিক্রমজিতের কথা একবারো নাহি
ভাবি মনে।
কি মোহিনী শক্তি ধরে রাজার ক্ষমতা!
কি কুহক রাজসিংহাসন!"

আত্মচিন্তা সকল স্বার্থের মূল। যখনই কোন বিষয় নিজের সুখের সহায় বলিয়া মনে হইল, তখনই সেই বিষয় অবধানের বিষয়ীভূত হইল।

স্বার্থচিন্তা বিরাগে অনুরাগের সৃষ্টি করে, দুঃখের দৈন্য এবং কষ্টের কঠোরতা দূর করে। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বস্তুতে আমি স্বার্থ অনুভব করিতাম—যাহা দেখিতে ভাল লাগিত, তাহাই দেখিতাম, যাহা শুনিতে ভাল লাগিত, তাহাই শুনিতাম। তখন বাহ্যবস্তু আমার চিত্ত আকর্ষণ করিত। আমাকে কোন বেগ পাইতে হইত না। পরে যখন বড় হইলাম, তখন পুরস্কারের আশাতেই হউক, বা শাস্তির আশঙ্কাতেই হউক অনেক অপ্রিয় কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইলাম। অভ্যাসের বলে অপ্রিয় বস্তু প্রিয় বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে যতই জ্ঞানের উন্মেষ এবং অভিজ্ঞতার বিকাশ হইতে লাগিল, ততই আমার নিজের স্বার্থ বুঝিতে লাগিলাম। কোন্‌টি আমার স্বার্থের সহায় এবং কোন্‌টি অন্তরায়, বুঝিতে সমর্থ হইলাম।

"ভোগ তৃষ্ণা স্বার্থ বলিদান দেহ মতিমান্,
জনগণ-মঙ্গল-কামনা
একমাত্র স্বার্থ রাখ হৃদে।
জনসেবা মহাব্রতে অভিমান যাবে,
জ্ঞানরত্ন করগত হবে,
জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মসাৎ করিয়া সংস্কার
পাপের বন্ধন হ'তে লভহ উদ্ধার।"

পঞ্চম অধ্যায়।

মনের অবস্থা।

আমি অনুভব করিতে পারি, চিন্তা করিতে পারি এবং ইচ্ছা করিতে পারি। অনুভূতি, চিন্তা এবং ইচ্ছা, এই তিনটি মনের প্রধান অবস্থা। ইহারা মনের এক-একটি অংশ নহে—একই মনের ত্রিবিধ অবস্থামাত্র। আমি চেয়ারে বসিয়া আছি। চেয়ারটির চারিটি পা আছে। আমি যদি বলি, 'এই পা চারিটি চেয়ারে আছে,' তাহা হইলে আমার ভুল হইল; কারণ, পা-চারিটি লইয়াই চেয়ার। চেয়ার এবং চেয়ারের পা পৃথক্ বস্তু নহে। তেমনি যদি বলি—আমার মনে চিন্তা আছে, অনুভূতি আছে, ইচ্ছা আছে—তাহা হইলে আমার ভুল হইবে; কারণ অনুভূতি, চিন্তা এবং ইচ্ছা লইয়াই আমার মন। মন এবং মনের অবস্থাকে পৃথক্ করিতে পারা যায় না।

মন এবং মানসিক অবস্থা।

মনের অবস্থাত্রয় পরস্পর একতাসূত্রে আবদ্ধ। একটি বালক দৌড়িতেছে, সহসা তাহার পদস্খলন হইল। সে আর দৌড়িতে পারিল না; ভূতলে পড়িয়া গেল। দ্রুতপদে তাহার নিকট যাইলাম; দেখিলাম, বালকটি অজ্ঞান হইয়াছে; দর-দর ধারায় রুধির বহিতেছে। আমার বড়ই দুঃখ হইল (অনুভূতি)। ক্ষতস্থান বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলাম; বুঝিলাম, ঔষধ-প্রয়োগ প্রয়োজন (চিন্তা)। তদনন্তর ঔষধ

অবস্থাত্রয়ের সৌখ্যভাব।

সংগ্রহ করিয়া আনিলাম এবং ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলাম (ইচ্ছা)। আমার বন্ধু অর্থাভাবে বড়ই কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার শীঘ্র একটি চাকরি হওয়া আবশ্যক। শুনিলাম, তাঁহার চাকরি হইয়াছে (চিন্তা)। এখন আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল (অনুভূতি)। তৎপরে আনন্দ প্রকাশ করিয়া একখানি পত্র লিখিলাম (ইচ্ছা)। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই অবস্থাত্রয় এমন সুন্দর সখ্যভাবাপন্ন যে, কেহ কাহারও বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না। যেখানে একটি, সেইখানেই অপর দুইটি।

"নিয়ত করিছ হাহাকার
কল্পনাতে বাড়াইয়া দুখ
কভু তুমি। হয়ো না উন্মুখ—
আপনারে ধিক্কারিতে হেন।
এ সংসারে সখা, স্থির জেনো—
বাড়ায় মানব দুঃখ যত
নিজে ইচ্ছা করি';—অনিবার
যা'রে ধ্যান কর, মনে তা'র
পড়িবেই ছায়া।"

অনুভূতি ব্যতীত চিন্তা কিংবা ইচ্ছা, ইচ্ছা ব্যতীত অনুভূতি কিংবা চিন্তা, এবং চিন্তা ব্যতীত অনুভূতি কিংবা ইচ্ছা থাকিতে পারে না! কল্পনা-প্রভাবে তুমি সুখের হিল্লোলে সন্তরণ দিতে পার, আবার দুঃখের পারাবারে নিমজ্জিতও হইতে পার। ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে তোমার সুখ-দুঃখের মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পার। অনবরত ধ্যানধারণার দ্বারা সুখ-দুঃখের বিষয়কে হৃদয়ে সজাগ রাখিতে পার।

একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা লইয়া কলম কাটিতেছ। অসাবধানতা হেতু অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিলে; যন্ত্রণায় অস্থির হইলে। অবশ্য এখানে তোমার

যেখানে অনুভূতি, সেইখানে ইচ্ছা এবং চিন্তা।

অনুভূতি প্রবল ; কিন্তু তথাপি তোমার চিন্তা বা ইচ্ছাশক্তির একেবারে লোপ হয় নাই। তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, তোমার হাত কাটে নাই, পা কাটে নাই বা অন্য কোন অঙ্গ কাটে নাই ; কিন্তু কাটিয়াছে একটি আঙ্গুল। সুতরাং তোমার চিন্তাশক্তি বর্ত্তমান। এখন তুমি ছুরির কথা ভাবিতেছ না, কলমের কথা ভাবিতেছ না—এখন সমস্ত বিষয় ভুলিয়া গিয়া কেবল সেই ক্ষতস্থানেই মনোনিবেশ করিয়াছ। মনোনিবেশে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন—তোমার সে শক্তিও আছে। ক্ষতস্থানে তৈলসিক্ত ন্যাকড়া বাঁধিতেছ—ইহাতেও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। যেখানে অনুভূতি সেইখানেই চিন্তা এবং ইচ্ছা। চিন্তার সাহায্যেই অনুভূতির অস্তিত্ব বুদ্ধির গোচর হয়। আমার চিন্তাশক্তি আছে, তাই আমি বুঝিতে পারি যে, আমার অনুভূতি আছে। শোক, তাপ, ভয় প্রভৃতি নানা প্রকারের অনুভূতি আছে। প্রত্যেক অনুভূতির মধ্যে আবার পরিমাণগত পার্থক্য আছে। চিন্তাই এই প্রকার এবং পরিমাণগত পার্থক্যের বিচারক। অনুভূতি হয় সুখদায়ক, না হয় দুঃখদায়ক। সুখদায়ক অনুভূতিকে স্থায়ী করিবার নিমিত্ত, এবং দুঃখদায়ক অনুভূতিকে দূরে রাখিবার নিমিত্ত মানুষ স্বভাবতঃই প্রয়াস পাইয়া থাকে। প্রয়াসে শক্তি—সুতরাং ইচ্ছার প্রয়োজন। সূর্য্যসিংহ যোধমলের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিল। যোধমল ধরাশায়ী হইল ; যন্ত্রণায় অস্থির হইল। এখানে অনুভূতির প্রাবল্য, কিন্তু চিন্তাশক্তির লোপ হয় নাই—এখনও মহারাজ পৃথ্বীর কথা বিস্মরণ হয় নাই, এখনও ভারতভূমি, জন্মভূমির কথা ভুলিয়া যায় নাই, এখনও যমুনাকে দেখিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিতে পারে নাই।

"যমুনে! বড় খেদ রহিল জীবনে
নারিলাম উদ্ধারিতে পৃথ্বী মহারাজে

হায় হায়! নির্ম্মূল সকল আশা,
ভারতের সুখরবি গেল অস্তাচলে!
হায় হিন্দু!
কেন সবে ভুলে গেল একতা-বন্ধন?
যমুনে! প্রাণেশ্বরি!
শেষ দেখা দেখে নিই জনমের মত!
দেহ মোরে চরম বিদায়।"

একজন যুবক নির্জ্জন গৃহে বসিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছে। যুবকটির এখানে চিন্তার প্রাধান্য অধিক হইলেও অনুভূতি এবং ইচ্ছাশক্তি একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। যুবক মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছে,—জ্ঞানের জন্য, না জীবিকার্জ্জনের জন্য? যে জন্যই হউক, ইহার মূলে অনুভূতি। যুবক মনের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং এই অজ্ঞতানিবন্ধন দুঃখ নিবারণের জন্য জ্ঞানের অভাব-মোচনের জন্য মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছে। দুঃখ এবং অভাব —অনুভূতি। অথবা যুবকের জীবনধারণোপযোগী দ্রব্য সামগ্রীর অভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, এই অভাব কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইবে। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে, মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের আবশ্যক। হয় ত সেই জন্যই যুবক মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছে। দুঃখ-নিবারণের জন্য কিংবা সুখ-সম্ভোগের নিমিত্তই যুবক জ্ঞানালোচনা করিতেছে। অতএব এখানেও অনুভূতি। অনুভূতি ব্যতীত চিন্তা থাকিতে পারে না। চিন্তার ক্রিয়া অনুভূতির উপর। অনুভূতিই চিন্তার উৎপাদক। যুবক নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতেছে। চিত্ত নিবিষ্ট করিতে হইলে, ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া আবশ্যক।

যেখানে চিন্তা সেইখানে ইচ্ছা এবং অনুভূতি।

বাহিরের উপদ্রব হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া পাঠ্য বিষয়ে নিবিষ্ট করিতে হইবে; চিন্তাস্রোতের গতিকে অন্যান্য বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া আলোচিত বিষয়ের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে। চিন্তাস্রোতের গতিকে সংযত করিবার নিমিত্ত, কোন নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালন করিবার নিমিত্ত এবং কোন বিশেষ বিষয়ের উপর কিঞ্চিৎকাল স্থায়ী করিবার নিমিত্ত, ইচ্ছাশক্তির নিয়োগ আবশ্যক। তুমি যখন বলিতেছ—

"ক্ষুদ্র মানবের স্বার্থ নিয়া
এ বিশ্ব রচনা নহে; তাই,
অহর্নিশি যত ব্যথা পাই,
হয় ত বা আছে গো ইহার
গূঢ় অর্থ কোন; বিধাতার
হয় বা এ বিধি জগতের
শুভ তরে!
ক্ষুদ্র মানবের
বুদ্ধি—ঠিক!—পারিবে কেমনে
অনন্ত এ বিধি-বিশ্লেষণে।"

তখন তোমার চিন্তার প্রাবল্য অধিক হইলেও ইহার মূলে এই প্রশ্ন,—

"এরি তরে কহে—ন্যায়বান্
তোমারে এ মূঢ় বিশ্বজনে!
কোথা তুমি? যবে প্রতিক্ষণে
অধর্ম্মের অদম্য প্রতাপে
এ পৃথিবী 'থর-থর' কাঁপে,
কপটতা, তীব্র ছলনায়,

মিথ্যাচার, বিদ্বেষ হিংসায়
ভরি' ওঠে যবে এ সংসার'
তখনো কি চেতনা তোমার
নাহি জাগে? কোথা তুমি—কোথা!"

দুঃখের কষাঘাতে চিন্তার উদ্রেক হইল এবং তথ্য-নির্ণয়ের প্রবৃত্তি জন্মিল। প্রবৃত্তি ইচ্ছার রূপান্তর মাত্র।

প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিলাম। যথারীতি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম। এক্ষণে আমার এক পেয়ালা চা পান করিবার ইচ্ছা হইল।

যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে অনুভূতি এবং চিন্তা।

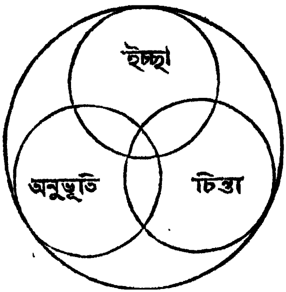
এই ইচ্ছার মূলে অনুভূতি। গত রাত্রিতে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করিয়াছিলাম। রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় নাই। শরীর এখন অবসন্ন। মনে স্ফূর্ত্তি নাই। শরীরের অবসন্নতা হেতু দুঃখ নিবারণের জন্য চা পান করিতে ইচ্ছা হইতেছে। এখানে চিন্তা-শক্তির কার্য্যও বর্ত্তমান। আমি জানি যে, চা পান করিলেই শরীরের অবসাদ ঘুচিয়া যাইবে, মনের স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া আসিবে। পূর্ব্বে অনেকবার আমার এইরূপ অবসাদ ঘটিয়াছিল এবং চা পানে উপকার পাইয়াছিলাম। বর্ত্তমান অবস্থাও পূর্ব্ব অবস্থার মত; সুতরাং এবারেও চা-পানে উপকার হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা দ্বারা বুঝিলাম যে, চা পান প্রয়োজন। অনুভূতি ইচ্ছার উৎপাদক। ইচ্ছার পরিণতি কার্য্য। কার্য্যের উদ্দেশ্য—সুখ অর্জ্জন বা দুঃখ বর্জ্জন। সুখ-দুঃখ—অনুভূতি মাত্র। কোন্ জিনিস সুখের এবং কোন্ জিনিস দুঃখের,—এই চিন্তাই এ প্রশ্নের মীমাংসা করে। সকল সুখই আমাদের বাঞ্ছনীয় নহে, সকল দুঃখই আমাদের বর্জ্জনীয় নহে সুতরাং কোন্‌টি বাঞ্ছনীয় এবং কোন্‌টি পরিহরণীয় ইহার বিচার আবশ্যক। চিন্তার দ্বারাই আমাদের কর্ত্তব্য দেখিতে পাই।

"দেখিবে কর্ত্তব্য যাহা জ্ঞানের আলোকে
সেই ধর্ম্ম সেই পুণ্য, ফল সেই পথে।"

অনুভূতিই কর্ম্মের হেতু, কর্ত্তব্যের প্রবর্ত্তক ; অনুভূতিই উন্নতির সোপান।

"অনন্ত অভাব ফল অনন্ত উন্নতি
এই মহামন্ত্র, দেব, রয়েছে অঙ্কিত
প্রস্তরে উদ্ভিদে, জীবে মানব হৃদয়ে,
সর্ব্বত্র অমরাক্ষরে।"

মনের এই ত্রিবিধ মানসিক অবস্থার সম্বন্ধ চিত্রের দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে দেখান যাইতে পারে।



অনুভূতির সময় মন নিষ্ক্রিয় ; ইচ্ছার সময় সক্রিয় ; এবং চিন্তার সময় নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয়।

মানসিক অবস্থার বৈরভাব।

মনের এই ত্রিবিধ অবস্থা পরস্পর সখ্য ভাবাপন্ন হইলেও তাহারা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। যখন একের উৎকর্ষ তখন অপরের অপকর্ষ্য লক্ষিত হয়।

"বলিব বলিব, দিদি, ভাবিতেছি কতবার,
বলি বলি পারি না বলিতে।

কেমন দুর্ব্বল প্রাণ, প্রাণনাথে যেই ক্ষণ
দেখি, দিদি, সম্মুখে আমার,
কি স্বর্গ ভাসে নয়নে, কি অমৃত বহে প্রাণে
কি যে মোহ হয় সে সঞ্চার।"

এখানে ভাবের মাত্রা অধিক হেতু যাহা বলিব বলিব মনে করিতেছে তাহা বলিতে পারিতেছে না। যখন মন ক্রোধান্বিত, তখন তাহাতে ভাবের মাত্রা অধিক; যখন মন দর্শনশাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত তখন তাহাতে চিন্তার আধিপত্য এবং যখন মন কর্ম্মরত তখন তাহাতে ইচ্ছার প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। ক্রোধে অভিভূত হইলে মানুষের দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না, ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান থাকে না এবং ইচ্ছাশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ভাবে অভিভূত হও, ইচ্ছাশক্তি শিথিল হইবে, জ্ঞানের আভা মলিন হইবে। নবাব মীর কাসেম দলনী বেগমকে গীত গায়িতে অনুরোধ করিলেন। "তখন মহা গোলযোগ বাধিল। তখন বীণার তার অবাধ্য হইল কিছুতেই সুর বাঁধে না। বীণা ফেলিয়া দলনী বেহালা লইল, বেহালাও বেসুর বলিতে লাগিল, বোধ হইল। নবাব বলিলেন, "হইয়াছে তুমি উহার সঙ্গে গাও।" তাহাতে দলনীর মনে হইল যেন, নবাব মনে করিয়াছেন, দলনীর সুর বোধ নাই। তার পর, তার পর, দলনীর মুখ ফুটিল না! দলনী মুখ ফুটাইতে কত চেষ্টা করিল, কিছুতেই মুখ কথা শুনিল না, কিছুতেই ফুটিল না! মুখ ফোটে ফোটে ফোটে না। মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থল কমলিনীর ন্যায়, মুখ যেন ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না। ভীরু কবির কবিতা কুসুমের ন্যায়, মুখ যেন ফোটে ফোটে তবু ফোটে না। স্ত্রীলোকের মানকালীন কণ্ঠাগত প্রণয় সম্ভাষণের ন্যায়, ফোটে ফোটে—তবু ফোটে না।" দলনী এখানে ভাব-মুগ্ধ, কর্ম্মে উদাসীন।

"কি যেন পাগল করি' রেখেছে আমায়,
ভাবমুগ্ধ, কর্ম্মে উদাসীন।"

যখন মানুষ তত্ত্ব চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন তখন তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা থাকে না, সুখ দুঃখের কথা মনে হয় না, বাহ্যবস্তুর জ্ঞান থাকে না, ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল হয়—কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি থাকে না। শৈবলিনীর সুষুপ্তি-সুস্থির মুখমণ্ডলের সুন্দর কান্তি দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "হায় কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজ মুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ আমি ত সর্ব্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত; আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া, এমন নব-যুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্ম-সুখ-পরায়ণ সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশ-সঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণী-মুখ-পদ্ম কি জীবনের সারভূত করিব? ছি ছি তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুম কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্রশেখর আহার করিতে ভুলিয়া গেলেন।" চিন্তার প্রাবল্য হেতু চন্দ্রশেখরে হৃদয়ে এখন ভাবের মাত্রা নিতান্ত কম। আবার যখন কেহ একান্ত কর্ম্মরত তখন তাহার চিন্তাশক্তি শিথিল হয়, সুখ দুঃখানুভূতি লোপ পায়—

কে শুয়ে ওখানে ?
কল্যাণ ! হৃদয়ের ধন !
শুষ্ক হও আঁখি !
শোকের সময় ইহা নয়।
যাও বৎস ! মহাবীর তুমি,
অমরত্ব কর লাভ ত্রিদিব প্রদেশে।

কঠোর কর্ত্তব্য পালনের সময় হৃদয়ের ধন, নয়নের পুত্তলি, মৃত সন্তানের নিমিত্তও শোক করিবার অবসর থাকে না। কর্ত্তব্যের কঠোর তাপে হৃদয়ের উৎস শুষ্ক হইয়া যায়।

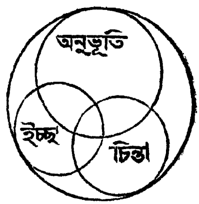
"নয়ন নীরস হও, শুষ্ক হও হিয়া !
এখনও কর্ত্তব্য মোর রয়েছে পড়িয়া !"

কোন গৃহস্থের ঘরে আগুন লাগিয়াছে। তুমি আগুন নিবাইতে ব্যস্ত হইয়াছ। কলসে কলসে জল আনিয়া আগুনে ঢালিতেছ। কাঁটা খোঁচায় তোমার হাত পা কাটিয়া গিয়াছে তোমার দৃক্‌পাত নাই। তুমি জ্ঞান শূন্য হইয়াছ, কিসে কি হইবে বুঝিতে পারিতেছ না, কেবল ছুটা-ছুটি করিতেছ। সাহায্য করিতে গিয়া অন্তরায় হইয়াছ। গৃহ-স্বামী একবারে শোকাভিভূত, নিষ্পন্দ নির্ব্বাক্।

"যেখানে নাহি প্রেম বিচার বিবেচনা—
হৃদয়ে বেঁধে রাখে হাতে পায়
যেখানে বহে প্রেম, হৃদয় অবিচারে
সরল শতধারে গলে যায়।
যেখানে প্রেম ক্ষীণ, অর্থ খুঁজে, বুঝে
ওজন করে প্রাণ কথা কয়।

যেথানে প্রেম ভরা, কত কি কহে তথা
নাহিক দ্বিধা বাধা কোন ভয়॥"

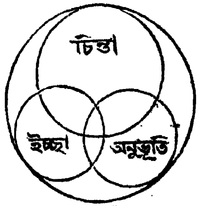
মানুষের মধ্যে কাহাতে বা ভাবের, কাহাতে বা ইচ্ছার, আবার কাহাতে বা চিন্তার মাত্রা অধিক দৃষ্ট হয়। কেহ বা স্বভাবতঃ ভাবুক, কেহ বা স্বভাবতঃ চিন্তাশীল, আবার কেহ বা স্বভাবতঃ কর্ম্মী।



ভাবুক

ভাবাধিক্য—

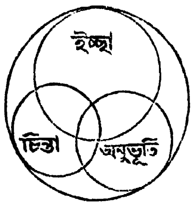
"তোর যে হৃদয় জল, সর্ব্বদাই টল্ টল্
যথা তথা পড়ে গড়াইয়া।
আকাশে মলিন মেঘ দেখিলে অভাগী তুই
মরমেতে মরিস কাঁদিয়া।"



জ্ঞানী

জ্ঞানাধিক্য—

"হেথা ধেয়ান নেমেছে জ্ঞানের নয়নে
জ্ঞানে সে ডুবেছে ধ্যানে,
হেথা ধ্যানের জ্ঞানের গঙ্গাসাগর,—
একাকার ধ্যানে জ্ঞানে,
'আমি ও তুমির' চক্রতীর্থ
এ সাধন-উদ্যানে!"



কর্ম্মী

ইচ্ছাধিক্য—

"সদা অবহেলি সুখে, ধর্ম্মেরে রাখি সম্মুখে,
চলেছে কর্ত্তব্য পথে, নাহি চাহি কোন ভিতে।"

কোন কোন মানুষে আবার এই তিনটী অবস্থার সমান বিকাশও পরিলক্ষিত হয়। বালক বালিকাদের ইচ্ছা এবং চিন্তাশক্তি অপেক্ষা ভাবের মাত্রা অধিক; কর্ম্মীদের চিন্তা এবং ভাব অপেক্ষা ইচ্ছাশক্তি প্রবল এবং তার্কিকদের ইচ্ছা এবং ভাব অপেক্ষা চিন্তার পরিমাণ অধিক।

আমার সম্মুখে একটি বস্তু আছে। বস্তুটি দেখিয়া বলিলাম "ইহার

বর্ণ লোহিত।" এই লোহিত বর্ণের জ্ঞান আমার কেমন করিয়া হইল? প্রথমতঃ এই বর্ণটির প্রতি চিত্ত-সংযোগ করিলাম। অবধান ব্যতীত কোন জ্ঞানই থাকিতে পারে না। পরে বুঝিলাম যে এই বর্ণটি শ্বেত নয় পীত নয়—শ্বেত পীত ইত্যাদি অপর বর্ণ হইতে দৃষ্ট বর্ণটি পৃথক্। এখানে আমার পার্থক্য জ্ঞান হইল। পূর্ব্বে আমি অনেক প্রকার বর্ণ দেখিয়াছি তন্মধ্যে লোহিত বর্ণও দেখিয়াছি। বর্ত্তমান বর্ণটি আমার পূর্ব্ব পরিচিত লোহিত বর্ণের সদৃশ। এখানে আমার সাদৃশ্য জ্ঞান হইল। যদি পৃথিবীতে একমাত্র লোহিত বর্ণ ছাড়া অন্য বর্ণ না থাকিত তবে লোহিত বর্ণের জ্ঞান আমাদের হইত না। এটি লোহিত বর্ণ বলিতে হইলেই ভাবিতে হইবে যে ইহা কাল নয়, সাদা নয় ইত্যাদি এবং আরও ভাবিতে হইবে যে ইহা আমার পূর্ব্ব পরিচিত লোহিত বর্ণের মত। সেই রূপে, মনের কোন একটি অবস্থার পরিচয় লইতে হইলে সেই অবস্থার প্রতি চিত্তসংযোগ করিতে হইবে, সেই অবস্থাটিকে তাহার বিসদৃশ অবস্থা হইতে পৃথক্ করিতে হইবে এবং সদৃশ অবস্থার সহিত এক করিতে হইবে। কোন একটি জিনিষের বা একটি অবস্থার জ্ঞান অসম্ভব—তদতিরিক্ত জিনিষের বা পৃথক্ পৃথক্ অবস্থার জ্ঞানের প্রয়োজন। অন্ধকার আছে বলিয়া আলোকের জ্ঞান সম্ভব। পাপ আছে বলিয়া পুণ্যের চিন্তা সম্ভব। যকৃত যখন অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় তখনই আমরা যকৃতের কথা ভাবি। দুঃখ আছে বলিয়া সুখে আনন্দ পাই।

অবধান, বৈসাদৃশ্যানয়ন এবং সাদৃশ্যানয়ন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মনের বিকাশ।

আমরা এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের মনে এখন নানা ভাবের উদয়, নানা অবস্থার সংঘটন হইতেছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের মনের বিকাশ হইতেছে, অবস্থার জটিলতাও বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু যখন আমাদের জীবনের সূচনা হইল, তখন আমাদের মনের অবস্থা কেমন ছিল? হার্‌বার্ট বলেন, প্রথম মনের প্রথম অবস্থায় মনের কোন জটিলতা ছিল না—অনুভূতি ছিল না, ইচ্ছা ছিল না, চিন্তা ছিল না। ইহার একই অবস্থা ছিল—এ অবস্থা জ্ঞানের নয়, ভাবের নয়, কর্ম্মের নয়।

মনের প্রারম্ভ

ইহা কি তবে একবারে নির্গুণ ছিল? একবারে নির্গুণ ছিল না—মাত্র ইহার দুইটি গুণ ছিল। ইহা আপনার পরিবর্ত্তন আপনি আনিতে পারে না—ইহা যেমনটি আছে, তেমনটি থাকিয়া যাইবে; এবং যদি কোন প্রকারে কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তবে নিজেকে সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া পূর্ব্ব অবস্থায় পুনরানয়ন করিতে পারে না। তখন

"তোমার সকল চেষ্টা, শত বাধা, সহস্র ক্রন্দন,
তাহার উত্তাল-স্রোতে ভেসে যায় তৃণের মতন।"

ইহার আর একটি গুণ এই যে, বাহ্যশক্তি কর্ত্তৃক ইহার চাঞ্চল্য উৎপাদিত হইলে, ইহাও ঐ শক্তির উপর প্রতিক্রিয়া করিতে সমর্থ।

হার্‌বার্ট আরও বলেন যে, প্রথম অবস্থায় সকলেরই মন একপ্রকার ;—ধনীর সন্তান এবং দরিদ্রের সন্তান, শিক্ষিত ব্যক্তির সন্তান এবং অশিক্ষিত ব্যক্তির সন্তান—সকলেরই মন প্রথম অবস্থায় একরকম—কোন পার্থক্য নাই। হার্‌বার্টের এ প্রকার অনুমান একেবারে অসম্ভব নয়। ইহাতে কতটুকু সত্য আছে জানি না, তবে কিছু সত্য আছে স্বীকার করিতে হইবে। মন প্রথম অবস্থায় সুপ্ত। বাহ্যবস্তুর ঘাত-প্রতিঘাতে এই সুষুপ্তি নষ্ট হয়। কিন্তু বাহ্যশক্তি একবারেই মনের নিকট পৌঁছিতে পারে না। বাহ্যশক্তি মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সুপ্ত মনকে জাগরিত করিতে সমর্থ হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় মনুষ্য-শরীরের অংশমাত্র। হার্‌বার্ট বলিয়াছেন যে, প্রথম অবস্থায় সকলের মন একপ্রকারের, কিন্তু তিনি ত বলেন নাই যে, সকলের শরীরও প্রথম অবস্থায় একপ্রকারের! অতএব জন্ম-সময়ে সকলের মন এক হইতে পারে, কিন্তু শরীরের গঠনের পার্থক্য-হেতু মনের এই সাম্যতা অচিরেই নষ্ট হইয়া যায়। দুইটি বালক এক সময়ে জন্মগ্রহণ করিল। দুইজনের মন একরকম। কিন্তু একজন অন্ধ, আর একজন চক্ষুষ্মান্‌। একজন দর্শনেন্দ্রিয়জনিত সুখের অধিকারী হইল, আর একজন তাহাতে বঞ্চিত হইল। দুইজনের মনের সাম্যতা নষ্ট হইয়া গেল। কেবল যে শরীর-যন্ত্রের গঠন-প্রণালীই মনের পার্থক্য সৃজন করে, এমন নহে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও বহুল পরিমাণে এ পার্থক্যের হেতু। একজন হয় ত বিলাসিতার কোমল ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইতেছে; আর একজন হয় ত দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিপীড়িত হইতেছে। একজনের বাসস্থান হয় ত জনতাপূর্ণ, কোলাহলপূর্ণ নগর, আর একজনের আবাসভূমি হয় ত শান্তিময় সামান্য পল্লীগ্রাম। একজনের পিতামাতা হয় ত শিক্ষিত, আর একজনের পিতামাতা হয় ত নিরক্ষর। শিক্ষা-দীক্ষা, আহার বিহার, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি

প্রভৃতি অনেক ব্যাপারে পার্থক্য লক্ষিত হয়, এবং এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে মনেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

"একই কানন, দেখ, করি পুণ্যাশ্রম
আমরা, তোমরা কর হিংস্রজন্তুবাস।
একই হৃদয়, শূন্য ইন্দ্রিয় লালসা
আমাদের, পরিপূর্ণ বাসনা-অনলে
তোমাদের।"

বংশ পরম্পরানুগত শারীরিক এবং মানসিক বিশেষত্ব।

কোন একটি পরিবারের সন্তান-সন্ততির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আকার-প্রকার বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ কর,—দেখিবে, তাহার শারীরিক গঠন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে—কিন্তু এই বিশেষত্বটুকু অন্য একটি পরিবারে দেখিতে পাইবে না। প্রত্যেক পরিবারেরই কিছু-না-কিছু বিশেষত্ব আছে, এবং এই বিশেষত্ব বংশ-পরম্পরানুগত। পিতার আকৃতির সহিত পুত্রের আকৃতির সাদৃশ্য বিরল নহে। কেবল যে আকৃতিগত সাদৃশ্যই লক্ষিত হইবে, এমন নহে। বিশেষভাবে প্রণিধান কর,—দেখিবে, মনোগত বিশেষত্বও আছে,—এক এক পরিবারের এক এক রকম মনের ভাব। এ ভাবও বংশ-পরম্পরানুগত।

"বাছারে!
বিনা পরিচয়ে আমি চিনেছি তোমারে।
সেই সুভদ্রার মুখ, পার্থ অবয়ব,
সেই সুভদ্রার প্রাণ, পার্থের প্রভব।
অর্জ্জুনের মানবত্ব, দেবীত্ব ভদ্রার,
তাঁহাদের পুত্র বিনা কে পাইবে আর?

ত্রিদিবের পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য ধরার,
তাঁহাদের পুত্র বিনা কে পাইবে আর?"

পিতার মনের ভাবের সহিত সন্তানের মনের ভাবের অনেক সাদৃশ্য থাকে। এক গৃহস্থের দুইটি সন্তান। বাল্যাবস্থায় তাহাদের মনের অবস্থা প্রায় এক ছিল। পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে দেখিবে, একজন যুদ্ধবিদ্যায়, আর একজন কাব্যালোচনায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। একজন কর্ম্মঠ, নির্ভীক এবং উদ্ধত—আর একজন আলস্যপরায়ণ, নিস্তেজ এবং শান্তি-প্রিয়। উহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এক ছিল না; উহাদের শিক্ষাও একরূপ হয় নাই। একজনকে পাহাড়-পর্ব্বতে, বন-জঙ্গলে, ঝড়-বৃষ্টিতে দিনাতিপাত করিতে হইয়াছে, আর একজনকে হয় ত প্রকৃতির অত্যাচার একেবারেই সহ্য করিতে হয় নাই—সুরম্য সুসজ্জিত অট্টালিকাতেই হয় ত কাল কাটাইতে হইয়াছে। একজনকে কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে, স্বেচ্ছায় বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; আর একজন হয় ত নিরন্তর নিরাপদে সুখ-শান্তিতে কালাতিপাত করিয়াছে। উহাদের শিক্ষা পৃথক্, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও পৃথক্ বলিয়া মনের বিকাশও বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাহ্যশক্তিনিচয় মনের বিকাশে বিশেষ সহায়তা করে।

মনোবিকাশের উপকরণ।

একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে ইঁট কাঠ প্রভৃতি কতকগুলি উপকরণের আবশ্যক। কিন্তু এই উপকরণগুলি বাহিরের শক্তিতে সঞ্চিত হইতেছে, বাহিরের শক্তিতেই সজ্জিত হইতেছে—গৃহের নিজের কোন শক্তি নাই। ইহার কোন অঙ্গ নষ্ট হইলে ইহাকে পুনরায় মেরামত করিবার শক্তি গৃহের নাই। কিন্তু বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে—জল বায়ু উত্তাপ ইত্যাদি ইহার উপাদান;—এ উপাদান কোন বাহিরের শক্তিদ্বারা সঞ্চিত হইতেছে

না। বীজের নিজেরই অন্তর্নিহিত শক্তি আছে; এই শক্তিসাহায্যে সূর্য্য হইতে উত্তাপ গ্রহণ করিতেছে, মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করিতেছে, আকাশ হইতে বায়ু গ্রহণ করিতেছে; নিজের উপকরণ নিজেই সংগ্রহ করিতেছে; যাহা পুষ্টিকর তাহাই গ্রহণ করিতেছে, অপুষ্টিকর দ্রব্য ত্যাগ করিতেছে। নিজের ভিতর হইতেই নিজের পত্র পল্লব ফল ফুল প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে ক্রমে ক্রমে বিকাশ করিয়া বৃক্ষটিকে পূর্ণাবয়ব করিয়া তুলিতেছে। ইহার একটি পল্লব কাটিয়া ফেল—দেখিবে সেখানে আর একটি পল্লব অঙ্কুরিত হইতেছে। বৃক্ষটির মত আমাদের মনেরও বিকাশ হইতেছে। এ বিকাশও অন্তর্নিহিত শক্তি-প্রসূত। ইহাতেও উপকরণের আবশ্যক। এই অন্তর্নিহিত শক্তি হইতে উপকরণগুলির আদান-প্রদান গ্রহণ-প্রত্যাখ্যান, সংযোগ-বিয়োগ, মিলন-ঘোটন প্রভৃতি কার্য্য হইতেছে। এই প্রকার ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার দ্বারা মানসিক শক্তিনিচয়ের পূর্ণ বিকাশ হইতেছে। মনের মূল শক্তি, বংশানুগত শারীরিক এবং মানসিক বিশেষত্ব, পারিপার্শ্বিক সামাজিক এবং প্রাকৃতিক অবস্থা—এই কয়টি মনের বিকাশ এবং পুষ্টিসাধনের উপায়। বীজ ব্যতীত বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে না। মূল শক্তি ব্যতীত বিকাশ অসম্ভব। শক্তিহীন বস্তুর স্বপ্রকাশ অসম্ভব। স্বপ্রকাশ এবং বিকাশ নামান্তর মাত্র। মন আত্মপ্রকাশে সমর্থ, কারণ মনের নিজস্ব শক্তি আছে। এই নিজস্ব শক্তিটিকে মূল-শক্তি বলা যায়। মূল-শক্তি ব্যতীত কেবল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাহায্যে বিকাশ অসম্ভব। এই মূল-শক্তি একেবারে সহায়সম্বলবিহীন নহে। শরীর এবং মনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। প্রত্যেক মানুষের অবয়বগত বিশেষত্ব আছে। এ বিশেষত্বটুকু বংশানুগত। প্রত্যেক মানুষের মানসিক বিশেষত্বও আছে; এ বিশেষত্বও শরীরগত বিশেষত্বের ন্যায় বংশানুগত। ইহা সকল সময়েই স্বোপার্জ্জিত নহে, শিক্ষালব্ধ নহে।

মানসিক শক্তির বিকাশের প্রাক্কালে ইহা যে একবারে নিষ্কলঙ্ক, একবারে পূর্ব্বসংস্কার বর্জ্জিত, তাহা বলা যায় না। শরীরের সহিত মনের সান্নিধ্যহেতুই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, মনের উপর পূর্ব্বসংস্কারের আভাস আছে, স্বীকার করিতেই হইবে। শরীর ব্যতীত প্রাথমিক অবস্থা সকলেরই সমান হইতে পারে,—মূল-শক্তি সকলেরই এক প্রকার হইতে পারে; কিন্তু এরূপ মন আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় নহে। তবে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে, জীবনের প্রথম অবস্থায় বিভিন্ন মনের ভিতর যতটুকু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, পরে ততটুকু হয় না। শরীরের সহিত মনের অতি নিকট সম্বন্ধ। শরীর সুস্থ, সবল হইলে মনকেও সুস্থ ও সবল করিতে পারা যায়। শরীর দুর্ব্বল হইলে মানসিক শক্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সুতরাং শরীরের উন্নতি-সাধন প্রয়োজন। জল, বায়ু, আহার, সংযম, ব্যায়াম ইত্যাদির উপর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। জল বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক শক্তি। শিক্ষা, দীক্ষা, পারিবারিক আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতি ইত্যাদি মনের বিকাশে সহায়তা করে—ইহাদিগকে সামাজিক পারিপার্শ্বিক শক্তি বলা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে বংশানুগত "পুরাতনের" উপর নূতনের ছায়া পতিত হইয়া নূতনের সৃষ্টি হইতেছে।

মনোবিকাশের পর্য্যায়।

এক হইতে সপ্তমবর্ষ পর্য্যন্ত মানুষের মন অবস্থার দাস, পারিপার্শ্বিক শক্তির ক্রীড়নক মাত্র। এখন মন একপ্রকার নিষ্ক্রিয়। এখনও চিন্তার উন্মেষ হয় নাই। ভূতের পা তালগাছের মত; রাক্ষসে মানুষ খায়, এই প্রকার রূপকথা শুনিতে ভালবাসে; সুতরাং এ অবস্থায় কল্পনা-শক্তির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এখন পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য্য বড়ই প্রবল। এটি সাদা, ওটি কাল; এটি শক্ত, ওটি নরম; এটি মিষ্ট, ওটি তিক্ত; ইত্যাদি প্রত্যক্ষ

জ্ঞানসঞ্চয়ে মন নিরত। এ অবস্থায় মানুষ বড়ই স্বার্থপর থাকে। নিজের সুখ দুঃখ ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। ইচ্ছাশক্তির এখনও তেমন বিকাশ হয় নাই—ইচ্ছাকে যদৃচ্ছা সঞ্চালিত এবং সংযত করিবার শক্তি এখনও সঞ্চয় করিতে পারে নাই। সপ্তম হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত মন অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। এখন আর সে অবস্থার দাস নহে, এখন আর সে অবস্থা কর্ত্তৃক পরিচালিত হয় না ;—অবস্থাকেও সে পরিচালিত করিতে পারে। এখন সে পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের উপর আধিপত্য সংস্থাপনে সচেষ্ট। এখন আর সে অবস্থার আদেশানুযায়ী কাজ করে না, অবস্থাকে নিজের আদেশের বশীভূত করিতে সচেষ্ট। সপ্তমবর্ষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়-সাহায্যে যে সকল জ্ঞানের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল, এখন সেই উপকরণ-গুলিকে স্মৃতিপটে ধারণ এবং স্মরণ করিবার শক্তি হইয়াছে। এই সময় স্মৃতিশক্তি বড়ই প্রবল। এখন যাহা অভ্যাস করা যায় বোধ হয় জীবনে আর তাহা ভোলা যায় না। অভিজ্ঞতার কষাঘাতে কল্পনাশক্তি শিথিল হইয়া পড়ে। বাস্তবের সম্মুখে অবাস্তবের কাহিনী আর ভাল লাগে না। এখন আর উপকথায় আমোদ পাওয়া যায় না, কিন্তু উপন্যাস-পাঠে যথেষ্ট আমোদ পাওয়া যায় ;—কিন্তু উপন্যাস যদি অস্বাভাবিক ঘটনাবলির বিন্যাস মাত্র হয়, তবে সে উপন্যাস-পাঠে কৌতূহল জন্মে না। এই সময় তর্ক-শক্তি এবং বিচার-শক্তি ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হয়। অনুভূতির জটিলতাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। এখন সে কেবল নিজের সুখ-দুঃখের জন্য লালায়িত নহে। এখন পরের জন্যও ভাবিতে শিখিতেছে। এখন আর কেবল ইন্দ্রিয়সুখে সন্তুষ্ট থাকে না—এখন জ্ঞানে সুখ পায়, কর্ম্মে সুখ পায়, ধর্ম্মে সুখ পায়, সৌন্দর্য্যে সুখ পায়। এখন ইচ্ছাশক্তিকে সংযত করিতে, নির্দ্দিষ্ট পথে, কর্ত্তব্যপথে চালাইতে পারে। চতুর্দ্দশ হইতে একবিংশতিবর্ষ কালের মধ্যে মানুষ অনেক পরিমাণে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বশীভূত

করিতে সমর্থ হয়। এখন সে স্বাবলম্বন শিক্ষা করিয়াছে—নিজেকে অনেকটা স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছে। এখন তাহার দৃষ্টি বহির্মুখী নহে —অন্তর্মুখী। প্রথম অবস্থায় যে জ্ঞান সংগৃহীত হইয়াছিল, দ্বিতীয় অবস্থায় যে জ্ঞান স্মৃতিপটে সঞ্চিত হইয়াছিল, এখন সেই সঞ্চিত জ্ঞানের শৃঙ্খলা সম্পাদনে সচেষ্ট। অনাবশ্যক জ্ঞানগুলি সংহার করিয়া আবশ্যক জ্ঞান-গুলির সংরক্ষণে এখন সচেষ্ট। দ্বিতীয় অবস্থায় অভ্যাসের বলে অবোধ্য এবং অর্থহীন ভাষাকেও স্মৃতিপটে ধরিয়া রাখা যাইত ; কিন্তু এখন আর তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু এখন কোন জিনিস বা ভাষা মনে রাখিতে হইলে ইহার অর্থবোধ আবশ্যক এবং স্মৃতির সহিত ইহার সাদৃশ্যের অনুসন্ধান আবশ্যক। এখনকার স্মৃতি জ্ঞানসম্ভূত,—অভ্যাসপ্রসূত নহে। এ সময়ের অনুভূতি জ্ঞানের সহায় এবং কর্ত্তব্যের প্রবর্ত্তক। মানুষের মন এইরূপে ক্রমশঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাহায্যে অন্তর্নিহিত আত্ম-শক্তির বিকাশ করিয়া জ্ঞানের দিকে, স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

"ফুল কহে ফুকারিয়া—ফল, ওরে ফল,
কতদূরে রয়েছিস্ বল্ মোরে বল্!
ফল কহে, মহাশয়, কেন হাঁকাহাঁকি,
তোমারি অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি!"

সপ্তম অধ্যায়

মন ও শরীর।

পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, শরীর ও মনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। মানুষ বলিতে আমরা মানুষের কেবল শরীর বুঝি না, মনও বুঝি না—কিন্তু উভয়ই বুঝি।

মন ও শরীরের সম্বন্ধ। উভয়েই নিরবচ্ছিন্ন। মনই আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবিধির নিয়ন্তা।

নিগূঢ় গোপন আত্মা তুমি হে,
হস্ত-চরণ আমরা সবে ;
তুমি চালাইলে তবে চলি মোরা,
তুমি বলাইলে বলি সে তবে।"

মনের উপর বাহ্যজগতের ক্রিয়া শরীরের ভিতর দিয়াই হইয়া থাকে আবার মনও শরীর দিয়াই বাহ্যজগতের উপর প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্,—ইহারা শরীরের অংশ। চক্ষুর সাহায্যে বর্ণ, কর্ণের সাহায্যে শব্দ, জিহ্বার সাহায্যে রস, নাসিকার সাহায্যে গন্ধ এবং ত্বকের সাহায্যে স্পর্শ প্রভৃতির জ্ঞান হইয়া থাকে। যে আজন্ম অন্ধ, তাহার বর্ণের জ্ঞান নাই ; যে আজন্ম বধির, তাহার শব্দ-জ্ঞান নাই। আবার মন ব্যতীত চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির। অতএব শরীরের ভিতর দিয়াই বাহ্যজগতের বিষয় আমরা অবগত হই। শরীরে কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলে, তাহা অচিরে মনোজগতে আনীত হয় ; আবার মনোজগতে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাহাও শরীরে প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়ে। শারীর-

লক্ষণমাত্র দেখিয়া আমরা মনের ভাব অনেক সময়েই অনুমান করিয়া থাকি। অতএব শরীর এবং মনে বড়ই মাখামাখি ভাব।

মন ও মস্তিষ্কের সম্বন্ধ।

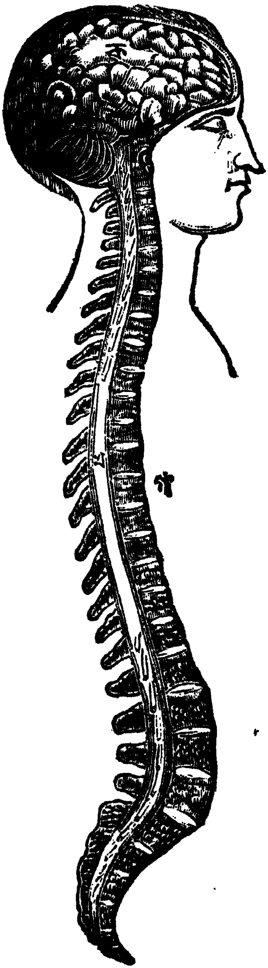
মনের সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ এবং নিকট। মস্তিষ্কের সহিত সমস্ত শরীর-যন্ত্রটি অসংখ্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র স্নায়ুসূত্রের দ্বারা সংলগ্ন। যদি কোন একটি বিশেষ অঙ্গের সহিত মস্তিষ্কের এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা হয়, অর্থাৎ ঐ অঙ্গের সহিত মস্তিষ্কসংলগ্ন স্নায়ুসূত্রগুলি কাটিয়া দেওয়া হয়, তবে সেই অঙ্গ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই থাকিবে না। কারণ, উক্ত বিচ্ছিন্ন অঙ্গের উপর কোন ক্রিয়া সংঘটিত হইলে, সেই ক্রিয়াভাষ মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত পৌঁছিবে না। সুতরাং তজ্জনিত কোন জ্ঞানও হইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মনের সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ অতি প্রয়োজনীয়। আরও পরীক্ষার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, যখনই আমি তোমার কোন অঙ্গ স্পর্শ করিলাম, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তোমার স্পর্শজনিত জ্ঞান হইবে না। স্পর্শ করিবার কিঞ্চিৎ পরে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তোমার অঙ্গ স্পৃষ্ট হইতেছে। তোমার শরীর-স্পর্শ এবং তজ্জনিত জ্ঞান—এই দুইএর মধ্যে সময়গত ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যবধান হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, অঙ্গবিশেষ স্পর্শজনিত বা অন্য কোন কারণ বশতঃ পরিবর্ত্তন-বার্ত্তা মস্তিষ্কে আনীত হইতে কিঞ্চিৎ সময়ের প্রয়োজন, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ বার্ত্তা মস্তিষ্কে আনীত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সম্বন্ধে জ্ঞানও হয় না। শরীরে যখন যে ক্রিয়া ঘটিতেছে, তখনই তাহার বার্ত্তা অন্তর্বাহী স্নায়ু কর্ত্তৃক মস্তিষ্কে আনীত হইতেছে। বাহ্যপরিবর্ত্তন যতক্ষণ পর্য্যন্ত মস্তিষ্কে ধাক্কা না দেয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহার জ্ঞান হয় না। আরও দেখিয়াছি যে, যখন মন অবসন্ন হয়, তখন মস্তিষ্কও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে, মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত

হয়। অকস্মাৎ মস্তিষ্কে আঘাত লাগিলে, চিন্তাশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়, সংজ্ঞাহীন হইতে হয়। যেখানে মানসিক বিকার সেইখানেই মস্তিষ্কের কোন না কোন অংশের হানি পরিলক্ষিত হয়। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে, মস্তিষ্কের রক্ত-চলাচল দ্রুত সম্পন্ন হইয়া থাকে। বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে মস্তিষ্কেরও তারতম্য লক্ষিত হয়। পাগলের মস্তিষ্কের ওজন ৩২ আউন্স, সাধারণ মনুষ্যের ৪৮ আউন্স এবং ধীমান ব্যক্তির ৬৪ আউন্স পর্য্যন্ত দেখা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, মস্তিষ্ক এবং মনের সম্বন্ধ অতি নিকট। সুতরাং, মানসিক ব্যাপারের সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলে, শরীরযন্ত্র সম্বন্ধে—বিশেষতঃ স্নায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

স্নায়ুমণ্ডলের গঠন।

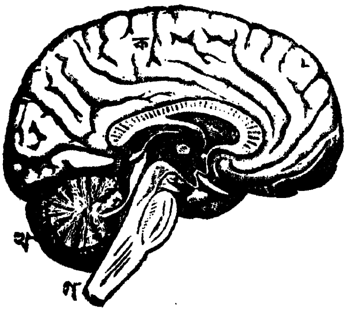
মানব-শরীরের প্রধান অবলম্বন অস্থি-কঙ্কাল। এই অস্থি-কঙ্কালের এক অংশ আমাদের মলদ্বারের কিঞ্চিৎ উপর হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহাকে মেরুদণ্ড বলে (গ)। আমাদের মস্তক মেরুদণ্ডের উপরিভাগে স্থাপিত। মেরুদণ্ড ও মস্তক নর-কঙ্কালের এক-খণ্ড বলা যাইতে পারে। এই মেরুদণ্ডের বলে আমাদের শরীর সবল ও উন্নত হইয়া থাকে, এবং ইহাই আমাদের মস্তককে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ মেরুদণ্ড একটি অস্থি নহে; ইহা কতকগুলি অস্থিখণ্ডের আশ্চর্য্য সমন্বয়। এক-এক জায়গায় এক-একটি গ্রন্থি হস্ত দ্বারাও অনুভব করা যায়। প্রত্যেক অস্থি-গ্রন্থি দুইটী অস্থি-খণ্ডের উপর্য্যুপরি অবস্থানের দ্বারা নির্ম্মিত। এই প্রকারে সমগ্র মেরুদণ্ডটী সপ্তবিংশ অস্থিখণ্ডে প্রস্তুত। এতগুলি বিভিন্ন অস্থিখণ্ড সংযুক্ত আছে বলিয়াই, আমরা পৃষ্টদেশকে ইচ্ছামত কতক পরিমাণে নোয়াইতে ও সোজা করিতে পারি। এই মেরুদণ্ডের উপরে

অতি কঠিন ও গুরুভারসহ শিরঃকঙ্কাল স্থাপিত রহিয়াছে। মেরুদণ্ডের উপাদান সচ্ছিদ্র গ্রন্থিগুলি একটি অপরটির উপর রক্ষিত; সুতরাং নিম্নতর প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তকের অধোভাগ পর্য্যন্ত একটি নিরবচ্ছিন্ন ছিদ্র রহিয়াছে। শিরঃকঙ্কালের অভ্যন্তরও শূন্য। সুতরাং মস্তকের ঊর্দ্ধভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরকাণ্ডের অধস্তনভাগ পর্য্যন্ত নর-কঙ্কালের অভ্যন্তর শূন্য। এই শূন্য অংশ একপ্রকার কোমল পদার্থে পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ এই পদার্থের মধ্যে দুই পদার্থের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একটি শ্বেত ও অপরটি ধূসর বর্ণের। এই পদার্থটিকে স্নায়ু-পদার্থ বলে। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে ধূসর পদার্থকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া শ্বেত পদার্থটি ও মস্তকের অভ্যন্তরে শ্বেত পদার্থটিকে পরিবেষ্টন করিয়া ধূসর পদার্থটি অবস্থান করিতেছে। মেরুদণ্ড-মধ্যস্থিত স্নায়ুপদার্থকে মজ্জা (খ) ও মস্তকের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুপদার্থকে মস্তিষ্ক বলে (ক)। মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ু-পদার্থকে স্নায়ুমণ্ডলের কেন্দ্র বলা হইয়া থাকে; যেহেতু,



মানব-শরীরের স্নায়ু হয় মস্তিষ্ক নয় মজ্জা হইতে নির্গত হইয়া শরীরের সকল অংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। শরীরের দূরতম প্রদেশের অতি ক্ষুদ্র স্নায়ুগুলিও পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া, শেষে, মস্তকে ও মেরুদণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে। শরীরের এমন কোন অংশ নাই, যাহা সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম স্নায়ুদ্বারা আচ্ছন্ন নহে। এই সকল সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম স্নায়ু পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া সমগ্র শরীর আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। একটি আলপিন বসিতে পারে এরূপ স্থান নাই, যাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র স্নায়ুর সন্নিবেশ না আছে। শরীরের বহির্ভাগে যেরূপ, অভ্যন্তরেও তদ্রূপ। স্নায়ু-সকলের সংখ্যা করা অসম্ভব; কিন্তু শারীর-তত্ত্ববিদেরা কতকগুলিকে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজনীয় মনে করিয়া, অপরগুলি হইতে পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা দর্শন-স্নায়ু, শ্রবণ-স্নায়ু ইত্যাদি। এগুলি বরাবর মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইয়া কথিত ইন্দ্রিয়াবয়ব সকল পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। মস্তকের অধোভাগে যে সকল স্নায়ু পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মজ্জা হইতে নির্গত হইলেও পরোক্ষভাবে মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইয়াছে। মস্তিষ্ক ও মজ্জা মিলিত হইয়া এক অবয়ব হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং অধোভাগের স্নায়ুগুলি মস্তিষ্কের সহিত ও ঊর্দ্ধভাগের স্নায়ুগুলি মজ্জার সহিত সম্বদ্ধ রহিয়াছে। স্নায়ু ও স্নায়ুকেন্দ্র লইয়াই আমাদের স্নায়ুমণ্ডল। একটি স্নায়ুকে যন্ত্রাদির দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, উহা কতকগুলি স্নায়ুসূত্রের সমষ্টি মাত্র। অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় স্নায়ুগুলির অভ্যন্তরে একটি সূত্র ও তাহাকে বেষ্টন করিয়া দুইটি আবরণ বা পর্দ্দা রহিয়াছে। আভ্যন্তরীণ সূত্রটিকে অক্ষনল ও উহার আবরণ দুইটিকে স্নায়ুরক্ষক আবরণ বলা হয়। কতকগুলি স্নায়ুতে গ্রন্থি আছে ও অপরগুলিতে উহা নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্নায়ুসকল পরস্পরকে কোন নগরের পথের ন্যায় কাটাকাটি করিয়া চারিদিকে চলিয়া গিয়াছে। স্নায়ুর উপাদান পূর্ব্ব কথিত

শ্বেত পদার্থ। মজ্জা বা মস্তিষ্কে যে শ্বেত পদার্থ আছে, স্নায়ুসকল সেই শ্বেত পদার্থের উপাদানে গঠিত। এই শ্বেত পদার্থ আবার অসংখ্য স্নায়ুসূত্রময়।



মস্তিষ্কের বামার্দ্ধ (অভ্যন্তরের দৃশ্য)।

(ক) বৃহৎ মস্তিষ্ক।

(খ) ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক।

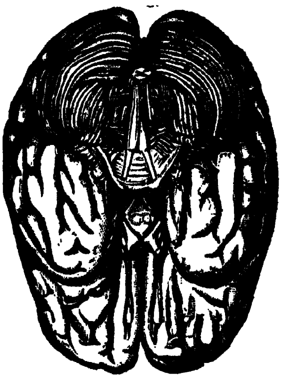
(গ) আয়ত মজ্জা।

মস্তিষ্কের গঠন।

আমাদের মস্তিষ্ক একটি বৃহৎ পুষ্পাকৃতি। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ মজ্জাদণ্ডের উপর এই বৃহৎ পুষ্প সন্নিবিষ্ট। মস্তিষ্কের এক অংশ ক্ষুদ্র হইয়া মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর দিয়া শরীর-কাণ্ডের অধস্তন ভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত, অথবা মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ মজ্জাদণ্ড মস্তকে প্রবেশ করিয়া এক বৃহৎ পুষ্পাকারে পরিণত হইয়াছে। যে স্থলে মেরুদণ্ড মস্তকে প্রবেশ করিয়াছে, সেই স্থলে মজ্জাদণ্ড বিশেষ প্রশস্ত ও স্থূল;—এই অংশকে আয়তমজ্জা বলে (গ)। ইহাকে আচ্ছাদন করিয়া একটি "ক্ষুদ্র-মস্তিষ্ক"

স্থাপিত (খ)। মজ্জা ও মস্তিষ্কের সন্ধিস্থল হইতে এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের উপরিভাগ পর্য্যন্ত যে অবয়ব তাহার দুই পার্শ্বে আরও দুইটি পৃথক্ অবয়ব রহিয়াছে। সর্ব্বোপরি মস্তিষ্কের গোলাকৃতি উর্দ্ধতন অংশ এক গভীর প্রণালী দ্বারা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে—যেন বৃন্তের উপর সপল্লব পুষ্প প্রস্ফুটিত। এই দুই অংশকে "গোলকার্দ্ধ" বলে। এই গোলকার্দ্ধের উপরিভাগ সমতল নহে। ইহাও অগভীর প্রণালী সমূহ দ্বারা বহু অংশে বিভক্ত হইয়া বন্ধুর হইয়া রহিয়াছে (ক)। গোলকার্দ্ধদ্বয় ভিতরের দিকে শ্বেতসূত্রগুচ্ছ দ্বারা সংমিলিত। কিছুদূর নিম্নে দুই গোলকার্দ্ধ হইতে নির্গত স্নায়ুসকল পরস্পরের ভিতর দিয়া বিভিন্নমুখে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে—অর্থাৎ বাম গোলকার্দ্ধ হইতে নির্গত স্নায়ু সকল শরীরের দক্ষিণাংশে ও দক্ষিণ গোলকার্দ্ধ হইতে নির্গত স্নায়ু সকল শরীরের বামভাগে চলিয়া গিয়াছে। বৃহৎ মস্তিষ্ক (ক) সমস্ত মস্তিষ্ক পিণ্ডের প্রায় আট ভাগের সাত ভাগ হইবে। ইহা সম্মুখের ভ্রূযুগল হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চাতে ঘাড়ের উপর পর্য্যন্ত সমস্ত করোটী জুড়িয়া অবস্থান করিতেছে।

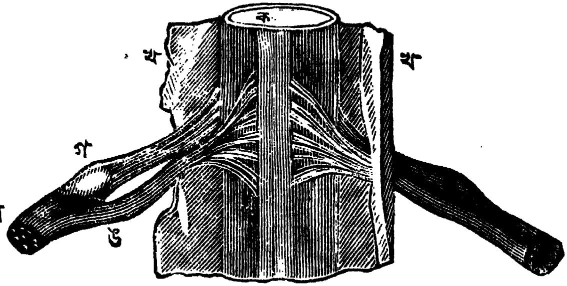
ক
খ
গ



মস্তিষ্কের তলদেশ।

বৃহৎ মস্তিষ্ক ছয় খণ্ডে বিভক্ত, বাম গোলকার্দ্ধে তিনটি এবং দক্ষিণ গোলকার্দ্ধে তিনটি পিণ্ড আছে যথা—

(ক) ললাটাস্থি পিণ্ড।
(খ) শঙ্খাস্থি পিণ্ড।
(গ) পশ্চাৎ মস্তকাস্থি পিণ্ড।



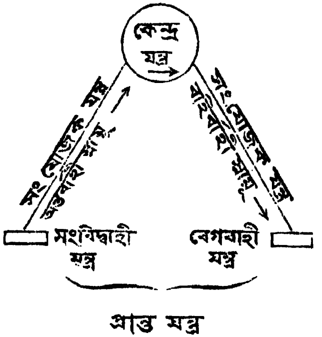
মস্তিষ্ক এবং মজ্জাদণ্ড হইতে অসংখ্য স্নায়ু সূত্র সকল নির্গত হইয়া সমস্ত শরীর যন্ত্রটিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। মস্তিষ্ক হইতে দ্বাদশ জোড়া স্নায়ু সূত্র নির্গত হইয়া চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। এই স্নায়ু গুলিকে করোটিক স্নায়ু বলা হয়। এই স্নায়ু ত্রিবিধ—সংবিদ্বাহী, বেগবাহী এবং উভয় বাহী। মজ্জাদণ্ড হইতে নির্গত স্নায়ু গুলিকে মেরবিক স্নায়ু বলা হয়। ইহা সংখ্যায় একত্রিশ জোড়া। মেরুদণ্ডের দুই দুই অস্থিগ্রন্থির মধ্যে অতি সামান্য অবকাশ রহিয়াছে। এই অবকাশ দিয়া দুইটি সূত্রাকার স্নায়ুমূল একটি শরীরের পুরোভাগ (ঙ) ও অপরটি পশ্চাৎ ভাগ (গ) হইতে নির্গত হইয়াছে। দুইটির মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, পশ্চাৎ ভাগ হইতে যে মূল নির্গত হইয়াছে, মেরুদণ্ড হইতে অল্প মাত্র দূরে উহা স্ফীত (গ) হইয়া উঠিয়াছে, এবং পুনরায় পূর্ব্বাকৃতি ধারণ করিয়া কিঞ্চিদগ্রে অপর মূলের সহিত মিলিত (ঘ) হইয়া একটি স্নায়ুবৎ হইয়া গিয়াছে। আরও কিছু দূরে অগ্রসর হওয়ার পর দুইটি মূল পুনরায় বিভিন্ন হইয়া শরীরের অপরাপর অংশে

স্নায়ুর প্রকার।

প্রবেশ করিয়াছে। যে সকল স্নায়ু সম্মুখের দিক হইতে আসিয়াছে তাহাদিগকে বহির্বাহী স্নায়ু বলে। ইহারা পেশী সঞ্চালক। ইহাদের শাখা প্রশাখা দেহের পেশী সমূহে বিস্তৃত রহিয়াছে। যে সকল স্নায়ু পশ্চাৎ ভাগ হইতে নির্গত হইয়াছে তাহাদিগকে অন্তর্বাহী স্নায়ু কহে। ইহাদের শাখা প্রশাখা ইন্দ্রিয় সমূহের প্রান্তযন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

এই বিশাল জগৎকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ। অন্তর্জগতের ক্রিয়াবলি বহির্জগতে প্রকটিত হইতেছে; আবার বহির্জগতের ক্রিয়াবলি অন্তর্জগতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমাদের স্নায়ুমণ্ডল এই দুই জগৎকে সংযুক্ত রাখিয়াছে। অন্তর্বাহী স্নায়ুকর্ত্তৃক বহির্জগতের ক্রিয়াবলি অন্তর্জগতে আনীত হইতেছে, আর বহির্বাহী স্নায়ুকর্ত্তৃক অন্তর্জগতের ক্রিয়াবলি বহির্জগতে নীত হইতেছে। অন্তর্বাহী স্নায়ুকর্ত্তৃক সংবিত্তির এবং বহির্বাহী স্নায়ুকর্ত্তৃক গতির বা গতিক্রিয়ার উৎপত্তি হইতেছে। স্নায়ুসমূহ সাধারণতঃ বার্ত্তাবাহক। প্রান্ত হইতে হইতে প্রান্তান্তরে বার্ত্তা বহন করিতে হইলে, বাহকের ক্লান্তি জন্মিতে পারে; সুতরাং স্থানে-স্থানে শক্তির পুনরুদ্দীপন আবশ্যক। সংবাদ বহনকালে যাহাতে স্নায়ুশক্তির হ্রাস না হয়, অথবা যাহাতে লুপ্তশক্তি পুনরুদ্দীপ্ত হয়, সেই জন্য স্নায়ুসূত্রের স্থানে-স্থানে শক্তি-উদ্দীপনী বিশ্রামাগার আছে। এই বিশ্রামস্থানগুলি কতকগুলি স্নায়ুকোষের সমষ্টিমাত্র। এই প্রকার এক-একটি সমষ্টিকে কোষগুচ্ছ বলা হয়। এক-একটি কোষ এক-একটি শক্তি-ভাণ্ডার। স্নায়ুপ্রবাহ কোষমধ্যে প্রবিষ্ট

স্নায়ুর ক্রিয়া।

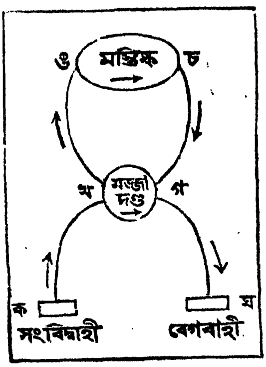


হইয়া শক্তিসঞ্চয়পূর্ব্বক গন্তব্য স্থানে ধাবিত হইয়া থাকে। স্নায়ুপ্রবাহের গন্তব্য স্থানও এই কোষ দ্বারাই নির্ণীত হয়। কোষ মাত্রেই অসংখ্য স্নায়ু সংলগ্ন; সুতরাং কোন একটি স্নায়ুপ্রবাহ কোষে প্রবিষ্ট হইয়া শক্তিসঞ্চয় করিলেও, কোন নির্দ্দিষ্ট স্নায়ু অবলম্বন না করিয়া নানা স্নায়ুতে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতে পারে। অতএব স্নায়ুপ্রবাহকে সংযত এবং নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালন করা আবশ্যক। স্নায়ুকোষই স্নায়ুপ্রবাহের গতি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। উপরের চিত্রে স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া মোটামুটি দেখান হইল।

মজ্জাদণ্ডের ক্রিয়া।

মজ্জাদণ্ড মস্তিষ্ক এবং শরীরকাণ্ডের সংযোজক। এই মজ্জাদণ্ড হইতে একত্রিশটি যুগ্ম স্নায়ু নির্গত হইতেছে। এই স্নায়ুগুলিকে মজ্জাস্নায়ু বলা হয়। প্রত্যেক স্নায়ুর দুইটি করিয়া মূল আছে; একটি পূর্ব্ববর্ত্তী, অপরটি পশ্চাদ্বর্ত্তী। অন্তর্বাহী স্নায়ুর মূল পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বহির্বাহী স্নায়ুর মূল পশ্চাৎবর্ত্তী; হস্ত-সংলগ্ন মজ্জাস্নায়ুর পশ্চাদ্বর্ত্তী মূলগুলি উচ্ছেদ কর, হস্তটি ইচ্ছামত ফিরাইতে-ঘুরাইতে পারিবে; কিন্তু ঐ হস্তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিলেও কোন যন্ত্রণার অনুভূতি হইবে না। আবার অন্য মূলটির উচ্ছেদ কর, তোমার যন্ত্রণার অনুভূতি থাকিলেও, সঞ্চালন-শক্তি লোপ পাইবে। আবার যদি কোন কারণে মজ্জাদণ্ডের কোন অংশের অনিষ্ট সংঘটিত হয় তবে দেখিবে যে, সেই অংশের নিম্নদেশ হইতে স্নায়ু নির্গত হইয়া যে-যে অংশে প্রবাহিত হইয়াছে, সেই-সেই অংশ একবারে অবশ হইয়া যাইবে;

এবং তাহাদের কোন প্রকার উত্তেজনা হইতে সুখ-দুঃখের অনুভূতি হইবে না। মজ্জাদণ্ডের আর একটি শক্তি আছে। ইহা অন্তর্বাহী স্নায়ুপ্রবাহের গতির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে। নিদ্রিত ব্যক্তির পদতলে আস্তে-আস্তে হাত বুলাইতে থাক, দেখিবে সে লোকটি তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার পা-খানি সরাইয়া লইতেছে। উহার পদতলে হস্তস্পর্শ করিতেছ। স্পর্শজনিত ক্রিয়াহেতু অন্তর্বাহী স্নায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু এই প্রবাহ মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত না যাইয়া মজ্জাদণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে—অন্তর্বাহী স্নায়ুপ্রবাহ বহির্বাহী স্নায়ুপ্রবাহে পরিণত হইতেছে। এই প্রকারে নিদ্রিত ব্যক্তির অজ্ঞাতসারেও তাহার পদ-সঞ্চালন হইতেছে। এখানে সংবিদ্বাহী স্নায়ুপ্রবাহ মজ্জাদণ্ড ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছে না। মজ্জাদণ্ড ইহার গতি প্রতিরোধ করিতেছে এবং অন্তর্বাহী স্নায়ুপ্রবাহকে বহির্বাহী স্নায়ুপ্রবাহে পরিণত করিতেছে। কতকগুলি অন্তর্বাহী স্নায়ুপ্রবাহ মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত যাইয়া বহির্বাহী স্নায়ুপ্রবাহে পরিণত হইতেছে; আর কতকগুলি অন্তর্বাহী স্নায়ুপ্রবাহ মজ্জাদণ্ড হইতেই বহির্বাহী স্নায়ুপ্রবাহে পরিণত হইতেছে। যে ক্রিয়া মস্তিষ্কদেশ অতিক্রম করিয়া আইসে তাহাকে সংজ্ঞা প্রত্যক্ষ ক্রিয়া বলে এবং যাহা মজ্জাদণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করে তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তি ক্রিয়া কহে। ক, খ, ঙ, চ, গ, ঘ সংজ্ঞাপ্রত্যক্ষ ক্রিয়ার পথ সূচিত করিতেছে এবং ক, খ, গ, ঘ প্রত্যাবর্ত্তি ক্রিয়ার পথ সূচিত করিতেছে।



মজ্জা বা মস্তিষ্ক হইতে নির্গত স্নায়ুমাত্রেই আয়তমজ্জাকে অতিক্রম

করিয়া গমনাগমন করে। আয়তমজ্জা মজ্জাদণ্ড ও মস্তিষ্কের বার্ত্তাবাহক।

আয়ত মজ্জার ক্রিয়া।

হৃদয়ের স্পন্দন, রক্তের প্রবাহ, পরিপাক ক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি আয়তমজ্জার কার্য্য। এই সকল অত্যাবশ্যক জীবন-ধারণোপযোগী কর্ম্মগুলি যদি সতত চিন্তার আয়ত্ত থাকিত, তাহা হইলে আমাদের জীবন রক্ষা একবারে অসম্ভব হইত। চিন্তামগ্ন হইলে হয় ত শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে ভুলিয়া যাইতাম; অথবা কর্ম্মরত হইলে হয় ত ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিতে বিস্মৃত হইতাম। এই সকল কার্য্যের ভার আয়তমজ্জার উপর ন্যস্ত। মন এই সকল কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত। নিদ্রাকালে আমাদের হৃদয়-স্পন্দন প্রভৃতি ক্রিয়া সহসা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে—এরূপ চিন্তা কখনই আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত করে না। অবশ্য ইচ্ছা করিলে আয়তমজ্জার কার্য্যাবলির নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারি; শ্বাস-প্রশ্বাস সংযত করিতে পারি; পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারি।

বৃহৎ মস্তিষ্ক ভাব, ভাবনা, ইচ্ছা প্রভৃতির আশ্রয়স্থল। এই মানসিক ক্রিয়াগুলি মস্তিষ্কের ধূসর বর্ণের পদার্থের সহিত অতি ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ।

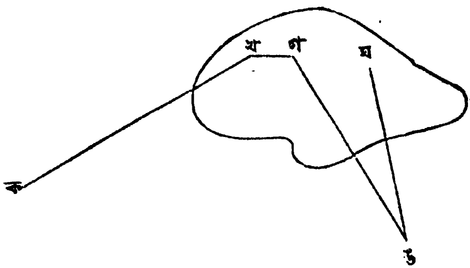
মস্তিষ্কের ক্রিয়া

এই মস্তিষ্কের আকার ও বিকাশের সহিত মানসিক শক্তিসমূহের নিতান্ত নিকট সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। পশু অপেক্ষা মনুষ্য-মস্তিষ্কের আয়তন অধিক এবং পশু অপেক্ষা মনুষ্যের বুদ্ধিও অধিক। মনুষ্যের বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে মস্তিষ্কের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোন ব্যাধি বা আঘাত হেতু বৃহৎ মস্তিষ্কের কোন অংশের অনিষ্ট ঘটিলে, মানসিক উচ্চবৃত্তিগুলির ক্রিয়া আংশিক বা সম্যক্ ভাবে লোপ পাইয়া থাকে। ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের দ্বারা আমাদের গতিশক্তি সঞ্চালিত এবং গতি-ক্রিয়া সংযত হইয়া থাকে। গতিশক্তির উৎপত্তিস্থল বৃহৎমস্তিষ্ক হইলেও

ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক এই শক্তিকে সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত করিয়া থাকে। ব্যাধিপ্রযুক্ত ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের অনিষ্ট সংসাধিত হইলে, পেশীসমূহের ক্রিয়া শিথিল হইয়া পড়ে এবং ইচ্ছানুযায়ী এই ক্রিয়ার সদ্ব্যবহার করা অসম্ভব হয়। আয়তমজ্জা শ্বাস প্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালনাদি ক্রিয়ার আশ্রয়স্থল। মজ্জা বা মস্তিষ্ক হইতে নির্গত স্নায়ুমাত্রেই আয়তমজ্জাকে অতিক্রম করিয়া গমনাগমন করে। আয়তমজ্জার অনিষ্টের সঙ্গে-সঙ্গে জীবননাশ অবশ্যম্ভাবী।

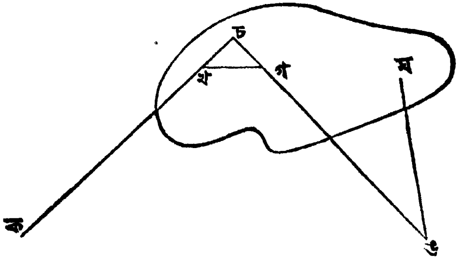
		যন্ত্র	স্থান	স্নায়ু পদার্থের বিভাগ		ক্রিয়া
				ধূসর	শ্বেত	
কেন্দ্রীয়	মস্তিষ্ক	বৃহৎ-মস্তিষ্ক	মস্তকের উর্দ্ধ ভাগ	বাহির	ভিতর	অনুভূতি, চিন্তা, ইচ্ছার আশ্রয়স্থল
		ক্ষুদ্র-মস্তিষ্ক	মস্তকের নিম্ন এবং পশ্চাৎভাগ	বাহির	ভিতর	গতিক্রিয়ার শৃঙ্খলানয়ন
		আয়তমজ্জা	মস্তকের সর্ব্ব নিম্ন ভাগ	ভিতর	বাহির	(ক) শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষেত্র (খ) সংবাহক
		মজ্জাদণ্ড	মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর	ভিতর	বাহির	(ক) সংবাহক (খ) প্রত্যাবর্ত্তি ক্রিয়ার আশ্রয়স্থল

নিম্নলিখিত চিত্রদ্বয়ের সাহায্যে স্নায়ু ও মস্তিষ্কের ক্রিয়া কথঞ্চিৎ দেখান যাইতে পারে।



আমার শরীরের কোন অংশে একটি মক্ষিকা বসিল। যেখানে মক্ষিকা বসিল সে স্থানটীকে ক বলিলাম। ক স্থানের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ঐ পরিবর্ত্তন অন্তর্বাহী স্নায়ু কর্ত্তৃক মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুচ্ছে (খ) আনীত হইল। (খ) এ সংবাদ পৌছিবামাত্রই মনের পরিবর্ত্তন হইল এই পরিবর্ত্তনকে সংবিত্তি বলে এখানে এই সংবিত্তিকে "মক্ষিকা সংবিৎ" এবং খ কে "মক্ষিকা সংবিৎ কেন্দ্র" বলিব। এই "মক্ষিকা সংবিৎ কেন্দ্র" হইতে আর একটি বেগ অপর স্নায়ু কর্ত্তৃক মস্তিষ্কের আর এক অংশ (গ) এ প্রেরিত হইল, আবার গ হইতে মাংশপেশী (ঙ)তে প্রেরিত হইল। তখন মক্ষিকাটি তাড়াইবার জন্য হস্ত সঞ্চালিত হইল। আবার হস্ত সঞ্চালন হেতু পরিবর্ত্তন পুনরায় মস্তিষ্কের আর এক অংশে (ঘ) আনীত হইয়া আর এক সংবিত্তির সৃষ্টি হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে দুই বার সংবিত্তির উদ্রেক হইল—একবার গ এ আর একবার ঘ এ। একবার মক্ষিকার উপস্থিতি জ্ঞান আর একবার হস্তসঞ্চালন জ্ঞান।

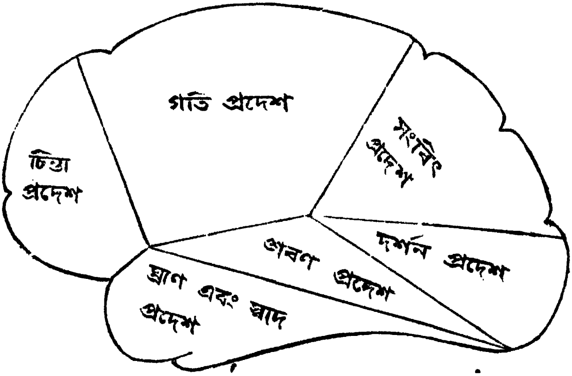
পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ অপেক্ষা আর একটি জটিল উদাহরণ লও।



কোন অসাধু ব্যক্তি পথিমধ্যে অপর এক ব্যক্তির কিঞ্চিৎ অর্থ দেখিতে পাইল; (ক) এই দর্শন ব্যাপার অচিরাৎ খ তে আনীত হইল। এখানে পূর্ব্বের ন্যায় খ হইতে গ এবং গ হইতে ঙতে যাইয়া ঐ অর্থ আত্মসাৎ রূপ কার্য্যটি ঝটিতি হইতে পারে; কিংবা খতে উদ্বোধক প্রবাহ দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—একটি প্রবাহ চিন্তাকেন্দ্র চ তে এবং আর একটি প্রবাহ গতিকেন্দ্র গ তে যাইতে পারে। যদি ঐ প্রবাহ চ পর্য্যন্ত পৌঁছায় তবে মনে হইবে যে পরস্বাপহরণে দোষ আছে এবং অবশেষে শাস্তিও হইতে পারে। যখন এই প্রকার চিন্তা মনে উদয় হইবে তখন পূর্ব্বগতি রোধক আর একটি প্রবাহ চ হইতে গ তে প্রেরিত হইবে এবং এই গতি পূর্ব্ব গতি প্রতিরোধ করিবে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি আর সেই অর্থ গ্রহণে সমর্থ হইবে না।

মস্তিষ্কের পৃথক পৃথক প্রদেশ শরীরাবয়বের পৃথক্ পৃথক্ অংশের সহিত স্নায়ু দ্বারা সংলগ্ন রহিয়াছে। মস্তিষ্কের কোন প্রদেশ স্পর্শসংবিৎ-গ্রহণে পটু, কোন দেশ দর্শনসংবিৎ গ্রহণে পটু, কোন দেশ গন্ধসংবিৎ গ্রহণে পটু, কোন দেশ স্বাদসংবিৎ গ্রহণে পটু, আবার কোন দেশ বা শব্দ-সংবিৎ গ্রহণক্ষম। মস্তিষ্কে যেমন পৃথক্ পৃথক্ সংবিৎ কেন্দ্র আছে তেমনি আবার পৃথক্ পৃথক্ গতিকেন্দ্রও আছে। কোনও কেন্দ্র হইতে মুখের,

কোনও কেন্দ্র হইতে গ্রীবার, কোনও কেন্দ্র হইতে হস্তের, কোনও কেন্দ্র হইতে চরণের, পেশী সমূহে বেগ প্রবাহ প্রেরিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত আবার সঙ্গ-বন্ধনী কেন্দ্রও আছে—এই কেন্দ্রের স্নায়ু সমূহ মস্তিষ্কের পৃথক্ পৃথক্ অংশকে সংযুক্ত করিয়া থাকে। এই চিত্র খানির সাহায্যে মস্তিষ্ক প্রদেশের মোটামুটি অবস্থান বুঝিতে পারা যায়।—



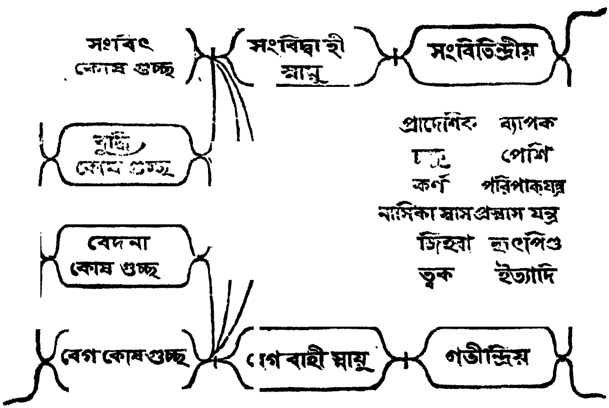
[মস্তিষ্কের বাম প্রদেশের মোটামুটি স্থান নির্ণয়]

অতএব দেখা যাইতেছে যে মস্তিষ্ক একটি যন্ত্র নহে কিন্তু ইহা বহু যন্ত্রের সমন্বয়। প্রত্যেক যন্ত্রই স্পষ্ট এবং পৃথক্ হইলেও সকলেই লক্ষ লক্ষ স্নায়ু সূত্রের দ্বারা সম্বন্ধাণুবদ্ধ। ক্রিয়া অনুসারে মস্তিষ্ক মণ্ডলীকে প্রধানতঃ চারি প্রদেশে বিভক্ত করা হইয়া থাকে—

মস্তিষ্কের প্রাদেশিক বিভাগ
- সংবিৎ কোষগুচ্ছ।
- বুদ্ধি কোষগুচ্ছ।
- বেদনা কোষগুচ্ছ।
- বেগ কোষগুচ্ছ।

বৃহৎ মস্তিষ্কের যে প্রদেশ সংবিৎ প্রবাহের দ্বারা উত্তেজিত হয় তাহাকে

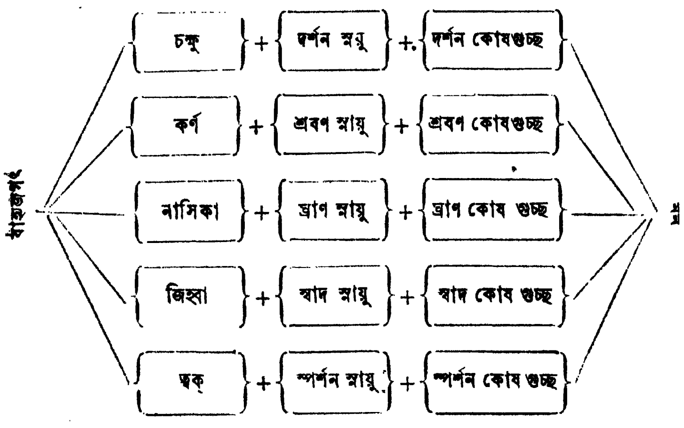
সংবিৎ কোষগুচ্ছ বলা হয়। কোন অজ্ঞাত উপায়ে মন এই উত্তেজনা অনুভব করিতে সমর্থ হয়। এবম্প্রকার অনুভূতিকে সংবিত্তি বলা হইয়া থাকে। বৃহৎ মস্তিষ্কের যে অংশ জ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট, যে অংশ প্রত্যক্ষীকরণ, স্মরণ, চিন্তন, প্রভৃতি কার্য্যের সহায় তাহাকে বুদ্ধি কোষগুচ্ছ বলা হয়। প্রত্যক্ষীকরণ, স্মরণ, চিন্তন, প্রভৃতি মানস ক্রিয়ার সময় মন কোনও এতাবৎ অজ্ঞাত উপায়ে এই গুচ্ছের ব্যবহার করিয়া থাকে। ভয়, ক্রোধ, ভালবাসা, প্রভৃতি বেদনানুভূতি সময়ে বৃহৎ মস্তিষ্কের যে প্রদেশের সহায়তা আবশ্যক তাহাকে বেদনা কোষগুচ্ছ বলা হয়। এবং ইচ্ছা সময়ে বৃহৎ মস্তিষ্কের যে প্রদেশ উত্তেজিত হয় তাহাকে বেগ কোষ-গুচ্ছ বলা হয়। মনই গতির স্রষ্টা; মনই ইচ্ছারূপে গতির উদ্রেক করে—কোনও অজ্ঞাত উপায়ে গতি কোষগুচ্ছকে উত্তেজিত করিয়া গতি প্রবাহের সৃষ্টি করে।



বৃহৎ মস্তিষ্ক প্রদেশে মনের বিশেষ আধিপত্য। এই স্থানেই মন বাহ্য জগৎ সম্বন্ধীয় সংবাদ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং এই স্থান হইতেই

মনের আদেশ বাহ্য জগতে প্রেরিত হয়। মনকে সাধারণতঃ অন্তর্জগৎ এবং মনাতিরিক্ত সমস্তই এমন কি ইন্দ্রিয়গ্রাম পর্য্যন্তও বাহ্য জগৎ বলিয়া স্বীকার করা হয়।

চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ত্বক এই পাঁচটি আমাদের ইন্দ্রিয়। স্নায়ু দ্বারা এই ইন্দ্রিয়গুলি মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত। এই সংযোজক স্নায়ুকে ইন্দ্রিয় রেখা বলা হয়। দর্শন রেখা, শ্রবণ রেখা, আস্বাদন রেখা আঘ্রাণ রেখা এবং স্পর্শন রেখা এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় রেখা। এই ইন্দ্রিয় রেখাকে বিশেষ ইন্দ্রিয় রেখা বলা হয়, কারণ, এক একটি রেখা দ্বারা জগতের এক একটি বিশেষ গুণের জ্ঞান হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় রেখা সমন্বিত ইন্দ্রিয়াবয়বকে ইন্দ্রিয় যন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়।



চক্ষু, দর্শন স্নায়ু, এবং দর্শন কোষগুচ্ছ এই তিনটি দর্শনযন্ত্রের অবয়ব। আলোকময় পদার্থ হইতে ইথর পদার্থের কম্পন হইতেছে; ঐ কম্পন অক্ষিপর্দায় আঘাত করিয়া আলোক প্রবাহের সৃষ্টি করিতেছে; এই

আণবিক আলোকপ্রবাহ দর্শনস্নায়ু দ্বারা প্রবাহিত হইয়া দর্শন কোষগুচ্ছকে উত্তেজিত করিতেছে। মন তখন এই উত্তেজনা অনুভব করিতেছে। এই অনুভূতিই আলোক সংবিত্তি। মন বুদ্ধিরূপে এই সংবিত্তিকে অনুবাদ করিয়া দ্রব্যের বর্ণ রূপ প্রভৃতি জ্ঞান লাভ করিতেছে। কর্ণ, শ্রবণ স্নায়ু এবং শ্রবণ কোষগুচ্ছ এই তিনটি শ্রবণ যন্ত্রের অবয়ব। শব্দায়মান পদার্থ হইতে বায়ু কম্পন হইতেছে, এই বায়ু কম্পন কর্ণ পটহে আঘাত করিয়া শব্দ প্রবাহের সৃষ্টি করিতেছে; ঐ প্রবাহ স্নায়ু দ্বারা প্রবাহিত হইয়া শ্রবণ কোষগুচ্ছকে উত্তেজিত করিতেছে। মন তখন এই উত্তেজনা অনুভব করিতেছে। এই অনুভূতি হইতে শব্দ সংবিত্তি হইতেছে। নাসিকা, ঘ্রাণ স্নায়ু, এবং ঘ্রাণ কোষগুচ্ছ এই তিনটি ঘ্রাণযন্ত্রের অবয়ব। ঘ্রাণময় পদার্থ হইতে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রেণুকণা নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া ঘ্রাণ প্রবাহের সৃষ্টি করিতেছে। এই প্রবাহ ঘ্রাণস্নায়ু কর্ত্তৃক প্রবাহিত হইয়া ঘ্রাণ কোষগুচ্ছকে উত্তেজিত করিতেছে। মন এই উত্তেজনা অনুভব করিতেছে। এই অনুভূতিই ঘ্রাণ সংবিত্তি। জিহ্বা, স্বাদ স্নায়ু এবং স্বাদ কোষগুচ্ছ এই তিনটি লইয়া আস্বাদন যন্ত্র। দ্রাব্য পদার্থ জিহ্বা স্পর্শ করিলে স্বাদ প্রবাহের উৎপত্তি হয়। এই প্রবাহ আণবিক প্রবাহ রূপে স্বাদ স্নায়ু কর্ত্তৃক প্রবাহিত হইয়া স্বাদ কোষগুচ্ছের উত্তেজনা উৎপাদন করে। মন তখন এই উত্তেজনা অনুভব করে এবং এই অনুভূতিই স্বাদ সংবিত্তি। ত্বক, স্পর্শন স্নায়ু এবং স্পর্শন কোষগুচ্ছ লইয়া স্পর্শযন্ত্র। ত্বকের সহিত কোন দ্রব্য স্পৃষ্ট হইলে স্পর্শ প্রবাহের সৃষ্টি হয়, এই প্রবাহ স্পর্শন স্নায়ু দ্বারা প্রবাহিত হইয়া স্পর্শন কোষগুচ্ছকে উত্তেজিত করে। মন তখন এই উত্তেজনা অনুভব করে এবং এই অনুভূতিই স্পর্শসংবিত্তি।

☞ [৮৫ পৃষ্ঠার চিত্রখানি উল্টাইয়া দেখিতে হইবে।]

অষ্টম অধ্যায়

সংবিত্তি

কেমন করিয়া মানুষের মনে ভাবের সমাবেশ হয়? সংসারে মানুষ নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় প্রবেশ করে। এখানে সমস্ত বিষয়ই তাহার অজ্ঞাত ও অপরিচিত। এই অজানিত দেশে তাহাকে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইবে। ইহার তথ্যসমূহ আবিষ্কার ও আয়ত্ত করিতে হইবে। যে জ্ঞানের বলে এই সকল কার্য্য সম্পাদিত হইবে, যে জ্ঞান জীবনে শৃঙ্খলা আনয়ন করিবে, যে জ্ঞান জীবনকে কর্ত্তব্যের দিকে, ধর্ম্মের দিকে পরিচালিত করিবে,—কেমন করিয়া সেই জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হয়? বাহ্যশক্তিই মনের সুপ্ত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে।

সংবিত্তি কাহাকে বলে।

"নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত্ত বিরাম নাই,
নিদ্রাহীন সারা দিন-রাত।"

সন্ধ্যার সময় গঙ্গার উপকূলে পদচারণা করিতেছি। মন চিন্তানিবিষ্ট। এমন সময় একটি সুঘ্রাণ পাইলাম। এ সুঘ্রাণ কিসের এবং কোথা হইতে আসিতেছে, বুঝিতে পারিলাম না, বা বুঝিবার চেষ্টাও করিলাম না। একটি সুঘ্রাণ পাইতেছি—মাত্র এই জ্ঞানটুকু আছে। কেমন করিয়া এই জ্ঞানের উদয় হইল? সুগন্ধি বস্তু হইতে

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রেণুকণা আসিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় সংলগ্ন স্নায়ুসমূহের প্রান্তভাগে আঘাত করিতেছে। সেই আঘাতে স্নায়ুসমূহ স্পন্দিত হইতেছে। অন্তর্বাহী স্নায়ু কর্তৃক উক্ত স্পন্দন মস্তিষ্কে নীত হইতেছে। এইবার শরীর-ক্রিয়া শেষ ও মানস-ক্রিয়া আরম্ভ হইল। মস্তিষ্কের চাঞ্চল্য হেতু মনও চঞ্চল হইয়া উঠিল। মস্তিষ্ক-স্পন্দনের উপর মনের প্রতিক্রিয়া হইল। তখন বুঝিলাম যে, এই স্পন্দন অপরাপর ইন্দ্রিয়-সংলগ্ন স্নায়ু-স্পন্দন হইতে পৃথক, এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়-সংলগ্ন স্নায়ু-স্পন্দন-সদৃশ। এইরূপ সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যজ্ঞান হইতে অনুভূতির সৃষ্টি হইল। এইরূপ অনুভূতিকে সংবিত্তি বলে।

"কুসুম আপনি ধরেছে গন্ধ,
গন্ধ কুসুমে ল'য়ে,
স্পর্শ শরীরে জাগায় চেতনা,
দুয়ে মিলি এক হ'য়ে।"

স্নায়বীয় স্পন্দনের উপর মানসিক প্রতিক্রিয়ার নাম সংবিত্তি। এখানে আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংবিত্তি হইল। কিন্তু যখনই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, এই সুঘ্রাণটি অদূরস্থিত বকুল পুষ্পের—তখনই আমি সংবিত্তির সীমা অতিক্রম করিলাম। এখানে আমার প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হইল।

আমি নিদ্রামগ্ন। দরজায় কেহ ধাক্কা দিতেছে। আমি কিন্তু কোন শব্দ শুনিতে পাইতেছি না। বায়ু স্পন্দন হইতেছে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্পন্দন হইতেছে, অন্তর্বাহী স্নায়ুর স্পন্দন হইতেছে, মস্তিষ্কের স্পন্দন হইতেছে; শরীর সম্বন্ধীয় সমস্ত কাজই হইতেছে, তথাপি কোন শব্দ শুনিতেছি না। কারণ, মন আমার সুপ্ত। এখন তাহার উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই। বাহ্য শক্তি আমার ইন্দ্রিয় স্পর্শ করিতেছে; কিন্তু সে শক্তি মনকে প্রবুদ্ধ

করিতে পারিতেছে না—সে শক্তির উপর মনের প্রতিক্রিয়া হইতেছে না। সুতরাং আমার সংবিত্তিও হইতেছে না। আমার পার্শ্বে যদি কেহ জাগ্রৎ অবস্থায় থাকে, তাহার কাছে শব্দ থাকিতে পারে; কিন্তু আমার কাছে কোন শব্দ নাই। বারংবার ধাক্কা দেওয়ায় আমার নিদ্রার ঘোর কমিতে লাগিল; সুপ্ত চৈতন্য কথঞ্চিৎ জাগরিত হইল; উপলব্ধি করিবার শক্তি ফিরিয়া আসিল। বাহ্যশক্তি-প্রসূত মস্তিষ্কক্রিয়ার উপর মানসিক প্রতিক্রিয়া হইল। বুঝিতে পারিলাম যে বর্ত্তমান স্পন্দন—দর্শন আস্বাদন প্রভৃতি-জনিত স্পন্দন হইতে পৃথক্ এবং পূর্ব্ব-পরিচিত শ্রবণ-জনিত স্পন্দন-সদৃশ। এতক্ষণে আমার শ্রোত্র-সংবিত্তি হইল। এইরূপে সংবিত্তির জ্ঞান হইয়া থাকে।

> "বার বার তুমি আপনার হাতে
> স্বাদে গন্ধে ও গানে
> বাহির হইতে পরশ করেছ
> অন্তর-মাঝখানে।"

পরে ক্রমশঃ যখন বুঝিলাম যে, কেহ দরজায় ধাক্কা দিতেছে বলিয়া শব্দ হইতেছে, তখন আমার "প্রত্যক্ষ-জ্ঞান" হইল। অতএব সংবিত্তির ক্রম—

১। বাহ্য কারণ { (ক) যান্ত্রিক—বায়বীয় স্পন্দন।
(খ) শারীর :—

(অ) ইন্দ্রিয়ের প্রান্তভাগে বায়বীয় স্পন্দনের ক্রিয়া।

(আ) অন্তর্বাহী স্নায়ু কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়-স্পন্দন মস্তিষ্কে আনয়ন।

(ই) মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তন।

২। মানস কারণ। { (ক) অবধান। (খ) সাদৃশ্যানয়ন। (গ) বৈসাদৃশ্যানয়ন। } মস্তিষ্ক-স্পন্দনের উপর মনের প্রতিক্রিয়া।

সংবিত্তি সাধারণতঃ দুই প্রকার—প্রাদেশিক এবং ব্যাপক। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি শরীরের এক-একটি অংশ।

প্রাদেশিক সংবিত্তি ও ব্যাপক সংবিত্তি

এই অংশগুলির সহিত বাহ্যজগতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। ইহারা এরূপ ভাবে গঠিত যে, ইহাদের উপর বাহ্যজগতের ক্রিয়া অতি সহজেই সম্পন্ন হয়। বাহ্যজগতের যাবতীয় পরিবর্ত্তন উক্ত অংশগুলি দ্বারা সহজেই গৃহীত এবং অন্তর্জগতে নীত হয়। উল্লিখিত এক-একটি অংশ এক-একটি গুণ গ্রহণের উপযুক্ত করিয়া গঠিত হইয়াছে। চক্ষু, বর্ণবাহক; শ্রোত্র, শব্দবাহক; ত্বক্, স্পর্শবাহক; নাসিকা, গন্ধবাহক; এবং জিহ্বা, রসবাহক।

"কেড়ে লহ নয়নের আলো, পাপ নয়ন কর অন্ধ;
চির যবনিকা প'ড়ে যাক হে, নিবে যাক্ রবি, তারা, চন্দ্র।
হ'রে লহ শ্রবণের শক্তি, থেমে যাক জলদের মন্দ্র;
সৌরভ চাহি না, বিধাতা, রুদ্ধ কর হে নাসা-রন্ধ্র।
স্বাদ হর হে, কৃপাসিন্ধু, চাহি না ধরার মকরন্দ;
স্পর্শ কর, হে, হরি, লুপ্ত ক'রে দাও অসাড় নিস্পন্দ।
তুমি মূর্ত্তিমান হ'য়ে এস প্রাণে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ;
এনে দাও অভিনব চিত্ত, ভুঞ্জিতে সে মিলনানন্দ।"

শরীরের এই পাঁচটি অংশকে পাঁচটি ইন্দ্রিয় বলে। বাহ্যবস্তুর উত্তেজনা-গ্রহণ-পটু শরীর-অংশের নাম ইন্দ্রিয়। কতকগুলি সংবিত্তি পঞ্চেন্দ্রিয়-সমুদ্ভূত, আর কতকগুলি কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়-সমুদ্ভূত নহে।

যাহারা ইন্দ্রিয়-সমুদ্ভূত, তাহারা প্রাদেশিক এবং অপরগুলি ব্যাপক। যাহা সমস্ত শরীর-যন্ত্র ব্যাপী, তাহাকে ব্যাপক সংবিত্তি বলা যায়। ব্যাপক সংবিত্তি শরীরের কোন্ অংশ-সংলগ্ন তাহা স্থির করা কঠিন। ইহার উৎপত্তির প্রাক্‌কালে উৎপত্তিস্থান নির্ণীত হইলেও পরক্ষণেই ইহা সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপী হইয়া পড়ে; শরীরের কোন বিশেষ প্রদেশে আবদ্ধ থাকে না। পরিপাক যন্ত্র হইতে ক্ষুধার উৎপত্তি হইলেও, এই ক্ষুধাজনিত অশান্তি সর্ব্বস্থানব্যাপী হয়। ক্ষুন্নিবৃত্তি কর,—তোমার মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হইবে, মনের স্ফূর্ত্তি হইবে, সমস্ত শরীরেই সুখ অনুভব করিবে। ব্যাপক সংবিত্তি শরীরের কোন বিশেষ প্রদেশান্তর্গত নহে। এরূপ সংবিত্তি হইতে বহির্জগতের কোন সমাচার প্রাপ্ত হই না। শরীরাভ্যন্তরের যদিও কিছু পাই,—তাহা অতি সামান্য। প্রাদেশিক সংবিত্তি শরীরাবয়বের কোন বিশেষ প্রদেশান্তর্গত।

ব্যাপক সংবিত্তি {
১। অনিন্দ্রিয় সমুদ্ভূত।
২। দেশ নির্ণয় অসম্ভব।
৩। অন্তর্দৈহিক।
৪। শারীরিক সুখ-দুঃখ-সংবাদ-বাহী।
৫। জীবন ধারণের সহায়।

প্রাদেশিক সংবিত্তি
১। ইন্দ্রিয় সমুদ্ভূত।
২। দেশ নির্ণয় সম্ভব।
৩। বহির্দৈহিক।
৪। বাহ্যজগৎ-সমাচার-বাহী।
৫। জ্ঞানবিস্তারের সহায়।

চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক্, নাসিকা, এবং জিহ্বা এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়। ইহাদের

গঠন-প্রণালী বিভিন্ন; উদ্বোধক শক্তিও ভিন্ন প্রকারের; সুতরাং স্পর্শকে ঘ্রাণ বলিয়া বা ঘ্রাণকে বর্ণ বলিয়া আমাদের ভ্রম হয় না। প্রাদেশিক সংবিত্তির উদ্বোধক-বাহ্য এবং বাহ্য-উদ্বোধকের মধ্যে নানাপ্রকার পার্থক্য দৃষ্ট হয়, এবং এই পার্থক্য অনুসারে সংবিত্তিরও পার্থক্য লক্ষিত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ানুভূতি পৃথক্; কারণ, একটি উদ্বোধকের প্রকৃতি আর একটি উদ্বোধকের প্রকৃতি হইতে পৃথক্।' দীপশিখার আলোক এবং বৈদ্যুতিক আলোক দুইটি পৃথক্ বস্তু; কারণ, একটির উদ্বোধক ক্ষীণ এবং আর একটির উদ্বোধক তীক্ষ্ণ। তোমার বাম হস্তে একটি পয়সা রাখিলাম এবং দক্ষিণ হস্তে দুইটি পয়সা পাশাপাশি রাখিলাম; দক্ষিণ হস্তের সংবিত্তি বাম হস্তের সংবিত্তি অপেক্ষা ব্যাপক—কারণ, একটি উদ্বোধকের ক্রিয়াস্থল আর একটির ক্রিয়াস্থল অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। এক হস্তে তোমার কপাল আর এক হস্তে তোমার কপোল স্পর্শ করিলাম। তুমি এই দুই স্পর্শের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করিলে—কারণ, ইহাদের উৎপত্তি স্থান পৃথক্। অতএব দেখা যাইতেছে, যে, উদ্বোধক যখন প্রবল, সংবিত্তিও তখন প্রবল। উদ্বোধক যখন বিস্তৃত, সংবিত্তিও তখন ব্যাপক। উদ্বোধক যখন স্থায়ী, সংবিত্তিও তখন তদ্রূপ। যখন উদ্বোধক ভিন্ন প্রকারের, তখন সংবিত্তিও ভিন্ন প্রকারের। আবার উদ্বোধকের ক্রিয়ার স্থান অনুসারে সংবিত্তিরও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অতএব উদ্বোধক এবং সংবিত্তির সম্বন্ধ এই প্রকার—

সংবিত্তির গুণাবলি।

সংবিত্তি।
১। পরিমাণগত—
(ক) প্রাবল্য।
(খ) ব্যাপকতা।
(গ) স্থায়িত্ব।
২। প্রকৃতিগত—
(ক) প্রকারগত—
(দর্শন, আস্বাদন, শ্রবণ ইত্যাদি)
(খ) স্থানগত।

উদ্বোধক।
১। পরিমাণগত—
(ক) প্রাবল্য।
(খ) বিস্তৃতি।
(গ) স্থায়িত্ব।
২। প্রকৃতিগত—
(ক) প্রকারগত—(রূপ, রস ইত্যাদি)
(খ) স্থানগত।
(অগ্র পশ্চাৎ, হস্ত, পদ ইত্যাদি।)

ওয়েবারের বিধি।

তুলাদণ্ডের একদিকে একটি সের রাখিয়া একসের চিনি ওজন কর। এখন যদি একটি সেরের উপর আর একটি সের রাখ তাহা হইলে চিনির পরিমাণ দ্বিগুণ করিতে হইবে; যদি তিনটি সের রাখ, তাহা হইলে চিনির পরিমাণ তিনগুণ বাড়াইতে হইবে; এইরূপে চারিটি সের রাখিলে চারিগুণ, পাঁচটি রাখিলে পাঁচগুণ বাড়াইতে হইবে। মনে কর চিনির পরিমাণ নির্দ্দেশ না করিয়া চাপ সংবিত্তির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে চাই। ত্বকের উপর একটি সের রাখিলাম; আমার চাপ সংবিত্তি হইল। এই সংবিত্তিকে চ বলিলাম।

আবার সেই সেরটির উপরে আর একটি সের রাখিলাম; নিশ্চয়ই চাপ সংবিত্তির মাত্রা বৃদ্ধি হইল—এবার এই সংবিত্তিকে ২চ বলিলাম। আবার ঐ দুইটি সেরের উপর আর একটি সের রাখিলাম—এবারও নিঃসন্দেহ চাপ সংবিত্তির মাত্রা বৃদ্ধি হইল—এবার কি এই সংবিত্তিকে ৩চ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে? যদি তাহা কর তাহা হইলে তোমার ভুল হইবে। পরীক্ষার দ্বারা ঠিক করা হইয়াছে যে যদি চাপ সংবিত্তিকে চ, ২চ, ৩চ, ৪চ ইত্যাদি রূপে বৃদ্ধি করিতে চাও, তাহা হইলে ওজনগুলিকে ১সের, ২সের, ৪সের, ৮সের ইত্যাদিরূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথম চাপ অপেক্ষা দ্বিতীয় চাপটি যে পরিমাণে বেশী, চতুর্থ চাপটিকে যদি তৃতীয় চাপটি হইতে সেই পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে চাও, তাহা হইলে দ্বিতীয় ওজনটির সহিত প্রথম ওজনটির যে সম্বন্ধ, চতুর্থ ওজনটির সহিত তৃতীয় ওজনটির সেই সম্বন্ধ হওয়া চায়। ২চ—চ=৩চ—২চ পাইতে হইলে ২ও : ১ও=৪ও : ২ও দিতে হইবে। (ও=ওজন)।

প্রকৃত সংবিত্তি অসম্ভব।

বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের পক্ষে প্রকৃত সংবিত্তি অসম্ভব। আমরা যাহাকে সংবিত্তি বলিতেছি, উহা প্রকৃতপক্ষে অবিমিশ্র মানসিক অবস্থা নহে। উহাতে স্মৃতিশক্তির ক্রিয়াও বর্ত্তমান। আমি যখন বলিতেছি যে, ইহা দর্শনেন্দ্রিয়ানুভূতি, তখন আমি বুঝিতেছি যে, ইহা অপরেন্দ্রিয়ানুভূতি নহে। সুতরাং দর্শনেন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে-সঙ্গে অপরেন্দ্রিয়ানুভূতির কথাও মনে হইতেছে। অতএব আমাদের পক্ষে স্মৃতির সাহায্য ব্যতীত সংবিত্তি অসম্ভব। কিন্তু যথার্থ সংবিত্তিতে অপর কোন মানস-ক্রিয়ার লেশমাত্রও থাকে না। সুতরাং এরূপ সংবিত্তির অস্তিত্ব আমরা অনুভব করিতে পারি না।

ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সন্দেহের চক্ষে, অবজ্ঞার চক্ষে দেখিও না।

সংবিত্তির প্রতিপ্রত্তি।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতেই বুদ্ধির বিকাশ, ভাবের উন্মেষ, চরিত্রের গঠন হইতেছে। মনে রাখিও—

"শরীর, ইন্দ্রিয়চয়, মানবের অদ্বিতীয়
সুখের ও শিক্ষার সোপান।
কামনা ইন্দ্রিয়জাত মানবের সুখ পথে
অদ্বিতীয় কর্ম্মের নিদান।"

পদার্থ যেমন অণু-পরমাণুর সমষ্টি, জ্ঞানও তেমনি ইন্দ্রিয়ানুভূতির সমষ্টি। বালকটি মুক্ত বাতায়নে বসিয়া ক্রীড়া করিতেছে; মনে করিও না, উহার সময় বৃথা অতিবাহিত হইতেছে। বালক যাহা দেখিতেছে, যাহা শুনিতেছে, যাহা করিতেছে—তাহারা প্রত্যেকেই জ্ঞানের ভাণ্ডারে কিছু-না-কিছু সঞ্চয় করিতেছে।

"ওরে মত্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে আত্মভোলা,
রেখেছিলি আপনার সব দ্বার খোলা,
চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক,
যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখ শোক,
যত ভাল মন্দ, যত গীত গন্ধ ল'য়ে
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে।
সেই পথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিনু নামি।
দ্বার রুধি জপিতিস্ যদি মোর নাম,
কোন পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম।

শৈশবকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রতাপ বড়ই প্রবল। তুমি একটি বালককে

কোন একটি প্রয়োজনীয় বিষয় বুঝাইয়া দিতেছ, এমন সময় একটি মূষিক-শাবক বালকের সম্মুখ দিয়া দৌড়িয়া গেল। বালকটি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তোমার শ্রম ব্যর্থ হইল। এখানে ইন্দ্রিয়ের পরাক্রম অধিক বলিয়া বুদ্ধির পরাজয় হইল। বালক বুদ্ধির কার্য্যকে অবহেলা করিয়া ইন্দ্রিয়ের আহ্বানে ধাবিত হইল। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের এরূপ প্রতিপত্তি চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকে না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞানের সংগ্রাম উপস্থিত হয়। অভিজ্ঞতার বলে এখন শক্তি-সঞ্চার হইয়াছে। সুতরাং অনেক স্থলে এখন জ্ঞানের জয় এবং ইন্দ্রিয়ের পরাজয় হইয়া থাকে। অনেক সময়ে এখন ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে মন চঞ্চল হয় না। আমি একাগ্রচিত্তে কোন গুরুতর বিষয় ভাবিতেছি এবং লিখিতেছি; ডাকওয়ালা আমার টেবিলের উপর দুখানা চিঠি রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু কখন রাখিয়া গিয়াছে, আমি কিছুই টের পাই নাই। বালকটি অবহিত-চিত্তে একটি সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করিতেছে; মশকে তাহার পৃষ্ঠদেশ দংশন করিতেছে কিন্তু দংশনজনিত যন্ত্রণা সে অনুভব করিতেছে না। অতএব সকল সময়েই যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি থাকে, তাহা নহে। বাহ্য-শক্তি প্রভাবে শরীরের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে; কিন্তু সে পরিবর্ত্তনের সংবিত্তি না থাকিতেও পারে। তবে কি আমরা মনকে একেবারে বাহ্যশক্তি-সম্পর্কশূন্য করিতে পারি। একেবারে সম্ভব কি না, সম্ভব হইলেও করা উচিত কি না, বলিতে পারি না তবে যথেষ্ট পরিমাণে মানসিক শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলে, ইন্দ্রিয়বন্ধন অনেক পরিমাণে শিথিল করিতে পারা যায়। ঐ দেখ সংসারে বীতশ্রদ্ধ মহাযোগী আহার বিহার বসন ভূষণ ত্যাগ করিয়াছে; শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুকে উপেক্ষা করিয়া একাসনে ধ্যান-স্তিমিত-লোচনে বসিয়া আছে। বলিতেছে—

"বসে বসে চন্দ্র সূর্য্য দিয়েছি নিভায়ে,
একে একে ভাঙ্গিয়াছি বিশ্বের সীমানা,
দৃশ্য শব্দ স্বাদ গন্ধ গিয়াছে ছুটিয়া,
গেছে ভেঙ্গে আশা ভয় মায়ার কুহক।"

নবম অধ্যায়

রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়

জিহ্বা এবং তালুদেশের পশ্চাৎভাগ হইতে স্বাদ সংবিত্তির উৎপত্তি। জিহ্বা প্রধানতঃ মাংশপেশীর দ্বারাই নির্ম্মিত। ইহার পেশীগুলি সহজেই সঙ্কুচিত এবং সম্প্রসারিত হয়। জিহ্বার উপরিভাগে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা দেখা যায়; এই দানাগুলিকে "রসকোরক" বলা হয়।

রসনেন্দ্রিয়ের গঠন।

জিহ্বার গোড়ার দিকের (ক) কোরকগুলি মোটা—ইহাদিগকে 'প্রাকার কোরক' বলা হয়। জিহ্বার অগ্রভাগের (গ) কোরকগুলি অধিকাংশই লম্বা, সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ণ। ইহাদিগকে 'সূত্রাকার কোরক' বলা হয়। জিহ্বার অপরাংশে (খ) অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দানা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আকার অনেকটা ব্যাঙের ছাতার মত। ইহাদিগকে 'ছত্রক কোরক' বলা হয়। এক একটি



রস কোরক কতকগুলি স্বাদ কোষের সমষ্টি বিশেষ। করোটিক স্নায়ু-

মণ্ডলীর পঞ্চম এবং নবম জোড়া স্নায়ুকে স্বাদগ্রাহী স্নায়ু বলে। পঞ্চম জোড়া স্নায়ু জিহ্বার অগ্রভাগে ও পার্শ্বে বিস্তৃত, এবং নবমজোড়া স্নায়ু জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে এবং তালুর সন্নিকটস্থ অংশ সমূহে বিস্তৃত রহিয়াছে।

রসনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া।

যখন কোন দ্রাব্য পদার্থ এই কোরকের সংস্পর্শে আইসে, তখনই আমাদের স্বাদ-জ্ঞান হয়। কেবল দ্রাব্য পদার্থেরই আস্বাদন সম্ভব। যে সকল পদার্থ জলসংস্পর্শে গলিয়া যায় না, তাহাদের স্বাদগ্রহণও সম্ভব নয়। নাসারন্ধ্র সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া এক টুকরা প্রস্তর বা লৌহ জিহ্বাগ্রে স্থাপন করিলে কোন প্রকার আস্বাদনের অনুভূতি হয় না। স্বাদ সাধারণতঃ চারি প্রকার—অম্ল, তিক্ত, মধুর, কষায়। এতদ্ব্যতীত অন্য আস্বাদনের উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু উহারা স্পর্শ ও স্বাদের সংমিশ্রণ মাত্র। চক্ষু এবং নাসিকার সাহায্য না লইলে কেবল জিহ্বার দ্বারা অতি অল্প সংখ্যক দ্রব্যেরই স্বাদ আমরা বুঝিতে পারি। নাসারন্ধ্র বন্ধ কর, চক্ষুর্দ্বয় মুদিত কর, পরে জিহ্বার উপর ক্রমান্বয়ে তিন চারি প্রকার স্বাদবিশিষ্ট দ্রব্য স্থাপন করিতে দাও; দেখিবে, উহাদের স্বাদনির্ণয়ে বিপত্তি ঘটিবে। ঘ্রাণ এবং দর্শন প্রকৃত স্বাদের রূপান্তর ঘটাইয়া থাকে। একই বৃক্ষের দুইটি ফলের মধ্যে যেটি দেখিতে সুন্দর, সেটি যেন খাইতেও সুস্বাদু বোধ হয়। সুগন্ধি দ্রব্যের আস্বাদনও তেমনি,—গন্ধহীন দ্রব্য অপেক্ষা যেন অধিক সুখকর।

স্বাদ সংবিত্তির সীমা।

সংবিত্তি মাত্রেরই প্রারম্ভ আছে, আবার পরিণতিও আছে। উদ্বোধক অতি ক্ষীণ, অতি দুর্ব্বল হইলে, প্রারম্ভসীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না; সুতরাং এরূপ উদ্বোধক হইতে কোন সংবিত্তিরও উদ্রেক হয় না। উদ্বোধক শক্তি প্রারম্ভ-সীমা অতিক্রম করিয়া যেমন ক্রমশঃ

বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সংবিত্তিরও প্রায় তদনুরূপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু উদ্বোধক শক্তি যখন অত্যন্ত অধিক হয়, তখন আর সংবিত্তির মাত্রা বৃদ্ধি হয় না। তোমার পায়ের উপর একটি অত্যন্ত ভারি দ্রব্য পতিত হওয়ায়, তোমার বেদনার অনুভূতি হইল। কিন্তু ঐ স্থানে যদি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য অপেক্ষা অধিক ওজনের আরও একটি দ্রব্য পতিত হইত, তাহা হইলেও বেদনায় কোন ইতর-বিশেষ পরিলক্ষিত হইত না। আস্বাদনেরও প্রারম্ভসীমা এবং প্রান্তসীমা আছে। দুই শত ভাগ জলের সহিত ১ ভাগ চিনি মিশাইলে মিষ্ট রসাস্বাদ হয়; পঞ্চবিংশতি শত ভাগ জলের সহিত ১ ভাগ লবণ মিশাইলে লবণের স্বাদ পাওয়া যায়; পঞ্চত্রিংশ-শত ভাগ জলের সহিত এক ভাগ কুইনাইন মিশাইলে তিক্ত রসাস্বাদ হয়। সংবিত্তির সীমা সম্বন্ধে কোন বিশেষ সাধারণ নিয়ম অবধারণ করা সম্ভব নহে; কারণ বস্তু এবং ব্যক্তি-বিশেষে এবং অবধান-শক্তির তারতম্য অনুসারে সংবিত্তির সীমাদ্বয়ের তারতম্য লক্ষিত হয়।

রসনেন্দ্রিয়ের বিশেষ একটি আশ্চর্য্য শক্তি আছে—এক স্বাদের সহবাসে বিপরীত স্বাদের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। কিঞ্চিৎ তিক্ত দ্রব্যের সহবাসে মিষ্ট দ্রব্য আরও মিষ্ট হয়; সামান্ত মধুর রসের সহবাসে অম্ল দ্রব্য আরও অম্ল বোধ হয়। তাপের সহিত স্বাদের সম্বন্ধ আরও চমৎকার। মুখ মধ্যে উষ্ণ জল লইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে উহা নিক্ষেপ কর; পরে কিঞ্চিৎ চিনি জিহ্বাগ্রে স্থাপন কর; দেখিবে, তুমি চিনির আস্বাদনে বঞ্চিত। আবার উষ্ণ জলের পরিবর্ত্তে বরফ লইয়া ঐরূপ করিলেও চিনির আস্বাদ অনুভব করিতে পারিবে না।

স্বাদের সহিত অপর সংবিত্তির সম্বন্ধ।

সত্য বটে রসনেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা স্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু রসনেন্দ্রিয়ের সকল অংশই সকল স্বাদগ্রহণক্ষম নহে। পৃথক্ পৃথক্

স্বাদের স্থান নির্ণয়।

অংশে পৃথক্ পৃথক্ রসাস্বাদ হইয়া থাকে। জিহ্বার পুরোভাগে মিষ্ট রসাস্বাদ, পার্শ্বদেশে অম্ল রসাস্বাদ এবং পশ্চাদ্দেশে তিক্ত রসাস্বাদ হইয়া থাকে।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া।

নাসারন্ধ্রের উর্দ্ধদিক্‌স্থ কোমল ঝিল্লীময় আবরণে ঘ্রাণেন্দ্রিয় অবস্থিত। এই ঝিল্লীময় আবরণে করোটিক স্নায়ুমণ্ডলীর প্রথম জোড়া স্নায়ুর অতি সূক্ষ্ম সূত্রবৎ শাখা প্রশাখা সমূহ বিস্তৃত রহিয়াছে। করোটিক স্নায়ুমণ্ডলীর এই প্রথম জোড়া স্নায়ুকে ঘ্রাণানুভাবক স্নায়ু বলা হয়। স্বাদের সহিত পরিপাক-যন্ত্রের যেমন সম্বন্ধ, ঘ্রাণের সহিত শ্বাস প্রশ্বাস-যন্ত্রেরও তেমনি সম্বন্ধ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে, বাষ্প বা যে বস্তু বাষ্পে পরিণত হইতে পারে তাহাদেরই ঘ্রাণ পাইয়া থাকি। মনুষ্য অপেক্ষা কোন-কোন পশুর ঘ্রাণশক্তি অধিক প্রবল। ঘ্রাণ স্বাদের সহায় এবং ঘ্রাণের সাহায্যে বায়ুর শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণীত হয় সত্য; কিন্তু এই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কুকুর নিজের শত্রু মিত্র চিনিতে পারে,—ইহার গন্তব্য স্থানও স্থির করিতে পারে। মানুষ অপরাপর ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে বলিয়া তাহার এই শক্তির তত বিকাশ হয় নাই; তথাপি, অভ্যাস এবং চেষ্টা বলে এই শক্তির যথেষ্ট ঔৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায়। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা কেবল ঘ্রাণের সাহায্যে, কোন্ সুরা কত দিনের পুরাতন, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারে।

গন্ধের প্রকার।

গন্ধ নানা প্রকারের; কিন্তু কেবল ঘ্রাণের সাহায্যে আমরা অতি অল্প গন্ধেরই পরিচয় পাইয়া থাকি। একজন লোকের চক্ষুর্দ্বয় বন্ধ করিয়া তাহাকে কতকগুলি দ্রব্যের ঘ্রাণ লইতে দাও। আবার তাহার নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া বা না করিয়াই আর কতকগুলি জিনিষ আস্বাদন করিতে দাও; দেখিবে,

লোকটি কতকগুলির যথার্থ নাম দিতে পারিবে না; কারণ, অনেক গন্ধই পরস্পর সদৃশ। একই বস্তু হইতে আমরা সকল সময়ে একরকম গন্ধ পাই না; আবার একই বস্তু একই সময়ে দুইজন লোককে একই গন্ধ বিতরণ করে না। এই সকল কারণে, গন্ধ নানা প্রকারের হইলেও, এ পর্য্যন্ত গন্ধের নাম নির্দ্দেশ করা হয় নাই; এবং অদূর-ভবিষ্যতে করা হইবে বলিয়াও মনে হয় না। স্বাদের নাম আছে, বর্ণের নাম আছে, কিন্তু গন্ধের নাম নাই। সুন্দর গন্ধ, সুখকর গন্ধ প্রভৃতি নাম আমরা উল্লেখ করি সত্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা গন্ধের নাম নয়। বিশেষ-বিশেষ গন্ধ হইতে আমাদের মনে বিশেষ-বিশেষ ভাবের উদয় হয় এবং আমরা ঐ ভাব অনুসারেই নামকরণ করিয়া থাকি। অতএব এই সকল নাম গন্ধের নাম নয়; গন্ধের ফলের, গন্ধ-উদ্দীপ্ত মানসিক ভাবের নাম।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ক্লান্তি।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় সকল সময়েই ঘ্রাণ গ্রহণে সমর্থ হয় না—ইহারও ক্লান্তি আছে। যে পাচক প্রত্যহই পলাণ্ডু রন্ধন করে, সে পলাণ্ডুর গন্ধ পায় না—তাহার ইন্দ্রিয় উক্ত ঘ্রাণ গ্রহণে অক্ষম হইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সময়ে অন্য ঘ্রাণ উপস্থিত হইলে, সে তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ক্লান্তি ঘটিলেও, যে গন্ধ হইতে ক্লান্তি জন্মে সেই গন্ধ ব্যতীত অপর গন্ধে ক্লান্তি জন্মে না। নাসিকার একটি রন্ধ্র বন্ধ কর; পরে অপর রন্ধ্রের সাহায্যে কোন একটি গন্ধ দ্রব্য আঘ্রাণ কর; কিছুক্ষণ পরে দেখিবে তুমি আর গন্ধ পাইতেছ না—কারণ, তোমার ইন্দ্রিয়ের ক্লান্তি জন্মিয়াছে। এক্ষণে অন্য একটি গন্ধ-দ্রব্য আঘ্রাণ কর,—ইহার গন্ধ পাইবে।

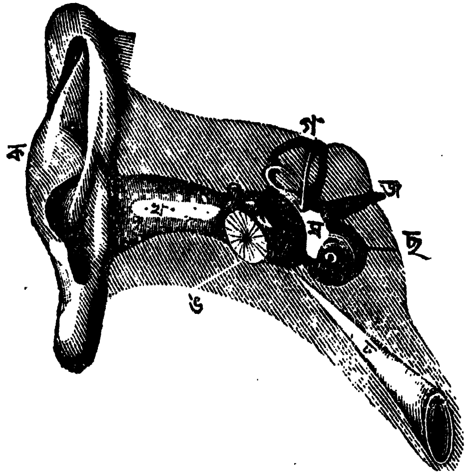
দশম অধ্যায়

শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়

করোটির দুই ধারে পার্শ্বকপালাস্থিতে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় স্থাপিত। এই ইন্দ্রিয় তিন ভাগে বিভক্ত—

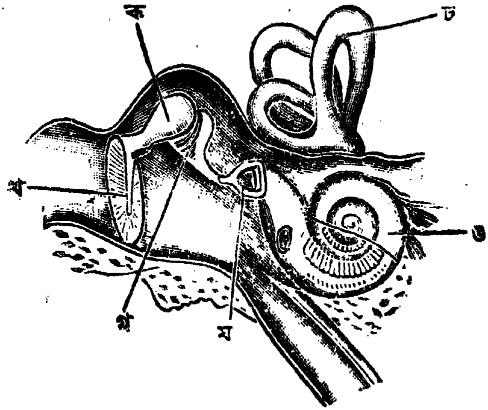
শ্রবণেন্দ্রিয়ের গঠন। কর্ণ { বাহ্য কর্ণ। মধ্য কর্ণ—পটহ গহ্বর। আভ্যন্তর কর্ণ—কর্ণকুহর। }

কর্ণের ঊর্দ্ধাংশ (ক) এবং কর্ণবিবর (খ) লইয়াই বাহ্য কর্ণ। কর্ণবিবরটি লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চি হইবে। ইহার গাত্র সূক্ষ্ম রোমাবৃত। ইহার ভিতর দিকের প্রান্তভাগটি একটি ঝিল্লী দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত। এই ঝিল্লীকে পটহ-ঝিল্লী (ঙ) বলে। ইহা অতিশয় পাতলা ও স্থিতিস্থাপক। ইহা ঢাকের চামড়ার ন্যায় টান৷ শ্রুতিবিবরের প্রথমাংশ উপাস্থিময় কিন্তু ইহার ভিতর দিকে অস্থিময় প্রাচীর আছে। এই নলপথটি পার্শ্বকপালাস্থিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পটহ ঝিল্লী হইতে আরম্ভ করিয়া বাদামী গবাক্ষ (ঘ) পর্য্যন্ত প্রদেশকে মধ্যকর্ণ বা পটহ গহ্বর বলা হয়। এই পটহ গহ্বরে তিনটি ক্ষুদ্র অস্থি আছে—যথা,—মুদ্গরাস্থি,



নেহাই অস্থি এবং রেকাব অস্থি। পটহ গহ্বরের তলদেশে যে ছিদ্রপথ আছে—তাহাকে কর্ণরন্ধ্র বলে (চ)। এই রন্ধ্রপথে কর্ণপটহের ভিতর বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। আভ্যন্তর কর্ণ বা কর্ণকুহর শব্দ-তরঙ্গ গ্রহণ করিয়া মস্তিষ্কে লইয়া যায়। ইহার তিনটি অস্থিময় অংশ আছে, যথা,—কর্ণশঙ্কুলী (ছ), কর্ণকুহরের অস্থিময় নিম্নাংশ, দেখিতে শামুকের খোলার ভিতরের অংশের ন্যায়; অর্দ্ধ চক্রাকার প্রণালী (গ), কর্ণ-কুহরের উপরের অংশ দেখিতে তিনটি ফাঁস দেওয়া একটি ফিতার গাঁইটের মত; (ছ) ও (গ) এর মধ্যভাগ একটি ডিম্বাকৃতি কক্ষদ্বারের ন্যায়। আভ্যন্তর কর্ণকুহরের নালি এবং কক্ষগুলি পরিবেষ্টন করিয়া একটি থলি আছে। ইহাকে গোলক-ধাঁধা ঝিল্লী বলে। ইহা একপ্রকার স্বচ্ছরস নামক তরল পদার্থের উপর ভাসমান। ইহার ভিতরেও এক-প্রকার তরল পদার্থ আছে, তাহাকে গর্ভরস বলে। এই গর্ভরসের ভিতর বালুকণার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু ভাসিতেছে। শ্রুতি-স্নায়ু করোটির ছিদ্রপথ দিয়া মস্তিষ্ক হইতে আভ্যন্তর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা গোলক-ধাঁধা ঝিল্লীর আভ্যন্তর প্রাচীরে দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। কর্ণশঙ্কুলীর ঝিল্লীতে অসংখ্য

সূত্রগুচ্ছ পাশাপাশি স্থাপিত আছে। ইহাদিগকে ছিলকা সূত্র বলে। ইহারা আবার সূক্ষ্ম শুঁয়াবিশিষ্ট কোষসমূহকে ধারণ করিয়া আছে।



আভ্যন্তর কর্ণকুহর

ক—মুদ্গরাস্থি
খ—পটহঝিল্লী
গ—নেহাই অস্থি
ঘ—রেকাব অস্থি
ঙ—কর্ণশম্বুলী
চ—অর্দ্ধচক্রাকার প্রণালী।

শব্দ-সংবিত্তির ক্রম।

বায়ুতরঙ্গ

বাহ্যকর্ণে গ্রহণ

শ্রুতিবিবরে প্রবেশ

কর্ণপটহে আঘাত
মুদ্গরাস্থির কম্পন
রেকাব অস্থির কম্পন
নেহাই অস্থির কম্পন
ছিল্কাসূত্রগুলির সঞ্চালন
কক্ষদ্বারের তরঙ্গায়ন
কর্ণশস্কুলী এবং অর্দ্ধচক্রাকার প্রণালীতে প্রবেশ
স্বচ্ছরসের তরঙ্গায়ন
গোলক বাঁধা ঝিল্লীর তরঙ্গায়ন
গর্ভরসের কম্পন
শুঁয়া বিশিষ্ট কোষসমূহের সঞ্চালন
শ্রুতিস্নায়ুর স্পন্দন
উক্ত স্পন্দন মস্তিষ্কে আনয়ন
শব্দ-সংবিত্তির সৃষ্টি।

রসনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে, যে দ্রব্য ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আইসে, তাহারই জ্ঞান হইয়া থাকে ; ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নাসিকা-সংস্পৃষ্ট দ্রব্য বা ইহার নিকটবর্ত্তী দ্রব্যের জ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অধিকতর দূরবর্ত্তী দ্রব্যের জ্ঞান হইয়া থাকে। কর্ণপটহে বায়ু-তরঙ্গের আঘাত হেতু শব্দানুভূতি হইয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয়-শক্তি এত প্রবল যে, ইহার সাহায্যে ধমনীতে রক্তপ্রবাহের শব্দ পর্য্যন্ত শ্রুত হইয়া থাকে। দুই হস্তের দুইটি অঙ্গুলির সাহায্যে তোমার কর্ণবিবরদ্বয় বন্ধ কর ; দেখিবে যে, একটি শব্দ-প্রবাহ শুনিতে পাইতেছ। আবার, একটি অঙ্গুলির দ্বারা একটি কর্ণবিবর রুদ্ধ করিয়া অপর হস্তটি তোমার

শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া।

বক্ষে স্থাপন কর; দেখিবে যে, এই শব্দপ্রবাহের ক্রমের সহিত তোমার হৃদয়-স্পন্দন ক্রমের সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। মাত্র চাপ হইতেও শব্দানুভূতি হইয়া থাকে। কর্ণবিবরে অঙ্গুলি রাখিয়া ক্ষণে-ক্ষণে চাপ দিলে শব্দানুভূতি হয়।

শ্রবণেন্দ্রিয় ও ভারসাম্যেন্দ্রিয়।

আমাদের কর্ণযন্ত্রে দুইটি ইন্দ্রিয় আছে একটি শ্রবণেন্দ্রিয় আর একটি ভারসাম্যেন্দ্রিয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের শব্দ-সংবিত্তি হয়। শব্দ দুই প্রকার—তান ও বিতান। বায়ুবিন্দুর ধাক্কা হইতে বিতান, আর তরঙ্গায়িত বায়ুপ্রবাহ হইতে তান সংবিত্তি হয়। কতকগুলি শব্দ কোমল, আবার কতকগুলি কর্কশ। যে শব্দ শ্রুতি-মধুর, যে শব্দে সুখের উদ্রেক হয়, তাহাই গীত; আর যাহা শ্রুতিকঠোর, যাহা হইতে বিরক্তি জন্মে, তাহাই গোলমাল। তান ও বিতানের জ্ঞান অনেক পরিমাণে শিক্ষালব্ধ। যে শব্দ আমার নিকট শ্রুতি-মধুর, তোমার নিকট তাহা কর্কশ বলিয়া মনে হইতে পারে। চীনবাসীদের নিকট যাহা গীত, জর্ম্মণদের নিকট তাহা বড়ই কর্কশ। গায়ক গীত গাহিতেছে। তুমি সঙ্গীতজ্ঞ, তাই উহার সুর-লয়ের ভ্রম-প্রমাদ লক্ষ্য করিতে পারিতেছ; কিন্তু আমি ঐ রসে বঞ্চিত বলিয়া গীতের কোন ত্রুটিই আমার লক্ষ্যপথে আসিতেছে না। আবার একই কারণ-সম্ভূত শব্দ অবস্থাবিশেষে পৃথক্ বলিয়া মনে হয়। বাদ্য-যন্ত্র এক হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তি তাহা হইতে যে ধ্বনি বাহির করিতে সমর্থ হইবে, অশিক্ষিত ব্যক্তি তাহা পারিবে না। কর্ণেন্দ্রিয় হইতে আমাদের আর এক প্রকার সংবিত্তি হয়; এ সংবিত্তি শব্দসংবিত্তি নহে; এ সংবিত্তি হইতে শব্দের জ্ঞান হয় না। এ সংবিত্তি হইতে শরীরের সাম্যাবস্থার বিপর্য্যয় জ্ঞান হয়। এই সংবিত্তিকে "ঘূর্ণন" সংবিত্তি বলিতে পারা যায়। তিন প্রকারে আমাদের

"ঘূর্ণন" সংবিত্তি হইতে পারে—উর্দ্ধকে অধঃ বলিয়া বা পশ্চাৎকে সম্মুখ বলিয়া বা বামদিককে দক্ষিণদিক বলিয়া মনে হইলে শরীরের স্থৈর্য্য নষ্ট হইতে পারে। আমাদের প্রত্যেক কর্ণেই তিনটি করিয়া যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রের সাহায্যেই আমরা আমাদের শরীরের সাম্যাবস্থা রক্ষা করিতে পারি। "ঘূর্ণন" সংবিত্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের দেহের স্থৈর্য্য নষ্ট হইয়াছে সুতরাং সতর্ক না হইলে পতন অবশ্যম্ভাবী।

শব্দের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য আছে—শব্দের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, উচ্চ-নিম্ন ক্রম আছে। কোন শব্দ উচ্চ, আবার কোনটি বা মৃদু। যে শব্দ যত নিকট হইতে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা তত মৃদু; আর যেটি যত দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায় তাহা তত উচ্চ। শব্দের আবার প্রকারগত পার্থক্যও আছে—শব্দোৎপাদক বস্তুর পার্থক্যই এ পার্থক্যের হেতু। একটি স্ত্রীলোক গীত গাহিতেছে, আর একটি পুরুষও সেই সুরে সেই মানে সেই গীত গাহিতেছে। দুই জনের শব্দের পার্থক্য আছে—এ পার্থক্য পরিমাণগত পার্থক্য নহে;—এখানে শব্দের উচ্চতা এক;—এ পার্থক্য প্রকারগত পার্থক্য। বায়ু-কম্পন শব্দানুভূতির হেতু—কম্পনের বিস্তৃতি এবং কম্পন-সংখ্যার তারতম্য অনুসারে শব্দের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। কম্পন-তরঙ্গের বিস্তৃতি বা পরিধি যত বেশী হয়, শব্দের উচ্চতাও তত অধিক হইবে। সেতারের কোন একটি তারের মধ্যভাগ ধরিয়া তোমার শরীরের দিকে টানিয়া ছাড়িয়া দাও; দেখিবে, তারটি অগ্র-পশ্চাৎ হইয়া কাঁপিতে থাকিবে; প্রথম কম্পন অধিক স্থান ব্যাপী হইবে, দ্বিতীয় কম্পন তদপেক্ষা অল্প স্থান অধিকার করিবে; তৃতীয় কম্পন আরও অল্প স্থান অধিকার করিবে;—এইরূপে দেখিবে যে, যেমন পরিধি কমিয়া

শব্দের পরিমাণ এবং প্রকার গত পার্থক্য।

আসিতেছে,শব্দের উচ্চতারও তেমনি হ্রাস হইতেছে। বায়ু-তরঙ্গের পরিধি যত বেশী হইবে, শব্দের উচ্চতাও তত বেশী হইবে। আবার দেখ, বাদক যখন সেতার বাজাইতেছে, তখন তাহার বাম হস্তের অঙ্গুলি একবার উপরে উঠিতেছে আবার নীচে নামিতেছে। এই বাম হস্তের গতি অনুসারে সুরের তারতম্য হইতেছে। শব্দের উচ্চতা এক হইলেও সুর সরু-মোটা হইতেছে। বাদক তাহার বাম হস্তের সাহায্যে তারের দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি করিতেছে। কারণ, তারের দৈর্ঘ্য যত বেশী হইবে, কম্পন-সংখ্যাও তত কম হইবে; আবার তারের দৈর্ঘ্য যত কম হইবে, কম্পন সংখ্যাও তত বেশী হইবে। কম্পন-সংখ্যা যত বেশী হয়, সুরও তত মিহি হয়। অতএব কম্পনের পরিধি অনুসারে শব্দ উচ্চ বা নিম্ন, এবং উহার সংখ্যা অনুসারে শব্দ মিহি বা মোটা হইয়া থাকে। প্রতি সেকেণ্ডে অন্ততঃ দ্বাদশটি কম্পন না হইলে, শব্দ শ্রুতি-গোচর হয় না; আবার কম্পন-সংখ্যা যদি প্রতি সেকেণ্ডে ষষ্টিসহস্রের অধিক হয়, তাহা হইলেও শব্দ শ্রুতির অগোচর থাকিয়া যায়। সুতরাং শব্দেরও দুইটি সীমা আছে—একটি নিম্নতম, অপরটি ঊর্দ্ধতম সীমা। কিন্তু এই সীমাদ্বয় সকলেরই পক্ষে সমান নয়। আমার পক্ষে যাহা নিম্নতম সীমা, অপরের পক্ষে তাহা নাও হইতে পারে। অনেকেই প্রতি সেকেণ্ডে ৩২টি কম্পন হইলেও শব্দ শুনিতে পায় না। মানুষের পক্ষে যে শব্দ ঊর্দ্ধতম সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া অশ্রুত থাকিয়া যায়, অনেক পশু সে শব্দ শুনিতে পায়। অর্থাৎ শব্দের উচ্চতা হেতু মানুষ যে শব্দ শুনিতে পায় না, অনেক পশু সে শব্দ শুনিতে পায়; আবার মানুষ যে শব্দ শুনিতে পায়, অনেক পশু তাহা শুনিতে পায় না।

মানুষের বয়োবৃদ্ধির সহিত শ্রবণ শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। বধির ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ-কেহ উচ্চ শব্দে, আবার কেহ-কেহ নিম্ন শব্দে বধির

শ্রবণ শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি।

হয়। যাহারা উচ্চ শব্দে বধির, তাহাদের নিকট উচ্চ শব্দে কথা কহিলে তাহারা শুনিতে পাইবে না; কিন্তু স্পষ্ট অথচ নিম্নস্বরে কথা কহিলে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবে। আবার যাহারা নিম্নস্বরে বধির, তাহাদের নিকট চীৎকার না করিলে শুনিতে পাইবে না। আবার আরও আশ্চর্য্যের বিষয়,—এমন অনেক বধির আছে, যাহারা একেবারে নিস্তব্ধতার মধ্যে থাকিয়াও উচ্চ শব্দ শুনিতে পায় না, কিন্তু বহু গোলমালের ভিতর হইতেও অতি মৃদু শব্দ শুনিতে পায়। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, এক স্বাদের সহবাসে অন্য স্বাদের মাত্রা বৃদ্ধি পায়; তেমনি এক শব্দের সহবাসে অন্য শব্দেরও মাত্রা বৃদ্ধি পায়। জাঁতার ঘড়ঘড় শব্দ হইতেছে;—এই শব্দে বধির ব্যক্তির কর্ণপটহ স্পন্দিত হইতেছে। পরে তুমি একটি মৃদু শব্দ করিলে। এই শব্দে পূর্ব্ব স্পন্দন অধিকতর দ্রুত হইয়া তাহার শ্রুতি-গোচর হইল। এই অতিরিক্ত স্পন্দনে তাহার শ্রুতি আকৃষ্ট হইল বলিয়া শব্দটি তাহার নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। অনেকেই আবার শব্দের সুরে বধির—ইহাদের সুর-বোধ নাই; পৃথক-পৃথক সুরের তারতম্য লক্ষ্য করিতে পারে না। সুরবোধহীন লোকে গীত গাহিবার সময় স্বরের হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া থাকে মাত্র; কিন্তু তাহাদের কি ত্রুটি হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না।

আমরা দর্শনেন্দ্রিয়ের বড়ই সমাদর করিয়া থাকি; কারণ, অপরাপর ইন্দ্রিয় সমুৎপন্ন জ্ঞানগুলিকেও দর্শনেন্দ্রিয়ে আরোপ করিয়া থাকি।

দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া।

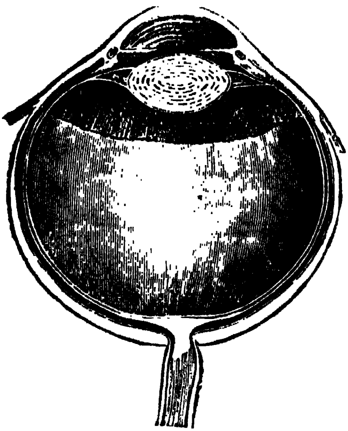
রসনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে জিহ্বাসংস্পৃষ্ট দ্রব্যেরই জ্ঞান হইয়া থাকে; ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী বস্তুরও জ্ঞান হইয়া থাকে; শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অধিক দূরতর বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে; আর দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তদধিক

দূরতর বস্তুরও জ্ঞান হইয়া থাকে। কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা প্রভৃতি দূরবর্ত্তী বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয়ের অভাব হইলে শ্বেত, নীল, লোহিত প্রভৃতি সকল প্রকার বর্ণ-জ্ঞানেরই অভাব হয়। এই ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়েরই সদ্ভাব আছে। যখন ঐ গোলাকার বস্তুটি স্পর্শ করিতেছ, তখন উহার বর্ণটিও দেখিতেছ। পরে উহার বর্ণমাত্র দেখিয়াই উহার আকার বুঝিতে সমর্থ হও। লোভ-নীয় বস্তু দেখিলে অনেক সময় অনেকেরই জিহ্বায় জল আইসে। অপরাপর ইন্দ্রিয়ের সাহচর্য্যেই দর্শনেন্দ্রিয় হইতে আমরা অনেক প্রকার জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকি ; কিন্তু শুধু চক্ষুর সাহায্যে কেবল বর্ণ ও আলোকের জ্ঞান হইয়া থাকে।

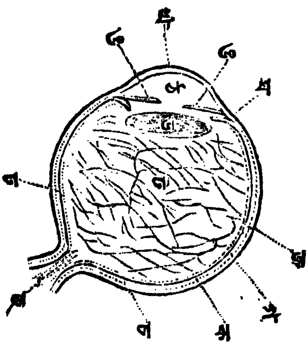
দর্শনেন্দ্রিয়ের গঠন।

আমাদের চক্ষুতে একটি পার্শ্বাংশুচ্ছেদক যন্ত্র আছে। ইহা স্বয়ঞ্চল। ইহার নাম নেত্রপটল। চক্ষু কাল বা কটা বলিতে আমরা যে অংশটুকু বুঝি ইহা চক্ষের সেই অংশটুকু। তীব্র আলোকে ইহা সঙ্কুচিত হইয়া কনীনিকার বা চক্ষু তারকার কিয়দংশ আবৃত করে, আবার ক্ষীণ আলোকে ইহা সম্প্রসারিত হইয়া কনীনিকা হইতে সরিয়া যায়। দিনের বেলায়, ঘরের ভিতর, জানালার নিকট বসিয়া একখানি আয়না সম্মুখে রাখিয়া তোমার চোখের তারার প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কর দেখিবে তোমার তারাটি ছোট দেখাইতেছে। কিন্তু সেই সময় যদি কেহ আস্তে আস্তে জানা-লাটি বন্ধ করিতে থাকে তবে দেখিবে যে যেমন ঘরের আলো ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে তেমনি চোখের তারাও ক্রমে ক্রমে বড় দেখাইতেছে। জলীয় রস এবং মসৃণ-রসের মধ্যে অর্থাৎ নেত্রপটলের পশ্চাতে একটি অতি সুন্দর উজ্জ্বল স্বচ্ছ আটাল পদার্থ আছে। ইহাকে স্বচ্ছ কাচ পুটক বলা হয়। ইহাও স্বয়ঞ্চল। ইহা আপনা আপনি,

অগ্র পশ্চাৎ না সরিয়া, কেবল ইহার আকারের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া, ইহার অধিশ্রয়ণ বিন্দু ঠিক করিয়া লয়।



স্বচ্ছ কাচ পুটকের পশ্চাতে একটি অন্ধকার কক্ষ আছে। এই কক্ষের পশ্চাতের দেওয়ালটি জালিময় পর্দ্দার দ্বারা আবৃত। ইহা বড়ই অনুভব-প্রবণ। আমরা যাহা কিছু দেখি তাহারই চিত্র এই পর্দ্দাতে প্রতি-ফলিত হয়। এই পর্দ্দাটি স্নায়ু-সূত্রে পূর্ণ। দর্শন স্নায়ুদ্বারা ইহা মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত আছে। এই অক্ষি-পর্দ্দাটি বিশেষরূপে অনুভব-প্রবণ হইলেও যে স্থানে দর্শন স্নায়ু এই পর্দ্দার সহিত যুক্ত হইয়াছে সেই স্থানটি আদৌ অনুভব-প্রবণ নহে। এই স্থানটিকে অন্ধবিন্দু বলা হয়। ইহার উপর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না।



বাহিরের সাদা ঘের—বাহ্যঝিল্লী বা দৃঢ়াবরণ—ঘ।

তাহার পরের ঘের—মধ্যঝিল্লী বা বর্ণা-বরণ—চ, ক, গ, জ।

তাহার পরের ঘের—পশ্চাৎঝিল্লী বা জালিময় পর্দ্দা—ঢ।

সমগ্র মধ্যভাগ—মসৃণ রস—ট।

ডিম্বাকার অংশ—স্বচ্ছ কাচ-পুটক—ড।

নেত্র পটল—ঙ, ঙ।

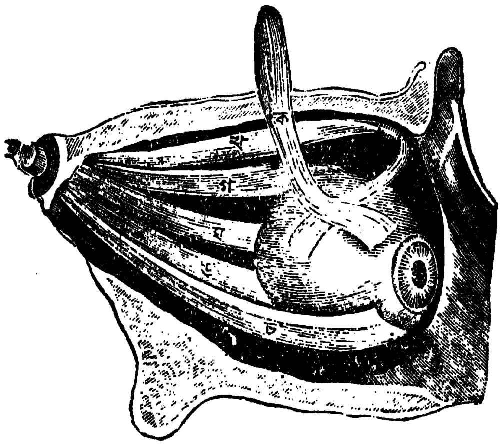
স্বচ্ছাবরণ—খ।

জলীয় রস—ঠ।

ঠ এবং ডএর মধ্যে কণীনিকা।

ছ—দর্শন স্নায়ু।

নেত্রপিণ্ডের পেশী সমূহ।



গ, ঙ, চ, ঘ—ঋজু পেশী

ক, খ, তির্য্যক্ পেশী।

ছ—দর্শন স্নায়ু।

ঋজুপেশী
- ঊর্দ্ধ—অক্ষিগোলককে ঊর্দ্ধদিকে সঞ্চালন করে।
- অধঃ—অক্ষিগোলককে নিম্নদিকে সঞ্চালন করে।
- আভ্যন্তর—অক্ষিগোলককে ভিতরের দিকে সঞ্চালন করে।
- বাহ্য—অক্ষিগোলককে বাহিরের দিকে সঞ্চালন করে।

তির্য্যক্ পেশী
- ঊর্দ্ধ—অক্ষিগোলককে অধঃ ও বাহ্যদিকে সঞ্চালন করে।
- অধঃ—অক্ষিগোলককে ঊর্দ্ধ ও বাহ্যদিকে সঞ্চালন করে।

ঈথারের তরঙ্গ সমূহ স্বচ্ছাবরণ, জলীয়রস, স্বচ্ছকাচপুটক এবং মসৃণ রসের ভিতর দিয়া প্রতিভঙ্গ হইয়া অক্ষিপর্দ্দাতে পদার্থ সমূহের প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে। এই প্রতিবিম্ব ঐ পর্দ্দার দ্বারা দর্শন স্নায়ুতে সঞ্চারিত হইয়া মস্তিষ্কে নীত হয় এবং তাহার ফলে দর্শন-সংবিত্তির সৃষ্টি হয়।

চক্ষের উপর আলোকের ক্রিয়া অনেক প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে কিন্তু অধ্যাপক হেরিং সাহেবের ব্যাখ্যা ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অক্ষিপর্দ্দায় তিন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক পদার্থেই দুই প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংসাধিত হয়—যথা রাসায়নিক সংযোজন এবং রাসায়নিক বিয়োজন। প্রত্যেক পদার্থেই এই দুই পৃথক্ প্রক্রিয়া হইতে দুইটি পৃথক্ সংবিত্তির সৃষ্টি হয়।

হেরিং সাহেবের ব্যাখ্যা

প্রথম পদার্থ
- (ক) সংযোজন ক্রিয়া = কৃষ্ণ-বর্ণ।
- (খ) বিয়োজন ক্রিয়া = শ্বেত-বর্ণ।

দ্বিতীয় পদার্থ
- (ক) সংযোজন ক্রিয়া = হরিত-বর্ণ।
- (খ) বিয়োজন ক্রিয়া = লোহিত-বর্ণ।

তৃতীয় পদার্থ { (ক) সংযোজন ক্রিয়া = নীল-বর্ণ।
(খ) বিয়োজন ক্রিয়া = পীত-বর্ণ।

এই প্রকারে ছয় প্রকারের রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে ছয় প্রকার প্রধান দর্শন-সংবিত্তির সৃষ্টি হইতেছে। অপরাপর দর্শন-সংবিত্তি এই ছয়টি সংবিত্তির বহুবিধ সমন্বয়ের ফলমাত্র।

দর্শন সংবিত্তির প্রকার।

আলোক দর্শন-সংবিত্তির উদ্বোধক। আলোক দুই প্রকার— মিশ্র ও অমিশ্র। সমলম্বি ইথর-তরঙ্গ সমন্বয়ে অমিশ্র আলোকের উৎপত্তি* হয়; আর বিসমলম্বি ইথর-তরঙ্গ সমবায়ে অমিশ্র আলোকের সৃষ্টি হয়। আলোক দুই প্রকার সুতরাং, দর্শন সংবিত্তিও দুই প্রকার—দীপ্তি ও বর্ণ। অমিশ্র আলোক হইতে বর্ণ-সংবিত্তি; আর মিশ্র আলোক হইতে দীপ্তি সংবিত্তি হইয়া থাকে। শ্বেত, কৃষ্ণ ও ধূসর এই তিনটিকে দীপ্তি বলা হয়। চলিত কথায় ইহাদিগকে বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহারা বর্ণ নহে। তিন প্রকারে—দীপ্তি-সংবিত্তির উৎপত্তি হইতে পারে—যথা

দীপ্তি-সংবিত্তি।

১। অক্ষিপটে মিশ্র আলোকের ক্রিয়া হেতু।

২। কতিপয় যুগ্ম অমিশ্র আলোক সংমিশ্রণে যথা—

(ক) রক্তপীত + হরিতাভ নীল।

(খ) পীত + নীল।

(গ) হরিতাভ পীত + পাটল।

৩। ন্যায্য অনুপাতানুযায়ী তিনটি অমিশ্র আলোকের সংমিশ্রণে

(ক) লোহিত + হরিত + পাটল।

(খ) লোহিত + পীত + হরিতাভ নীল।

বর্ণ-সংবিত্তির—সাধারণতঃ চারিটী ধারা—

বর্ণ-সংবিত্তির ধারা।

(১) লোহিত, লোহিতাভ পীত, পীত।
(২) পীত, পীতাভ হরিত, হরিত।
(৩) হরিত, হরিতাভ নীল, নীল।
(৪) নীল, নীলাভ-লোহিত, লোহিত।

এক বেগুনিয়া রং ব্যতীত এই সমস্ত বর্ণগুলিই রামধনুকে দৃষ্ট হয়। আমরা সাধারণতঃ বর্ণ ও দীপ্তির পার্থক্য বুঝিতে পারি না যাহাকে আমরা বর্ণ বলি তাহা বর্ণ ও দীপ্তির সমন্বয় মাত্র। যখন অতি সামান্য আলোকে "সপ্তবর্ণের" প্রতি দৃষ্টি করি তখন আমরা কোন বর্ণই দেখিতে পাই না; যাহা দেখি তাহা কেবল 'ধূসর' শ্রেণী মাত্র। অতএব মানিয়া লইতে হইবে, যে সকল বর্ণেই এই ধূসর বর্ত্তমান। যাহারা বর্ণান্ধ তাহারা সাদা, কাল ও ধূসর বর্ণের পদার্থ দেখিয়া থাকে, কিন্তু মানুষ যদি "দীপ্তি-অন্ধ" হয়, অর্থাৎ তাহারা যদি সাদা কাল এবং ধূসর পদার্থ দেখিতে না পায় তাহা হইলে তাহারা কোন জিনিষই দেখিতে পাইবে না। আরও, অক্ষিপট্টের বহির্ভাগের গঠন প্রণালী অপেক্ষা মধ্যভাগের গঠন-প্রণালী অধিক জটিল এবং মধ্যভাগ হইতেই আমাদের বর্ণ-সংবিত্তি হইয়া থাকে, এবং এই মধ্যভাগ অতিক্রম করিয়া যতই আমরা কিনারার দিকে যাইতে থাকি ততই আমাদের বর্ণসংবিত্তি কমিতে থাকে, অবশেষে যখন একবারে কিনারায় আসিয়া উপনীত হই তখন যাহা থাকে তাহা কেবল দীপ্তি-সংবিত্তি মাত্র।

চক্ষুর ভিতর অক্ষিপট্টে যে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, তাহা আমরা দেখিতে পাই না; আমরা যাহা দেখি, তাহা বহির্দেশের বস্তু মাত্র।

অক্ষিপ্রতিবিম্বের বাহ্য প্রক্ষেপণ। আত্মচাক্ষুষ ছায়া।

চক্ষু-প্রতিবিম্ব সহজেই ইহার স্বাভাবিক উৎপত্তিস্থলে বিক্ষিপ্ত হয়, অর্থাৎ বহির্দেশের যে বস্তু হইতে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়,

সেই বস্তুতেই ইহা প্রক্ষিপ্ত হয়। অক্ষিপটের প্রতিবিম্ব বহির্দেশে প্রকটিত হওয়া অক্ষিপটের নৈসর্গিক গুণ মাত্র। তোমার চক্ষুর্দ্বয় প্রায় নিমীলিত করিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইবে। যাহাকে স্ফুলিঙ্গ বলিতেছি—বাস্তবিক তাহা স্ফুলিঙ্গ নহে। তাহা ছায়া বা প্রতিবিম্ব মাত্র। চক্ষুর মধ্যস্থ মসৃণরসে যে সকল কণিকা ভাসিতেছে, অক্ষিপটে তাহাদের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া বহির্দেশে দৃষ্ট হইতেছে। অন্ধকার গৃহে দাঁড়াইয়া বাম চক্ষুটি মুদ্রিত কর। পরে একটি বাতি জ্বালিয়া দক্ষিণ চক্ষুর পার্শ্বে কিন্তু অতি নিকটে ধরিয়া আস্তে আস্তে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তাকার করিয়া এবং সামান্য অগ্র পশ্চাৎ করিয়া ঘুরাইতে থাক—দেখিবে যে তোমার সম্মুখে একটি গোলাকার চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। এই চিত্রটি জালের ন্যায়। ইহা অক্ষিপটের মধ্যস্থ রক্তবহা শিরা সমূহের চিত্র। অক্ষিপটে প্রতিবিম্বিত শিরাসমূহের ছায়া বহির্দেশে দৃষ্ট হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে অক্ষিপটের প্রতিবিম্ব বহির্দেশে স্বতঃই প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

বিপর্য্যস্ত প্রতিবিম্ব।

দৃষ্ট বস্তু হইতে কিরণ সকল চক্ষুস্থিত মধ্যবিন্দু বা পাতস্থান অতিক্রম করিয়া অক্ষিপটে পতিত হয়। সুতরাং অক্ষিপটে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় অর্থাৎ উল্টা হইয়া যায়। উপরের দিক নীচে যায় এবং নীচের দিক উপরে যায়। কিন্তু দৃষ্ট বস্তু যদি চক্ষুর সন্নিকটস্থ হয়, তাহা হইলে অক্ষিপটে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব বিপর্য্যস্ত হইতে পারে না। একটি পিন লইয়া একখানি পোষ্টকার্ডে একটি ছিদ্র কর। পোষ্টকার্ডখানি চক্ষুর নিকটে রাখিয়া ঐ ছিদ্র দিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। পরে পিনটির মস্তকের দিকটি উপরে রাখিয়া নীচের দিকটি ধরিয়া কণীনিকার অতি নিকটে রাখিয়া পোষ্টকার্ডের ছিদ্র দিয়া দেখিতে চেষ্টা কর, দেখিবে যে,

পোষ্টকার্ডের অপর পার্শ্বে পিনটির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে এবং ঐ প্রতিবিম্বটি বিপর্য্যস্ত। আবার যদি পোষ্টকার্ডখানিতে ৫।৬টি ছিদ্র করিয়া ঐ প্রকারে একটি পিন রাখিয়া দেখ তাহা হইলে ৫।৬টি বিপর্য্যস্ত প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে দৃষ্ট বস্তু কণীনিকার অতি নিকটবর্ত্তী হইলে অক্ষিপটে তদ্বস্তুর বিপর্য্যস্ত প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। অক্ষিপটে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব যখন বিপর্য্যস্ত তখন বাহ্যবস্তুগুলি কেন বিপর্য্যস্তভাবে দৃষ্ট হয় না? আমরা যাহা দেখি তাহা বাহ্যবস্তুও নহে এবং তদ্বস্তু প্রতিফলিত প্রতিবিম্বও নহে কিন্তু সেই প্রতিবিম্ব হইতে মনের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটে আমরা সেই পরিবর্ত্তনই লক্ষ্য করি মাত্র। বাহিরের বস্তুগুলি যে সহজভাবে দৃষ্ট হয় ইহা কেবল আমাদের আজন্মলব্ধ অভ্যাস এবং শিক্ষার ফল। তুমি তোমার চোখে একখানি চশমা লাগাও। এ চশমার পাথরের এমনি গুণ যে ইহার ভিতর দিয়া যাহাই দেখিবে তাহাই উল্টা দেখাইবে। তুমি মাসাবধি এই চশমা চোখ হইতে নামাইতে পাইবে না। তোমার নিকট এখন সকল জিনিষই বিপর্য্যস্ত দেখাইবে। এখন তোমার হাত পা ও গতির সাহায্যে বস্তুসকলকে স্পর্শ করিয়া তাহাদের অবস্থান নির্ণয় করিয়া তোমাকে তোমার দৈনন্দিন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। এইরূপ কিছুদিন করিতে করিতে তোমার এমন অভ্যাস হইয়া যাইবে যে বস্তুগুলি আর তোমার নিকট বিপর্য্যস্ত বোধ হইবে না। এখন তাহারা সহজ বলিয়া দৃষ্ট হইবে।

দীপ্তি-বৈষম্য।

দুইখানি চতুষ্কোণ কাগজ লও—একখানি কাল এবং আর একখানি সাদা। এই কাগজ দুইখানি আর একখানি বড় কাগজের উপর পাশাপাশি রাখ। এই কাগজ দুইখানির মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য হইবে। এক্ষণে

এই দুইখানি কাগজের উপর একটি করিয়া ধূসরবর্ণের দণ্ড স্থাপন কর। পরে একখানি শ্বেত স্বচ্ছ পাতলা কাগজ লইয়া উহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেল। এইবার এই স্বচ্ছ কাগজের ভিতর দিয়া ধূসরবর্ণের দণ্ডদ্বয়ের দীপ্তির তারতম্য লক্ষ্য কর। যদিও এই দণ্ডদ্বয়ের দীপ্তি প্রকৃতপক্ষে এক, তথাপি পটভূমির পার্থক্য হেতু দীপ্তির পার্থক্য অনুভূত হইতেছে—একটি গাঢ় আর একটি পাতলা বলিয়া বোধ হইতেছে।

বর্ণ-বৈষম্য।

তোমার টেবিলখানি একখানি খুব সাদা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া ফেল। টেবিলের উপর তোমার কলমটি—কোনপ্রকারে সোজাভাবে দাঁড় করাইয়া রাখ। গৃহের সমস্ত দরজা-জানালার পর্দ্দাগুলি ফেলিয়া দাও; কেবল একটি দরজা অল্পমাত্র খুলিয়া রাখ। দেখিবে যে, কলমটির ছায়া টেবিলের উপর পতিত হইয়াছে। শ্বেত সূর্য্যালোক এই ছায়াটির কারণ। এক্ষণে একটি বাতি জ্বালিয়া এমন জায়গায় ধর—যাহাতে ঐ কলমের আর একটি ছায়া ঐ টেবিলের উপর পতিত হইতে পারে। এইবার এই ছায়াদ্বয়ের বর্ণ-বৈষম্য লক্ষ্য কর। একটি ছায়া শ্বেত দিবালোক সমুদ্ভূত, এবং আর একটি ছায়া কৃত্রিম পীত আলোক সমুদ্ভূত। দেখিবে যে, কৃত্রিম আলোকসমুৎপন্ন ছায়ার বর্ণ নীল দেখাইতেছে—যদিও প্রকৃতপক্ষে ইহা ধূসর। পারিপার্শ্বিক বর্ণ সহবাসে ইহা নীলবর্ণ দেখাইতেছে। এক বর্ণের সহবাসে অপর বর্ণের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

বর্ণের উপর বর্ণের ক্রিয়া।

একখানি চতুষ্কোণ সবুজরঙের এবং আর একখানি চতুষ্কোণ ধূসরবর্ণের কাগজ লইয়া শ্বেতপটভূমির উপর স্থাপন কর। উহাদের উপর ফিকে সবুজরঙের দুইটি দণ্ড রাখিয়া স্বচ্ছ শ্বেত কাগজ দিয়া আচ্ছাদন কর। এক্ষণে ফিকে সবুজের উপর গাঢ় সবুজের ক্রিয়া লক্ষ্য কর। আবার,

একটি সবুজরঙের দণ্ড লইয়া একখানি লাল কাগজের উপর, এবং আর একটি ঐ বর্ণের দণ্ড লইয়া আর একখানি ধূসরবর্ণের কাগজের উপর রাখিয়া শ্বেত স্বচ্ছ কাগজ লইয়া আচ্ছাদন করিয়া দাও। এক্ষণে সবুজরঙের উপর লালরঙের ক্রিয়া লক্ষ্য কর। আবার দুইখানি সবুজ-রঙের দণ্ড লও। একটি পীতবর্ণের কাগজের উপর এবং আর একটি নীলবর্ণের কাগজের উপর রাখিয়া শ্বেত স্বচ্ছ কাগজ দিয়া আচ্ছাদন করিয়া ফেল। এক্ষণে দণ্ডদ্বয়ের বর্ণবিপর্য্যয় লক্ষ্য কর। সবুজরঙের কাগজখণ্ডের উপরিস্থিত দণ্ডটি বর্ণহীন দেখাইতেছে, কিন্তু লালবর্ণ কাগজখণ্ডের উপরিস্থিত দণ্ডটির বর্ণ আরও গাঢ় দেখাইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দণ্ডদ্বয়ের বর্ণ এক। পীতবর্ণের কাগজখণ্ডটির উপর সবুজ দণ্ডটি নীলাভ সবুজ দেখাইতেছে এবং নীলবর্ণ কাগজখণ্ডটির উপর সবুজ দণ্ডটি পীতাভ সবুজ দেখাইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কোন বর্ণের সহবাসে কোন বর্ণের লোপ হইতেছে; কোন বর্ণের সহবাসে কোন বর্ণের বৃদ্ধি হইতেছে; আবার পরস্পর সহবাসে পরস্পরের বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। যদি লাল এবং সবুজ আলো, অথবা পীত এবং নীল আলো অক্ষিপটের একই স্থানে পতিত হয়, তাহা হইলে উহাদের পরস্পরের বর্ণ লোপ পায়। এক বর্ণ আর এক বর্ণের নাশ করে। অবশেষে যাহা থাকে তাহা ধূসর-সংবিত্তি মাত্র। রাসায়নিক সংযোজন এবং রাসায়নিক বিয়োজন এই দুইটি বিরুদ্ধ প্রক্রিয়া; সুতরাং একটি আর একটিকে সংহার করে।

যদি আমাদের দুইটি চক্ষু না থাকিয়া মাত্র একটি চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে আমরা আংশিকরূপে অন্ধ হইতাম; কারণ, আমাদের অক্ষিপটের

"অন্ধবিন্দু" কাহাকে বলে।

কিয়দংশ আলোক গ্রহণে একেবারে অক্ষম। একটি পেনশিলের উপর একটি পয়সা রাখিয়া

নিশ্চল ভাবে ধরিয়া রাখ; পরে আর একজনকে এক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ দূর হইতে আসিয়া ক্ষণমাত্র অবসর না লইয়া, কেবল একটি অঙ্গুলির সাহায্যে পয়সাটি ফেলিয়া দিতে বল; দেখিবে সে অপারগ হইবে—পয়সাটির ঠিক স্থান নির্ণয়ে অসমর্থ হইবে।



বাম চক্ষুটি বন্ধ করিয়া এই চিত্রখানি তোমার চক্ষুর সম্মুখে ধর। এক্ষণে দক্ষিণ চক্ষুর সাহায্যে একদৃষ্টে, নির্ণিমেষ লোচনে + চিহ্নটির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এখন তুমি তোমার চক্ষুকে সর্ব্বতোভাবে নিশ্চল রাখিয়া অপর তিনটি চিহ্ন দেখিতে পাইতেছ। এখন চিত্রখানি তোমার চক্ষুর ঠিক সম্মুখে রাখিয়া চক্ষুর নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে দূরে সরাইয়া লও। যখন তোমার চক্ষু এবং চিত্রের মধ্যে আন্দাজ ৭ ইঞ্চি ব্যবধান হইবে, তখন দেখিবে যে, চতুষ্কোণ চিহ্নটি অন্তর্হিত হইয়াছে,—যদিও ত্রিকোণ এবং গোলাকার চিহ্নটি বর্ত্তমান রহিয়াছে। চিত্রখানি তোমার চক্ষুর নিকট হইতে আরও দূরে লইয়া যাও। যখন উহাদের মধ্যে ব্যবধান আন্দাজ ১১ ইঞ্চি হইবে তখন দেখিবে যে, ত্রিকোণ চিহ্নটি অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু অপর দুইটি বর্ত্তমান। চিত্রখানি আরও আন্দাজ ১৬ ইঞ্চি তফাতে লইয়া যাও; দেখিবে যে, গোলাকার চিহ্নটি অন্তর্হিত হইয়াছে,—যদিও অপর দুইটি বর্ত্তমান। যদি তুমি তোমার চক্ষু নিশ্চল রাখিতে না পার, যদি তোমার দৃষ্টি + চিহ্নতে একেবারে আবদ্ধ না থাকে, এবং চিত্রখানি যদি একেবারে সোজা ভাবে না ধরা হয়, তাহা হইলে তোমার পরীক্ষাকার্য্য সফল হইবে না। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে

যে, অক্ষিপট্টের সকল অংশেরই দৃষ্টি-শক্তি নাই—ইহার কিয়দংশ অন্ধ। এই অংশকে অন্ধবিন্দু বলা হয়।

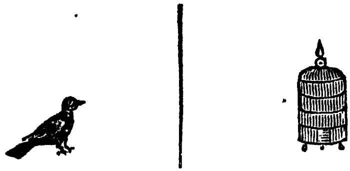
দৃষ্টি-ক্ষেত্র।

এই পুস্তকের যে কোন অক্ষরে তোমার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর; দেখিবে, সেই অক্ষরটি তোমার নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে; কিন্তু কিয়দ্দূর ব্যাপিয়া উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অক্ষরগুলিও তোমার দৃষ্টির অন্তর্গত এবং তদতিরিক্ত অক্ষরগুলি তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত। অতএব দৃষ্টির সীমা আছে—কিয়দংশ দৃষ্টির অন্তর্গত; আবার কিয়দংশ দৃষ্টির বহির্ভূত। যাহা এককালে দৃষ্টির অন্তর্গত, তাহাকেই দৃষ্টিক্ষেত্র বলা হয়।

দ্বৈনেত্রিক-দর্শন।

সচরাচর আমরা দুইটি চক্ষুর সাহায্যেই দেখিয়া থাকি। এক-চক্ষু-লব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা দুই-চক্ষু-লব্ধ জ্ঞান জটিল। ঠিক তোমার নাসিকার সম্মুখে একখানি কার্ড সোজা ভাবে ধর। ইহার কিনারা তোমার নাসিকার দিকে থাকিবে। নাসিকা এবং কার্ডের ব্যবধান আন্দাজ ১ ফুট মাত্র রাখিতে হইবে। এক্ষণে, প্রথমতঃ একচক্ষু দ্বারা, পরে দুই চক্ষুর দ্বারা এই কার্ডের প্রতি লক্ষ্য কর। এক-চক্ষুদৃষ্ট কার্ডের প্রতিবিম্ব, দুই-চক্ষু-দৃষ্ট প্রতিবিম্ব হইতে পৃথক্ প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুরই জ্ঞান তদ্বস্তুর দুইটি প্রতিবিম্বের সমন্বয়। দুই চক্ষুর সাহায্যে আমরা যাহা দেখি, তাহা দুই-চক্ষু-লব্ধ দুইটি প্রতিকৃতির সমন্বয় মাত্র। তোমার চক্ষুর তারাদ্বয়ের ব্যবধান মাপিয়া লইয়া, একখণ্ড কাগজের উপর ঐ ব্যবধানানুযায়ী দুইটি বিন্দুপাত কর। পরে চক্ষুর্দ্বয় বিন্দুদ্বয়ের উপর ন্যস্ত করিয়া একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ ব্যাপিয়া দেখিতে থাকিলে দেখিতে পাইবে, কি প্রকারে বিন্দুদ্বয়ের উপর চক্ষুর্দ্বয়ের ক্রিয়া হইতেছে। আবার, একই সরল রেখার উপর দুইটি পেনসিল সোজাসুজি ভাবে

রাখ। পেনসিলদ্বয়ের ব্যবধান ৫ ইঞ্চি হইবে। প্রথমতঃ দূরবর্ত্তী পেনসিলটির উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর; দেখিবে, নিকটবর্ত্তী পেনসিলটি দুইটি পেনসিল বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তৎপরে নিকটবর্ত্তী পেনসিলটির উপর দৃষ্টিপাত কর; তখন দূরবর্ত্তী পেনসিলটি দুইটি বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এই প্রতিকৃতিদ্বয়ের কোন্‌টি বাম চক্ষুর এবং কোন্‌টি অপর চক্ষুর, তাহা সহজেই স্থির করা যায়। প্রথমে একচক্ষু পরে আর এক চক্ষু বন্ধ করিয়া লক্ষ্য করিলে সহজেই ইহা নির্ণয় করা যায়। তোমার



নাসিকায় সংলগ্ন করিয়া এক খানি কার্ড (চিত্রে প্রদর্শিত) পক্ষী এবং পিঞ্জরের মধ্য-স্থলে রেখাটির উপর ধরিয়া বাম চক্ষুর সাহায্যে পক্ষীটি এবং দক্ষিণ চক্ষুর সাহায্যে পিঞ্জরটি স্থিরভাবে নিরীক্ষণ কর। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিবে যে, পক্ষীটি আস্তে-আস্তে অগ্রসর হইয়া পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিবে। এক্ষণে তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহা দুইটি প্রতিকৃতির সমন্বয় মাত্র।

বর্ণ-বৈচিত্র্য।

সূর্য্য-কিরণে একটুক্‌রা শ্বেতবর্ণের কাগজের বর্ণ পর্য্যবেক্ষণ কর। পরে ঐ কাগজের উপর একখানি স্বচ্ছ স্ফটিক ধর; দেখিবে যে, কাগজের উপর আকাশধনুর রং প্রতিফলিত হইয়াছে। কাগজটির উপর আলোকের যাবতীয় রশ্মি প্রতিফলিত হইতেছে বলিয়া কাগজটির বর্ণ সাদা দেখাইতেছে; পরে যখন উহার উপর স্বচ্ছ স্ফটিক ধরা হইতেছে, তখন আলোকরশ্মিগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে বলিয়া কাগজের উপর বহুবর্ণের সমাবেশ দেখা যাইতেছে। ইথর-তরঙ্গের কম্পন হইতে বর্ণ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি; যথা—

লোহিত—	৪৫০,০০০০০০০০০০০০	বার	প্রতি	সেকেণ্ডে কম্পন
পাটল—	৮০০,০০০০০০০০০০০০	"	"	"
পীত—	৫২৬,০০০০০০০০০০০০	"	"	"
সবুজ—	৫৮৯,০০০০০০০০০০০০	"	"	"
নীল—	৬৪১,০০০০০০০০০০০০	"	"	"

লোহিত, পাটল এবং নীল এই তিনটি বর্ণকে সাধারণতঃ মুখ্য বর্ণ বলা হয়। এই বর্ণত্রয়ের সংমিশ্রণে নানাবর্ণের উৎপত্তি হয়। কৃত্রিম উপায়েও আলোক-সংবিত্তি সম্ভব। চক্ষুর ভিতর দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চালনা করিলে, কিংবা মুদ্রিত চক্ষুর উপর অঙ্গুলির চাপ দিলে অথবা মস্তকে সজোরে আঘাত করিলে আলোক দেখিতে পাওয়া যায়।

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা বিবিধ বর্ণের পার্থক্য লক্ষ্য করিতে পারে না। এরূপ লোককে বর্ণান্ধ বলিতে পারা যায়। মনুষ্যের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪ জন লোক বর্ণান্ধ।

বর্ণান্ধতা।

অনেকেই লাল রং দেখিতে পায় না; তাহাদের নিকট লাল রং সবুজ বলিয়া মনে হয়। ইহারা লাল এবং সবুজের পার্থক্য লক্ষ্য করিতে পারে না। আবার এমন অনেক লোক আছে, যাহারা সবুজ-বর্ণ দেখিতে পায় না। ইহারা সবুজকে লাল বুঝিয়া ভুল করিয়া থাকে।

অক্ষিপট্টের তিনটি দেশ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যথা—

অক্ষিপট্ট দেশ ও বর্ণক্ষেত্র-পরিধি।

(ক) কেন্দ্রদেশ।
(খ) মধ্যদেশ।
(গ) বহির্দ্দেশ।

কেন্দ্রদেশে সকল প্রকার বর্ণ ও দীপ্তি পরিলক্ষিত হয়। মধ্যদেশে নীল এবং পীতবর্ণ এবং এতদুভয়োৎপন্ন অপরাপর বর্ণ দৃষ্ট হয়। বহির্দ্দেশে

সকল দ্রব্যই ধূসর বলিয়া বোধ হয়। এই দেশত্রয়ের পরিধি চিরনির্দ্দিষ্ট নহে। নিম্নলিখিত কারণে এই পরিধির হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে। (ক) বর্ণের দীপ্তি যত বেশী হইবে উহার ক্ষেত্রও ততই বড় হইবে। (খ) বর্ণের আয়তন যেমন বৃদ্ধি হয় ইহার ক্ষেত্রও তেমনি বৃদ্ধি হয়। (গ) মিশ্র বর্ণের সময় বর্ণ ও পটভূমির বর্ণের বৈপরীত্য যত অধিক হইবে দৃষ্টিক্ষেত্রের পরিধিও তত অধিক হইবে। (ঘ) বর্ণ যে পরিমাণে অমিশ্র হয় ইহার পরিধিও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। (ঙ) অক্ষিপটের ক্লান্তি এবং গ্রাহিণীশক্তির তারতম্য অনুসারেও ক্ষেত্রের পরিধির তারতম্য হইয়া থাকে। (চ) চেষ্টা এবং অভ্যাসের বলে বর্ণক্ষেত্রের পরিধি বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। (ছ) বয়সের ভেদ অনুসারেও বর্ণক্ষেত্রের ভেদ হইয়া থাকে। দশ বৎসর বয়সের বালকের বর্ণক্ষেত্র আর বিশ বৎসর বয়সের লোকের বর্ণক্ষেত্র এক নহে। (জ) ব্যাধি এবং বর্ণান্ধতা হইতেও বর্ণক্ষেত্রের পরিধি সংযমিত হয়।

তোমার বাম হস্তের তর্জ্জনী বাম চক্ষুর এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দক্ষিণ চক্ষুর সম্মুখে সোজা ভাবে রাখ। তর্জ্জনীদ্বয়ের ব্যবধান ৪ কিংবা ৫ ইঞ্চির অধিক হইবে না। অঙ্গুলিদ্বয়ের ব্যবধানের ভিতর দিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর। চারিটি প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে। অঙ্গুলিদ্বয়কে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী কর দেখিবে যে, মধ্য প্রতিবিম্ব দুইটি মিলিয়া এক হইয়াছে এবং এই মিলিত প্রতিবিম্বটি পার্শ্ব প্রতিবিম্বদ্বয় অপেক্ষা স্পষ্ট এবং স্বাভাবিক।

দ্বৈনেত্রিক প্রতিবিম্ব বিদ্রাবণ।

তোমার চক্ষুর সম্মুখে একটি কম্পাস ধর। ইহার বাহুদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকিবে এবং বাহুদ্বয়ের প্রান্ত বিন্দুদ্বয় ঊর্দ্ধ দিকে থাকিবে। কম্পাসটি চক্ষুর্দ্বয় হইতে ৪।৫ ইঞ্চি তফাতে থাকিবে। বিন্দুদ্বয় চক্ষুর্দ্বয়ের সম্মুখে থাকিবে।

দ্বৈনেত্রিক কেন্দ্র দূরত্ব।

এক্ষণে কম্পাসের বাহুদ্বয়ের ব্যবধানের ভিতর দিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর। দুইটি বিন্দু চারিটি বিন্দুতে পরিণত হইবে। বাহুদ্বয়ের ব্যবধান ক্রমে ক্রমে কমাইতে থাক। যখন দেখিবে চারিটি বিন্দুর দুইটি বিন্দু মিলিয়া এক বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে তখন বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব মাপ কর। কম্পাসের বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে যে ব্যবধান দেখিতে পাইতেছ, তোমার চক্ষুর কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেও প্রায় সেই ব্যবধান বর্ত্তমান। যখন আমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখন দর্শন রেখাগুলি সমান্তরাল কিন্তু নিকটস্থ দ্রব্য দেখিবার সময় কিঞ্চিৎ কেন্দ্রাভিমুখীন হইয়া থাকে।

অনুযায়ী নেত্রবিন্দু।

একখানি কাগজে পেনসিলের অগ্রভাগের দ্বারা দুইটি ছিদ্র কর। ছিদ্র দুইটির মধ্যে যে ব্যবধান থাকিবে তাহা দ্বৈনেত্রিক কেন্দ্রদূরত্বের সমান হইবে। তোমার ললাটের সম্মুখে কাগজখানি ধর। একটি ছিদ্র বাম চক্ষুর সম্মুখে এবং আর একটি ছিদ্র দক্ষিণ চক্ষুর সম্মুখে থাকিবে। ছিদ্রদ্বয়ের ভিতর দিয়া একটি দূরের জিনিষে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। দুইটি ছিদ্র একটি ছিদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে ছিদ্র-দ্বয়ের মধ্যস্থ ব্যবধানের হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া কয়েক বার পরীক্ষা করিলেই কৃতকার্য্য হইবে। নেত্রদ্বয়ের অনুযায়ী বিন্দুদ্বয় হইতে উৎপন্ন প্রতিবিম্ব-দ্বয় মিলিত হইয়া একটি প্রতিবিম্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

দ্বৈনেত্রিক দর্শন রেখা।

দ্বৈনেত্রিক কেন্দ্র-দূরত্ব রেখাকে সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া যে রেখা টানা যায় তাহাকেই দ্বৈনেত্রিক দর্শন রেখা বলে। কাগজের ছিদ্র দুইটি যে স্থানে মিলিয়া এক হইতেছে সেই স্থানটি দ্বৈনেত্রিক কেন্দ্র-দূরত্ব রেখার মধ্যভাগ। সম্মুখে আয়নাখানি ধরিয়া তোমার চক্ষুর প্রতিবিম্ব দেখ। চক্ষুর্দ্বয় সমান্তরাল

রাখিয়া আস্তে আস্তে আয়নাখানি তোমার দিকে লইয়া আইস। যখন আয়নাখানি তোমার নাসিকা এবং ললাট স্পর্শ করিবে, তখন তুমি দুইটি চক্ষুর পরিবর্ত্তে একটি চক্ষু দেখিবে এবং ইহা আকারে বড় দেখাইবে। দ্বৈনেত্রিক দর্শনরেখার উপর এই মিলিত চক্ষু দৃষ্ট হয়। একখানি এক হস্ত পরিমিত লম্বা কাগজ লও। পেনসিলের অগ্রভাগের দ্বারা উহাতে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র কর। কাগজখানি চক্ষুর্দ্বয়ের নিকটে ধর। ছিদ্রটি দক্ষিণ চক্ষুর সম্মুখে থাকিবে, যেন ইহার ভিতর দিয়া আলোক দৃষ্ট হয়। চক্ষুর্দ্বয় সমান্তরাল এবং নিশ্চল রাখ। যেন কাগজের ভিতর দিয়া আকাশের দিকে তাকাইতেছ। এক্ষণে কাগজখানি আস্তে আস্তে তোমার বাম দিকে টানিয়া লও। ছিদ্রটি প্রথমে দক্ষিণ চক্ষু পরে বাম চক্ষুর উপর দিয়া চলিয়া যাইবে। ছিদ্রটি প্রথমে দর্শনরেখার দক্ষিণে দৃষ্ট হইবে। পরে দর্শনরেখা অতিক্রম করিয়া বাম দিকে আসিয়া অদৃশ্য হইবে। আবার পরক্ষণেই দ্বিতীয় ছিদ্রের উদয় হইবে। ইহার গতিও পূর্ব্ব ছিদ্রের ন্যায়।

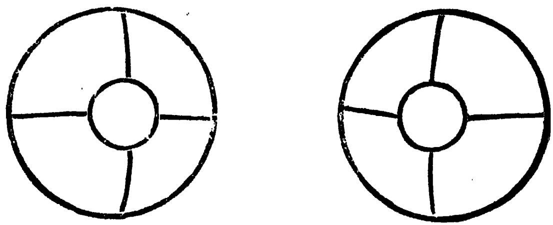
দ্বৈনেত্রিক সংঘর্ষ।

দুই চক্ষুর দুইটি বিসদৃশ প্রতিবিম্বের সমন্বয়কে দ্বৈনেত্রিক সংঘর্ষ বলা হয়। তোমার দক্ষিণ চক্ষুর সম্মুখে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীটি ধর। বামচক্ষুর সম্মুখে বামহস্তের করতলটি ধর। করতল এবং তর্জ্জনীর ব্যবধানের ভিতর দিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। এক্ষণে দেখিবে যে তর্জ্জনীটি করতলের উপর ন্যস্ত। একখানি চিঠির কাগজ পাকাইয়া একটি নল প্রস্তুত কর। এই নলটির ব্যাস কিঞ্চিন্ন্যূন এক ইঞ্চি হইবে। এই নলটি দক্ষিণ চক্ষুর উপর স্থাপন কর। বাম হস্তের করতল বাম চক্ষুর সম্মুখে ধর। এক্ষণে একই সময়ে করতলে এবং নলের ভিতর দিয়া আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। দেখিবে যে, তোমার করতলে একটি পরিষ্কার ছিদ্র হইয়াছে এবং যাহা

দেখিতেছ তাহা কেবল তোমার করতলস্থ গোলাকার ছিদ্র দিয়াই দেখিতেছ।

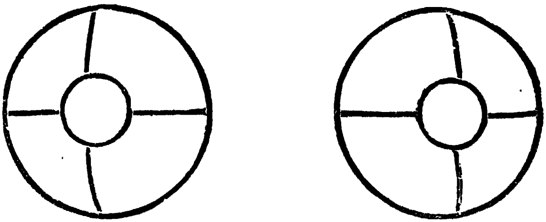
দ্বৈনেত্রিক বস্তু প্রত্যক্ষ।

দুই-চক্ষু-লব্ধ দুইটি বিসদৃশ প্রতিবিম্বের সমন্বয়ে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ-বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হয়। দুই চক্ষুদ্বারা এই দুইটি চিত্রের প্রতি অনিমেষ-লোচনে এমন ভাবে তাকাইতে থাকে যেন, ক্রমে ক্রমে একটি চিত্রের ক্ষুদ্র বৃত্তটি আর একটি চিত্রের ক্ষুদ্র বৃত্তের উপর, এবং একটির বৃহৎ বৃত্তটি একটির বৃহৎ বৃত্তের উপর আসিয়া মিশিয়া যায়। যখন প্রথমে এই চিত্র



দুইটি দেখিবে তখন চারিটি প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে। পরে দুইটি প্রতিবিম্ব মিশিয়া একটি প্রতিবিম্বে পরিণত হইবে। এক্ষণে তিনটি প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে। মধ্য প্রতিবিম্বটি দুইটি প্রতিবিম্বের সমন্বয়। ইহা অপর দুইটি অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট। ইহা দেখিয়া এখন বোধ হইবে যেন একটি লম্বা গেলাস উপুড় করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে এবং বেধ আছে। ক্ষুদ্র বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্র দ্বয়, বৃহৎ বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্রদ্বয় অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্ত্তী সুতরাং ক্ষুদ্র বৃত্তদ্বয়কে মিলিত করিতে যে পরিমাণে চক্ষুর্দ্বয়কে কেন্দ্রাভিমুখীন করিতে হয়, বৃহৎ বৃত্তদ্বয়কে মিলিত করিতে চক্ষুর্দ্বয়কে সেই পরিমাণে কেন্দ্রাভি-[মুখী]ন করিতে হয় না। চক্ষুর্দ্বয় অধিক কেন্দ্রাভিমুখী বলিয়া মিলিত

ক্ষুদ্র বৃত্তটি নিকটে এবং চক্ষুর্দ্বয় অল্প কেন্দ্রাভিমুখী বলিয়া মিলিত বৃহৎ বৃত্তটি দূরে বোধ হইতেছে। মিলিত ক্ষুদ্র বৃত্তটি নিকটে এবং মিলিত বৃহৎ বৃত্তটি দূরে বোধ হওয়ায় এই প্রতিবিম্বটি একটী ত্র্যবয়বী পদার্থের আকার ধারণ করিতেছে।



আবার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এই চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এখানে বৃহৎ বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্রদ্বয়, ক্ষুদ্র বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্রদ্বয় অপেক্ষা অধিক নিকট-বর্ত্তী, সুতরাং সম্মিলিত বৃহৎ বৃত্তটি, সম্মিলিত ক্ষুদ্র বৃত্ত অপেক্ষা অধিক নিকটবর্ত্তী। সুতরাং এখানে গেলাসটি উল্টা দেখাইতেছে। পূর্ব্ব চিত্রে গেলাসটির বহির্ভাগ দেখা যাইতেছিল, আর এক্ষণে উহার ভিতরের দিক দেখা যাইতেছে।

দৈহিক-বিকিরণ।

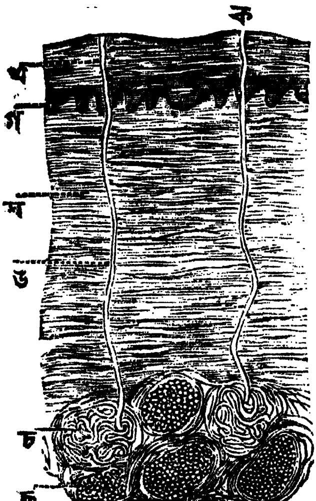
দুইটি সমান চতুষ্কোণ কাগজ লও। একটির বর্ণ কাল, আর একটির বর্ণ সাদা। কাল কাগজখানি একখানি সাদা কাগজের উপর, আর সাদা কাগজখানি একখানি কাল কাগজের উপর লাগাইয়া দাও। কাগজ দুইখানি পাশা-পাশি রাখ। এক্ষণে চতুষ্কোণ দুইটির তারতম্য লক্ষ্য কর। কালটি অপেক্ষা সাদাটি বড় দেখাইবে। কাল চতুষ্কোণটির উপর যতগুলি আলোক-রশ্মি পতিত হইতেছে—তাহাদের প্রায় সমস্তই ইহা শোষণ করিয়া লইতেছে—অল্পমাত্র রশ্মি স্বচ্ছকাচপুটক পর্য্যন্ত পৌছিতেছে।

আর সাদা চতুষ্কোণটির উপর যতগুলি রশ্মি পতিত হইতেছে, তাহাদের প্রায় সকলগুলিই স্বচ্ছ-কাচ-পুটক পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছে। সুতরাং অক্ষি-পটের এক অংশ অপেক্ষা আর এক অংশ অধিক উদ্বুদ্ধ হইতেছে এবং অনুদ্বুদ্ধ দেশে আলোক-রশ্মি বিস্তৃত হইতেছে বলিয়া অক্ষিপটের দৈহিক ক্রিয়ারও ব্যাপ্তি হইতেছে।

একাদশ অধ্যায়

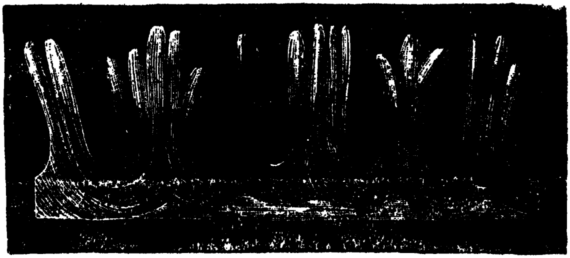
ত্বগিন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়।

খ—উপত্বক; ঘ—ত্বক; ছ—মেদকোষ; গ—বর্ণকোষ; চ—স্বেদ-গ্রন্থি; ঙ—ঘর্ম্মবহা প্রণালী। পার্শ্বের চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে চর্ম্মের গঠন প্রণালী কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। একখণ্ড চামড়া লইয়া তাহাকে কুড়ি গুণ বড় করিয়া দেখিলে যেমন দেখায়, এই চিত্রে সেইরূপ দেখাইতেছে। আমাদের দেহের উপরের আব-রণের দুইটি স্তর আছে। উপরের স্তরটিকে উপত্বক্ বলে। ইহা অতিশয় পাতলা। "নুনছাল" উঠিলে যাহা উঠিয়া যায় বা ফোস্কা



ত্বগিন্দ্রিয়ের গঠন

পড়িলে যাহা ফুলিয়া উঠে তাহা উপত্বক্। ইহা অতিশয় পাতলা। ইহাতে স্নায়ু বা রক্তবহা নালী নাই। উপত্বকের নীচের স্তরকে ত্বক্ বলা হয়। ইহাই প্রকৃত ত্বক্। ইহা স্নায়ু এবং রক্তকোষে পূর্ণ। ত্বক্ এবং উপত্বকের মধ্যবর্ত্তী অংশকে বর্ণকোষ বলে। প্রকৃত ত্বক্‌টি একটি সমতল স্তর নহে। ইহার উপরিভাগ অসংখ্য কাঁটার ন্যায় উঁচু উঁচু



হইয়া রহিয়াছে। এই উচ্চ অংশগুলিকে উন্নয়ন বলে। উন্নয়নগুলি সংবিদ্-স্নায়ু-সংযুক্ত। উপত্বকের চাপে উন্নয়নগুলি নমিত হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে স্নায়ুপ্রান্ত অভিভূত হইলে স্পর্শ-সংবিত্তির সৃষ্টি হয়। যে স্থানে স্পর্শ-সংবিত্তি অধিক, সেই স্থানের উন্নয়নগুলিতে একপ্রকার ডিম্বাকৃতি কোষ দেখা যায়। এই কোষকে ত্বকানুকোষ বলে। অঙ্গুলি ও জিহ্বার অগ্রভাগে এবং হাতের তালুতে স্পর্শ-সংবিত্তি অধিক।

ত্বগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে আমাদের ত্বগিন্দ্রিয়ই সর্ব্বাঙ্গব্যাপী। ইহা আমাদের শরীরাবয়বের কোন বিশেষ অংশে অধিষ্ঠিত নহে। ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের স্পর্শ-সংবিত্তি হইয়া থাকে। স্পর্শ-সংবিত্তি সকলেরই সমানভাবে থাকে না। কাহার-কাহারও এই শক্তির এত অধিক উৎকর্ষ হইয়া থাকে যে, ত্বকের সহিত কোন বস্তুর সংস্পর্শ হইবার পূর্ব্বেই

উহারা তাহার স্পর্শজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ত্বগিন্দ্রিয় সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপী হইলেও সকল অঙ্গেই সমানভাবে স্পর্শানুভূতি হয় না। কোন অঙ্গের স্পর্শশক্তি অধিক এবং কোন অঙ্গের স্পর্শশক্তি কম। কোন্ অঙ্গের কি প্রকার স্পর্শশক্তি, তাহা সহজেই প্রমাণ করিতে পারা যায়। একটি কম্পাস লও। উহার বাহুদ্বয় অধিক পরিমাণে পৃথক্ করিয়া কাহারও পৃষ্ঠদেশের কোন অংশে স্থাপন কর। দেখিবে, সে দুইটি বিন্দুর স্পর্শ অনুভব করিতেছে। পরে বাহুদ্বয়ের ব্যবধান কমাইয়া সেই স্থানে স্থাপন কর। এইরূপে ক্রমশঃ ব্যবধান কমাইতে থাক; পরে দেখিবে যে বাহুদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও লোকটির কেবল একটি বিন্দুরই স্পর্শজ্ঞান হইতেছে—দুইটি বিন্দুর স্পর্শজ্ঞান হইতেছে না। শরীরাবয়বের স্থানভেদে এই ব্যবধানের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অপেক্ষা চক্ষুহীন ব্যক্তির স্পর্শ-শক্তি অধিক। অন্ধ ব্যক্তির চক্ষুর কাজ অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ত্বগিন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ই অন্ধ ব্যক্তির বিশেষ সহায়। অন্ধ ব্যক্তির স্পর্শ-শক্তি স্বভাবতঃই অধিক নহে; কিন্তু উহারা অধিক পরিমাণে ঐ শক্তির উপর নির্ভর করে বলিয়া ঐ শক্তি বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ করে।

স্থানিক-সংবিত্তি।

আমার শরীরের যে কোন স্থান স্পর্শ কর; আমি চক্ষুর সাহায্য না লইয়াই সে স্থান নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইব। এই স্থান-নির্দ্দেশ-শক্তি অভ্যাস-প্রসূত; এবং এই অভ্যাস এত প্রবল হইতে পারে যে, কোন অঙ্গের অভাব হইলেও সে অঙ্গের সংবিত্তির অভাব হয় না। যাহাদের হাত বা পা কোন কারণবশতঃ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহারাও সময়ে-সময়ে হস্তে বা পদে যন্ত্রণা বা অন্য কোন পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়া থাকে। হস্ত

না থাকিলেও হস্তের স্থলবিশেষে যন্ত্রণার অনুভূতি হয় কেন? পূর্ব্বে কতকগুলি স্নায়ুসূত্র হস্তাবলম্বিত ছিল। হস্তের যে কোন স্থানে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে সে সংবাদ অন্তর্বাহী স্নায়ু কর্ত্তৃক মস্তিষ্কে আনীত হইত এবং সেই স্নায়ুবার্ত্তার উপর নির্ভর করিয়া মন বুঝিতে পারিত হস্তের কোন স্থানে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এখন ঐ হস্তাবলম্বি স্নায়ুসূত্রগুলির প্রান্তভাগে কোন প্রকার চাঞ্চল্য উৎপন্ন হইলেই মন স্বভাবতঃ হস্তেই সেই চাঞ্চল্যের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আমার শরীরের কোন্ স্থান স্পর্শ করিতেছ, তাহা নির্ণয় করিতে পারি সত্য; কিন্তু একেবারে ঠিক স্থানটি নির্দ্দেশ করা কঠিন। চক্ষু মুদ্রিত কর। পরে একটি পেনসিল লইয়া শরীরের যে কোন স্থানে একটি বিন্দু পাত কর। পেনসিলটি উঠাইয়া লও। পুনরায় পেনসিলটি সেই বিন্দুর ধারে রাখিতে চেষ্টা কর—দেখিবে তোমার চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিলে, আমাদের স্পর্শানুভূতি নির্ভুল হয় না; কিন্তু ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত গতীন্দ্রিয় সংমিলিত হইলে স্পর্শ সংবিত্তি অধিকতর স্পষ্ট হয়। পুস্তকের মলাটের উপর অঙ্গুলি স্থাপন কর, মলাটটি মসৃণ বলিয়া বোধ হইবে; কিন্তু যদি মলাটের উপর অঙ্গুলি ঘর্ষণ কর, দেখিবে ইহা তত মসৃণ নহে। কিংবা একখণ্ড কাচের উপর একগাছি চুল রাখিয়া, ২।৩ খানি কাগজ দিয়া চুলটি আচ্ছাদন কর। পরে ইহার উপর অঙ্গুলি স্থাপন কর, চুলের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু কাগজটির উপর অঙ্গুলি ঘর্ষণ কর, উহার অস্তিত্ব বোধ হইবে।

ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত গতীন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ।

স্পর্শ-সংবিত্তির একটি সীমা আছে—স্পর্শমাত্রেরই অনুভূতি হয় না। যে স্পর্শের শক্তি-প্রাচুর্য্য নিতান্ত কম, যে স্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে

স্পর্শ-সংবিত্তির সীমা।

আসিলেও ত্বগিন্দ্রিয়ের কোন প্রকার চাঞ্চল্য উৎপন্ন হয় না—সে স্পর্শে সংবিত্তিও হয় না। তোমার বাম হস্তের তালুর উপর দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলি অতি আস্তে-আস্তে বুলাইতে থাক। অঙ্গুলিটি অনবরত তালুর সংস্পর্শে থাকিবে, কিন্তু অঙ্গুলির উপর বিন্দুমাত্র চাপ দিবে না। দেখিবে, অঙ্গুলি তালু-সংস্পর্শে থাকিলেও সকল সময়েই স্পর্শানুভূতি হইতেছে না—মনে হইবে, যেন হাতের উপর দিয়া একটি মক্ষিকা বা পিপীলিকা চলিয়া যাইতেছে। এখানে অঙ্গুলির গতি অবিরাম; কিন্তু স্পর্শানুভূতি সবিরাম। তোমার অঙ্গুলিসকল এবং তালু পরস্পর সংস্পৃষ্ট। তোমার অঙ্গুলির কম্পন অনিবার্য্য। এই কম্পন হেতু অঙ্গুলির উপর কোথাও চাপ পড়িতেছে, আবার কোথাও বা পড়িতেছে না,—কিন্তু অঙ্গুলি সর্ব্বদাই তালু-সংস্পৃষ্ট। সুতরাং যেখানে চাপ পড়িতেছে, সেইখানেই স্পর্শজ্ঞান হইতেছে। অতএব চাপের মাত্রার উপর স্পর্শানুভূতি নির্ভর করিতেছে;—যেখানে মাত্রা একবারে কম হইতেছে, সেখানে, স্পর্শ-সংবিত্তি হইতেছে না। তোমার হস্ত টেবিলের উপর রাখিয়া তালুর উপর ৩ সের ওজনের একটি দ্রব্য রাখিয়া দাও। পরে চক্ষু মুদ্রিত কর। আমি তোমার অজ্ঞাতসারে, অতি সতর্কতার সহিত, কোন প্রকারে তোমার হস্তের চাঞ্চল্য উৎপাদন না করিয়া, উক্ত দ্রব্যের উপর আরও এক পোয়া ওজনের আর একটি দ্রব্য রাখিলাম; তুমি কিন্তু তাহা টের পাইলে না। আরও এক পোয়া রাখিলাম, এখনও বুঝিতে পারিলে না। এইরূপে যতক্ষণ না পূর্ব্ববর্ত্তী ৩ সেরের উপর আরও এক সের ওজন না চাপিবে, ততক্ষণ তুমি চাপের তারতম্য বুঝিতে পারিবে না।

বস্তুর উষ্ণতার তারতম্য অনুসারে উহার চাপেরও তারতম্য হইয়া থাকে। আমি সমান ওজনের এবং আকারের তিনখানি লৌহ-শলাকা

লইলাম। ইহাদের মধ্যে একটি অত্যন্ত ঠাণ্ডা, আর একটির উত্তাপ তোমার শরীরের উত্তাপের সমান এবং তৃতীয়টির উত্তাপ কিছু বেশী—অর্থাৎ যতটুকু তুমি হস্ত দ্বারা সহ্য করিতে পার। হস্ত দ্বারা এই তিনটি লৌহদণ্ডের ওজন অনুমান করিতে বলিলাম। তোমার নিকট এই তিনটির ওজন এক বলিয়া অনুমিত হইবে না; এবং যতক্ষণ তুলাদণ্ডের দ্বারা ওজন না করা হইবে, ততক্ষণ তোমার বিশ্বাস হইবে না যে, বাস্তবিক উহাদের ওজন সমান। যাহার উত্তাপ তোমার শরীরের উত্তাপ অপেক্ষা কম বা বেশী, তাহারই ওজন বেশী বলিয়া বোধ হইবে, কারণ ঐ বস্তু হইতে ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিক উত্তেজনা হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তাপের সহিত ত্বকের সম্বন্ধ নিতান্ত কম নহে।

তাপ ও ত্বক্।

তিনটি পাত্র লইয়া প্রথম পাত্রে গরম জল—যতটুকু গরম হাতে সহ্য হইতে পারে; দ্বিতীয় পাত্রে অত্যন্ত ঠাণ্ডা জল এবং তৃতীয় পাত্রে নাতিশীতোষ্ণ জল রাখ। এক হস্ত গরম জলে এবং আর এক হস্ত ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া রাখ। পরে উভয় হস্তই এক সঙ্গে তৃতীয় পাত্রের জলে ডুবাইয়া দাও; দেখিবে যে, একই জল এককালে ঠাণ্ডা ও গরম বোধ হইতেছে। শরীরের সকল অংশেই শীতাতপ সমান ভাবে অনুভূত হয় না;—কোন অংশে শীত অনুভূত হয়, আবার কোন অংশে তাপ অনুভূত হয়। যে অংশে শীত অনুভূত হয় তাহাকে শীতবিন্দু, এবং যে অংশে উত্তাপ অনুভূত হয় তাহাকে উষ্ণবিন্দু বলা হয়। সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া এই বিন্দুগুলি অবস্থান করিতেছে। শীতবিন্দু এবং উষ্ণবিন্দু পাশাপাশি এবং মেশামিশি হইয়া রহিয়াছে। একটি পেনসিলের অগ্রভাগটি বরফ-জলে ডুবাইয়া লইয়া অতি আস্তে-আস্তে বাহুর নিম্নদেশে বুলাইতে থাক; দেখিবে যে

শীতবিন্দু ও উষ্ণ বিন্দু।

সেই অঙ্গের সকল বিন্দুতেই সমান শৈত্য অনুভূত হইতেছে না। আবার ঐ পেনসিলের অগ্রভাগটি গরম করিয়া সেই প্রকারে বুলাইতে থাক, দেখিবে যে, এবারেও সকল বিন্দুতে সমান তাপ অনুভূত হইতেছে না। কোন-কোন বিন্দুতে তাপ-সংবিত্তি স্পষ্ট হইতেছে। তোমার বাহুর নিম্ন-দেশে একটি এক ইঞ্চি চতুষ্কোণক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাকে ৬৪ সমান অংশে বিভক্ত কর। এক্ষণে এই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র চতুষ্কোণের উপর একবার পেনসিলের ঠাণ্ডা অগ্রভাগটি স্থাপন করিয়া যাও; এবং আর একবার গরম অগ্রভাগটি স্থাপন করিয়া যাও। দেখিবে যে, কোন-কোন ক্ষুদ্র চতুষ্কোণটিতে শৈত্য অনুভূত হইতেছে আবার কোন-কোনটিতে উষ্ণতা অনুভূত হইতেছে। শীতবিন্দুতে উষ্ণতার অনুভূতি হইতেছে না, আবার উষ্ণবিন্দুতে শৈত্যানুভূতি হইতেছে না। এইরূপে ত্বকের শীতবিন্দু এবং উষ্ণবিন্দুর স্থান নির্ণয় করা যাইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তুমি যখন উষ্ণ জলে তোমার হাত ডুবাইয়াছিলে, তখন সেই হস্তের উষ্ণবিন্দুগুলি উত্তেজিত হইয়াছিল এবং অপর হস্তের শীতবিন্দুগুলি উত্তেজিত হইয়াছিল; কারণ এই হস্তটি ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়াছিলে। পরে যখন উভয় হস্তই নাতি-শীতোষ্ণ জলে ডুবাইলে, তখন এই জল শীতবিন্দু বা উষ্ণবিন্দু-গুলিকে বিশেষ ভাবে উত্তেজিত করিতে পারিল না; কিন্তু পূর্ব্ব উত্তেজনা এখনও বর্ত্তমান বলিয়া একই জল একসময়ে উষ্ণ ও শীতল বলিয়া বোধ হইল।

স্পর্শসংবিত্তির উৎকেন্দ্রিক প্রক্ষেপণ।

তোমার মস্তকের চুল স্পর্শ কর। কোথায় তোমার স্পর্শসংবিত্তি হইতেছে—চুলের না মস্তকের স্পর্শে? মাত্র নখের দ্বারা কোন একটী দ্রব্য স্পর্শ কর। তোমার স্পর্শ সংবিত্তি হইবে, কিন্তু এ সংবিত্তির উৎপত্তি স্থল কোথায়? এক-খানি ছড়ি লইয়া, চক্ষুর্দ্বয় বন্ধ করিয়া, অতি

আস্তে আস্তে মেজের উপর আঘাত করিতে থাক তোমার স্পর্শ সংবিত্তি হইবে, কিন্তু এ সংবিত্তি কি ছড়ির অগ্রভাগ হইতে আসিতেছে? ছড়ির অগ্রভাগটি মেজের উপর স্থিরভাবে রাখিয়া ছড়ির মাথার উপর হাতের চাপ দাও। এখন যে স্পর্শসংবিত্তি হইতেছে তাহার উৎপত্তি স্থান কোথায়? চুলে বা নখে কোনপ্রকার সংবিদস্নায়ু নাই। চুল এবং নখের মূল দেশের স্নায়ুপ্রান্ত উত্তেজিত হইয়া যে সংবিত্তি হইতেছে তাহা নখে এবং চুলে অবস্থান করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। ছড়ির দ্বারা কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলে আমাদের মনে হয় যেন আমরা ছড়িতেই দ্রব্যাদি স্পর্শ করিতেছি এবং ছড়ি হইতেই স্পর্শজ্ঞান হইতেছে। হস্তমুষ্টিতে এ স্পর্শজ্ঞান অনুভূত হয় না; কারণ স্পর্শ সময়ে ছড়ির অপর প্রান্তে স্পৃষ্টবস্তুর স্পষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞান বর্ত্তমান। যখন মস্তকের কেশ স্পর্শ করি, তখন আমি জানি যে, আমার অঙ্গুলি মস্তকের চর্ম্মসংশ্লিষ্ট নহে। এরূপ স্থলে আমাদের অবধান কেবল স্পর্শ সংবিত্তিতে নিবদ্ধ না থাকিয়া উদ্বোধকেও ন্যস্ত হয়। এইজন্য স্পর্শসংবিত্তি আমাদের শরীরাবয়ব ছাড়াইয়া অপর বস্তুতে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়।

কঙ্কাল মানবদেহের প্রধান অবলম্বন। ইহাই আমাদের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহকে আবরণরূপে বেষ্টন করিতেছে। নরকঙ্কাল কতকগুলি অস্থিখণ্ডের অপূর্ব্ব সমাবেশ। পেশীর সাহায্যে অস্থিগুলিকে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায়।

পৈশিক সংবিত্তি

তন্তু দ্বারা পেশীসমূহ অস্থিখণ্ডে সংযুক্ত। পেশী হইতে চাপ ও যন্ত্রণা সংবিত্তির, তন্তু হইতে টান সংবিত্তির ও অস্থির সন্ধিস্থল হইতে আর একপ্রকার চাপ সংবিত্তির উৎপত্তি হয়। টেবিলের উপর তোমার একটি বাহু নিশ্চল ভাবে রাখিয়া ইহার কিয়দংশে কোকেন নামক ঔষধ লাগাইয়া দাও। ঐ অংশটুকু স্পর্শ-সংবিত্তি-শূন্য হইবে। এক্ষণে ঐ

অংশের উপত্বকের উপর চাপ দিলে তন্নিম্নস্থ পেশী চ্যাপ্‌টা হইয়া যাইবে এবং ইহার ফলে একপ্রকার সংবিত্তি হইবে। এই সংবিত্তিকে পৈশিক সংবিত্তি বলে।

তন্তুর দ্বারা পেশীসমূহ অস্থিখণ্ডে সংলগ্ন। পেশীর ন্যায় তন্তু সমূহেও সংবিদ-স্নায়ু বর্ত্তমান, অতএব তন্তু হইতেও একপ্রকার সংবিত্তির উদ্রেক হয়, ইহা টান সংবিত্তি। তোমার পার্শ্বে তোমার হাতখানি অতি সহজভাবে ঝুলাইয়া রাখ। একটুকরা দড়ি লইয়া তাহার এক প্রান্তে একটি বেশ ভারি দ্রব্য বাঁধিয়া ইহার অপর প্রান্তটী তোমার মধ্যমা অঙ্গুলির অগ্রভাগে বাঁধিয়া দাও। এক্ষণে এই ভার হেতু তোমার সমগ্র হস্তটী নীচের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এবং এই আকর্ষণ হইতে একপ্রকার সংবিত্তির উদ্রেক হইতেছে। তন্তু এই সংবিত্তির উৎপত্তি স্থল। এই সংবিত্তির নাম টান সংবিত্তি। অস্থিসন্ধিস্থল হইতে ইহার উৎপত্তি হইতেছে না, কারণ ভারের আকর্ষণ হেতু সন্ধিস্থলের সংঘর্ষণ হইতেছে না।

বন্ধনী সংবিত্তি।

অস্থি গ্রন্থিসমূহও সংবিদ-স্নায়ুময়। সুতরাং গ্রন্থিদেশ হইতেও এক প্রকার সংবিত্তি হয়। এ সংবিত্তির প্রকৃতি অনেকটা চাপ সংবিত্তির ন্যায়। এক টুকরা সূতা লইয়া তাহার একপ্রান্তে একটি ভারি দ্রব্য বাঁধিয়া অপর প্রান্তটি মধ্যমা অঙ্গুলির অগ্রভাগে বাঁধিয়া দাও। মেজের উপর একটি নরম গদি পাতিয়া রাখ। অর্থাৎ ভারি দ্রব্যটি ইহার উপর পতিত হইলে যেন শব্দ না হয়। এক্ষণে চক্ষুর্দ্বয় বন্ধ করিয়া তোমার হাতখানি ঝটিতি নামাইয়া ফেল। যেই ভারি দ্রব্যটি গদির উপর আশ্রয় পাইবে অমনি তুমি একটি ঊর্দ্ধগামী ধাক্কা অনুভব করিবে। তোমার মনে হইবে যে, সূতাটি হঠাৎ শক্ত হইয়া তোমাকে ধাক্কা দিতেছে। এই ধাক্কাটি

সন্ধি সংবিত্তি।

তোমার হস্তে অনুভূত হইবে। দ্রব্যটি যখন গদি স্পর্শ করিতেছে, তখন তোমার হস্তটি আকর্ষণমুক্ত হইতেছে সুতরাং অস্থিগ্রন্থির নীচের দিক উপরের দিকে ধাক্কা দিতেছে। এই প্রকারে গ্রন্থিসংলগ্ন-স্নায়ু সংক্ষুব্ধ হইয়া একপ্রকার সংবিত্তির সৃষ্টি করিতেছে। এই সংবিত্তিকে একপ্রকার চাপ সংবিত্তি বলিতে পারা যায়।

অন্ননালী-সংবিত্তি।

যে পথ দিয়া খাদ্য দ্রব্য সকল মুখের ভিতর দিয়া পাকাশয়ের নিম্নভাগে গমন করে, সেই রাস্তাটিকে অন্ননালী বলা হয়। এই নালীর উপরিভাগকে অর্থাৎ মুখের ঠিক পশ্চাৎভাগকে গলকক্ষ বলে এবং ইহার ঠিক নিম্নের ভাগকে গলনালী বলে। অন্ননালী—ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং বমন এই তিন সংবিত্তির আশ্রয়। ক্ষুধার স্থান পাকস্থলী। ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়া গেলে পাকস্থলীর প্রাচীরগুলি শুষ্ক হইয়া যায় এবং কুঁকড়াইয়া যায়। এই কুঞ্চনের জন্য পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী-সংলগ্ন সংবিদ-স্নায়ুসমূহ সংক্ষুব্ধ হয় এবং ইহার ফলে যে সংবিত্তি হয় তাহারই নাম ক্ষুধা। তৃষ্ণার স্থান গলকক্ষ। এই কক্ষের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, শুষ্ক হইলে তৎসংলগ্ন স্নায়ুপ্রান্ত উত্তেজিত হইয়া যে সংবিত্তি হয় তাহারই নাম তৃষ্ণা। মুখ গহ্বরের পশ্চাৎভাগ জলীয় দ্রাবকের দ্বারা লেপন করিলে তৃষ্ণার উপশম হয়। গলনালী-সংলগ্ন স্নায়ুপ্রান্তের উপর চাপ পড়িলে এক প্রকার সংবিত্তি হয়। ইহাই বমন সংবিত্তি। এই সংবিত্তি স্বাদ, ঘ্রাণ ও ঘূর্ণন সংবিত্তির সমন্বয়।

বায়ুকোষ, রক্তকোষ এবং মূত্রকোষও কতকগুলি সংবিত্তির আশ্রয় স্থান।

সংবিত্তির প্রকারভেদ।

১। প্রাদেশিক সংবিত্তি (উদ্বোধক-বাহ্যিক)

(ক) দর্শন-সংবিত্তি
- দীপ্তি-সংবিত্তি (উদ্বোধক—মিশ্র আলোক)
- বর্ণ-সংবিত্তি (উদ্বোধক—অমিশ্র আলোক)

(খ) শ্রবণ-সংবিত্তি
- বিতান্‌-সংবিত্তি (উদ্বোধক—বায়ুবিন্দুর-ধাক্কা)
- তান-সংবিত্তি (উদ্বোধক—তরঙ্গায়িত বায়ু প্রবাহ)

(গ) ঘ্রাণ-সংবিত্তি—(উদ্বোধক—গন্ধরেণু)

(ঘ) স্বাদ-সংবিত্তি—(উদ্বোধক—দ্রাব্য-পদার্থ)

(ঙ) স্পর্শ-সংবিত্তি
- চাপ-সংবিত্তি (উদ্বোধক—ত্বক্‌ ও উপত্বকের উত্তেজনা)
- তাপ-সংবিত্তি (উদ্বোধক—চর্ম্মোপরি উত্তাপ)

২। ব্যাপক-সংবিত্তি (উদ্বোধক—আভ্যন্তরীণ)

(চ) পৈশিক-সংবিত্তি—(উদ্বোধক—পেশীর আকুঞ্চন ও সঙ্কোচন)

(ছ) বন্ধনী-সংবিত্তি—(উদ্বোধক—তন্তুর আকর্ষণ)

(জ) সন্ধি-সংবিত্তি —(উদ্বোধক—অস্থিসন্ধির ঘর্ষণ)

(ঝ) অন্ননালী-সংবিত্তি
- ক্ষুধা-সংবিত্তি (উৎপত্তিস্থল—পাকস্থলী)
- তৃষ্ণা-সংবিত্তি (উৎপত্তিস্থল—গলকক্ষ)
- বমন-সংবিত্তি (উৎপত্তিস্থল—গলনালী)

(ঞ) সঞ্চালন-সংবিত্তি (উদ্বোধক—রক্তকোষের পরিবর্ত্তন)

(ট) শ্বাস-সংবিত্তি (উদ্বোধক—বায়ুকোষের পরিবর্ত্তন)

ইত্যাদি।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রত্যক্ষ

তুমি আলোকরাশি দেখিতেছ, বা তুমি মিথ্যাবাদীকে ঘৃণা কর, বা তোমার মনে ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে—ইত্যাদি বিষয় তোমাকে যুক্তি-তর্কের দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হয় না। এরূপ জ্ঞান তোমার অনায়াসলব্ধ, এরূপ জ্ঞান সদ্যসদ্যই লাভ হইয়া থাকে; এরূপ জ্ঞানের জন্য মীমাংসার প্রয়োজন হয় না, প্রমাণের আশ্রয় লইতে হয় না। যে শক্তি-প্রভাবে আমাদের এই প্রকার সদ্য জ্ঞান-লাভ হইয়া থাকে, তাহার

নাম— { প্রত্যক্ষ-শক্তি
বোধি-শক্তি
গ্রাহিকা-শক্তি
গোচরী-শক্তি
সহজ প্রজ্ঞা-শক্তি

জলের শৈত্য আছে, ফুলের গন্ধ আছে, আগুনের উত্তাপ আছে—ইত্যাদি জ্ঞান আমার প্রত্যক্ষ। আমার বোধিশক্তি হেতু সহজেই এই সকল জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই শক্তি-প্রভাবে সদ্য বস্তুজ্ঞান গ্রহণে সমর্থ হই

বলিয়া, ইহাকে গ্রাহিকা-শক্তি বলা হইয়া থাকে। এই শক্তির সাহায্যে জ্ঞাত বিষয় বুদ্ধির গোচরীভূত হয় বলিয়া, ইহাকে গোচরী-শক্তিও বলা হয়। আবার এই শক্তি-প্রভাবে প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ হয় বলিয়া, ইহাকে সহজ-প্রজ্ঞা-শক্তিও বলা হইয়া থাকে।

জড়জগৎ, মনোজগৎ এবং তত্ত্বজগৎ—এই ত্রিবিধ জগতেরই কিছু-না-কিছু আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; সুতরাং আমাদের ত্রিবিধ বোধ-শক্তিও আছে। এই ত্রিবিধ বোধ-শক্তির—

নাম— { ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ
সংজ্ঞা-প্রত্যক্ষ
অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ

ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সাহায্যে জড়-জগতের, সংজ্ঞা-প্রত্যক্ষ সাহায্যে মনো-জগতের এবং অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সাহায্যে তত্ত্ব-জগতের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

জড়-জগতে ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানের প্রথম সোপান। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই মনের বাহিরের, বাহ্যজগতের এবং বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। এবংবিধ সদ্যজ্ঞানের—

নাম— { ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ
বহিঃপ্রত্যক্ষ
বাহ্যপ্রত্যক্ষ
বস্তুপ্রত্যক্ষ
প্রত্যক্ষ

জড়জগতের ন্যায় মনোজগতেও আমাদের অবাধ-গতি। আমার জ্ঞান, আমার অনুভূতি, আমার ইচ্ছা—আমার মানস-প্রত্যক্ষ। আমার মন স্নেহার্দ্র হইলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহা জানিতে পারি। মনের মধ্যে

যখনই যে ভাবের উদয় হইতেছে, তখনই আমি তাহা জানিতেছি—এ জ্ঞান আমার সদ্যজ্ঞান এবং মনোজগৎ সম্বন্ধীয় এরূপ সদ্যজ্ঞানের—

নাম—
সংজ্ঞা-প্রত্যক্ষ
আন্তর-প্রত্যক্ষ
আত্ম-প্রত্যক্ষ
সংজ্ঞা-বোধি
মানস-প্রত্যক্ষ

তত্ত্ব-প্রত্যক্ষের দ্বারা আমরা চরম সত্যের সদ্যজ্ঞান লাভ করিতে পারি। এই প্রত্যক্ষের সাহায্যেই আমাদের দেশ, কাল এবং হেতু সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এ প্রত্যক্ষও নানাবিধ নামে অভিহিত।

নাম—
তত্ত্ব-প্রত্যক্ষ
তত্ত্ব-বোধি
সত্য-প্রত্যক্ষ
সাত্ত্বিক-প্রত্যক্ষ

তত্ত্ব-প্রত্যক্ষ মনোবিজ্ঞানের বিষয়াধীন নহে। প্রত্যক্ষ অর্থে সচরাচর ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই বুঝাইয়া থাকে। এক্ষণে আমরা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বাহ্যজগৎ জ্ঞানের সমস্যা।

চক্ষু মেলিয়াই সম্মুখের ঐ কদলী-বৃক্ষটি দেখিতে পাইলে; উহা দেখিবার জন্য তোমার কোন প্রকার আয়াস হইল না। কেবল উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই উহার পল্লবসমূহের বর্ণ, ফুলের শোভা, ত্বকের মসৃণতা ও শৈত্য, কাণ্ডের ব্যাস এবং বৃক্ষটির উচ্চতা—সকলই যুগপৎ তোমার নয়নপথে পতিত হইল। ঐ সঙ্গে বৃক্ষটি কত দূরে এবং কোন্ দিকে অবস্থিত, তাহাও প্রত্যক্ষ করিলে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এত বিভিন্ন গুণ-

সমূহ একই মুহূর্ত্তে কেবল চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইতেছ। কেবল যে গুণগুলি প্রত্যক্ষ করিতেছ তাহা নহে—ঐ সবুজ বর্ণ ও ঐ দৃঢ়তা, মসৃণতা প্রভৃতি গুণগুলি প্রত্যক্ষ কদলী বৃক্ষে আরোপ করিয়া, কদলী বৃক্ষটির গুণ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছ। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সকল বিভিন্ন গুণ যদিও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বিষয়, তথাপি মাত্র একই ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা সকলই প্রত্যক্ষ করিতেছ। স্পর্শ না করিলে মসৃণতা জানা যায় না। হস্ত বা অঙ্গুলীর দ্বারা বলপ্রয়োগ না করিলে, কাঠিন্য বুঝা যায় না। ফলের আস্বাদন জিহ্বারই প্রত্যক্ষ। দিক্ ও দূরত্ব শরীর ও হস্তপদাদির দ্বারাই জানা সম্ভব। তথাপি একমাত্র চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারাই সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ করিতেছ। আমাদের মনে হয় যে, জন্মাবধি চোখে দেখিয়া, বা কাণে শুনিয়া, বা ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করিয়া আমরা আমাদের চতুর্দ্দিক্স্থ বস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। অবশ্য এরূপ প্রত্যক্ষ অসম্ভব হইলে, জগতে জীবনরক্ষা প্রাণীমাত্রেরই পক্ষে অসম্ভব হইত। তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান কদলী বৃক্ষটি একটি বস্তু। সাধারণ চক্ষে জ্ঞানের বিকাশ হইতে উহা ঐ প্রকার একটি বস্তুই রহিয়াছে; কিন্তু বস্তুবিভাগের ও বিশ্লেষণের সর্ব্বপ্রকার উপায় ব্যর্থ না হইলে বিজ্ঞান কোন বস্তুকে অবিভাজ্য মৌলিক বলিয়া ধরিয়া লইতে নারাজ। তাই মনোবিজ্ঞান এই প্রত্যক্ষ বস্তুকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়াছে। সদ্যোজাত শিশু সম্মুখস্থ বস্তুর দিক্ ও দূরত্ব নিরূপণ করিতে অক্ষম। বয়স ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের ঐ শক্তি ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। তবে কি আমাদের জীবনে এমন দিন ছিল, যখন আমাদের দূরত্ব, দিক্ প্রভৃতির আদৌ জ্ঞান ছিল না? বস্তুর আকৃতি এবং পরিমাণ বিষয়েও ঐরূপ। বৈজ্ঞানিকেরা এ প্রশ্নের উত্তরে এক

প্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দিক্, দূরত্ব, আকৃতি, পরিমাণ প্রভৃতির জ্ঞান আমাদের সহজাত নহে। মানসিক নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে ঐ জ্ঞানের আরম্ভ ও বিকাশ হইয়াছে। আলোচনা-বলে আমরা এই জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারি ও করিয়া থাকি। ব্যক্তি-বিশেষে ঐ জ্ঞান যেমন শুদ্ধ ও নির্ভুল দেখা যায়, অপর ব্যক্তিতে সেরূপ দেখা যায় না। প্রথমোক্ত ব্যক্তির ঐ উন্নতি অভ্যাস ও বিশেষ অনুশীলন দ্বারা সাধিত হইয়াছে দেখা যায়। আরও এক কথা—চক্ষু আলোক ও বর্ণ মাত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ; কিন্তু কি উপায়ে একটি দ্রব্য দেখিবামাত্র উহার শব্দ, ঘ্রাণ, রস প্রভৃতি অন্যান্য বিবিধ গুণ আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা আশ্চর্য্য।

বর্ণ, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার; উহারা "মনের ভিতর" আছে। কিন্তু যখন গৃহ, বৃক্ষ প্রভৃতি কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, তখন ঐ বস্তুর বর্ণকে ঐ বস্তুর গুণ বলিয়া বুঝি। আভ্যন্তরিক মানসিক ব্যাপার কি উপায়ে বাহ্যিক বস্তুর গুণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়—ইহা একটি জটিল সমস্যা। ঐ বৃক্ষটির সবুজ বর্ণ ঐ বৃক্ষে নাই, কিন্তু আমার মনে আছে—ইহা সাধারণ মনুষ্যের বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সবুজ বর্ণ যে আমার মনের বিকার, তাহা উপলব্ধি করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। অন্ধের শ্বেত, পীত বর্ণের জ্ঞান অসম্ভব। তুমি চক্ষু মুদিয়া থাক, বৃক্ষটির বর্ণও গুপ্ত থাকিবে; অথবা চক্ষু মেলিয়া রাখিয়া অন্য বিষয়ে মনকে ব্যাপৃত রাখ, বর্ণ দেখিতে পাইবে না। যেখানে আলোকের অভাব আছে, অর্থাৎ দৃষ্ট বস্তু হইতে চক্ষের উপর আলোক প্রতিফলিত না হয়, সেখানে বর্ণও থাকে না। ইহা ছাড়া প্রকৃতি-তত্ত্ববিদেরা দেখাইয়াছেন যে, দৃশ্যমান বস্তুতে বর্ণ নাই। দৃশ্য বস্তু হইতে ইথর নামক অতি সূক্ষ্ম অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাষ্পময় পদার্থ-স্পন্দনের তরঙ্গ চক্ষুর উপর

প্রতিঘাত হইয়া দর্শন-স্নায়ুর ও মস্তিষ্কের দর্শনক্ষেত্রের স্নায়ুগ্রন্থিসমূহে স্পন্দন উৎপাদন করিলে, কোন অভাবনীয় কারণে মনের মধ্যে আলোক ও বর্ণের জ্ঞান হয়। ইথর-তরঙ্গের সংখ্যা অনুসারে বর্ণের বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়; সুতরাং আমাদের মনের বাহিরে বর্ণের স্থানে ইথরের তরঙ্গ মাত্র রহিয়াছে। ইথর-তরঙ্গ বা স্পন্দন বর্ণ নহে। সেই রূপ, শব্দও একটি মানসিক ব্যাপার মাত্র। বাহ্যজগতে বায়ুর স্পন্দন ও তরঙ্গ মাত্র রহিয়াছে। কর্ণ-পটহের উপরে উহাদের ঘাত-প্রতিঘাতে মস্তিষ্কের শ্রবণক্ষেত্র স্পন্দিত হইয়া শব্দ-জ্ঞান উৎপন্ন করে। অতএব যাহাকে আমরা বস্তুর গুণ বলিয়া জানি, তাহা প্রকৃত পক্ষে মনের ব্যাপার ও মনের মধ্যেই অবস্থিত। যদি তাহাই হয়, তবে বিচার্য্য কোন উপায়ে শ্বেত, পীত ইত্যাদি বর্ণ মন হইতে বাহির হইয়া বৃক্ষ, গৃহাদি বাহ্যবস্তুর গুণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা জ্ঞান মাত্র প্রত্যক্ষ করি; কিন্তু কি করিয়া অন্তর্জগতের ব্যাপারসমূহ হইতে বাহ্যজগতের বস্তুসমূহের জ্ঞান হয়, ইহার মীমাংসা করা বড়ই কঠিন। যাহাকে বাহ্য বস্তু বলি, আমরা তাহার গুণমাত্র প্রত্যক্ষ করি; এবং এক-একটি গুণ আমাদের মনের এক-একটি বিকার মাত্র। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, আমাদের বাহ্য বস্তুর জ্ঞান উহার গুণসমষ্টির জ্ঞান মাত্র। বাহ্যবস্তু গুণসমষ্টি মাত্র। যদি গুণগুলি মানসিক ব্যাপার হয়, তাহা হইলে জ্ঞানময় বস্তুটিকেও মানসিক ব্যাপার বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। কারণ ঐ বৃক্ষটি বাহ্যিক বস্তু, "বাহিরে" আছে; আমার দর্শন, স্পর্শন ব্যতিরেকেও উহার অস্তিত্ব থাকে। এরূপ জ্ঞান সার্ব্বজনীন, এবং অপর সকল জ্ঞানের প্রমাণ ও ভিত্তিস্বরূপ। বৈজ্ঞানিককে বুঝাইয়া দিতে হইবে, কি করিয়া এই স্বতন্ত্র বাহ্যিক-বস্তুর জ্ঞান আমাদের হইল। কি করিয়া মানসিক ব্যাপার সমষ্টিতে

"বস্তুত্ব" "বাহ্যত্ব" "দূরত্ব" প্রভৃতি আরোপিত হইল। বাহিরে দূরে স্বতন্ত্র বাহ্যবস্তু সম্বন্ধীয় এই সকলের জ্ঞান আমাদের কোন্ মানসিক নিয়ম অনুসারে ও কি করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, উহা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দেওয়া মনোবিজ্ঞানের অন্যতম কর্ত্তব্য। এই সমস্যাকে বাহ্যিক-জগৎ-জ্ঞানের সমস্যা বলা হইয়া থাকে।

অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিচার করিতে লইলে, আমাদের মনে সাধারণতঃ এই দুইটি প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে—

১। মনের বাহিরেও কি "কিছু" আছে?

২। যদি থাকে, তবে উহা কি এবং কেমন?

সুতরাং প্রথমতঃ বিচার করিতে হইবে যে, কেমন করিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, মনের বাহিরেও কিছু আছে, পরে জানিতে হইবে যে, কি উপায়ে আমরা বুঝিতে পারি যে, ঐ "কিছু"টি কি, কেমন এবং কোথায় আছে। অতএব প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের এই দুইটি মাত্র উপাদান; যথা—

১। বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান।

২। বাহ্যবস্তুর পরিচয়।

প্রথম উপাদানটি সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়টী পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ।

কেবল সংবিত্তির সাহায্যেই মনের অতিরিক্ত বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। কিন্তু সংবিত্তি মনের অবস্থা মাত্র; সুতরাং মনের অবস্থা হইতে মনের বাহিরের বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? সংবিত্তি যখন মনের বিকার মাত্র, তখন সংবিত্তির সাহায্যে মনের আভ্যন্তরীণ বিষয়ই অবগত হওয়া সম্ভব; কিন্তু মনের বাহিরেও যে কিছু আছে, এ জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? সংবিত্তির ভিতর এমন একটি অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, যে শক্তি প্রভাবে মন স্বতঃই মনের অতিরিক্ত

বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বজ্ঞান।

বস্তুর বিষয় চিন্তা করিতে বাধ্য হয়। মনের ভিতর যখন কোন সংবিত্তির উদয় হয়, তখনই আমি বুঝিতে পারি যে, আমার মন এ সংবিত্তির কর্ত্তা নহে, আমার মন ইহার উৎপাদক নহে; ইহার উপর আমার মনের কোন আধিপত্য নাই। মন ইহার সৃষ্টি করিতে যেমন অসমর্থ, ইহার বিলোপ সাধনেও তদ্রূপ অসমর্থ। ইহার আবির্ভাব-তিরোভাব মনের ক্ষমতাতিরিক্ত। সংবিত্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না; সুতরাং সংবিত্তির উৎপাদক—বস্তুরও অস্তিত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। মন যখন সংবিত্তির হেতু নহে, তখন মন ব্যতীত অন্য "কিছু" ইহার কারণ—ইহা স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। আমার শব্দ-সংবিত্তি হইল, মনের পরিবর্ত্তন ঘটিল—এ সংবিত্তি, এ পরিবর্ত্তন স্বকৃত নহে; মন ইহার কর্ত্তা নহে; সুতরাং মন ব্যতীত অপর "কিছু" ইহার কর্ত্তা। সংবিত্তি আমার ইচ্ছাধীন নহে। আমার ইচ্ছার উপর ইহার সৃষ্টি-স্থিতি-লয় নির্ভর করে না। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ইহা আমার মনের উপর আরোপিত হইয়া থাকে; আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহা আমার মন হইতে তিরোহিত হইয়া যায়। অতএব মন যদি সংবিত্তির উদ্বোধক না হয়, তবে মন ব্যতীত অপর "কিছু" ইহার উদ্বোধক। এইরূপে সংবিত্তি হইতে বাহ্যজগতের অস্তিত্ব-জ্ঞান হইয়া থাকে। এ জ্ঞান সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ।

এক্ষণে দেখা যাউক, কিরূপে আমাদের "বস্তু-পরিচয়" হইয়া থাকে। সম্মুখে একটি বস্তু দেখিয়া বলিলাম, "আমি লেবু দেখিতেছি।" লেবু দেখিতেছি—এই জ্ঞান আমার কেমন করিয়া হইল? প্রথমতঃ আমার জ্ঞান হইল যে, আমি শুনিতেছি না, স্পর্শ করিতেছি না, আস্বাদন করিতেছি না, আঘ্রাণ করিতেছি না—কিন্তু দেখিতেছি মাত্র।

বাহ্যবস্তুর পরিচয়।

কিন্তু কি দেখিতেছি? অবশ্য "কিছু" দেখিতেছি, এবং "যাহা" দেখিতেছি, তাহার বর্ণ কাল নয়, সাদা নয়, লাল নয়—উহা পীতবর্ণের। ঐ পীতবর্ণ পদার্থটি চতুষ্কোণ নহে, ত্রিকোণ নহে—কিন্তু গোলাকার। "আমি লেবু দেখিতেছি"—এই বাক্যটি বিশ্লেষণ করিলে, পাঁচটি বাক্য পাওয়া যায়, যথা—

১। আমি দেখিতেছি

২। আমি "কিছু" দেখিতেছি

৩। আমি পীতবর্ণ "কিছু" দেখিতেছি

৪। আমি পীতবর্ণ গোলাকার "কিছু" দেখিতেছি

৫। আমি লেবু দেখিতেছি।

লেবু হইতে একপ্রকার উদ্বায়ী তরল পদার্থের স্পন্দন দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর আঘাত করিতেছে; ঐ আঘাতজনিত দর্শনেন্দ্রিয়ের স্পন্দন অন্তর্বাহী স্নায়ু কর্ত্তৃক মস্তিষ্কে আনীত হইতেছে এবং মস্তিষ্কও স্পন্দিত হইতেছে। এই মস্তিষ্ক-স্পন্দনের উপর মনের প্রতিক্রিয়া হইল। বুঝিলাম যে, এই স্পন্দন নাসিকা, কর্ণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-প্রেরিত স্পন্দন হইতে পৃথক্, কিন্তু পূর্ব্বপরিচিত চক্ষু-প্রেরিত স্পন্দন সদৃশ। এই প্রকার মনের প্রতিক্রিয়া হইতে দর্শনেন্দ্রিয়ানুভূতি হইল। বুঝিতে পারিলাম, "আমি দেখিতেছি।" কিন্তু এই সংবিত্তির উদ্বোধক আমার মন নহে। কোন বাহ্য শক্তি ইহার উদ্বোধক। আমি এই সংবিত্তির কর্ত্তা নহি, জ্ঞাতা মাত্র। যখন সংবিত্তি আছে, তখন ইহার কর্ত্তাও আছে। আমার মন যদি ইহার কর্ত্তা না হয়, তবে মন ছাড়া "কিছু" ইহার কর্ত্তা। এইরূপে, সংবিত্তি হইতে সংবিত্তির কারণ নির্ণয় করিলাম; আমি মনের বাহিরের কোন বস্তু দেখিতেছি, এই জ্ঞান হইল। এইরূপে আমার সংবিত্তির "বিষয়ীকরণ" হইল। আমি পূর্ব্বে শ্বেত, পীত

লোহিত প্রভৃতি অনেক বর্ণ দেখিয়াছি; কিন্তু বর্ত্তমান বর্ণটি আমার পূর্ব্বপরিচিত পীতবর্ণের মত—অন্য বর্ণের মত নহে। সুতরাং আমার দৃষ্ট বস্তুটি পীতবর্ণের। আমি ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ প্রভৃতি নানা আকারের বস্তু দেখিয়াছি—কিন্তু বর্ত্তমান বস্তুটির আকার আমার পূর্ব্বপরিচিত গোলাকারের মত—অন্য আকারের মত নহে। আমি পূর্ব্বে যে সকল লেবু দেখিয়াছি, এই বস্তুটির তাহাদের সহিত সাদৃশ্য আছে; সুতরাং আমি যাহা দেখিতেছি, সেটিও লেবু। আবার যখনই আমি বুঝিলাম যে এই বস্তুটি লেবু, তখনই লেবুর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদির কথা আমার মনে উদয় হইল। এতগুলি মানস-প্রক্রিয়ার পর একটি বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইল। প্রক্রিয়াগুলি এত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয় যে, সাধারণতঃ আমরা উহাদিগকে লক্ষ্য করি না।

তুমি একটি শব্দ শুনিলে, শুনিয়া বলিলে, "কলেজের ঘণ্টা বাজিতেছে।" এই বাক্যটিকেও বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পাওয়া যায়:—

১। আমি শুনিতেছি
২। আমি "কিছুর" ধ্বনি শুনিতেছি
২। আমি ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেছি
৪। আমি কলেজের ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেছি।

ঘণ্টার স্পন্দন হইতে বায়ুর স্পন্দন, বায়ুস্পন্দন হইতে কর্ণপটহের স্পন্দন, কর্ণপটহের স্পন্দন হইতে মস্তিষ্ক-স্পন্দন হইল; স্পন্দিত মস্তিষ্কের উপর মনের প্রতিক্রিয়া হইল। বুঝিলাম, এই স্পন্দন অন্যান্য ইন্দ্রিয়জনিত স্পন্দনের তুল্য নহে,—ইহা শ্রবণেন্দ্রিয়জনিত স্পন্দন সদৃশ। এই রূপে শব্দ-সংবিত্তি হইল। কিন্তু এই শব্দের কর্ত্তা আমার মন নহে—আমার মন হইতে

এ শব্দ হইতেছে না। এ শব্দের উপর মনের কোন আধিপত্য নাই। শব্দ বাহিরে হইতেছে—মন শুনিতেছে মাত্র। সুতরাং এ শব্দের উৎপাদক মন নহে—কোন বাহ্যবস্তু ইহার উৎপাদক। পূর্ব্বে আমি অনেক প্রকার শব্দ শুনিয়াছি—পিয়ানোর শব্দ, পাপিয়ার শব্দ ইত্যাদি কত প্রকার শব্দ শুনিয়াছি—কিন্তু এ শব্দ ঐ সকল শব্দের মত নহে। পূর্ব্ব-পরিচিত ঘণ্টাধ্বনির সহিত এ শব্দটির সাদৃশ্য আছে; অতএব আমি ঘণ্টার শব্দ শুনিতেছি। আমি গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াছি, আদালত-গৃহের ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াছি, ডাকঘরের ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াছি; কিন্তু এ ধ্বনি ঐ সকল ধ্বনির মত নহে—ইহা আমার পূর্ব্বপরিচিত কলেজের ঘণ্টা-ধ্বনির মত। সুতরাং আমি কলেজের ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেছি। যখন ঘণ্টাধ্বনি বলিয়া বুঝিতে পারিলাম, তখন স্মৃতি এবং সঙ্গ-শক্তির সাহায্যে ঘণ্টার আকার-প্রকার আমার মনে হইল। যখন কলেজের ঘণ্টা বাজিতেছে বলিতেছি, তখন যে কেবল আমার মনে সংবিত্তি মাত্র হইল তাহা নহে; সংবিত্তির সঙ্গে-সঙ্গে ঘণ্টার চিত্র, কলেজের চিত্র, ঘণ্টাটি কোথায় এবং কতদূরে অবস্থিত ইত্যাদি কত বিষয় মনে হইল। এইরূপে আমাদের "বস্তু পরিচয়"—হইয়া থাকে। ইহা পরোক্ষ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান।

এই দৃষ্টান্তদ্বয় হইতে দেখা যাইতেছে যে, কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংবিত্তির প্রয়োজন, এবং সংবিত্তির উদ্বোধক বস্তুর প্রকৃতি পরিচয়ও আবশ্যক।

প্রত্যক্ষ প্রণালী।

রূপ-রসাদির আধার নিরূপণ ও করণ-জ্ঞান ব্যাপারের নাম "প্রত্যক্ষজ্ঞান" বা "বস্তুজ্ঞান।" রূপ দেখিলাম, বা রস অস্বাদন করিলাম, কিন্তু ঐ রূপ-রসের আধার নিরূপণ না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। আমি রূপ অনুভব করিতেছি সত্য, কিন্তু আমার মন এ রূপের স্রষ্টা নয়, আমার মন এ রূপের আধার নহে।

সুতরাং এ রূপের আধার এবং কারণ-নির্ণয় প্রয়োজন। মনে করিও না, প্রথমে সংবিত্তি—পরে আধার-নির্ণয় ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। একটির পর আর একটি নহে—দুইটিই একসঙ্গে সম্পাদিত হইয়া থাকে। বহু সংবিত্তির সমন্বয়ে একটি নির্দ্দিষ্ট বস্তুর জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যখন প্রথমে আমি লেবু দেখিয়াছিলাম, তখন জিহ্বার দ্বারা ইহার রস আস্বাদন করিয়াছিলাম, নাসিকার দ্বারা ইহার ঘ্রাণ লইয়াছিলাম, চক্ষুর সাহায্যে ইহার বর্ণ-নির্ণয় করিয়াছিলাম, ত্বকের সাহায্যে ইহার মসৃণতা এবং ত্বক্ ও পেশীর সাহায্যে ইহার আকার নির্ণয় করিয়াছিলাম। এইরূপে কতকগুলি সংবিত্তির সমবায়ে আমার লেবুর জ্ঞান হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে আমি একটি বস্তু দেখিয়া বলিলাম, "ঐ বস্তুটি লেবু"—এখন আমি ইহা আঘ্রাণ করিতেছি না, আস্বাদন করিতেছি না, স্পর্শ করিতেছি না, কেবল দেখিতেছি মাত্র। এক্ষণে একটি মাত্র সংবিত্তি উপস্থিত,—অপরগুলি অনুপস্থিত। কিন্তু, বস্তুর বর্ণটি দেখিলেই, উহার আকার, আস্বাদন, গন্ধ প্রভৃতি সকলগুলিই আমার মনে যুগপৎ উপস্থিত হইতেছে। এখানে ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত, এবং অপরাপর সংবিত্তি প্রত্যক্ষ ভাবে অনুপস্থিত হইলেও, স্মৃতি এবং সঙ্গশক্তি প্রভাবে পুনরায় চিত্তপটে উপস্থিত হইতেছে। এই স্মৃত-সংবিত্তিগুলিকে পরোক্ষ সংবিত্তি বলা যাইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বস্তু-জ্ঞান পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ উপাদানের সমন্বয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ উপাদান উপস্থিত সংবিত্তি এবং পরোক্ষ উপাদান স্মৃত-সংবিত্তি। অতএব বস্তুজ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উপাদানের সমন্বয়। এইরূপে—

"দেহ আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
এ কি অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার।

এ কি জ্যোতিঃ! এ কি ব্যোম দীপ্ত দীপ জ্বালা
দিবা আর রজনীর চির-নাট্যশালা!
এ কি শ্যাম বসুন্ধরা, সমুদ্রে চঞ্চল,
পর্ব্বতে কঠিন, তরু-পল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার। এ কি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ!
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।"

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে এই কয়টি মানসক্রিয়ার প্রয়োজন—

১। সংবিত্তি—
২। স্মৃতি—
৩। অবধান—
৪। বিচার—
(ক) সাদৃশ্যানয়ন
(খ) বৈসাদৃশ্যানয়ন।
৫। বিশ্বাস (বাহ্যজগতের অস্তিত্বে)

এবং এই কয়টি প্রধান উপকরণ—

১। প্রত্যক্ষ সংবিত্তির গ্রহণ—
২। অপ্রত্যক্ষ সংবিত্তির স্মরণ—
৩। বিষয়ী-করণ (সংবিত্তির আধার নিরূপণ)
৪। দেশ এবং কাল নিরূপণ—
৫। জাতি-জ্ঞান—বস্তুটি কোন্ জাতীয়।

সংবিত্তি এবং প্রত্যক্ষ-জ্ঞান—দুইটিই মানসিক ব্যাপার হইলেও, উহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে—যথা—

সংবিত্তি	১।	অমিশ্র মানসিক অবস্থা।
	২।	উপাদান—প্রত্যক্ষ।
	২।	স্মরণ কষ্ট-সাধ্য।
	৪।	মন নিষ্ক্রিয়।
	৫।	অনুভূতির মাত্রা অধিক।
প্রত্যক্ষ	১।	মিশ্র মানসিক অবস্থা (প্রত্যক্ষজ্ঞান=সংবিত্তি+চিন্তা)
	২।	উপাদান—প্রত্যক্ষ+অপ্রত্যক্ষ
	৩।	স্মরণ—সহজসাধ্য।
	৪।	মন সক্রিয়।
	৫।	বুদ্ধির মাত্রা অধিক।

বাহ্যবস্তু গুণ-সমষ্টি মাত্র। বাহ্যবস্তুর জ্ঞান বলিতে তাহার গুণ-সমষ্টির জ্ঞান বুঝিয়া থাকি; কারণ আমরা যাহাকে বাহ্যবস্তু বলি, তাহার গুণমাত্র প্রত্যক্ষ করি। প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাহ্য-বস্তুর অস্তিত্ব-এবং পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

বস্তু-গুণের বিচার।

অতএব এক্ষণে বস্তু-গুণের বিচার আবশ্যক। আমরা যে জগতে বাস করিতেছি, ইহা দৃশ্যমান জগৎ। ইহার দ্রব্যসমূহ, দর্শনার্হ। ইহার যে কোন বস্তু লই না কেন, উহা চক্ষু দ্বারা জানিতে পারি; অথবা, যাহা প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা স্থল, সময় ও ঘটনা-বিশেষে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব—এরূপ ধারণা আমাদের আছে। যতক্ষণ না বস্তুবিশেষকে প্রত্যক্ষ করি, ততক্ষণ যেন উহা জানা হয় না বলিয়া মনে হয়। সত্য বটে, অন্ধেরও জগৎ আছে; কিন্তু চক্ষুষ্মান্

ব্যক্তির জগৎ ও চক্ষুহীন ব্যক্তির জগতের মধ্যে অভাবনীয় পার্থক্য আছে। কতকগুলি দ্রব্য, গুণ ও দ্রব্যের ক্রিয়া লইয়া অন্ধের জগৎ। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির দ্রব্য,গুণ ও ক্রিয়াবলির নিকট উহা অতি সামান্য। আমাদের জ্ঞানের গোচরীভূত প্রায় যাবতীয় বস্তুই চক্ষু দ্বারা দেখিয়া থাকি। এই দৃশ্যমান বস্তুসমূহের সংখ্যার বা প্রকারের ইয়ত্তা নাই। অনন্ত দ্রব্যরাশির সকল প্রকার সাদৃশ্য ও বৈষম্য আমরা চক্ষু দ্বারাই উপলব্ধি করি। দুইটি পুষ্পের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা দৃশ্যমান, অর্থাৎ পুষ্প দুইটি বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও "আলো-আঁধারের" বিচিত্র সমন্বয় মাত্র। স্বর্ণ ও রৌপ্যখণ্ডের পার্থক্য বুঝিতে প্রধানতঃ বর্ণেরই পার্থক্য বুঝা যায়। প্রত্যেক বস্তুই সাধারণতঃ বর্ণ ও আলোকের বিশেষ সমন্বয় বলিয়া মনে হয়। উপরে কথিত হইয়াছে, বস্তুটির রূপ কি, না জানিলে ইহা জানাই হইল না; তদ্রূপ বস্তুটির আকৃতি, পরিমাণ, কাঠিন্য, গুরুত্ব প্রভৃতি না জানিলেও বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে জানা হইল বলিয়া মনে হয় না। যতক্ষণ না বস্তুটি হস্ত দ্বারা বা শরীরের কোন অংশ দ্বারা স্পর্শ করিয়া উহার কাঠিন্য, দার্ঢ্য ইত্যাদি উপলব্ধি না করি, ততক্ষণ উহার অস্তিত্ব বিষয়েও আমাদের প্রতীতি হয় না। চক্ষু দ্বারা দর্শন করিবামাত্র বস্তুটিকে স্পর্শ করিয়া উহার অস্তিত্ব অনুভব করা আমাদের অতি প্রয়োজনীয় মনে হয়। প্রত্যেক বস্তুরই বর্ণ, আকৃতি, কাঠিন্য ইত্যাদি গুণ ব্যতিরেকে ঘ্রাণ, শব্দ, শৈত্য ইত্যাদি গুণও আছে; কিন্তু আকৃতি, অবস্থান, গুরুত্ব ইত্যাদি গুণগুলিকে আমরা অপরাপর গুণসমূহের আধার বলিয়া মনে করি। দ্রব্যবিশেষের বর্ণ, ঘ্রাণ, স্বাদ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। অন্ধকারে কোন দ্রব্যেরই বর্ণ থাকে না। বায়ু-মধ্যে কম্পিত না হইলে কোন দ্রব্যেরই শব্দ হয় না। সুতরাং রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি, দ্রব্যের স্থায়ী গুণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। পরন্তু, কোন দ্রব্যের বর্ণ, রস জানিলেই

উহার অপর গুণ বা ধর্ম্মের বিষয় নিশ্চিতরূপে জানা যায় না; কিন্তু আকার-প্রকার, পরিমাণ জানা থাকিলে, বস্তুটি সকল স্থানে ও সকল সময়ে কি প্রকার থাকিবে, তাহা জানা হইল—অর্থাৎ উহার তথ্য জানা হইল। কোন বস্তুর গন্ধের, বা বর্ণের, বা রসের অভাব হইতে পারে; কিন্তু উহার আকৃতি, পরিমাণ বা বিস্তৃতির একান্ত অভাব হইতে পারে না। যে কোন অবস্থাতেই থাকুক, উহার কোন-না-কোন আকৃতি বা কিছু-না-কিছু পরিমাণ থাকিবেই থাকিবে। সূক্ষ্মতম অবস্থাতেও কোন বস্তু একেবারে পরিমাণশূন্য হয় না। এই কারণে বিস্তৃতি, অভেদ্যতা প্রভৃতি গুণ-সমূহকে বস্তুর প্রকৃতিগত ধর্ম্ম ও বর্ণ-গন্ধ ইত্যাদিকে মনের বিকার বলিয়া দার্শনিকেরা মনে করিতেন; কিন্তু যে ইন্দ্রিয়-প্রণালী দ্বারা আমরা বর্ণ, রস, গন্ধ অনুভব করি, সেই ইন্দ্রিয়-প্রণালী দ্বারাই আকৃতি, পরিমাণ, কাঠিন্য, গুরুত্ব ইত্যাদি অনুভব করিয়া থাকি। যদি প্রথমটি মনের বিকার মাত্র হয়, তবে শেষোক্তটি না হইবে কেন? তথাপি উপরি-উক্ত কারণে আকৃতি, পরিমাণ প্রভৃতি গুণকে মুখ্য ও বর্ণ-গন্ধ ইত্যাদিকে গৌণ ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

মুখ্যগুণ—
১। সার্ব্বজনিক।
২। অপরিবর্ত্তনশীল।
৩। সর্ব্ববাদিসম্মত।
৪। অত্যাবশ্যক।

গৌণগুণ—
১। অসার্ব্বজনিক।
২। পরিবর্ত্তনশীল।
৩। সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।
৪। অত্যাবশ্যক নহে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রত্যক্ষ বিষয়

দেশ কাল এবং গুণ এই তিনটি আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। যখনই আমরা বাহ্যজগতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখনই এই তিনটি জিনিষ আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। (১) আমরা দেখি এটি এখানে, ওটি সেখানে; এটি নিকটে, ওটি দূরে; এটি বড়, ওটি ছোট; এটির আকার এক রকম, ওটির আকার আর এক রকম। এই প্রকারে দ্রব্যগুলি দেশমধ্যে অবস্থিত। (২) আবার দেখিতেছি যে, এখানে একটি ঘটনার পর আর একটি ঘটিতেছে; একটির পর আর একটি আসিতেছে; একটির পর আর একটি যাইতেছে। ঘণ্টা বাজিল, ছাত্রেরা গৃহে ফিরিল। বিদ্যুৎ চমকিল, মেঘ ডাকিল। সূর্য্য অস্তমিত হইল, আকাশে নক্ষত্রগুলি দেখা দিল। (৩) আরও দেখিতেছি যে এখানে প্রত্যেক দ্রব্যই স্ব স্ব সদৃশ, আবার প্রত্যেক দ্রব্যই পরস্পর বিসদৃশ। কোন কোন দ্রব্যের মধ্যে সাদৃশ্য অধিক, আবার কোন কোন দ্রব্যের মধ্যে বৈসাদৃশ্য অধিক। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রত্যক্ষ ত্রিবিধ প্রকারের—

ত্রিবিধ প্রত্যক্ষ।

প্রত্যক্ষ— { দেশ প্রত্যক্ষ, কাল প্রত্যক্ষ, গুণ প্রত্যক্ষ }

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে প্রত্যেক সংবিত্তিরই বিস্তৃতি আছে, ব্যাপ্তি আছে। সংবিত্তির বিস্তৃতি জ্ঞান হইতে দেশ প্রত্যক্ষ হয়; সংবিত্তির ব্যাপ্তি জ্ঞান

হইতে কাল প্রত্যক্ষ হয়, এবং সংবিত্তির প্রকার ভেদ জ্ঞান হইতে গুণ প্রত্যক্ষ হয়।

কতকগুলি সংবিত্তি অনুভব করিতেছ। সংবিত্তিগুলি পরস্পর মিশ্রিত হইতেছে। এই সংমিশ্রণের ফলে যে জ্ঞান হইতেছে তাহাই গুণ-প্রত্যক্ষ। মাত্র সংবিত্তি সমষ্টিকে গুণ-প্রত্যক্ষ বলা হয় না। কারণ সংবিত্তি মানসিক ক্রিয়া মাত্র—ইহা মনের টুক্‌রা বিশেষ নহে। একটি ক্রিয়া আর একটি ক্রিয়ার সহিত মিলিতেছে এবং এই মিশ্রণের জন্য দুইটি ক্রিয়ারই রূপান্তর হইয়া এক অভিনব ক্রিয়ার সৃষ্টি হইতেছে কারণ একটি ক্রিয়া আর একটি ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হইতেছে। এইরূপে কতকগুলি সংবিৎ ক্রিয়ার সংমিশ্রণে যে অভিনব ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহারই নাম প্রত্যক্ষ। চাএর আস্বাদন—ইহা গুণ প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষটিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহা নানা সংবিত্তির সংমিশ্রণজনিত এক নূতন গুণ বিশেষ।

গুণ-প্রত্যক্ষ।

চাএর স্বাদ প্রত্যক্ষ {
- তিক্ত স্বাদ সংবিত্তি।
- চাএর প্রকৃত স্বাদ সংবিত্তি।
- তাপ সংবিত্তি।
- চাপ সংবিত্তি (রসনেন্দ্রিয়ের উপর জলের চাপজনিত)
- ঘ্রাণ সংবিত্তি।
- দর্শন সংবিত্তি (চাএর বর্ণজনিত) ইত্যাদি।

অন্ধকার ঘরে তুমি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতেছ। অনবধানতা হেতু তোমার পায়ে আঘাত লাগিল। তুমি বুঝিতে পারিলে তোমার "পায়ে" আঘাত লাগিয়াছে; আরও বুঝিলে যে, তোমার "বাম" পায়ে আঘাত

দেশ-প্রত্যক্ষ, স্থানিক চিহ্ন।

লাগিয়াছে ; আরও বুঝিতে পারিলে যে তোমার "জানুর নীচে" আঘাত লাগিয়াছে। এইরূপে যে স্থানে তোমার আঘাত লাগিয়াছে তোমার সেই স্থানবিশেষের জ্ঞান হইতেছে। এ জ্ঞানের মূল কি? কেমন করিয়া বুঝিলে যে, তোমার এই স্থানে আঘাত লাগিয়াছে? মনে করিতে পার যে এক স্থানের চাপ-সংবিত্তি অন্য স্থানের চাপ-সংবিত্তি হইতে বিভিন্ন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। চাপ-সংবিত্তির মধ্যে প্রকারগত পার্থক্য নাই। সকল স্থানেরই চাপ-সংবিত্তি, চাপ-সংবিত্তি ব্যতীত অন্য সংবিত্তি নহে, কিন্তু তথাপি স্থান বিশেষ স্পর্শ করিলে আমরা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারি কোন্ স্থানটি স্পৃষ্ট হইতেছে। অতএব আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, চক্ষু, চর্ম্ম ও সন্ধিস্থল হইতে উৎপন্ন সংবিত্তি সমূহের "স্থানিক চিহ্ন" আছে, যে চিহ্নের সাহায্যে স্থান বিশেষের পরিবর্ত্তন ঘটিলে তৎক্ষণাৎ আমাদের সেই স্থানের জ্ঞান হইয়া থাকে। একটি ভেকের মস্তক হইতে মস্তিষ্ক পিণ্ডটি অতি সাবধানে সরাইয়া লও। তৎপরে বৈদ্যুতিক প্রবাহের দ্বারা তাহার শরীরের কোন একটি অংশ উত্তেজিত কর,—দেখিবে যে, ভেকটি তাহার পায়ের সাহায্যে ঠিক সেই অংশটুকু স্পর্শ করিতেছে।

দেশ প্রত্যক্ষ, অবস্থান।

কোন বস্তুর অবস্থান প্রত্যক্ষ করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের জ্ঞান "কোথায়" আছে এবং "কতদূরে" আছে। "স্থানিক চিহ্নের" সাহায্যে আমরা চর্ম্মের স্থান নির্ণয় করিতে পারি, চর্ম্মের উপর কোন স্থানের পরিবর্ত্তন ঘটিলে, কোন্ স্থানে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু আমাদের চক্ষুরও কি "স্থানিক চিহ্ন" আছে যাহার সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমরা চক্ষুর কোন্ স্থানে দেখিতেছি? হাঁ, চক্ষুরও "স্থানিক চিহ্ন" আছে। একটি ক্ষুদ্র লাল চিহ্ন লও। এই চিহ্নটি অক্ষি-

পট্টের কেন্দ্রস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া বাহিরের দিকে আস্তে আস্তে সরাইয়া লও। তোমার চক্ষু নিশ্চল রাখিবে। ইহা ঐ বর্ণটির অনুসরণ করিতে পাইবে না। বর্ণটি যতক্ষণ অক্ষিপট্টের কেন্দ্রস্থলে থাকিবে, ততক্ষণ ইহা লাল দেখাইবে; ইহা যখন কেন্দ্র হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যাইবে, তখন ইহা নীলাভ হইবে; পরে যখন আরও দূরে যাইবে, তখন ইহা একবারে কাল হইয়া যাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চক্ষুর সাহায্যেও আমাদের "কোথায়" জ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু যদি আমরা কেবল দর্শন-সংবিত্তির উপর নির্ভর করি, তাহা হইলে বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইব। কারণ মাত্র দর্শন সংবিত্তি হইতে সকল সময়েই বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান লাভ হয় না। যখন ঐ লাল বস্তুটি অক্ষিপট্টকেন্দ্র হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইতেছে, তখন তুমি বর্ণ প্রত্যক্ষ করিতেছ সত্য কিন্তু ইহা স্বরূপ বর্ণ নহে। স্বরূপ বর্ণটি লাল, কিন্তু এখন তুমি যাহা দেখিতেছ তাহা নীল। কিন্তু স্বরূপ প্রত্যক্ষই আমাদের প্রয়োজন। জিনিষটি যেমন ঠিক তেমনিটিই আমরা দেখিতে চাই—ইহাকে রূপান্তরিত করিয়া দেখা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সেই জন্য লাল বর্ণটিকে আমরা নীল বর্ণে পরিণত করিতে চাই না। লাল বর্ণটি যেই কেন্দ্রস্থল ত্যাগ করিয়া নীলবর্ণে পরিণত হইতেছে, অমনি আমরা ইহাকে কেন্দ্রাভিমুখী করিতেছি। বর্ণটিকে কেন্দ্র-বহির্ভূত থাকিতে দিতেছি না, চক্ষু কেন্দ্রকে সেই বর্ণের দিকেই চালিত করিতেছি। অক্ষিকেন্দ্রকে দৃষ্ট বস্তুর দিকে চালিত করিলে, অক্ষিগোলকের পেশী সমূহ আকৃষ্ট হইয়া পৈশিক সংবিত্তির সৃষ্টি করে। এক এক প্রকার দৃষ্টিতে এক এক প্রকার পৈশিক সংবিত্তি হইতেছে। অতএব পৈশিক সংবিত্তিও বস্তুর অবস্থান-জ্ঞানের বিশেষ সহায়। বস্তুটি দৃষ্টিক্ষেত্রের কোন্ স্থানে অবস্থিত, তাহা পৈশিক সংবিত্তি সাহায্যেও জানা যায়। আবার এই পৈশিক সংবিত্তি

সাহায্যে বস্তুর দূরত্বও নির্ণয় করিতে পারি। বস্তুটি যত নিকটবর্ত্তী হয় পৈশিক সংবিত্তির পরিমাণও তত বৃদ্ধি পায় এবং ইহা যত দূরবর্ত্তী হয় পৈশিক সংবিত্তির পরিমাণও তত কমিয়া যায়। দ্রব্যটি বামদিকে থাকিলে এক প্রকার পৈশিক ক্রিয়া হয়, দক্ষিণ দিকে থাকিলে আর এক প্রকার, ঊর্দ্ধে থাকিলে আর এক প্রকার এবং নিম্নে থাকিলে আর এক প্রকার ক্রিয়া হয়।

দেশ প্রত্যক্ষ, অঙ্গস্থিতি।

দর্শনেন্দ্রিয় এবং পৈশিকেন্দ্রিয় এই দুই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আমাদের অঙ্গস্থিতি জ্ঞান হয়। কেমন ভাবে বসিয়া আছি, কেমন ভাবে দাঁড়াইয়া আছি, বসিয়া আছি না দাঁড়াইয়া আছি ইত্যাদি আমরা দেখিতে পাই। আবার এক এক প্রকার অবস্থানের এক এক প্রকার পৈশিক-সংবিত্তি হয় বলিয়া চক্ষুর সাহায্য না লইয়াও শরীরের অবস্থান বিষয় জানিতে পারি। আমাদের শরীরের অবস্থান জ্ঞান বিষয়ে ত্বক্ এবং সন্ধিস্থান সমুৎপন্ন সংবিত্তি সমূহ বিশেষ কার্য্যকরী। আমাদের পদতলের চর্ম্ম যদি সংবিত্তি উৎপাদনে অক্ষম হইত, তাহা হইলে আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে চলাচল করিতে পারিতাম না। আমাদের কটিদেশ হইতে যদি ভার-সংবিত্তি না হইত, তাহা হইলে আমাদের দৈহিক অবস্থান নির্ণয়ে বিপত্তি ঘটিত। একখানি তক্তার উপর লম্বা হইয়া শুইয়া থাক। তক্তাখানি এমন ভাবে রাখ যে, ইহার একদিক উঠাইলে অন্যদিকটি নামিয়া যায়। তুমি চক্ষু মুদ্রিত কর। এক্ষণে তোমার মস্তকের দিকটি আস্তে-আস্তে নামান হইতেছে। তুমি যখনই বুঝিতে পারিবে যে, তুমি তোমার "মাথার উপর দাঁড়াইয়াছ," তখনই তোমাকে তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কিন্তু তুমি তোমার "মাথার উপর দাঁড়াইবার" বহু পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিবে যে, "এইবার হইয়াছে"। যে মুহূর্ত্তে তুমি তোমার স্কন্ধদেশের উপর ভার অনুভব

করিবে এবং যখনই তোমার মেরুদণ্ডের গ্রন্থি সমূহের সংঘর্ষণ আরম্ভ হইবে, তখনই তোমার মনে হইবে যে, তুমি তোমার "মাথার উপর দাঁড়াইয়াছ"। আবার যদি তোমাকে এই অবস্থা হইতে পুনরায় ক্ষিতিজ-সমান্তরাল অবস্থায় আনা যায়, তাহা হইলে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবার বহু পরে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তোমাকে পূর্ব্বাবস্থায় রাখা হইয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার স্কন্ধদেশ হইতে পূর্ব্ব ভার-সংবিত্তি অপসৃত না হয়, ততক্ষণ তুমি তোমার সাম্যভাবাবস্থার বিষয় বুঝিতে পারিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শরীরের ভার বিতরণ এবং গ্রন্থি সংঘর্ষণ, অঙ্গস্থিতি-প্রত্যক্ষ বিষয়ে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়া থাকে।

পৃথিবী অনবরত ঘুরিতেছে। কিন্তু পৃথিবীর গতির বিষয় আমাদের প্রত্যক্ষ নহে, কারণ এ গতি একটানা এবং একরকম। যখন তুমি

দেশ প্রত্যক্ষ, গতি।

অর্ণবপোত বা বায়ুপোতে আরোহণ করিয়া গমনাগমন কর, তখন অনেক সময়েই তোমার গতির বিষয় তুমি উপলব্ধি করিতে পার না, অনেক সময়েই তোমার মনে হয় যেন পোতখানি নিশ্চল নিষ্কম্প হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তুমি যখন তোমার চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষ, গৃহ ইত্যাদি দেখ, তখন বুঝিতে পার যে, পোতখানি সচল। যখন গতির কোন পরিবর্ত্তন হয় না, যতক্ষণ ইহা একটানা এবং একরকম, ততক্ষণ ইহার উপলব্ধি হয় না। কিন্তু যখনই গতির হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তখনই আমরা ইহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। গাড়ীখানি চলিতে-চলিতে হঠাৎ থামিতেছে, আর তুমিও সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছ; হঠাৎ ইহার বেগ বৃদ্ধি হইতেছে, আর তুমিও পশ্চাতের দিকে হেলিয়া পড়িতেছ। যখন তুমি সম্মুখে বা পশ্চাতে ঝুঁকিতেছ, তখন তোমার শরীরের ভারসাম্যের বিপর্য্যয় ঘটিতেছে; তোমার চর্ম্ম-দেশের উপর চাপের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে;

কোন কোন পেশীর সঙ্কোচ হইতেছে; কোন কোন পেশীর সম্প্রসারণ হইতেছে; কোন কোন তন্তু আকৃষ্ট হইতেছে, আবার কোন কোন তন্তু কুঞ্চিত হইতেছে; কোথাও বা সন্ধিস্থলের সংঘর্ষণ হইতেছে, আবার কোথাও বা সন্ধিস্থল বিপরীতমুখী হইতেছে। এই প্রকার সংবিৎ-সমষ্টি হইতে আমাদের গতিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। চক্ষুর সাহায্যেও আমাদের গতিজ্ঞান লাভ হয়। গাড়ীখানি চলিয়া যাইতেছে, ইহা আমরা দেখিতেছি। এক সেকেণ্ড পূর্ব্বে গাড়ীখানি ঐ বৃক্ষের নিকট ছিল, তার পর ঐ বৃক্ষের নিকট, তার পর ঐ বৃক্ষ, ঐ বৃক্ষ ......। যদি গাড়ীর সঙ্গে জগতের সমস্ত জিনিষই সমান বেগে চলিতে থাকিত, তাহা হইলে চক্ষুর সাহায্যে গাড়ীর গতির জ্ঞান আমাদের হইত না।

ত্বক সাহায্যে গতি নির্দ্দেশ।

তোমার শরীরের উপর দিয়া একটি পিপীলিকা চলিয়া যাইতেছে, তাহা তুমি বুঝিতেছ। অতএব ত্বক্-সংবিত্তির সাহায্যে ত্বকের উপর অপর বস্তুর গতিজ্ঞান সম্ভব। কিন্তু ত্বকের উপর কোন বস্তুর গতিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সেই বস্তুটি যতক্ষণ ত্বকের একটি স্থানিক চিহ্ন হইতে অপর স্থানিক চিহ্নে না যায় ততক্ষণ ইহার গতিজ্ঞান হইবে না। এবং ত্বকের উপর বস্তুটির চাপ যদি অতি মৃদু হয় এবং ইহার গতি যদি অতি মন্থর হয়, তাহা হইলে আমাদের গতিজ্ঞান হইবে না; কারণ দ্বিতীয় স্থানিক চিহ্নে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই প্রথম স্থানিক চিহ্ন-সংবিত্তি স্মৃতিবহির্ভূত হইয়া যাইবে। তোমার বন্ধুকে তোমার সম্মুখে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিতে বল। তুমি একখানি খুব নরম কয়লা দিয়া তোমার বন্ধুর বাহুর নিম্নদেশের কোন স্থান স্পর্শ কর। তোমার বন্ধুকে বল যে, যখনই সে কয়লার গতি বুঝিতে পারিবে তখনই সে এক প্রকার সঙ্কেত করিবে। এক্ষণে তুমি কয়লাখানি আস্তে-আস্তে সরাইতে

থাক। কয়লার গতি যেন একরকম এবং একটানা হয়। দেখিবে যে, যখনই কয়লার গতি আরম্ভ হইবে, ঠিক তখনই তোমার বন্ধু ইহার গতি উপলব্ধি করিতে পারিবে না। কয়লাখানি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে পর, তোমার বন্ধু বুঝিতে পারিবে যে, ইহা চলিতেছে। কয়লার গতি যদি বামাবর্ত্ত বা দক্ষিণাবর্ত্ত হয়, তাহা হইলে ইহার গতি বুঝিতে যতটুকু সময় লাগিবে, ইহার গতি উর্দ্ধ বা অধোগামী হইলে ইহার গতি উপলব্ধি করিতে তদপেক্ষা অধিক সময় লাগিবে।

সন্ধি-সংবিত্তি সাহায্যে যে সকল গতি নির্দ্দেশ হয়, তাহা আমাদের নিজের শরীরাবয়বের বা ইহার অংশ বিশেষের গতি মাত্র। এখানেও গতি আরম্ভ হইতেই গতি জ্ঞান হয় না। আবার, তোমার বন্ধুকে একখানি টেবিলের সম্মুখে বসাও। টেবিলের উচ্চতা সাধারণ টেবিল অপেক্ষা কম হইবে। টেবিলের উপর একখানি দেড় হস্ত পরিমিত লম্বা পাতলা তক্তা রাখ। তোমার বন্ধুর হাতখানি ঐ তক্তার উপর রাখিতে বল। হস্তের তলদেশ উপরের দিকে থাকিবে এবং কনুই টেবিলের কিনারা পর্য্যন্ত আসিবে। কনুই হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সমস্ত অংশটুকু তক্তাখানির উপর ন্যস্ত থাকিবে। হাতখানি একবারে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিবে। তোমার বন্ধুকে চোখ বন্ধ করিতে বল। এক্ষণে তক্তার যে প্রান্তে অঙ্গুলি ন্যস্ত সেই প্রান্তটি ধরিয়া অতি সন্তর্পণে এবং অতি আস্তে-আস্তে তক্তাখানি উঠাইতে থাক। তক্তাখানি তুলিবার সময় যেন কোন রকম ধাক্কা না লাগে, বা কোন প্রকার শব্দ না হয়। দেখিবে যে তক্তাখানি কিয়দ্দূর উঠিলে পর তোমার বন্ধুর গতিজ্ঞান হইতেছে।

সন্ধি সাহায্যে গতি নির্দ্দেশ।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, চক্ষুর সাহায্যেও গতিজ্ঞান হইয়া থাকে।

কোন নির্দ্দিষ্ট নিশ্চল বস্তুর তুলনায় অপর সচল বস্তুর গতিজ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু এই নির্দ্দিষ্ট নিশ্চল বস্তুর অভাবে, মাত্র চক্ষুলব্ধ গতিজ্ঞানকে নিশ্চয় জ্ঞান বলা যাইতে পারে না। তোমার বন্ধুকে একখানি অন্ধকার ঘরের ভিতর বসাও। অতি ক্ষীণ আলোক বিশিষ্ট একটি লণ্ঠন লইয়া তোমার বন্ধুর সম্মুখস্থ দেওয়ালের উপর আলোর একটি দাগ ফেল। এই দাগটিকে বার-বার অদৃশ্য করিয়া দাও। এই দাগটির আবির্ভাব এবং তিরোভাবের মধ্যে সময়ের কোন স্থিরতা থাকিবে না। অর্থাৎ কখন এক সেকেণ্ড পরে, কখনও বা দুই সেকেণ্ড পরে ইহা আবির্ভূত হইবে। ইহার স্থায়িত্বকালেরও কোন স্থিরতা থাকিবে না। কখন কখন দুই সেকেণ্ড, কখন বা তিন সেকেণ্ড স্থায়ী হইবে, কখন আরও বেশী স্থায়ী হইবে। কখন বা ইহা নিশ্চল থাকিবে, কখন বা সচল হইবে। তোমার বন্ধু, কখন এই দাগটি সচল এবং কখন ইহা অচল, বলিতে প্রায়ই ভুল করিয়া ফেলিবে।

চক্ষু সাহায্যেও গতি জ্ঞান।

সংবিত্তি মাত্রেরই স্থায়িত্ব আছে। অতএব সকল প্রকার সংবিত্তি হইতেই সময় প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যখন আমরা চলাচল করি, তখন আমাদের পদদ্বয় এবং হস্তদ্বয় দুলিতে থাকে। যখন দক্ষিণ পদ চলে, তখন বাম হস্তখানিও চলে; আবার যখন বামপদখানি চলিতে থাকে, তখন দক্ষিণ হস্তখানিও চলিতে থাকে। যখন এক পদ চলে, তখন অন্য পদ বিশ্রাম করে। মনে কর, বাম পদের উপর দাঁড়াইয়া আছি। এক্ষণে এই পদের তলদেশের চর্ম্মের উপর খুব চাপ পড়িতেছে; জানুদেশে এবং কটিদেশেও অত্যন্ত চাপ পড়িতেছে। দক্ষিণ পদখানি এক্ষণে শূন্যের উপর। এ পদেও চাপ-সংবিত্তি বর্ত্তমান, কিন্তু ইহার পরিমাণ খুব কম। এখানে

কাল প্রত্যক্ষ, ছন্দ।

গতি-সংবিত্তি আছে; জানুদেশে এবং কটিদেশে চাপ-সংবিত্তির অভাব জ্ঞানও বর্ত্তমান। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চলন কার্য্যে এক পদের সংবিত্তির পরিমাণ অধিক, আর এক পদের অল্প। যেমন—

বাম পদ ভূমিতে—অধিক;
দক্ষিণ পদ শূন্যে—অল্প;
দক্ষিণ পদ ভূমিতে—অধিক;
বাম পদ শূন্যে—অল্প;
বাম পদ ভূমিতে—অধিক;
দক্ষিণ পদ শূন্যে—অল্প।

এইরূপে অধিক অল্প, অধিক অল্প, অধিক অল্প, অধিক অল্প ইত্যাদির ক্রমিক জ্ঞান হইতেছে। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াতেও এইরূপ ক্রমিক পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। যখন শ্বাস গ্রহণ করি তখন ইহা হ্রস্ব, আর যখন ত্যাগ করি, তখন ইহা দীর্ঘ। এখানে হ্রস্ব দীর্ঘ, হ্রস্ব দীর্ঘ, হ্রস্ব দীর্ঘ ইত্যাদি ক্রমিক পরিবর্ত্তন জ্ঞান হইতেছে। এই প্রকার সুশৃঙ্খল, পর্য্যায়ক্রমে পরিবর্ত্তন জ্ঞান হইতেই আমাদের ছন্দ জ্ঞান হয়।

উপরি উক্ত দেশ কাল এবং গুণ প্রত্যক্ষ ত্রয়ের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইতেছে যে, জাগতিক ব্যাপার সমূহের বিশ্লেষণকেই প্রত্যক্ষীকরণ বলা হয়।

প্রত্যক্ষীকরণের উদ্দেশ্য।

মনের যখন পূর্ণ বিকাশ হয় নাই, মন যখন অপরিপক, তখন জগতের বস্তুসমূহের মধ্যে শৃঙ্খলা দেখিতে পাই না, সকলই বিশৃঙ্খল বলিয়া মনে হয়। পরে যখন জ্ঞানের উন্মেষ হয়, ইন্দ্রিয় সমূহ পরিপুষ্ট হয়, তখন ক্রমশঃই আমরা বিশৃঙ্খলার ভিতর শৃঙ্খলা উপলব্ধি করিতে শিখি। আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয় জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। এই সকল দ্বার দিয়াই বাহ্যজগৎ মনোজগতে

প্রবেশ লাভ করে। এই দ্বার সমূহ যতই পরিপুষ্ট, যতই ইহাদের সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য বাড়িয়া যায়, ততই আমরা জগৎকে নানা অংশে—গুণ অংশে, দেশ অংশে এবং কাল অংশে—বিভক্ত করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য উপভোগে সমর্থ হই। জগতের সকল বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা মানব মনের পক্ষে সম্ভব নহে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার কর, ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন কর; কিন্তু তবুও হয়ত আকাশের কত তারা, কত নক্ষত্র, আমাদের দৃষ্টির অগোচর থাকিয়া যাইবে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি যতই শক্তিশালী হউক না কেন, তথাপি কি ইহা সকল অণুই পর্য্যবেক্ষণে সমর্থ হইবে? তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যতই আমাদের প্রত্যক্ষীকরণ শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, ততই আমরা জগতের নূতন নূতন তথ্যের অধিকারী হইব, ততই নূতন নূতন বিষয়ের জ্ঞানলাভে সমর্থ হইব। প্রত্যক্ষই জ্ঞানের প্রধান সহায়। প্রত্যক্ষের উপরই বিজ্ঞান-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

বস্তু প্রত্যক্ষ

বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ দুইটি পরস্পরের সম্মুখীন ও সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্ম-সংযুক্ত। বহির্জগৎ বিরাট, অন্তর্জগৎ ক্ষুদ্র, বহির্জগৎ দেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে; অন্তর্জগৎ কোনও দেশব্যাপী নহে। বহির্জগতের বস্তুমাত্রেই

অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ।

এক-একটি দেশ বা স্থানব্যাপক; অন্তর্জগতের বস্তুসমূহ একটির পর একটি করিয়া সংঘটিত হয়; বহির্জগতের ঘটনাবলি যুগপৎ সংঘটিত হয়। বহির্জগৎ শরীরের বাহিরে অবস্থিত; অন্তর্জগৎ শরীরের বাহিরে কি ভিতরে—এ কথা অর্থহীন; অন্তর্জগৎ চৈতন্যময়, বহির্জগৎ জড়; অন্তর্জগৎ আত্মময়; বহির্জগৎ অনাত্মময়; বহির্জগৎ আমাদের শরীর হইতে স্বতন্ত্র; ইহা বিরাট দেশ মধ্যে অবস্থিত; ইহার প্রত্যেক বস্তুই ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মহাকায় পর্ব্বত হইতে ক্ষুদ্রতম পরমাণু পর্য্যন্ত সকল দ্রব্যেরই দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ আছে। বহির্জগতের সকল দ্রব্যই স্থানব্যাপক ও অভেদ্য; অর্থাৎ আমাদের গতি বা চেষ্টাকে বাধা দিতে সমর্থ। চেষ্টা করিলেই আমরা হস্তদ্বারা পর্ব্বত ভেদ করিতে পারি না। আমাদের পর্ব্বত-ভেদের চেষ্টা প্রতিহত হয় ও স্বতন্ত্র,—আমাদের চেষ্টা-রোধ-কারী অপর পদার্থে বিশ্বাস আমাদের মনে দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হয়। যাহা আমাদের ইচ্ছাকে বাধা দেয়, তাহা অবশ্য আমাদের ইচ্ছার বহির্ভূত ও বলপ্রয়োগে সমর্থ অন্য বস্তু। আমার হস্তস্থিত কলমটি, দীর্ঘ, প্রস্থ, গভীর ও কঠিন; এবং ইহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিলে ইহাও বিপরীত বলপ্রয়োগ দ্বারা আমার ইচ্ছাকে বাধা দেয়। ইহা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধবিশিষ্ট স্বতন্ত্র পদার্থ, এ জ্ঞান কিরূপে হইল—এ প্রশ্ন স্বতঃই মনের মধ্যে উদয় হয়।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, ইন্দ্রিয়-সাহায্যেই প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সকল গুণ প্রত্যক্ষ করা যায় না। বিশেষ-বিশেষ ইন্দ্রিয় বস্তুজ্ঞানের বিশেষ-বিশেষ দ্বার।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের স্থান।

নাসিকা দ্বারা সুগন্ধ গ্রহণ করিয়া পুষ্প-বিশেষের জ্ঞান লাভ করিতে পারি; জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন করিয়াও বস্তুবিশেষকে জানিতে পারি; কিন্তু অধিকাংশ বস্তুই

আমরা ত্বক্, কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা জানিয়া থাকি। এই জন্য বস্তুর জ্ঞানলাভে শেষোক্ত তিন ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আবার, এই তিনের মধ্যে ত্বক্ ও চক্ষুর প্রাধান্য আরও গুরুতর। চক্ষু দ্বারা আমরা অধিকতর সংখ্যার ও প্রকারের দ্রব্যগুণসমূহ জানিতে পারি। শ্রবণ বা স্পর্শন দ্বারা এত পরিমাণ ও এত বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যগুণ আমরা জানিতে পারি না। শব্দমাত্রেই শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। মানুষের ভাষা শব্দ ও শব্দের বিভিন্ন প্রকারের সমাবেশ মাত্র। ভাষা আছে বলিয়াই মানুষের প্রাধান্য। এই ভাষার দ্বারাই আমরা পরস্পরকে জানিতে পারি। ভাষার দ্বারাই যাবতীয় অপ্রত্যক্ষ বস্তু জানিতে পারি এবং অপরকে জানাইয়া থাকি। সাধারণ ভাষার তাল-মান-রাগ নাই। শব্দসমূহ তাল-মান-রাগে সন্নিবিষ্ট হইলেই সঙ্গীত হয়। রাগের অসংখ্য প্রকার-ভেদ আমরা কর্ণ দ্বারা অনুভব করিতে পারি। ঘ্রাণ ও রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারাও আমরা জগতের অনেক বস্তু ও দ্রব্যগুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ; কিন্তু সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের হিসাবে জিহ্বা ও নাসিকা-গ্রাহ্য দ্রব্যগুণ অপরেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে ন্যূন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন বস্তুর রূপ, আকৃতি শব্দ ইত্যাদি জ্ঞানের পক্ষে যত প্রয়োজনীয়, স্বাদ বা ঘ্রাণ তত প্রয়োজনীয় নহে। সাধারণতঃ পঞ্চেন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া আমরা জগতের বস্তু সমূহকে প্রত্যক্ষ করি। প্রজ্ঞাত দ্রব্যসমূহকে আমাদের জীবন রক্ষা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের হিসাবে উচ্চ ও নিম্ন স্থান দেওয়া হয়। এতদনুসারে যে সকল ইন্দ্রিয় আমাদের জ্ঞানের অধিক সহায়, সেই সকল ইন্দ্রিয়কে উচ্চতর ইন্দ্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই শ্রেণীবিভাগে দর্শনেন্দ্রিয় সর্ব্বোচ্চ, তন্নিম্নে শ্রবণেন্দ্রিয়, তন্নিম্নে স্পর্শনেন্দ্রিয় ও তৎসহগামী গতীন্দ্রিয়। তৎপরে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও সর্ব্বনিম্নে রসনেন্দ্রিয়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ—প্রধানতঃ এই দুইটি মাত্র

গুণ গ্রহণ করিয়া থাকি, এবং ইহাদের কতকগুলি প্রকার-ভেদও অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু গন্ধবিশেষের জ্ঞান ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। গন্ধ দ্বারা অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ দ্রব্যের জ্ঞান হয়; রসনা দ্বারা অম্ল, মধুর, তিক্ত, কটু, কষায়, লবণ ইত্যাদির জ্ঞান হয়, এবং আস্বাদ দ্বারা বহু দ্রব্যের গুণ ও প্রকৃতি আমরা জানি ও পরীক্ষা করিয়া থাকি। কিন্তু দুইটি মিষ্ট রসের মধ্যে পার্থক্য রসনা দ্বারা অনুভব করা অনেক সময়ে সুকঠিন। অনেক সময় ঘ্রাণ রস বলিয়া ও রস ঘ্রাণ বলিয়া ভ্রম হয়। চক্ষু ও কর্ণ দ্বারা আমরা বহু দুরস্থ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারি; কিন্তু জিহ্বার দ্বারা মাত্র ইহার উপরে স্থাপিত বস্তুই উপলব্ধি করিতে পারি; এবং নাসিকা দ্বারা অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ দ্রব্যেরই ঘ্রাণ গ্রহণ করিতে পারি; জিহ্বার ন্যায় ত্বক্ দ্বারা আমরা ত্বক্-সংলগ্ন বস্তুরই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি; কিন্তু ত্বকের ভিন্ন-ভিন্ন অংশ-সংলগ্ন ভিন্ন-ভিন্ন বস্তুর পৃথক্-পৃথক্ জ্ঞান হইয়া থাকে। মাত্র ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা উষ্ণ ও শীতল, মসৃণ ও রুক্ষ বস্তু অনুভব করি; কিন্তু আমাদের শরীরের গতিশীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহে ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত গতীন্দ্রিয়ের সাহচর্য্যহেতু, আমরা ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুণ সকলের জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হই। বস্তুর দূরত্ব, দেশ, অবস্থান, বিস্তার, কাঠিন্য, গুরুত্ব, আমরা ত্বগিন্দ্রিয় ও গতীন্দ্রিয়ের সংযোগ-ক্রিয়ার দ্বারা অনুভব করি। এই দুই ইন্দ্রিয়ের সহযোগ ও সাহচর্য্য এত ঘনিষ্ঠ যে, উভয় ইন্দ্রিয়ের সমন্বয় গতি-স্পর্শেন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়। ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের জীবন-রক্ষার উপযোগী দ্রব্য ও দ্রব্যগুণসমূহকে উপলব্ধি করা সম্ভব বলিয়াই অন্ধ ও বধির ব্যক্তিও বস্তু-জগতের সহিত প্রয়োজনমত কারবার করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ত্বগিন্দ্রিয় অতি অল্প মাত্র ব্যবধান-স্থিত দ্রব্যকেও গ্রহণ করিতে অসমর্থ; সেই জন্য চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণ

অধিকতর জ্ঞানলাভ দ্বারা জীবন সংগ্রামে অধিকতর কৃতকার্য্য হয়। আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় অসংখ্য শব্দ ও অসংখ্য রাগাদির জ্ঞান গ্রহণে সমর্থ। যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গতি ও স্পর্শ-জ্ঞানের সংযোগ হেতু ত্বগিন্দ্রিয় বহু জ্ঞানের উপায়ভূত হইয়াছে, তদ্রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয় গতিশীল হওয়াতে উহা দ্বারা আমরা অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছি। চক্ষুর্দ্বয় গতিশীল না হইলে আমাদের ঐ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞান অপেক্ষাকৃত কম হইত। কর্ণ গতিশীল নহে। উহার মাংসপেশীর গতি আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। তথাপি, আমাদের মস্তক কতক পরিমাণে সঞ্চালন করিতে পারি বলিয়া উহার সঞ্চালন-সাহায্যে কর্ণ দ্বারা শব্দের দিক্ নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। উপরে যে ইন্দ্রিয়ের শ্রেণী-সন্নিবেশ করা হইয়াছে, তাহাতে গতীন্দ্রিয়ের স্থান বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। ইহা স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহিত অভিন্ন ভাবে বহুদিন যাবৎ গৃহীত হইয়া আসিতেছে। এই দুইএর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ; সে জন্য উহা স্পর্শেন্দ্রিয়ের সমান স্থান পাইবার যোগ্য।

উপরিউক্ত পাঁচ বা ছয় ইন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদের বস্তুজ্ঞানের অন্য উপায় নাই। দীর্ঘ বা প্রস্থ বা যে কোন দ্রব্য-গুণই হউক, আমরা এই কয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করি। দ্রব্যের গুণ-মাত্রেই আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ। বিস্তার ও অভেদ্যতাই বস্তুর সর্ব্বপ্রধান ও মুখ্য গুণ। অপর গুণ সকল ইহাদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। কাঠিন্য পেশীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বাধা-জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিস্তার অর্থে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ বুঝায়। ইহারা দেশ বা স্থানে এক-একটি রূপ মাত্র। ইহারা এক-একটি পেশীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ অর্থাৎ গতি জ্ঞানের সমষ্টি মাত্র। দক্ষিণ হইতে বাম বা বাম হইতে দক্ষিণ দিকে হস্ত পদ বা সমগ্র শরীরের অবাধ গতিতে প্রতিমুহূর্ত্তে যে গতি-জ্ঞান হয়, উহার পর্য্যায়কে প্রস্থ এবং ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ বা অধঃ হইতে ঊর্দ্ধ দিকে ঐ গতিতে যে প্রত্যক্ষ-

পরম্পরা হয় উহাকে দৈর্ঘ্য, এবং তোমার উপস্থিত অবস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া শরীর হইতে দূরদেশের গতিতে যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হয় উহার সমষ্টিকে বস্তুর বেধ বা গভীরতা বলে।

সাধারণতঃ মনুষ্য দর্শন ও স্পর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা চতুর্দ্দিকৃস্থ বস্তুর জ্ঞান গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু অন্ধ ব্যক্তিও যে উহাদিগকে জানিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি এই বস্তুটি দূরে, অপরটি নিকটে, একটি দক্ষিণে, অন্যটি বামে, একটি উর্দ্ধে, একটি নিম্নে, একটি বৃহৎ, একটি ক্ষুদ্র; একটি গোলাকার, একটি চতুষ্কোণ—ইত্যাদি জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়, তেমনি অন্ধ ব্যক্তিও দূর-নিকট, দক্ষিণ-বাম, বৃহৎ-ক্ষুদ্র, গুরু লঘু প্রভৃতি বাহ্যবস্তুর মুখ্য গুণসমূহ সম্যক্ অনুভব করিতে সমর্থ।

ত্বাচ প্রত্যক্ষ ও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ।

চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির মনে হয় যে, সে আলোক ও বর্ণমালা ছাড়া উপরি-উক্ত গুণসমূহকে মাত্র চক্ষু দ্বারাই জানিয়া থাকে—য়েন অন্য ইন্দ্রিয়ের ইহাতে কোন প্রকার সহায়তা নাই। আমরা পরে দেখিব যে, দ্রব্যের মুখ্য ধর্ম্মগুলির মধ্যে কাঠিন্য ও গুরুত্ব মাত্র ত্বগিন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য এবং অপরগুলি ত্বগিন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় উভয়েরই গ্রাহ্য। আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় ত্বগিন্দ্রিয় অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী বলিয়া ত্বগিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণগুলিও দর্শনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণে অনূদিত হইয়া দর্শনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিশেষতঃ দুইটি ইন্দ্রিয়ই একযোগে সর্ব্বদা কর্ম্ম করে এবং পরস্পরের সহায়তা করে বলিয়া, কোন্‌টি চক্ষুর বিষয়, কোন্‌টি বা ত্বকের বিষয়, তাহা আমাদের পৃথক্ করার প্রয়োজন হয় না, বা করা সম্ভব হয় না। সাধারণ মনুষ্যের বাহ্যবস্তু সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞানমাত্রই এই দুই ইন্দ্রিয়ের সহযোগ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু অন্ধ ব্যক্তিতে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে উৎপন্ন। বাহ্যবস্তুর জ্ঞান ত্বাচ ও দর্শন-প্রত্যক্ষ

হইলেও, উহাদের পৃথক্ প্রকৃতি, প্রকার, উৎপত্তি ও বিকাশের নিয়ম বিশেষ ভাবে মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য। আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, বস্তুর কোন্-কোন্ গুণ ত্বক্ দ্বারা উপলব্ধি করি, এবং কি উপায়ে তত্তৎ জ্ঞানের পরিণতি হয়। আমরা চক্ষুষ্মান্। চক্ষুবিহীন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা আমাদের থাকিতে পারে না। সুতরাং অন্যত্র অন্ধ ব্যক্তির ব্যবহার ও নিজের অভিজ্ঞতার উপর অনুমান প্রতিষ্ঠিত করিয়া যতদূর সম্ভব এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব।

ত্বাচ প্রত্যক্ষ।

মাত্র ত্বক্ দ্বারা উষ্ণ, শীতল, মসৃণ, রুক্ষ—কেবল ইহাই অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু যখন কোন দ্রব্য হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া উহা শক্ত কি নরম, উহা এত স্থান ব্যাপিয়া আছে, উহা এত বড় কি এই আকৃতির—এইরূপ জ্ঞান হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, স্পর্শের সহিত অঙ্গুলি অথবা অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতির সংযোগ হওয়াতে, এইরূপ জ্ঞান হইতেছে। গতিবিহীন স্পর্শ আমাদের হয় কি না সন্দেহ। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একবারে নিশ্চল রাখিয়া, ঈষদুষ্ণ জলপূর্ণ পাত্রে শরীর নিমজ্জিত করিলে, কতক পরিমাণে কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়ের অনুভূতি হয়—নতুবা প্রায়ই স্থলে উভয়েন্দ্রিয়ের নিয়ত সহযোগ দেখা যায়। যখনই কোন দ্রব্য স্পর্শ করি, তখনই উহার আকার, কাঠিন্য, দূরত্ব ইত্যাদি জ্ঞান আমাদের মনে উদিত হয়। অন্ধ ব্যক্তি এই সচেষ্ট স্পর্শ দ্বারা বস্তুর দূরত্ব, আকৃতি ইত্যাদি অনুভব করিয়া থাকে। অথবা, যেখানে আলোকের অভাব, সেখানে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও বিনা চক্ষুর সাহায্যে বস্তুর ঐ সকল গুণ জ্ঞাত হইয়া থাকে। মুখ্য গুণমাত্রই আমরা এই প্রকারে জানিতে সমর্থ হই। ইহার মধ্যে অভেদ্যতা, গুরুত্ব ও কাঠিন্য আমরা অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানিতে পারি না। অবশিষ্ট মুখ্য গুণ দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারাও জানিতে

পারি ; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারাই উহাদের জ্ঞান হয়। কোন অন্ধকার স্থানে উপবেশন করিয়া তোমার নিকটস্থ কোন দ্রব্যের দূরত্ব বা পরিমাণ বা আকৃতি কি প্রকারে অনুভব কর, ইহা প্রণিধান করিয়া দেখিলে, অন্ধ ব্যক্তির কি প্রকারে ঐ সকল জ্ঞান হয়, কতক পরিমাণে বুঝিতে পারিবে। অথবা, কোন অন্ধ ব্যক্তি কি প্রকারে দ্রব্য সমূহের দূরত্ব ইত্যাদি জ্ঞাত হয়, তাহা অনুধাবন করিলে, এ বিষয় বুঝিতে পারা যাইবে। অন্ধ ব্যক্তি পথ চলিবার সময় পদ দ্বারা অথবা পদ ও যষ্টি দ্বারা এবং কোন-কোন স্থলে হস্ত দ্বারাও প্রত্যেক পদবিক্ষেপে ভূমিকে ভাল করিয়া স্পর্শ করে, এবং দ্বিতীয় পদবিক্ষেপের পূর্ব্বে কোন্ দিকে কত দূরে পদক্ষেপ করিবে, তাহা মনের মধ্যে ঠিক করিয়া লয়। "এত দূরে বস্তুটি রহিয়াছে," ইহার অর্থ অন্ধের মনে "এতটুকু চলা," অথবা যদি দ্রব্যটি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা সম্ভব হয়,তাহা হইলে "এতদূরে" অর্থে, অন্ধ ব্যক্তির হস্তে এতটুকু ক্রিয়া বা চেষ্টা বা গতিমাত্র বুঝায়। "দূর" অর্থে মনের মধ্যে এই চেষ্টা-পরম্পরামাত্র। কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শরীরের চেষ্টা বা গতি বুঝিতে আমরা তত্তৎ অঙ্গ বা শরীরের দৃশ্যমান স্থান পরিবর্ত্তনমাত্র বুঝিব না। আমরা চক্ষু ব্যবহার না করিয়াও, আমার অঙ্গুলি বা জিহ্বা বা হস্ত কোন্ দিকে এবং কতদূরে চালনা করিতেছি, তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও সমগ্র শরীরের চলাচল বা গতি মাংস-পেশীর আকুঞ্চন বা প্রসারণের ফল। যখনই কোন মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়, তখনই আমাদের মনে গতি বা চেষ্টার জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। অঙ্গুলি বিশেষের বা হস্তবিশেষের চেষ্টাতে এই প্রকার একটির পর একটি করিয়া ক্রমিক কতকগুলি চেষ্টা বা ক্রিয়ার জ্ঞান হয়। আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যতগুলি চেষ্টা হয়, সেই চেষ্টা-সমষ্টি আমার মনের মধ্যে দূরত্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সাধারণতঃ সকলেই জানে যে এক স্থান হইতে

অন্য স্থানের দূরত্ব আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শরীরের গতি দ্বারা মাপ করিয়া থাকি। লোকে জানে যে, দূরত্ব ঐখানে পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা হস্ত দ্বারা বা গতিশীল অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দ্বারা উহার মাপমাত্র করিয়া থাকি। এই দূরত্বের পরিমাপক আমাদের চেষ্টার পরম্পরামাত্র। চেষ্টা-পরম্পরা অধিক হইলে দূরত্ব অধিক, কম হইলে দূরত্ব কম। মনে কর, তোমার সম্মুখে একটি ছোট টেবিল রহিয়াছে। তুমি উহার একপ্রান্ত একটি অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলে; পরে ঐ প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলে, করিয়া বুঝিলে, টেবিলটি এত বড়। প্রথম যখন তোমার অঙ্গুলি টেবিলের একপ্রান্তে স্থাপিত হইল, তখন অবশ্য টেবিলটির কাঠিন্য, উষ্ণতা ইত্যাদির জ্ঞান হইল। তাহার পর-মুহূর্ত্তে তোমার অঙ্গুলির নূতন চেষ্টা ও তৎসংযুক্ত স্পর্শজ্ঞান ও তৃতীয় মুহূর্ত্তে আর এক নূতন চেষ্টা ও তৎসংযুক্ত স্পর্শজ্ঞান, এই প্রকারে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তোমার অঙ্গুলি টেবিলের অপর প্রান্তে উপস্থিত হয়,—ততক্ষণ পর্য্যন্ত কতকগুলি সংযুক্ত চেষ্টা ও স্পর্শজ্ঞান প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই ও টেবিলের প্রত্যেক অংশেই হইবে। আমাদের এই স্পর্শ ও চেষ্টা-জ্ঞানের সংযোগে সাধারণ জ্ঞান হইয়া থাকে; এবং ইহা "এতদূর" বলিতে, আমরা এই সমবায়-জ্ঞানের পরম্পরা বুঝিয়া থাকি। যেখানে এই পরম্পরা একেবারে অবিচ্ছিন্ন, আমরা বুঝি ঐ স্থানটি পরিপূর্ণ। শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চলাচল বা গতি অর্থে আমরা সাধারণতঃ উহাদের দৃশ্যমান স্থান-পরিবর্ত্তন মাত্র বুঝিয়া থাকি। কিন্তু চক্ষুহীন ব্যক্তি উহাদের স্থান-পরিবর্ত্তন দেখিতে পায় না; তবে কি করিয়া উহারা বুঝিতে পারে যে, উহার দক্ষিণ হস্ত নড়িতেছে, বামহস্তটি উপরের দিকে বা নীচের দিকে কিংবা ডান হইতে বামে, বা অধঃ হইতে উর্দ্ধে চলিতেছে? হাত-পায়ের গতির পরিচায়ক জ্ঞান নিশ্চয়ই উহার

আছে। ভিন্ন-ভিন্ন গতির পরিচায়ক বিভিন্ন জ্ঞান আছে, এবং ঐ জ্ঞান দর্শনেন্দ্রিয় হইতে উদ্ভূত নহে। স্পর্শনের দ্বারা আমরা শীত, উষ্ণ, কর্কশ, মসৃণ অবস্থামাত্র অনুভব করি। অন্য দ্রব্যের সহিত সংস্পর্শে চর্ম্মস্থ স্নায়ু-সূত্রগুলির ক্রিয়া জন্যই এই জ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতি পেশীর আকুঞ্চন-প্রসারণে উৎপন্ন হয়। পেশীমধ্যস্থ স্নায়ু-সূত্রের ক্রিয়া জন্য গতি-জ্ঞান হয়। স্পর্শেন্দ্রিয়-জ্ঞান এই গতি-জ্ঞান হইতে পৃথক এবং উহাদের দৈহিক যন্ত্রও পৃথক। সেই জন্য বৈজ্ঞানিকেরা একটি পৈশিক ইন্দ্রিয় নামে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় স্বীকার করেন—ইহাকে গতীন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে। আমরা গতি বলিতে হস্তপদাদির দৃশ্যমান সঞ্চালন বুঝিব না; উক্ত সঞ্চালনের সহগামী মানস-প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বুঝিব। এই জ্ঞান গতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের। দিক্, দূরত্ব ও দ্রুততা অনুসারে গতি বিভিন্ন। দিক্ অর্থে দক্ষিণ ও বাম, ঊর্দ্ধ ও অধঃ, পশ্চাৎ ও পুরঃ, বুঝাইয়া থাকে। হস্ত দক্ষিণ দিকে লইয়া যাইতে কতকগুলি মাংসপেশী সঙ্কুচিত ও কতকগুলি প্রসারিত হয়; আবার ঐ হস্তটী উহার বিপরীত দিকে লইয়া গেলে পূর্ব্বে যে পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়াছিল, সেইগুলি প্রসারিত, এবং যেগুলি প্রসারিত হইয়াছিল, সেগুলি সঙ্কুচিত হয়। এই বিপরীত সঙ্কোচন-প্রসারণের জ্ঞান দ্বারাই আমাদের দিক্ নির্ণয় হইয়া থাকে। হস্তটি একই ভাবে অর্দ্ধমিনিট চালনা করা ও একমিনিট চালনা করা এক নহে। সময়ের পরিমাণ অনুসারে জ্ঞানেরও পার্থক্য হয়। আমার হস্তের গতির প্রারম্ভ স্থান হইতে দূরত্ব অনুসারে জ্ঞানের বিভিন্নতা হয়। আমার হস্ত এক ফুট চলিল বা এক গজ চলিল, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি। এক গজ দূরে হস্তটি লইয়া যাইতে এক সেকেণ্ড বা একমিনিট লাগিতে পারে—গতির দ্রুততা অনুসারে আমাদের জ্ঞানের বিভিন্নতা হয়। যখন নিশ্চল হইয়া উপবিষ্ট আছ, তখনও তোমার শরীর

বা অঙ্গবিশেষ কোন্ অবস্থায় আছে—অর্থাৎ কোন্ দিকে বা কোন্ স্থানে আছে তাহা তুমি বুঝিতে পার। এই অবস্থানের জ্ঞানও গতীন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। আমাদের সকল গতিই শরীরের বা শরীর-অংশবিশেষের নিশ্চেষ্ট অবস্থা হইতে প্রারব্ধ।

বাধা জ্ঞান।

চেষ্টা বা গতি জ্ঞান দ্বিবিধ—অব্যাহত গতি এবং ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত গতি। যেমন শূন্যে হাত নাড়িলে বোধ হয় আমার চেষ্টার কোন বাধা হইতেছে না, আমি ইচ্ছামত শরীর বা অঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারিতেছি; কিন্তু যখন কোন গুরু দ্রব্য তুলিতে চেষ্টা করি, বা দেওয়াল ইত্যাদির প্রতি চেষ্টা প্রয়োগ করি, তখন আমার চেষ্টা ব্যাহত হয়। আমরা শক্তি বলিয়া যাহা বুঝি, তাহা এই ব্যাহত চেষ্টা বা বাধা-জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমার চেষ্টা ব্যাহত হওয়াতেই, চেষ্টা-প্রয়োগকারী ও চেষ্টা-প্রতিরোধকারী শক্তির যুগপৎ জ্ঞান হয়। অনেকে এই ব্যাহত চেষ্টা হইতে অনুমান করেন যে, আমার ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র ও চেষ্টার প্রতি-রোধক অপর এক বস্তু বাহ্যজগতে আছে। যদি আমার চেষ্টা ও ইচ্ছা ব্যতীত কিছু না থাকিত, তাহা হইলে আমার চেষ্টা পর্ব্বতের প্রতি প্রয়োগ করিলেও ফলবতী হইত। কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও পর্ব্বতকে স্থানচ্যুত করিতে পারি না; সুতরাং পর্ব্বতটি একটি স্বতন্ত্র পদার্থ—হয় ত আমাকে বাধা দিবার যোগ্য ক্ষমতাও ইহার আছে। আমার চেষ্টা ইহার চেষ্টার নিকট পরাভূত। দ্রব্যের গুরুত্ব, অভেদ্যতা, কাঠিন্য, তরলতা ইত্যাদি গুণ এই বাধা-জ্ঞানের বিভিন্ন মাত্রা। যে দ্রব্য তুলিতে বা সরাইতে অধিক বলপ্রয়োগ করিতে হয়, তাহা গুরু, এবং যাহা তুলিতে কম বল প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লঘু। প্রথমটিতে আমার চেষ্টা অধিকতর এবং দ্বিতীয়টিতে অল্পতর ব্যাহত। অধিক চেষ্টা সত্ত্বেও

যাহার মধ্য দিয়া আমার শরীরের বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি অসম্ভব, তাহা কঠিন; অল্প চেষ্টাতে যেখানে ঐ গতি সম্ভব তাহা তরল, বা যেখানে আরও অল্প চেষ্টার প্রয়োজন তাহা বাষ্পীয় পদার্থ।

দেশের আর একটি রূপ দ্রব্যের আয়তন। পর্ব্বতের আয়তন বৃহৎ, ধূলিকণার আয়তন ক্ষুদ্র। কিন্তু আয়তন উভয়েই বর্ত্তমান। প্রথমোক্তটির আয়তন পরিমাণ করিতে সমস্ত শরীরটিকে নানাদিকে চালাইতে অর্থাৎ পর্ব্বত বেষ্টন করিতে হইবে, উহার উপরে উঠিতে হইবে, এবং নামিতে হইবে। একটি টেবিলের আয়তন স্থির করিতে হইলে মাত্র হস্তটিকে চালিত করিলেই হয়। আবার হস্তস্থিত আমলকীটির আয়তন স্থির করিতে হইলে, উহার চতুর্দ্দিকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলেই হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে শরীর বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির চালনা দ্বারাই বস্তুমাত্রের আয়তন উপলব্ধি হয়। চালনার পরিমাণ অনুসারে, আয়তন অধিক কি স্বল্প তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। একটি আম্রফল হস্তে রক্ষিত হইল। ইহা কি আকারের এবং কত বড়, তাহা আমরা অক্লেশে বুঝিয়া থাকি। হস্তে রক্ষিত দ্রব্যটির চতুর্দ্দিক আমার অঙ্গুলিগুলি বেষ্টন করে; অঙ্গুলির মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয় এবং উহার সহিত আম্র-সংস্পর্শের সঙ্গে-সঙ্গে স্পর্শ-প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপে গতি ও স্পর্শ-সংবিত্তির সহযোগে, বস্তুটি কত বড় ও কি আকারের, তাহা আমরা জানিতে পারি। এইরূপে যতপ্রকার ক্ষেত্র আছে, প্রত্যেকটিই সচেষ্ট স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহায়তায় আমরা জানিতে পারি।

আয়তন প্রত্যক্ষ।

মনের ভাব একটির পর একটি করিয়া সংঘটিত হয়। একই মুহূর্ত্তে দুই কি ততোধিক ভাব একত্র সংঘটিত হয় না। পক্ষান্তরে, স্থূল

বিস্তার প্রত্যক্ষ।

পদার্থের বিভিন্ন অংশ একই মুহূর্ত্তে অবস্থিত। অপিচ উহারা এক-একটি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বা মানস ব্যাপার। এরূপ স্থলে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ-পরম্পরা কি করিয়া যুগপৎ অবস্থিত স্থূল পদার্থের অংশ-সমষ্টিতে পরিণত হয়? মনে কর, তোমার সম্মুখে একটি টেবিল রহিয়াছে। তুমি উহার এক প্রান্ত অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া আছ। তন্মুহূর্ত্তে তোমার একটি স্পর্শজ্ঞান এবং অঙ্গুলি ও শরীরের অবস্থান জ্ঞান হইল। পর মুহূর্ত্তে দ্বিতীয় স্পর্শজ্ঞান ও অঙ্গুলির একটি বিশেষ গতি-জ্ঞান হইল। এই প্রকারে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে একটি স্পর্শজ্ঞান ও তৎসঙ্গে একটি গতি-জ্ঞান হইয়া সংযুক্ত জ্ঞানের একটি ধারা হইল। মনে রাখিবে যে, যখন দ্বিতীয় জ্ঞানটি হইল, তখন প্রথমটির অন্তর্ধান হইয়াছে—উহা তোমার স্মৃতিতে মাত্র বর্ত্তমান। এইরূপে পরবর্ত্তী জ্ঞানটির উদয় ও পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানটির লোপ হইতেছে। এক মুহূর্ত্তে কোন দুইটিরই উপলব্ধি হইতেছে না। কিন্তু তুমি জান, টেবিলের স্পৃষ্ট বিন্দুসমূহ পাশাপাশি একই মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান—তুমি যেটিকে ইচ্ছা স্পর্শ করিতে পার। অপর পক্ষে দেখিলে, স্পৃষ্ট বিন্দুসমূহ তোমার মানস-প্রত্যক্ষের ধারামাত্র। নিম্নলিখিত প্রকারে এই পারম্পর্য্য যৌগপত্যে পরিণত হয়। তোমার অঙ্গুলি টেবিলের অপর প্রান্তে উপস্থিত হওয়ার পর বিপরীত দিকে ইহাকে চালনা করিলে, তুমি পূর্ব্বকথিত স্পৃষ্ট বিন্দুসমূহ অনুভব করিবে—কিন্তু উহাদের ক্রম বিপরীত। এবম্প্রকারে যদি তোমার অঙ্গুলির গতির হ্রাস বা বৃদ্ধি কর, তবুও সেই-সেই বিন্দু সেই-সেই ক্রমেই অনুভব করিবে। বিন্দু সকলের যৌগপত্য অর্থে আমরা ইহা ভিন্ন আর কিছু বুঝি না। আর এক কথা—যদি প্রথম বিন্দু হইতে আরম্ভ না করিয়া তুমি একবারে দ্বিতীয় বিন্দু স্পর্শ করিতে, তাহা হইলে দ্বিতীয় বিন্দুর

স্পর্শজ্ঞান অন্তরূপ হইত। প্রথম বিন্দুর স্পর্শজ্ঞান থাকা জন্য দ্বিতীয় বিন্দুর স্পর্শজ্ঞান একটু রূপান্তরিত হয় ও সেইরূপে দ্বিতীয় বিন্দুর সংস্কার জন্য তৃতীয় বিন্দুর স্পর্শজ্ঞান পরিবর্ত্তিত হয়। এই শেষ বিন্দুর স্পর্শজ্ঞান পূর্ব্ববর্ত্তী সমগ্র স্পর্শ-জ্ঞানের সংস্কারের ফলে পরিবর্ত্তিত। এই পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জ্ঞানের সংস্কারের সহিত উপস্থিত জ্ঞানের মিশ্রণে প্রত্যেক স্পৃষ্ট বিন্দুর এক অভিনব স্পর্শজ্ঞান হয়। বিন্দু বিশেষের অবস্থান আমরা "এই সংযুক্ত জ্ঞান দ্বারা বুঝি। বিস্তার অর্থে যুগপৎ অবস্থিত বিন্দু-সমষ্টি মাত্র বুঝিয়া থাকি। কিন্তু তোমার অঙ্গুলি যে বিন্দুটি ছাড়াইয়া আসিয়াছে, তাহাও এই মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান আছে। ইহার অর্থ মাত্র এই যে, তোমার সংস্কার অনুযায়ী অঙ্গুলি চালনা করিলে, তুমি পূর্ব্ব-পরিচিত স্পর্শ-জ্ঞান পুনরায় প্রাপ্ত হইবে। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের এই স্থায়ী-সম্ভাবনার নাম জগতের দ্রব্যসমূহের বস্তুত্ব। তবে শব্দ, স্পর্শ আদি গুণের সহিত বাধা-জ্ঞানের সংযোগ হইলে, অর্থাৎ এই এই বর্ণ বা শব্দ যখনই প্রত্যক্ষ হয় তখনই বিশেষ বাধা-জ্ঞানের অনুভব হইলে, বাধাকারী দ্রব্যের সেই সেই গুণ আছে, এই জ্ঞান হয়। তখনই আমার বাহ্যবস্তুটি এই এই গুণ-বিশিষ্ট, এইরূপ জ্ঞান হয়।

একটি জিনিস কোন্ দিকে, কত দূরে, বড় কি ছোট, গোল কি ত্রিকোণ, তাহা আমরা চক্ষু দ্বারাই দেখিয়া থাকি। তবে অন্ধেরা কি করিয়া দেখে, সাধারণতঃ আমরা তাহা ভাবি না। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি যে চক্ষু দ্বারা ঐ সকল বিষয় বিনা আয়াসে সুন্দররূপে প্রত্যক্ষ করে, সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে। আবহমান কাল হইতে এই জ্ঞান ও বিশ্বাস মানুষের আছে। ধর্ম্মাচার্য্য বার্কলে সাহেব খ্রীষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কিন্তু এ: মত খণ্ডন করিয়া তাঁহার সুবিখ্যাত বাণী প্রচার করিলেন,—"দূরত্ব আমরা দেখি না, স্পর্শ

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ।

করি।” দূরত্বাদি দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে—স্পর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সত্য বটে, চক্ষু দ্বারাও দ্রব্যের ঐ সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করি; কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত উহা সম্ভব নহে। চক্ষু দ্বারা আমরা বস্তুসকলের বর্ণ, উজ্জ্বলতা এবং উহাদের বহু প্রকার ভেদ অনুভব করি। উহাদেরই ইতর-বিশেষে দ্রব্যের দূরত্ব প্রভৃতির জ্ঞান হয়। অর্থাৎ আমরা জানি নিকটের একটি জিনিষ যে বর্ণের ও যেরূপ উজ্জ্বল দেখায়, দূর হইতে ঠিক সেই বর্ণের বা সেইরূপ উজ্জ্বল দেখায় না। উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল বর্ণ আর বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন প্রকার সমাবেশ দূরত্বের ও নৈকট্যের নিদর্শন, পরিচায়ক। চক্ষুর দ্বারা দূরত্বের পরিমাপ করি, ইহার অর্থ—চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষগুলিকে স্পর্শ-প্রত্যক্ষে অনুবাদ করি। বর্ণ ইত্যাদি যেন চাক্ষুষ ভাষা। আমাদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা বলে ঐ ভাষার অর্থ করাকে দূরত্বের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। বাস্তবিক উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। বর্ণবিশেষের রূপান্তর বা বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন প্রকার সমাবেশমাত্র চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব; কিন্তু কোন দ্রব্যের গুরুত্ব, কি আকার, কি পরিমাণ, কি দূরত্ব, আমরা দেখিতে পাই না। চক্ষু-গ্রাহ্য বর্ণ ইত্যাদি দূরত্বের নিদর্শনমাত্র—বিভিন্ন দূরত্বের বিভিন্ন নিদর্শন। চাক্ষুষ ভাষাকে স্পার্শিক ভাষায় অনুবাদ করাকেই দূরত্বের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ বলে।

বারক্লের এই মীমাংসা বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান-সম্মত মীমাংসা। চাক্ষুষ বস্তু-জ্ঞান আমাদের সহজাত নহে—ইহা জন্ম হইতে আরব্ধ শিক্ষার পরিণতি; অর্থাৎ চোখ দিয়া দূরত্ব ইত্যাদি বুঝা শিক্ষা করিতে হয়। বারক্লের এই মীমাংসা সাধারণ মনুষ্য-জ্ঞানের বিরোধী। তাঁহার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত এক বিপক্ষদল রহিয়াছেন, যাঁহারা বলেন, স্পর্শ-ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত, চক্ষু দ্বারা দূরত্ব অনুভব করা সম্ভব। বারক্লের সময় পৈশিক ইন্দ্রিয়ের পৃথক অস্তিত্ব লোকে জানিত

না। অধুনা ঐ ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ স্থিতি লোকে বুঝিতে পারিয়াছে, এবং দূরত্ব ইত্যাদি যে আমার শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির গতিমাত্র অনুমেয় তাহাও সপ্রমাণ হইয়াছে। ঐ সকল গুণ মাত্র স্পর্শেন্দ্রিয়-লব্ধ নহে, প্রকৃত-পক্ষে উহারা গতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য; তবে স্পর্শ ও গতীন্দ্রিয় অভিন্নভাবে পরস্পরের সহায়তা করাতে উভয় ইন্দ্রিয়কে যেন এক ইন্দ্রিয় বলিয়া মনে হয়। উহাদের এই সংযোগকে সচেষ্ট স্পর্শ বলা হয়।

বর্ত্তমান কালের বারক্লের শিষ্যগণ বলেন, চক্ষুর চেষ্টা বা গতির দ্বারা দিকের দক্ষিণ বা বাম, ঊর্দ্ধ ও অধঃ, বস্তুর আকৃতি ও আকার, আমরা অনুভব করিতে সমর্থ। আমাদের চক্ষুর্দ্বয়কে আমরা এদিক হইতে ওদিক এবং অধঃ হইতে উর্দ্ধে চালনা করিতে পারি, এবং উহার অক্ষ-রেখার চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে পারি। এই সকল গতির সাহায্যে আমরা দ্রব্যের উক্ত সকল গুণ অনুভব করিতে পারি; কিন্তু স্ব-অবস্থান-বিন্দু হইতে যেমন হস্তকে আমরা সম্মুখে ও দূরে চালাইতে পারি, চক্ষুকে উহার কোটর হইতে সেরূপ বাহির করা অসম্ভব। সুতরাং যাহাকে ক্ষেত্রের গভীরতা বা বেধ বলে, তাহা চক্ষু-গ্রাহ্য নহে। কোনও দ্রব্যের এক দিক হইতে অপর দিক, ও নিম্ন হইতে উপরে ও উপর হইতে নীচে চক্ষু চালনা করিয়া ও উহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দ্রব্যাদির আকার ইত্যাদি জানিতে পারি; কিন্তু দ্রব্যের গুরুত্ব, অভেদ্যতা ও গভীরতা আমরা চক্ষু দ্বারা অনুভব করিতে পারি না।

বিপক্ষ মতাবলম্বীরা এমনও বলেন যে, চক্ষুকে নিশ্চল রাখিয়া দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আকার ও পরিমাণ আমরা জানিতে পারি। চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ পর্দ্দার উপরিভাগ বিস্তারযুক্ত। একই মুহূর্ত্তে উহার বিভিন্ন অংশ উত্তেজিত হইলে যুগপৎ বহু আলোক ও বর্ণ প্রত্যক্ষ না হইয়া পারে না। সুতরাং চক্ষু স্থির রাখিলে, যুগপৎ বহু বিন্দু-জ্ঞান অর্থাৎ বিস্তৃতি-জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী।

বস্তুর আয়তন চাক্ষুষ গতি ব্যতীতও আমাদের বোধগম্য ; প্রত্যক্ষ বস্তুটি যত বড়ই হউক না কেন রেটিনায় প্রতিফলিত ছবির দ্বারা উহার উত্তেজিত ভাগের বিস্তার অনুযায়ী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হইবে। বস্তুর বাস্তব আয়তন ও রেটিনাস্থ ছবির আয়তন দুইটী পৃথক্। প্রথমোক্তটিকে চাক্ষুষ ও শেষোক্তটিকে বাস্তব আয়তন বলে। একই বস্তু যতদূরে যাইবে উহার প্রতিচ্ছবিও তত ক্ষুদ্র হইবে ; আবার, দূরস্থ দ্রব্য নিকটে আসিলে উহার প্রতিচ্ছবি বড় হইবে। চাক্ষুষ কোণের পরিমাণ দূরত্বের বিপরীত ভাবে বেশী ও কম হয়। কোণ বড় হইলে দূর কম ও কম হইলে দূর বেশী হইবে। দৃষ্ট বস্তুর দুইপ্রান্ত হইতে আলোক-রশ্মিদ্বয় রেটিনার বিন্দুবিশেষে মিলিত হইয়া যে কোণ উৎপন্ন করে, তাহাকে চাক্ষুষ কোণ বলে।

মানুষের সাধারণতঃ দুইটি চক্ষু। যাহারা একচক্ষু-হীন তাহারা অবশ্য এক চক্ষু দ্বারা যাবতীয় পদার্থ দর্শন করিয়া থাকে। দুই চক্ষুর যন্ত্র-প্রান্ত পৃথক্। বিভিন্ন রেটিনাতে পৃথক্ পৃথক্ ছবি প্রতিফলিত হয়—দুইটি পৃথক্ ছবি, কিন্তু দৃষ্ট বস্তু এক। কি করিয়া পৃথক্ ছবির দ্বারা এক বস্তুর উপলব্ধি হয় ইহার মীমাংসা কঠিন। কখন কখন দেখা যায়, দুই চক্ষুতে দুইটি পৃথক্ বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। চক্ষুপ্রান্তে ঈষৎ চাপ দিয়া চক্ষু গোলককে বিভিন্নমুখী করিলে, এক বস্তু প্রত্যক্ষ না করিয়া দুই বস্তু প্রত্যক্ষ করি। সাধারণতঃ সহজ অবস্থাতে কিন্তু দুই চক্ষু দ্বারা আমরা একটি বস্তুরই উপলব্ধি করিয়া থাকি। রেটিনাক্ষেত্রের নিম্নভাগে বা দর্শনকেন্দ্রে দৃশ্য বস্তুর আলোক সম্পাত হইলেই বস্তুটি সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। উহার বাহিরে রেটিনার মধ্যভাগে আলোক-সম্পাত হইলে উহা অস্পষ্ট-ভাবে লক্ষিত হয়। ক্রমে কেন্দ্র হইতে যত দূরে আলোক-সম্পাত হয়, দ্রব্যটি ততই অধিক অস্পষ্ট হয়। ক্রমে দূরে গিয়া বস্তুটি দর্শনক্ষেত্রের

দ্বৈনেত্রিক প্রত্যক্ষ।

বহির্ভূত হইয়া যায়। কেন্দ্র হইতে একই দিকে সমদূরস্থ কোনও বিন্দুতে আলোক-সম্পাত হইলে বস্তুটি এক দেখায়। দূরত্ব বা দিকের পৃথকত্ব হইলে বস্তু দুইটি দেখায়। আমাদের এক চক্ষু হস্ত দ্বারা আবৃত করিয়া কোনও বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিলে, আমরা উহার ঠিক অবস্থান বিন্দু নির্ণয় করিতে পারি না। বাম চক্ষু আবৃত করিলে উহা অপেক্ষাকৃত দক্ষিণে, এবং দক্ষিণ চক্ষু আবৃত করিলে উহা বামে যেন সরিয়া যায়। দক্ষিণ চক্ষুর রেটিনাতে প্রতিফলিত ছবি ও বাম চক্ষুর রেটিনাতে প্রতিফলিত ছবি এক নহে। তাহা হইলে ইহাই বুঝা গেল যে, কোন দ্রব্যকে লক্ষ্য করিলে আমাদের উভয় চক্ষু পরস্পরের সহায়তা করে। দৃষ্ট বস্তুর ঠিক সম্মুখস্থ অংশের একই ছবি উভয় রেটিনাতে প্রতিফলিত হয়। উভয় চক্ষুদ্বারা আমরা এক অভিন্ন বস্তু প্রত্যক্ষ করি; কিন্তু উহার কতক অংশ উভয় চক্ষুর গোচর হয় না। বস্তুর বাম প্রান্তে অবস্থিত অংশের ছবি মাত্র বাম চক্ষুর রেটিনার বাম প্রান্তভাগে প্রতিফলিত হওয়াতে, উহা বাম চক্ষুরই গোচর হইয়া থাকে; সেইরূপে উহার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত অংশ সমূহের ছবি দক্ষিণ রেটিনার দক্ষিণপ্রান্তে প্রতিফলিত হওয়াতে উহা দক্ষিণ চক্ষুরই গোচর হইয়া থাকে। এখন উভয় রেটিনাতে প্রতিফলিত ছবির সংযোগে সমগ্র বস্তুটির একটি ছবি আমাদের চিত্তে প্রতিফলিত হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, একচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির বস্তু-প্রত্যক্ষ দুইচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ ও হীন।

স্থান নির্ণয়—বহির্দৈহিক ও আন্তর্দৈহিক।

ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের স্থানভেদে গুণভেদ পরিলক্ষিত হয়। তোমার কপোলে মশক দংশন করিবামাত্র, দংশন-যন্ত্রণা নিবারণের উদ্দেশ্যে তোমার হস্ত মুহূর্ত্ত মধ্যে দষ্টস্থানে উপস্থিত হইল। শরীরের কোন্ স্থানে মশক উপবিষ্ট, এবং তোমার হস্ত ও অঙ্গুলিগুলি কোন্ দিকে

ও কতক্ষণ এবং কি প্রকারে চালনা করিলে উহারা উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া তোমার দংশন-যন্ত্রণা নিবারণ করিবে, নিমেষ মধ্যে এ সকল বিষয় তুমি মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া লইলে, এবং উপযোগী সঞ্চালন সংঘটিত হইল। শরীরের অন্য প্রদেশে মশকটি দংশন করিলে অন্যপ্রকার হস্ত-চালনা দ্বারা দংশন-যন্ত্রণা উপশম করিতে হইত। আমাদের মনে হয়, এই ব্যাপারটি আমাদের সহজাত। এত শীঘ্র কলের মত আমার হস্তটি যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া যন্ত্রণার লাঘব করে যে, উহা অযত্ন-সম্ভূত না হইলে সম্ভব হইত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্র শিশুটির কপোলে মশক দংশন করিতেছে; শিশুটি ক্রন্দন করিতেছে; ইহার হস্ত-পদও চারিদিকে চলিতেছে; কিন্তু দষ্ট প্রদেশে ত হস্তটি যাইতেছে না! কোথায় কপোল, কোথায় কপোলের সেই অংশ যেখানে দংশন হইতেছে, শিশু তাহা জানে না। কোন্ দিকে কেমন করিয়া হাত চালাইতে হইবে, তাহাও সে জানে না। আমাদের এই জ্ঞান শিক্ষালব্ধ। যেমন হস্তপদাদি শরীরের দ্বারা বাহ্যজগতের বস্তু সমূহের অবস্থান, দিক, দূরত্ব নির্ণয় করিতে হয়, ঠিক সেইরূপে স্বশরীরেরও বিভিন্ন অংশের অবস্থান ইত্যাদি ঐ সকলের গতি দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। দৈবাৎ একটি অঙ্গুলি কি কিছু একবারে মশক দষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে যাতনার কিছু উপশম হইল; অমনি মনের মধ্যে উক্ত প্রকার অঙ্গের গতি ও যন্ত্রণা-লাঘব জন্য সুখের অনুভূতি সংযুক্ত হইয়া গেল। এই সংযোগ বা সঙ্গ বলে ভবিষ্যতে মশক-দংশন হইবামাত্র সংযুক্ত হস্ত-চালনাও সংঘটিত হয়। এই প্রকারে শরীরের কোন্ অংশ কোন্‌দিকে কতদূরে স্থিত, আমরা ক্রমশঃ তাহা শিক্ষা করি, এবং বিভিন্ন অংশের চিত্র মনোমধ্যে চিত্রিত করিয়া লই। যে সকল স্থান হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে পারা যায় না—যেমন শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি—উহাদের ঠিক

অবস্থান আমরা জানিতে পারি না। তবুও কতক পরিমাণে শরীরের বহিঃপ্রদেশের সহিত আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির স্থানের সম্বন্ধ বুঝিতে পারি। এই প্রকারে শরীরের অংশবিশেষে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের স্থান-নির্ণয়কে আন্তর্দৈহিক স্থান-নির্ণয় বলে। গন্ধ, স্পর্শ, বর্ণ, শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষগুলির স্থান শরীরের চতুর্দ্দিকস্থ বাহ্যজগতে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। এই প্রকার নির্দ্দেশকে বহির্দৈহিক স্থান-নির্দ্দেশ বলে। একই মশক শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে দংশন করিলে, হস্ত ও অঙ্গুলি প্রভৃতির বিভিন্ন গতি হয়। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শরীরের স্থান অনুসারে দংশন-অনুভূতিও পৃথক্ পৃথক্। এই পার্থক্য উদ্বোধকের বা যন্ত্রের পার্থক্য জন্য নহে; কারণ, মশক-দংশন সকল স্থানেই উদ্বোধক ও চর্ম্মই ইন্দ্রিয়-যন্ত্র। উদ্বোধক ও ইন্দ্রিয় এক হওয়া সত্ত্বেও যে পার্থক্যের জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রাদেশিক বা স্থানিক পার্থক্য বলে; এবং ইন্দ্রিয়-জ্ঞানবিশেষকে শরীরের স্থানবিশেষে আরোপ করাকে ইহার স্থান-নির্ণয় বলে। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ মাত্রেরই স্থানভেদে গুণভেদ নাই। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অংশবিশেষে বিশেষ ঘ্রাণের অবস্থান নাই। রসনেন্দ্রিয়ের যে কোন প্রদেশই উদ্বোধিত হউক না কেন, এক উদ্বোধকের দ্বারা একমাত্র জ্ঞানেরই বিকাশ হইবে। শ্রবণেন্দ্রিয়েরও দৈহিক যন্ত্র-প্রদেশের পার্থক্য অনুসারে শ্রবণের পার্থক্য হয় না। যে সকল ইন্দ্রিয়ের যন্ত্রান্তভাগ বিস্তৃত এবং শরীরের বহিঃপ্রদেশে স্থাপিত সেই সকল ইন্দ্রিয়েরই উদ্বোধকের স্থানানুসারে জ্ঞানেরও বিভিন্নতা হয়। স্পর্শেন্দ্রিয়ের চর্ম্ম ও দর্শনেন্দ্রিয়ের রেটিনা এ বিষয়ে সকল ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চর্ম্মের বিভিন্ন প্রদেশে একই দ্রব্যের সংস্পর্শে বিভিন্ন স্পর্শ-জ্ঞানের উদয় হয়। তেমনি রেটিনার বিভিন্ন প্রদেশে একই আলোক-রশ্মির ক্রিয়াতে বিভিন্ন জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। প্রধান-প্রধান জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রবণেন্দ্রি

অন্যতম; কিন্তু ইহার বিস্তৃত যন্ত্রান্ত নাই এবং সেই জন্য শব্দের স্থানিক গুণভেদ হয় না। রসনা ও নাসিকার যন্ত্রান্ত বিস্তৃত হইলেও বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জ্ঞানের আরোপ করা যায় না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ ও মায়িক প্রত্যক্ষ।

তোমার একটি কুকুরছানা, একটি বিড়ালছানা এবং একটি ছাগলছানা আছে। তুমি আজন্ম ইহাদিগকে দুধ খাইতে দিতেছ। একই দুগ্ধ হইতে বিড়ালের নিকট বিড়ালের অস্থিমজ্জা ইত্যাদি নির্ম্মিত হইতেছে। কুকুরের নিকট কুকুরের অস্থিমজ্জা ইত্যাদি নির্ম্মিত হইতেছে এবং ছাগলের নিকট ছাগলের উপযোগী অস্থিমজ্জা নির্ম্মিত হইতেছে। এখানে খাদ্য এক, খাদ্য জীর্ণকরণ প্রণালীও এক, তথাপি একই পদার্থ হইতে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের সৃষ্টি হইতেছে। জন্তুত্রয়ের আন্তরিক বিশেষত্বই এ পার্থক্যের কারণ। যেমন শরীরের খাদ্য আছে, তেমনি মনেরও খাদ্য আছে। জ্ঞেয় বস্তু মাত্রেই মনের খাদ্য। জ্ঞেয় বস্তু এক হইলেও মনের পার্থক্য অনুসারে জ্ঞানেরও পার্থক্য হইয়া থাকে। একই বস্তু হইতে নানা মনে নানা জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। একই জ্ঞেয় বস্তু হইতে কোন দুইটি ব্যক্তির একই জ্ঞানলাভ হইতে পারে না। কোন লোক তাহার গাভীটিকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেছে দেখিয়া একজন হাসিতেছে আর একজন দুঃখে অভিভূত হইতেছে। এখানে প্রত্যক্ষ বস্তু এক হইলেও তদ্বস্তু-সমুৎপন্ন জ্ঞান পৃথক্, কারণ জ্ঞাতার মনের গঠন প্রণালী পৃথক্; একজন দয়ালু আর একজন নিষ্ঠুর। অতএব দেখা যাইতেছে যে পূর্ব্ব

আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ।

অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিপর্য্যয় ঘটাইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ বস্তু এক হইতে পারে এবং তদ্বস্তু-সমুৎপন্ন সংবিত্তিও এক হইতে পারে কিন্তু তথাপি মানুষের অভিজ্ঞতার পার্থক্য-হেতু প্রত্যক্ষের পার্থক্য হইয়া থাকে। যখনই কোন উদ্বোধক ইন্দ্রিয়গ্রামের ভিতর দিয়া সংজ্ঞা-ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হয় তখনই ইহা কোন একটি নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করে এবং সংজ্ঞাক্ষেত্রস্থিত অপরাপর ভাবসমূহের সহিত মিলিত হইয়া একটি অভিনব জ্ঞানের সৃষ্টি করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই বর্ত্তমান জ্ঞানটির উপর পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার ছায়া পড়িয়াছে। এইরূপ নূতনের সহিত পুরাতনের মিলন, বর্ত্তমানের সহিত অতীতের সম্ভাষণ পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সঙ্গবদ্ধ। আমি ক খ গ উচ্চারণ করিতেছি; তুমি ইহা শুনিতেছ; তোমার জ্ঞান হইতেছে; কিন্তু এ জ্ঞান একবারে নিরালম্ব নহে, একবারে নিরপেক্ষ নহে, একবারে নিঃসঙ্গ নহে। যখনই তুমি ক খ গ শুনিতেছ তখনই তোমার মনে ঘ ঙ চ উদয় হইতেছে। ঘ ঙ চ না ভাবিয়া ক খ গ চিন্তা করা তোমার সম্ভব হইতেছে না। ঘ ঙ চ এর ছায়া আসিয়া ক খ গ এর স্বরূপ জ্ঞানকে বিরূপ করিতেছে। ক খ গ ইহাদের পুরাতন সহচরগুলিকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হইতেছে—তাহারাও অগ্রসর হইয়া ইহাদিগকে চিনিতেছে, আলিঙ্গন করিতেছে এবং উভয় পক্ষের সম্মিলনে যে জ্ঞানের সৃষ্টি হইতেছে তাহাই আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ। আমাদের মন বহু স্মৃতি, বহু ভাব, বহু ভাবনার ভাণ্ডার। যখনই কোন একটি নবীন অভিজ্ঞতার সম্মুখে উপস্থিত হই তখনই ইহা পুরাতনের সহিত মিশিয়া যায়। পূর্ব্ব সঞ্চিত ধারণা আসিয়া নূতনকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে ঠিক যেমনটি প্রত্যক্ষ করি ঠিক তেমনটি উপলব্ধি করিতে পারি না। এইরূপ পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা-সম্পৃক্ত প্রত্যক্ষের নাম আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ।

যখন আমরা কোন নূতন বিষয় আত্মীকরণ করিতে ইচ্ছুক হই তখন যাহাতে আমাদের সঞ্চিত ধারণাসমূহের কোন প্রকার বিপর্য্যয় না ঘটে সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হই।

আত্মীকরণ-প্রবৃত্তি।

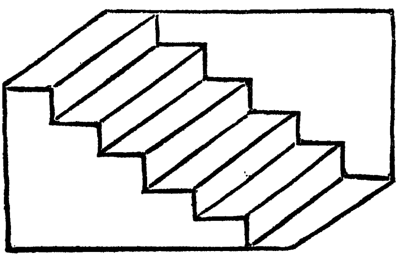
নূতন বিষয়কে পূর্ব্ব সঞ্চিত অভিজ্ঞতার উপাদানরূপে গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হই। কোন বিষয়কেই একবারে নূতন, একবারে পূর্ব্বসংস্কার বর্জ্জিত, একবারে সম্পর্কশূন্য বলিয়া গ্রহণ করিতে মানুষ নিতান্ত অনিচ্ছুক। বালকটি বরফ দেখিয়াছে কিন্তু মিছরি দেখে নাই, লেবু দেখিয়াছে কিন্তু বেল দেখে নাই, সুতরাং সে যখন প্রথমে মিছরি দেখে তখন ইহাকে বরফ বলে, অথবা যখন বেল দেখে তখন ইহাকে লেবু বলে। মিছরি বা লেবুকে নূতন জিনিষ বলিয়া লইবার তাহার প্রবৃত্তি নাই। তাহার মনে যে সকল বিশ্বাস, যে সকল ধারণা আছে তাহাদের সংহার বা অন্যপ্রকার সমাবেশ করিতে মন নিতান্তই নারাজ। আমি যখনই যে জিনিষের সম্মুখে উপস্থিত হই না কেন তখনই ইহাকে আমি আমার মত করিয়া প্রত্যক্ষ করি। এই আত্মীকরণ প্রবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মনের ধৈর্য্য নষ্ট করিতে, নূতন জিনিষের সমন্বয়ে মনের চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে আমরা স্বতঃই নারাজ। তুমি একজন অশিক্ষিত লোককে তাহার কুসংস্কারের কবল হইতে পরিত্রাণ করিতে চাও; তুমি তাহাকে যুক্তির সাহায্যে, তর্কের সাহায্যে অনেক বুঝাইলে, অনেক শিখাইলে, অবশেষে সে তাহার ভ্রম বুঝিল, তোমার তর্কের সার্থকতা উপলব্ধি করিল তুমিও মনে করিলে তোমার শ্রম সফল হইল। কিছুদিন পরে তুমি আবার ঐ লোকটির নিকটে যাও দেখিবে সে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটিই আছে —তোমার উপদেশ তাহাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে যে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রবৃত্তি

মানুষের স্বভাবিক এবং এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান দুষ্ট হইয়া থাকে—একই বস্তু হইতে পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। ঘড়ি নির্ম্মাতার নিকট যে গৃহ অন্ধকার, নর্ত্তকীর নিকট তাহা আলোকিত। পূর্ব্ব সংস্কার হইতে যেমন প্রত্যক্ষের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তেমনি আবার প্রত্যক্ষ হইতেও পূর্ব্বসংস্কারের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। পুরাতন নূতনকে পরিবর্ত্তন করিতেছে, নূতন আবার পুরাতনের পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে। বালকটির একটি শ্বেতবর্ণের কুকুর আছে তাই বালকের ধারণা কুকুর মাত্রেই সাদা। কিন্তু সে তাহার বন্ধুর বাড়ী গিয়া দেখিল সেখানে একটি জন্তু আছে—লোকে ইহাকেও কুকুর বলিতেছে যদিও ইহার রং কাল। বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ হইতে বালকের পূর্ব্বসংস্কার সংশোধিত হইয়া গেল ; সে এখন বুঝিল যে কুকুর মাত্রেই সাদা নহে।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ।

এই চিত্রটির প্রতি লক্ষ্য কর। প্রথম দৃষ্টিতে তুমি কি দেখিতেছ? ইহা কি একটি সিঁড়ি? যাহা তুমি প্রথম দৃষ্টিতেই প্রত্যক্ষ করিতেছ সে প্রত্যক্ষ তোমার মনে কতক্ষণ স্থায়ী হইতেছে? বাস্তবিক তুমি যাহা দেখিতেছ তাহা সাদা কাগজের উপর অঙ্কিত কতকগুলি কাল রেখা মাত্র। কিন্তু এই রেখা কয়টির সমাবেশ হইতে তোমার সিঁড়ির



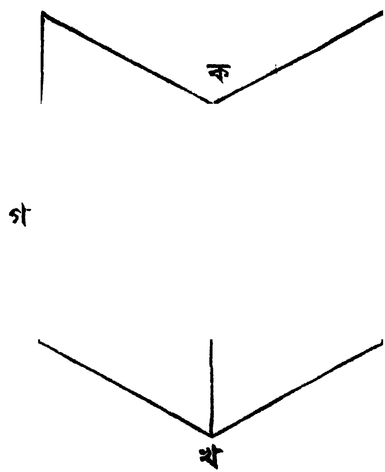
প্রতীতি হইতেছে। অতএব তুমি যাহা দেখিতেছ তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছ কি? তুমি দেখিতেছ রেখা কিন্তু প্রত্যক্ষ করিতেছ সিঁড়ির চিত্র। মাত্র রেখার সমাবেশ হইতেই সিঁড়ির প্রতীতি হইতেছে না। এ প্রতীতি পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতার ফল। যে

পূর্ব্বে কখন সিঁড়ি বা সিঁড়ির চিত্র দেখে নাই তাহার এই রেখা সমষ্টি হইতে এ প্রতীতি হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে বাহ্যিক উদ্বোধকের উপর পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার আভাস না পড়িলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। চিত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের সিঁড়ির চিত্রই মনে হইবে—মাত্র কতকগুলি কালির দাগ বলিয়া মনে হইবে না।

বর্ত্তমান প্রত্যক্ষের প্রকৃতি ভাবি প্রত্যক্ষের উপরও বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এই চিত্রটির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। এখানে তুমি

প্রত্যক্ষ ও ভাবি প্রত্যক্ষ।

যেমনটি প্রতীক্ষা করিবে তেমনিটী প্রত্যক্ষ করিবে। তুমি যদি মনে করে ক খ রেখাটি তোমার নিকটবর্ত্তী আর গ ঘ রেখাদ্বয় তোমা হইতে দূরে আছে তাহা হইলে তোমার সেইরূপই প্রতীতি হইবে। কিংবা যদি তুমি পূর্ব্ব হইতে মনে কর যে গ ঘ রেখাদ্বয় তোমার নিকট-বর্ত্তী কিন্তু ক খ রেখা তোমা হইতে দূরে আছে তাহা হইলে তোমার তাহাই প্রতীতি হইবে। এইরূপে চিন্তার সাহায্যে কোন প্রত্যক্ষের প্রতীক্ষা করিলে, সেই প্রতীক্ষালব্ধ প্রত্যক্ষের নাম ভাবিপ্রত্যক্ষ।



একই আকৃতির তিনটি বোতল লও। ইহাদের মধ্যে একটি বড়, একটি মধ্যম এবং একটি ছোট। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড দ্বারা বোতল

প্রত্যক্ষ, ভাবিপ্রত্যক্ষ এবং আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ

তিনটিকে এমন ভাবে পূর্ণ কর যেন তিনটিরই ওজন একবারে সমান হয়। এক্ষণে তুলা দ্বারা বোতলগুলি এমন ভাবে বন্ধ কর যেন প্রস্তরখণ্ড গুলি একবারে নিশ্চল থাকে। এক্ষণে অপর একজনকে হস্ত দ্বারা বোতল গুলির ওজন নির্ণয় করিতে দাও। যে বোতলটি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট তাহার ওজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বোধ হইবে আর যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় তাহার ওজন সর্ব্বাপেক্ষা কম বোধ হইবে। এই প্রকার ভ্রমের কারণ—

১। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ
২। আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ } সংমিশ্রণ।
৩। ভাবিপ্রত্যক্ষ

প্রথমতঃ—চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সাহায্যে বোতল তিনটির প্রকৃত আকার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি; তাহার পর, মনে হইতেছে যে সাধারণতঃ বড় জিনিষের ওজন বেশী এবং ছোট জিনিষের ওজন কম অতএব এখানে আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষের ক্রিয়া বর্ত্তমান—বোতল তুলিবার পূর্ব্বেই মনে হইতেছে যে, বড় বোতলটির ওজন বেশী হইবে এবং ছোটটির ওজন কম হইবে। তার পর ভাবিপ্রত্যক্ষের স্থচনা হইল। আমি প্রতীক্ষা করিতেছি যে, বড় বোতলটির ওজন অধিক হইবে এবং ছোটটির ওজন কম হইবে। তার পর বোতল তিনটি যখন ক্রমান্বয়ে হাতে করিতে লাগিলাম তখন ভাবিপ্রত্যক্ষের সহিত বর্ত্তমান প্রত্যক্ষের সংঘাত উপস্থিত হইল। এই সংঘাতের ফলে ভাবিপ্রত্যক্ষানুযায়ী "ভারী বস্তুটি" মধ্যবিৎ বোতলের তুলনায় পাতলা বোধ হইল এবং ভাবিপ্রত্যক্ষানুযায়ী "পাতলা" বস্তুটি ভারী বোধ হইল।

নিম্নলিখিত বর্ত্তমান মতিঝিলের বর্ণনাটি পাঠ কর। এক একটি অক্ষরে

মনোনিবেশ না করিয়া সমস্তটি পড়িয়া যাও এবং যে কয়টি ভুল লক্ষিত হয় তাহার গণনা করিয়া যাও।

"মতিঝিলের সে নবাভবন এখন ধূলিলিবুণ্ঠিত; তাহার কৃষ্ণমর্ম্মররচিত সুরচিত তোনড় দ্বারের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান; তাহাতে লতাগুল্মে ঢাকিয়া পরিতেছে! ভাগীরথি আর তাহার পাদধোত করিয়া প্রহাবিত হয় না। ঝিলের নিল সলিলে আর পদ্মকোরক তেমন শোভায় বিকশিত হয় না। চারিদিক হইতে কি এক গভীর মর্ম্মবেদনার হাহাকার বহন করিয়া তীররুক্তগুলি বায়ুভরে নিরন্তর শন্‌শন্‌ করিতেছে। ঝিলের জল শৈলার-গাদ্বলে কলঙ্কিত হইয়াছে। বনজন্তুর নিভৃত নিতেকন বলিয়া জনসমাজ রহিত হইয়া গিয়াছে।"

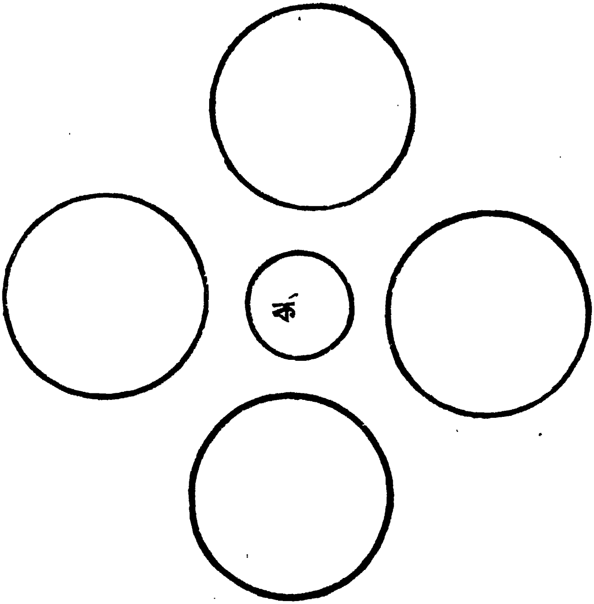
পুনরায় অক্ষরে অক্ষরে মনঃসংযোগ করিয়া পাঠ কর। এক্ষণে ভুলের সংখ্যা কত? প্রথম পাঠ কালে যদি কোন একটি ভুল অপ্রত্যক্ষ থাকিয়া যায় তবে সে প্রত্যক্ষের কারণ আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ। দুই একটি কথা পাঠ করিবার পর আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ প্রভাবে পরবর্ত্তী কথাটি পূর্ব্ব হইতে মনে উদয় হইয়া বর্ত্তমান প্রত্যক্ষকে রূপান্তরিত করিয়া দিতেছে, এবং যাহা ভুল তাহা নির্ভুল বলিয়া বোধ হইতেছে।

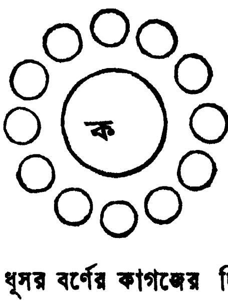
সন্নিকটস্থ বস্তুর সঙ্গ হেতু প্রত্যক্ষ বস্তুর রূপান্তরিত হইয়া থাকে। এই চিত্রগুলির প্রতি লক্ষ্য কর। র্ক একং ক এই দুই এর কোনটি বড়? প্রকৃতপক্ষে ক এবং র্ক উভয়েই সমান। র্ক অপেক্ষা ক বড় বলিয়া বোধ হইতেছে।

সঙ্গ ও প্রত্যক্ষ।

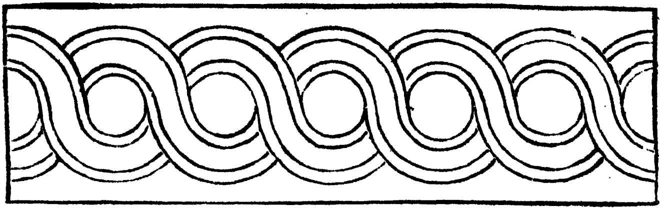
সুতরাং সঙ্গ হেতু একই বস্তু পৃথক্ ভাবে প্রতীয়মান হইতেছে।

আবার লাল, নীল, সবুজ, কাল, এই চারি বর্ণের চারিখানি কাগজ লও। উহাদের প্রত্যেকের মধ্যভাগে ধূসরবর্ণের সচ্ছিদ্র গোলাকার এবং অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের কাগজ রাখিয়া প্রত্যেকটিকে শ্বেত বর্ণের স্বচ্ছ কাগজ দিয়া আচ্ছাদন করিয়া দাও। এক্ষণে শ্বেত বর্ণের





কাগজের ভিতর দিয়া ধূসর বর্ণের কাগজের দিকে লক্ষ্য কর দেখিবে প্রত্যেকের বর্ণ পৃথক্ বলিয়া বোধ হইবে। যদিও আচ্ছাদন এক বর্ণের, যদিও মধ্যস্থ কাগজখণ্ড একবর্ণের, তথাপি তলস্থ কাগজের বর্ণ পার্থক্য হেতু মধ্যস্থ কাগজখণ্ডকে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে।

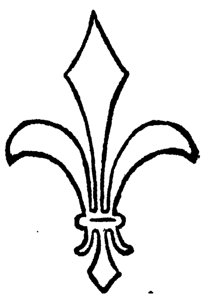


কোন বস্তুকে সম্যক্‌রূপে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সেই বস্তুর যাবতীয় অংশে চক্ষু এবং অবধান শক্তির গতি আবশ্যক। এই চিত্রটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর—দেখিবে তোমার দৃষ্টি নিশ্চল থাকিতেছে না। তোমার চক্ষু চিত্রের রেখার গতি অনুসরণ করিতেছে; কখনও দক্ষিণ হইতে বামে যাইতেছে, আবার কখনও বা বাম হইতে দক্ষিণে আসিতেছে। চক্ষুর গতি অনুসারে অবধানের গতি হইতেছে। এইরূপ গতির সহায়ে আংশিক এবং সঙ্গ প্রত্যক্ষ নিচয়ের সংমিশ্রণে সম্যক্ প্রত্যক্ষের সৃষ্টি হইতেছে।

কোন বস্তু প্রত্যক্ষ সময়ে একটি বিশেষ বিন্দু বা বিশেষ রেখা আমাদের প্রথম অবধান আকর্ষণ করে। এবং সেই বিন্দু বা রেখা হইতে দৃষ্টি

উৎপত্তি কেন্দ্র ও ঈক্ষণ গতি।

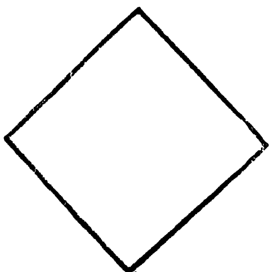
এবং অবধানের গতি আরম্ভ হয়। এই কেন্দ্র বা রেখাকে "উৎপত্তি কেন্দ্র" বলে এবং দৃষ্টি বা অবধান গতিকে "ঈক্ষণ গতি" বলা হয়। এই চিত্রের প্রতি লক্ষ্য কর। এখানে "উৎপত্তি কেন্দ্র" তলদেশে এবং "ঈক্ষণ গতি" ঊর্দ্ধগামী।



উৎপত্তি কেন্দ্র এবং ঈক্ষণগতির স্থানভেদে প্রত্যক্ষ বিষয়েরও ভেদ পরিলক্ষিত হয়। ক এবং খ এই দুইটি চিত্র লক্ষ্য করিলে বোধ হয় যে

উহারা একবারে বিভিন্ন প্রকারের চিত্র। উৎপত্তি কেন্দ্র এবং ঈক্ষণ গতির পার্থক্যই এ বিভিন্নতার কারণ।

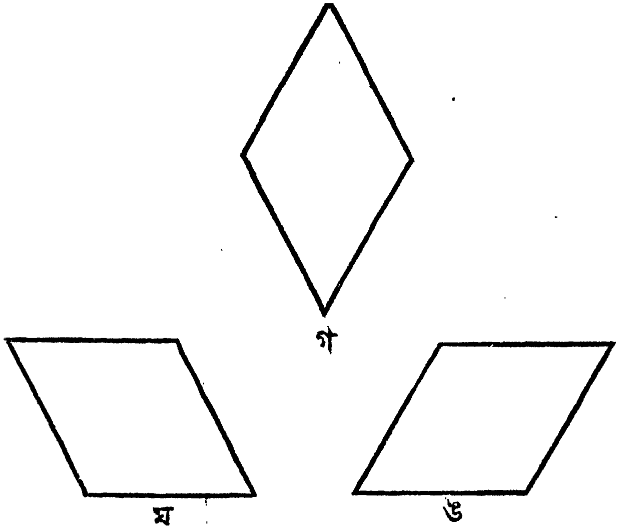
ক এর তলস্থ রেখা উৎপত্তি কেন্দ্র এবং ঈক্ষণগতি উর্দ্ধগামী। খ এর উৎপত্তি কেন্দ্র তলস্থ বিন্দু এবং ঈক্ষণগতি উর্দ্ধগামী।



খ

আবার গ, ঘ, ঙ, এই চিত্রত্রয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি চিত্রই এক তত্রাচ ইহারা পৃথক্ বলিয়া বোধ হইতেছে। গ এর উৎপত্তি কেন্দ্র তলস্থ বিন্দু আর ঘ এবং ঙর উৎপত্তি কেন্দ্র তলস্থ রেখা। তিনটিরই ঈক্ষণগতি উর্দ্ধগামী হইলেও গ এর ঈক্ষণগতি এক-বারে সোজা উর্দ্ধগামী, ঘ এর ঈক্ষণগতি বামাবর্ত্ত এবং ঙর ঈক্ষণগতি দক্ষিণাবর্ত্ত। সুতরাং ঈক্ষণগতির পার্থক্য অনুসারে চিত্রত্রয় পৃথক্ দেখাইতেছে। আবার ঘ এবং ঙ এই চিত্রদ্বয়ের মধ্যে ঘ অপেক্ষা ঙ অধিক প্রীতিপ্রদ বোধ হইতেছে। এই প্রীত্যাধিক্যের কারণ কি? চক্ষুর গতি যত সহজে দক্ষিণাবর্ত্ত হয় তত সহজে বামাবর্ত্ত হয় না। চক্ষুর গতি বামাভিমুখী করা অপেক্ষা দক্ষিণাভিমুখী করা সহজ। ঘএ ঈক্ষণ

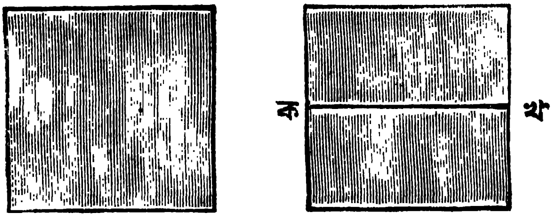
গতি বামাবর্ত্ত, আর ঙতে ঈক্ষণগতি দক্ষিণাবর্ত্ত, অতএব ঙর ঈক্ষণগতি সহজ সম্পন্ন বলিয়া অধিক প্রীতিপ্রদ। আবার যদি তুমি কল্পনা কর যে ঘ এবং



ঙ শূন্যে ঝুলিতেছে, তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় তলস্থ রেখাদ্বয় উৎপত্তি কেন্দ্র না হইয়া উপরিস্থ রেখাদ্বয় উৎপত্তি কেন্দ্র হইবে; ঈক্ষণ-গতি উর্দ্ধগামী না হইয়া অধোগামী হইবে এবং ঘএর গতি দক্ষিণাবর্ত্ত হইবে এবং ঙর গতি বামাবর্ত্ত হইবে। এক্ষণে ঙ অপেক্ষা ঘ অধিক প্রীতিপ্রদ হইবে।

(১) এবং (২) এই দুইটি চিত্র সমান হইলেও দ্বিতীয়টি অপেক্ষা প্রথমটি লম্বা বোধ হইতেছে। দ্বিতীয়টিতে ঈক্ষণগতি ক খ রেখার অনুযায়ী। এখানে উর্দ্ধগামী রেখাগুলি ক খ রেখাকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে। অতএব ঈক্ষণ-গতি যখন ক খ রেখার অনুসরণ করিতেছে তখন প্রত্যেক উর্দ্ধগামী রেখাই এই গতিকে বাধা প্রদান

করিতেছে। ক্ষণিকের জন্য প্রত্যেক উর্দ্ধগামী রেখাই ঈক্ষণ-গতির প্রতিবন্ধক হইতেছে। অতএব এখানে ঈক্ষণ-গতি অবাধ নহে বলিয়া



(১) (২)

যেন ইহা সঙ্কুচিত হইতেছে। প্রথমটিতে ঈক্ষণ-গতি উর্দ্ধগামী রেখানুযায়ী। এখানে ইহার গতি অবাধ এবং অপ্রতিহত। অতএব দেখা যইতেছে যে দ্বিতীয়টিতে ঈক্ষণ-গতি অবাধ নহে বলিয়া হই৷ সঙ্কীর্ণ বোধ হইতেছে এবং প্রথমটিতে এই গতি অবাধ বলিয়া ইহা দীর্ঘ বোধ হইতেছে।



পার্শ্বে রেখাদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। প্রথম রেখাটির ঈক্ষণ-গতি সরলরেখার প্রান্তদ্বয় হইতে বহির্মুখী হইতেছে; আবার দ্বিতীয় রেখার ঐ গতি সরল রেখার প্রান্তদ্বয় হইতে অন্তর্মুখী হইতেছে। যেখানে ঈক্ষণ-গতি প্রান্তবিন্দুদ্বয় হইতে অন্তর্মুখী হইতেছে সেখানে যেন ঐ গতি বাধা প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে; আর যেখানে ঈক্ষণ-গতি প্রান্তবিন্দুদ্বয় হইতে বহির্মুখী হইতেছে সেখানে যেন ঐ গতি অপ্রতিহত হইয়া আরও দূরে চলিয়া যাইতেছে। অতএব যেখানে গতি অন্তর্মুখী সেখানে যেন সরল রেখাটি সঙ্কুচিত বোধ হইতেছে; আর যেখানে গতি বহির্মুখী সেখানে উহা আরও প্রসারিত বোধ হইতেছে। অতএব রেখাদ্বয়ের দৈর্ঘ্য এক হইলেও যেখানে গতি অন্তর্মুখী সেখানে

ছোট এবং যেখানে বহির্মুখী সেখানে বড় বলিয়া বোধ হইতেছে।

সঙ্গ হেতু প্রত্যক্ষ বস্তুর রূপান্তরিত হইয়া থাকে সত্য কিন্তু আবার ভাবসঙ্গই প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিশেষ সহায়! পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে স্পর্শেন্দ্রিয় এবং গতীন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আমাদের দূরত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু যখন ঐ ইন্দ্রিয়দ্বয়ের দ্বারা দূরত্বের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে থাকি, তখন চাক্ষুষ চিহ্নগুলিও অবলোকন করি। পরে মাত্র চাক্ষুষ চিহ্ন হইতে আমাদের দূরত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহার একমাত্র কারণ সঙ্গ প্রভাব। সম্মুখে একটি বস্তু দেখিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর দূরত্বও মনে হইল। যখন গতিস্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করিতাম তখন নিম্নলিখিত চাক্ষুষ চিহ্নগুলিও অবলোকন করিতাম।

১। দূরত্ব অধিক হইলে বস্তু ছোট দেখায়।

২। দূরত্বের ইতরবিশেষে আলো আঁধারের তারতম্য হয়।

৩। দূরত্ব অধিক হইলে বস্তুর অস্পষ্টতা অধিক হয়।

৪। দ্রষ্টা এবং দৃষ্ট বস্তুর ব্যবধান অন্তর্গত বস্তুর সংখ্যা দূরত্বের নিদর্শন।

৫। দ্রষ্টার নিশ্চল অবস্থায় পার্শ্বস্থ বস্তুর গতির দ্রুততাও দূরত্বের লক্ষণ ইত্যাদি।

যখন এই চাক্ষুষ লক্ষণগুলি প্রত্যক্ষ করি তখন সঙ্গ হেতু আমাদের দূরত্বের প্রত্যয় জন্মে। যখন বস্তুর প্রকৃত আকার আমাদের জানা থাকে তখন বস্তুর আকারের তারতম্য অনুসারে দূরত্বের ইতর বিশেষ বুঝিতে পারা যায়। দূরত্ব যত বেশী হইবে বস্তুও তত ছোট দেখাইবে। আবার দূরত্ব যত বেশী হয় বস্তুটিও তত অস্পষ্ট হয়। অস্পষ্টতা যত বেশী, দূরত্বও তত বেশী। দ্রষ্টা এবং দৃষ্ট বস্তুর মধ্যে অপরাপর বস্তুর সংখ্যা যত বেশী হইবে

দূরত্বও তত বেশী হইবে। আবার যখন গমনশীল রেলগাড়ীতে বসিয়া থাকি তখন দেখি যে পার্শ্বস্থ দ্রব্যগুলি যত বেশী নিকটে তাহারা তত বেশী দ্রুতবেগে সরিয়া যায়। এই সকল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সহিত গতিস্পর্শেন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গ হেতু একটির উপস্থিতিতে অপরটি মনে হয়। প্রত্যক্ষ মাত্রেই এ সঙ্গপ্রভাব বর্ত্তমান। যখন অন্ধকার গৃহে পথ খুঁজিতে খুঁজিতে কোন কঠিন দ্রব্যে হাত লাগে তখন বলিয়া উঠি—"এটা টেবিল"; তখন সঙ্গস্বভাব হেতু মাত্র স্পর্শ সংবিত্তি হইতে ইহার আকৃতি প্রকৃতি প্রভৃতি সকলই মনে উদয় হয়।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানে দুইটি বিষয়ের বিশেষ আবশ্যক—প্রত্যক্ষ সংবিত্তি এবং অপ্রত্যক্ষ সংবিত্তি (সংবিত্তি + চিন্তা)। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বাহ্যবস্তুর উপলব্ধি যেমন প্রয়োজন, চিন্তারও তেমনি আবশ্যক। বাহ্যবস্তুর উপলব্ধি ব্যতীত প্রত্যক্ষ সংবিত্তি হইতে পারে না এবং চিন্তার সহায়তা ভিন্ন অপ্রত্যক্ষ সংবিত্তির স্মরণ অসম্ভব। অতএব কোন ফলের প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ঐ দুইটি প্রক্রিয়াই নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক। যদি ঐ দুইটির একটিতেও দোষ থাকে তবে ফলজ্ঞানও ভ্রান্তিমূলক হইবে। তুমি যাহাকে প্রত্যক্ষ মনে করিতেছ, তাহা প্রত্যক্ষ না হইতে পারে। তুমি যাহা সত্য মনে করিতেছ, তাহা সত্য না হইতে পারে। কোন সময়ে একজন লোক কতকগুলি বিষধর সর্প ধরিয়া একটি খাঁচার মধ্যে রাখিয়াছিল। তাহার চাকরের অসাবধানতা বশতঃ খাঁচাটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং সর্পগুলিও পলাইয়া যায়। বহু অনুসন্ধানের পর একটি ছাড়া সমস্ত সর্পগুলিই বাড়ীর মধ্যে ধৃত হইয়াছিল। চাকরটির অন্তঃকরণ বড়ই দুর্ব্বল ছিল। সে রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে তাহার বিছানাটি বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইল। তারপর শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া সর্পটির বিষয় মনে

ভুল প্রত্যক্ষের হেতু।

মনে চিন্তা করিতে লাগিল। এমন সময় তাহার পায়ের নিকট ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনিতে পাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পায়ের অঙ্গুলিতে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিল। "সাপ, সাপ, সাপে আমাকে কামড়াইয়াছে"—বলিয়া গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিল। পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল বলিয়া ফেলিল। অবশেষে তাহার ঘর অনুসন্ধানের পর দেখা গেল যে সাপের পরিবর্ত্তে তাহার শয্যার পার্শ্বে একটা পাতি হাঁস বসিয়া আছে। এই হাঁস চাকরটিই ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল এবং তাহার গৃহে রাখিয়াছিল। এখানে অবশ্য শব্দের সংবিত্তি ছিল সুতরাং শব্দানুভূতিতে কোন দোষ ছিল না। কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভূতির যথার্থ ব্যাখ্যা করা হয় নাই। প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা হয় নাই। চিন্তার কার্য্য প্রমাদশূন্য হয় নাই। অপ্রত্যক্ষানুভূতির নির্ভুল স্মরণ হয় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে কেবল প্রত্যক্ষ সংবিত্তি থাকিলেই যে প্রকৃত ফলজ্ঞান হয় তাহা নহে—সংবিত্তির অর্থ নির্ণয় একান্ত আবশ্যক।

আকৃতি প্রত্যক্ষে ভ্রম।

একটি সমচতুষ্কোণ অঙ্কিত কর। ইহা দেখিয়া এখন বোধ হইবে যে, ইহার চওড়া অপেক্ষা ইহার উচ্চতা অধিক। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উভয়ই সমান। এইরূপ ভ্রম প্রত্যক্ষের হেতু কি? আমাদের চক্ষু অতি সহজেই দক্ষিণ এবং বামাবর্ত্ত হইয়া থাকে কিন্তু অত সহজে উর্দ্ধ বা অধোগামী হয় না। সুতরাং ঐ চতুষ্কোণটির চওড়ার দিক ঈক্ষণ করিতে যতটুক পৈশিকক্রিয়ার আবশ্যক, ইহার উচ্চতা ঈক্ষণ করিতে তাহা অপেক্ষা অধিক পৈশিক-ক্রিয়ার আবশ্যক। চওড়া অপেক্ষা উচ্চতার দিকে অধিক চেষ্টার আবশ্যক। সুতরাং এই চেষ্টার আধিক্য হেতু উচ্চতা অধিক বলিয়া মনে হইতেছে। কতকগুলি চতুষ্কোণ অঙ্কিত কর। ইহার চওড়া

অপেক্ষা উচ্চতা কম হইবে। এক্ষণে এই চিত্রগুলি লক্ষ্য করিয়া স্থির কর কোন চিত্রটি সমচতুষ্কোণ। যে চিত্রটি সমচতুষ্কোণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সেই চিত্রটির চওড়ার দৈর্ঘ্য হইতে উচ্চতার দৈর্ঘ্য বাদ দিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই তোমার ভ্রমের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিবে।

কোন একটি জিনিষকে চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ কর এবং সেই জিনিষটিকে আবার সচেষ্ট স্পর্শদ্বারা প্রত্যক্ষ কর। সচেষ্ট স্পর্শ প্রত্যক্ষ অপেক্ষা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষটি বৃহৎ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যদি সেই বস্তুটি আবার মাত্র ত্বকের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা হয় তাহা হইলে ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইবে। শূন্য গর্ভ দন্তটি দর্পণ সাহায্যে দেখিলে যতটুকু দেখায় জিহ্বা বা অঙ্গুলির সাহায্যে স্পর্শ করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক বড় দেখায়। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে আমাদের প্রত্যয় অধিক বলিয়া ত্বাচ প্রত্যক্ষকে ভ্রম বলিয়া মনে হইতেছে।

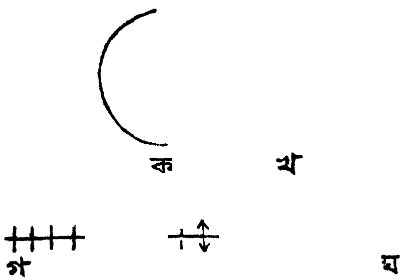
আয়তন প্রত্যক্ষে ভ্রম।

রেলগাড়ীর রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া "লাইন" দুইটি দেখিলে বোধ হয় যেন তাহারা অপর প্রান্তে পরস্পরাভিমুখী হইতেছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা সমান্তরাল। একটি "কম্পাস" লও। ইহার বাহুদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান এরূপ হইবে যে, একটি বাহু বিন্দু অধরের মধ্যস্থল এবং অপরটি ওষ্ঠের উপরিভাগ স্পর্শ করিবে। এক্ষণে উহার বাহুবিন্দুদ্বয় এক কর্ণের মূলদেশে স্থাপন করিয়া, কপোলদেশ অতিক্রম করিয়া, ওষ্ঠাধরের উপর দিয়া অপর কর্ণ প্রান্ত পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাও। কপোলদেশ হইতে যতই ওষ্ঠাধরের দিকে অগ্রসর হইবে, ততই বোধ হইবে যে বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব বাড়িয়া যাইতেছে। আবার ওষ্ঠাধর হইতে যেমন কপোলদেশ অতিক্রম করিতে থাকিবে ততই বিন্দুদ্বয়ের ব্যবধান কমিয়া যাইবে।

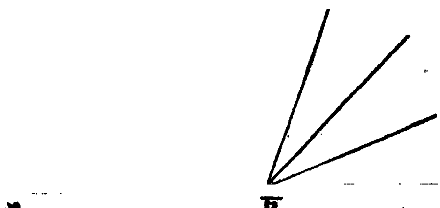
চক্ষুর্দ্বয় বন্ধ কর। একজন একটি পেনসিল লইয়া তোমার

স্কন্ধদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া হস্তের অঙ্গুলির প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইতেছে। পেনসিলের গতি একপ্রকার—অর্থাৎ ইহার হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে না। কিন্তু তোমার মনে হইতেছে ইহার গতির হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে—যেন ইহা কখন দ্রুত চলিতেছে, আবার কখন আস্তে আস্তে চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গতির হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে না। স্থানিক আনুভূতিক শক্তির পার্থক্য অনুসারে গতি প্রত্যক্ষে পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে।

গতি প্রত্যক্ষে ভ্রম।



খ অপেক্ষা ক কে বড় বলিয়া বোধ হইতেছে, আবার গ ঘ এর দক্ষিণার্দ্ধ অপেক্ষা বামার্দ্ধ বড় বোধ হইতেছে। ঙ অপেক্ষা চ কে বড়

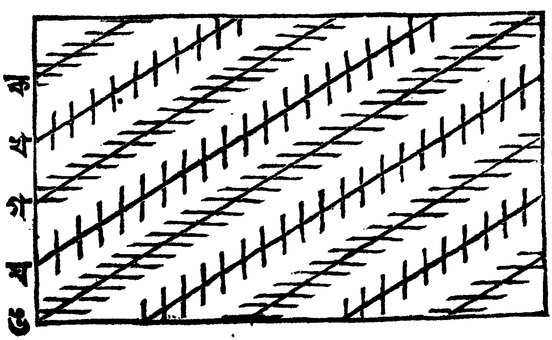


বলিয়া বোধ হইতেছে। দুইটি সমান আকারের স্থানে যদি একটি শূন্য

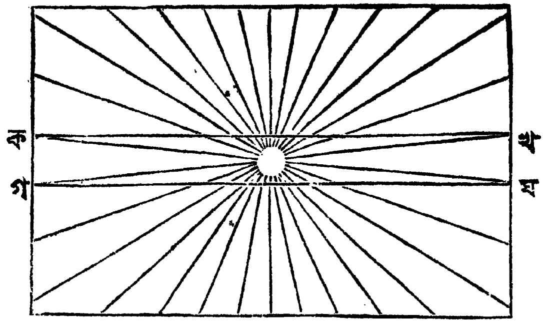
এবং আর একটি পূর্ণ থাকে তবে শূন্য স্থানটি অপেক্ষা পূর্ণ স্থানটি বড় বলিয়া বোধ হয়। ৪ অক্ষরটির নিম্নার্দ্ধ অপেক্ষা উপরার্দ্ধের আকার ছোট হইলেও সমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঐ অক্ষরটি যদি উল্টাইয়া রাখা যায় তখন নিম্নার্দ্ধটি ছোট বোধ হইবে (৪)।



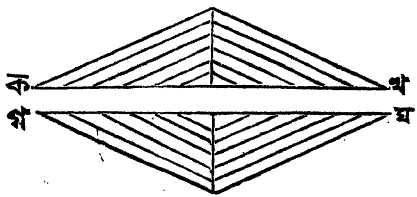
অ আ রেখাটি সরল রেখা হইলেও সরল রেখা নয় মনে হইতেছে।



এখানে ক খ গ ঘ ঙ রেখাগুলি পরস্পর সমান্তরাল হইলেও সমান্তরাল বলিয়া বোধ হইতেছে না।



এখানে ক খ রেখা, গ ঘ এর সহিত সমান্তরাল হইলেও তেমন বোধ হইতেছে না।



এখানেও ক খ, গ ঘ এর সহিত সমান্তরাল হইলেও সমান্তরাল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। এই তিনটি চিত্রের উপরেখাগুলি আমাদের ঈক্ষণ গতির পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে সুতরাং অবধান গতিরও ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। সুতরাং সঙ্গ এবং ঈক্ষণ গতি এই দুইএর সমন্বয়ে দৃষ্টবস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞানে বিপর্য্যয় ঘটিতেছে।

ষোড়শ অধ্যায়

সংজ্ঞা।

ঐ দেখ, বালকটির মুখ বিবর্ণ হইল, মস্তক হেলিয়া পড়িল, আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, ভূতলে পতিত হইল। বোধ হয় সে মূর্চ্ছিত হইতেছে। শ্বাসপ্রশ্বাস অসংযত হইল, বোধ হয় বন্ধ হইয়া গেল। সে মূর্চ্ছিত হইয়াছে, তুমি তাহার নিকটে গেলে, সে তোমাকে দেখিল না, তোমার কথা শুনিল না। তুমি তাহার চক্ষে জল নিক্ষেপ করিলে, সে তাহা অনুভব করিল না। যেন তাহার সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার লোপ হইয়াছে। সে সংজ্ঞাহীন হইয়াছে। ক্রমশঃ বিপদ কাটিয়া গেল, চক্ষু উন্মীলন করিল, মানস ক্রিয়া আরম্ভ হইল। সুপ্তসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল।

সংজ্ঞা কাহাকে বলে।

* * "হইল বামা
সেই স্মৃতি সুখাবেশে মূর্চ্ছিতা আবার।
হেলিয়া পড়িল শির, ধরিলেন ভদ্রা করে;
বর্ষিলেন মুখে চক্ষে; * *
ধীরে রমণীর জ্ঞান, ধীরে রমণীর স্মৃতি,
আসিল ফিরিয়া", * *।

সর্ব্বপ্রকার মানস ব্যাপারের সাধারণ নাম সংজ্ঞা।

সংজ্ঞার দ্বিবিধ অবস্থা।

আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাজমহল দেখিয়াছি কিন্তু তাজমহলের কথা আমার সকল সময়ে মনে হয় না। আজ সে কথা হঠাৎ আমার মনে হইল কেন? এতদিন তাজমহলের ধারণা কোথায় ছিল? অবশ্য কোথাও ছিল না একথা মনে করিতে পারি না। যদি কোথাও না ছিল তবে কেমন করিয়া আবার মনোমধ্যে উদয় হইল? সুতরাং স্বীকার করিতে হইল যে মনের মধ্যেই ছিল কিন্তু ইহার সংজ্ঞা ছিল না।

"একি! কাহার এ মোহন মূরতি?

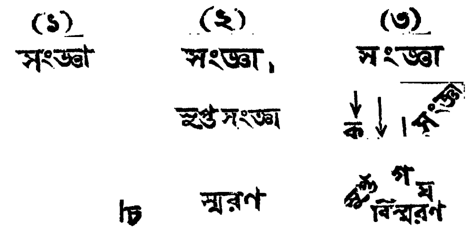
* * *

দূরাগত বেণুধ্বনি প্রায়,
স্মৃতি মাঝে এক অস্ফুট আলোক সম,
জাগিছে এ মোহন মূরতি!
বোধ হয় বালিকা বয়সে
যেন আমি হেরেছি ইঁহায়,
তারপর—তারপর আর দেখি নাই।

অনেক বিষয়ই এখন আমার সংজ্ঞার বাহিরে কিন্তু চেষ্টা করিলে আবার অনেক বিষয়ই আমি স্মরণ করিতে পারি। অতএব দেখা যাইতেছে যে আমাদের অভিজ্ঞাত সকল বিষয়ই মনোরাজ্যে বর্ত্তমান; তবে কতকগুলি সংজ্ঞার অন্তর্গত এবং কতকগুলি সংজ্ঞাবহির্ভূত। অতএব সকল সময়েই মনের দুইটি অবস্থা, একটি জাগ্রৎ অবস্থা আর একটি সুপ্ত অবস্থা। মনের জাগ্রৎ অবস্থাকে সংজ্ঞা এবং সুপ্ত অবস্থাকে সুপ্ত-সংজ্ঞা নামে অভিহিত করিব। সুপ্তসংজ্ঞাক্ষেত্রস্থিত বিষয়কে সংজ্ঞা-ক্ষেত্রে আনয়ন করার নাম স্মরণ। আমি একটি লোক দেখিলাম।

লোকটি আমার পরিচিত কিন্তু তাহার নাম আমার মনে আসিল না। এখানে নামটি সুপ্ত সংজ্ঞায়। চেষ্টা এবং চিন্তার পর যখন নামটি স্মরণ হইল, তখন ইহা সংজ্ঞাক্ষেত্রে।

"কৃষ্ণপক্ষ অন্ধকারে ক্ষীণচন্দ্রকর লেখা,
যেইরূপে ধরাতলে ধীরে ধীরে দেয় দেখা,
স্মৃতির আলোক ধীরে মনোরাজ্যে উত্তরার
ভাসিতে লাগিল, ভেদি আত্ম ভ্রান্তি অন্ধকার।
অনেক দিনের দূরবিস্মৃত সঙ্গীত মত
পড়িতে লাগিল মনে জীবন-ঘটনা-যত।"



ক খ গ ঘ ঙ চ = মন; খ গ ঘ ঙ = সংজ্ঞা; ক খ ঙ চ = সুপ্ত সংজ্ঞা। সংজ্ঞা অপেক্ষা সুপ্তসংজ্ঞার ক্ষেত্র অধিক অর্থাৎ অভিজ্ঞাত বিষয়ের অধিকাংশই সুপ্ত সংজ্ঞাক্ষেত্রে অবস্থিত। ক চ সংযুক্ত করিয়া কোন রেখা না থাকায় সুপ্ত সংজ্ঞাক্ষেত্রের একদিকের অসীমত্ব বুঝাইতেছে। খ ঙ সংজ্ঞাক্ষেত্রের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। এই ক্ষেত্রের হ্রাস বৃদ্ধি আছে। যখন মানুষ তন্দ্রাভিভূত হয় তখন ইহার সীমা কমিয়া যায়। গাঢ় নিদ্রার সময় খ ঙ—গ ঘ এর সহিত মিলিত হইয়া যায়। কোন বিষয়কে সুপ্ত সংজ্ঞাক্ষেত্র হইতে সংজ্ঞাক্ষেত্রে আনয়ন করাই স্মরণ (২)। বিস্মৃতির সময় স্মৃতি সংজ্ঞাক্ষেত্র হইতে সুপ্ত সংজ্ঞাক্ষেত্রে

গমন করে। স্মৃতি সুপ্ত সংজ্ঞাক্ষেত্রের যত অধোগামী হয় তাহার স্মরণও তত কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। ঘ অপেক্ষা গ কে, গ অপেক্ষা খ কে, এবং খ অপেক্ষা ক কে অধিক সহজে স্মরণ করা যায় (৩)।

যখন আমি সম্পূর্ণরূপে সজাগ তখন আমার সংজ্ঞা বর্ত্তমান। যখন পূর্ণ মাত্রায় নিদ্রিত তখন আমি সংজ্ঞাহীন; আবার যখন আমি তন্দ্রালু তখন সংজ্ঞাও ক্ষীণ। মূর্চ্ছাকালে মানুষ একবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া থাকে, আবার মূর্চ্ছার ঘোর যেমন ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে সংজ্ঞার দীপ্তিও তেমনি ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। অতএব যখনই আমাদের মানস জীবন, বা মানস অভিজ্ঞতা বর্ত্তমান তখনই আমরা সংজ্ঞাবিশিষ্ট। যতক্ষণ আমাদের ভাব ভাবনা আশা ভরসা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার বর্ত্তমান ততক্ষণ সংজ্ঞাও বর্ত্তমান। মানস ব্যাপারের জ্ঞান মাত্রকেই সংজ্ঞা বলা হয়। সংজ্ঞা একান্ত মৌলিক এবং অবিভাজ্য সুতরাং সংজ্ঞাকে সূত্রবদ্ধ করা যায় না।

সংজ্ঞা পরিবর্ত্তনশীল।

যতক্ষণ আমরা সজাগ থাকি ততক্ষণ কত বস্তু, কত ব্যাপার, কত ব্যক্তিই না আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়; কত স্মৃতি, কত কল্পনা, কত বেদনারই না উদয় হয়। একটির পর একটির আবির্ভাব হইতেছে, একটির পর একটির তিরোভাব হইতেছে। এইরূপে আমার সংজ্ঞাক্ষেত্রে অবিশ্রান্তভাবে ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এ প্রবাহের বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই। আমার সংজ্ঞা অনবরত পরিবর্ত্তনশীল। নূতন অভাব, নূতন বাসনা, নূতন উদ্যম, নূতন চিন্তা, নূতন প্রতিজ্ঞা,নূতন বিশ্বাস পুরাতনকে পরাভূত করিয়া সংজ্ঞাক্ষেত্রকে সর্ব্বদাই অধিকার করিতেছে।

কিন্তু সংজ্ঞাক্ষেত্র :পরিবর্ত্তনশীল হইলেও মানসিক অবস্থা নিচয় পরম্পরাবচ্ছিন্ন নহে। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যেও নিরবচ্ছিন্নতা বর্ত্তমান।

সংজ্ঞা নিরবচ্ছিন্ন।

সংজ্ঞাক্ষেত্রে নানা ভাবের নানা চিন্তার উদয় হইলেও এখানে বহুত্বে এক, পার্থক্যে সাম্য এবং বিরোধে ঐক্য দৃষ্ট হয়। সংজ্ঞাক্ষেত্রে বহুচিচ্ছায়ার উদয় হইতেছে আবার অস্ত হইতেছে, কিন্তু কোন একটি চিচ্ছায়াও একবারে সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত নহে। বর্ত্তমান অতীতের ছায়া এবং ভবিষ্যতের আভাষ। যে মানস চিত্রখানি এক্ষণে আমার সংজ্ঞাক্ষেত্রে উদীয়মান তাহার মূল অতীতে এবং শাখা প্রশাখা ভবিষ্যতে। বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা অতীত মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে এবং ভবিষ্যৎ অবস্থার সূচনা করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিতে পার যে সংজ্ঞা যদি নিরবচ্ছিন্ন হয় তবে সংজ্ঞার মধ্যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় কেন? যখন আমি নিদ্রামগ্ন তখন আমি সংজ্ঞাহীন, সুতরাং নিদ্রার পূর্ব্ব এবং পর সংজ্ঞার মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে। ব্যবধান রহিয়াছে সত্য, কিন্তু এ ব্যবধান বাস্তব নহে। তুমি একখানি পুস্তক পড়িতেছ। পুস্তক খানির দ্বিতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে। পরে যখন তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল তখন পুনরায় সেই পুস্তকখানি পাঠে মনোনিবেশ করিলে। এখন তুমি তৃতীয় অধ্যায় হইতে পাঠ আরম্ভ করিলে। যদি নিদ্রা হেতু তোমার সংজ্ঞার বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে তবে কেমন করিয়া বুঝিলে যে নিদ্রার পূর্ব্বে ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলে। সুতরাং নিদ্রাকালেও সংজ্ঞা বর্ত্তমান ছিল স্বীকার করিতে হইবে। নিদ্রাকালীন সংজ্ঞা সুপ্তসংজ্ঞা।

স্বার্থ এবং অবধান শক্তি অনুসারে সংজ্ঞার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। তুমি আমায় একটি গল্প বলিতেছ কিন্তু আমি যদি সে গল্পে কোন স্বার্থ অনুভব না করি তাহা হইলে আমার অবধান শক্তি বিষয়ান্তরে ধাবিত হইবে। কিন্তু গল্পটি যদি আমার মনোমত হয় তাহা

স্বার্থ, অবধান, এবং সংজ্ঞা।

হইলে আমি উহাতে বিশেষ স্বার্থ অনুভব করিব এবং আমার অবধান শক্তিও উহাতে একান্ত অনুরক্ত থাকিবে। আবার যখন মনোনিবেশ



সহকারে গল্পটি শুনিতেছি তখন সেই গল্পের প্রত্যেক অংশেই সমান মনোযোগ অর্পণ করিতেছি না। আবার গল্প শ্রবণকালে সেখানে অপর লোকের সমাগম কিছু না কিছু বুঝিতেছি; গৃহটি ক্রমশঃ অন্ধকার হইতেছে এবং ঠাণ্ডা হইতেছে তাহাও বুঝিতেছি। এ সমস্তই সংজ্ঞাক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেছে সত্য কিন্তু তথাপি তাহারা সংজ্ঞার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিতে পারিতেছে না—এ সকল বিষয়ে এখন আমার বিশেষ স্বার্থ নাই। ইহারা সংজ্ঞাক্ষেত্রে বর্ত্তমান থাকিলেও সংজ্ঞার কেন্দ্রস্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিতেছে না। যাহাতে বিশেষ স্বার্থ আছে তাহাই আমরা বিশেষ ভাবে অবধান করি এবং যাহা বিশেষ ভাবে অবধান করি তাহাই কেন্দ্র সংজ্ঞায় উপস্থিত হয়। আবার এমন অনেক বিষয় আছে যাহা এখন সংজ্ঞাক্ষেত্র বহির্ভূত কিন্তু আবশ্যক হইলে স্মরণশক্তি সাহায্যে সংজ্ঞাক্ষেত্রে আনয়ন করা যাইতে পারে। এ ক্ষেত্রকে সুপ্ত সংজ্ঞাক্ষেত্র বলা হয়। অতএব সংজ্ঞারও পরিমাণ আছে। স্বার্থ এবং অবধান এই পরিমাণের নিয়ন্তা।

আমি জানি, আমি অনুভব করি, আমি ইচ্ছা করি, এবং আমি বুঝিতে পারি যে এই জ্ঞান, অনুভূতি, এবং ইচ্ছা, আমারই মনের ক্রিয়া।

সংজ্ঞার লক্ষণ।

যেমন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সাহায্যে বাহ্যজগতের জ্ঞানলাভ করিতে পারি তেমনি সংজ্ঞায় অন্তর জগতের সত্ত্ব জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সংজ্ঞাই অবস্থানিচয়ের বন্ধন স্বরূপ। সংজ্ঞাই নানা অবস্থার ঐক্য সাধন করিয়া থাকে। সংজ্ঞাজ্ঞান

সত্ত্ব। সংজ্ঞা মনের চক্ষু বিশেষ। ইহা আমাদের অন্তরেন্দ্রিয়। আমি জানি আমি নৈরাশ হইয়াছি ; আমি জানি আমি সত্য বলিতে ইচ্ছুক ; আমি জানি আমি অস্তোন্মুখী সূর্য্য দেখিতেছি। এবম্প্রকার জ্ঞানে আমার ভুল হইতে পারে না। সংজ্ঞার সাক্ষ্য চরম এবং অভ্রান্ত। যখনই একটি চিন্তা, একটি বেদনা, একটি উদ্দেশ্য আমার অন্তরে আঘাত করিতেছে তখনই আমার সংজ্ঞা বর্ত্তমান। জাগ্রতই থাকি বা নিদ্রিতই থাকি মন সতত সক্রিয়—সংজ্ঞা অনবরত বর্ত্তমান। যে ব্যাপার সংজ্ঞাক্ষেত্রে উদয় হয় না তাহা মানসিক নহে। আমি জানি যে আমি এক্ষণে আমার স্নেহময়ী জননীর আশীর্ব্বচন স্মরণ করিতেছি ; আমি জানি আমি আগামী বর্ষ হইতে বেদাধ্যয়নে রত হইব ; কিন্তু অতীত বা ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতা যাহা আমার সংজ্ঞাক্ষেত্রে অবর্ত্তমান তাহা আমি জানি না। আমি মাত্র বর্ত্তমান মানসিক অবস্থার বিষয়ই জানিতে পারি। অতএব সংজ্ঞার লক্ষণ—

১। মানস ব্যাপারের জ্ঞাতা

২। অভ্রান্ত

৩। মানস ব্যাপার মাত্রেই বর্ত্তমান

৪। মাত্র বর্ত্তমান অবস্থার জ্ঞাতা

আমি অবধান করি ; আমার সংজ্ঞা আছে ; আমি স্মরণ করি। অবধান কালে মন তাহার শক্তি নিচয়কে কেন্দ্রীভূত করে, চিন্তার সময় মন বস্তু বিশেষের জ্ঞান অর্জ্জন করে ; স্মরণ কালে লব্ধজ্ঞানকে চিত্তপটে আনয়ন করে এবং সংজ্ঞা সাহায্যে মন এই এই কার্য্যে ব্যাপৃত তাহা বুঝিতে পারে। যখন আমি সম্যক্‌রূপে অবধান করি তখন আমার সংজ্ঞা স্পষ্ট ; স্মরণ সম্পূর্ণ। যখন আমার অবধান সামান্য তখন

অবধান, স্মরণ, এবং সংজ্ঞা।

সংজ্ঞা অস্পষ্ট; স্মরণ প্রমাদপূর্ণ। যখন আমার অবধানের একান্ত অভাব তখন সংজ্ঞা এবং স্মরণেরও একান্ত অভাব। তুমি কর্ম্মলিপ্ত; ঘণ্টা বাজিল; শব্দের সংজ্ঞা হইল না সুতরাং এ শব্দের স্মৃতিও অসম্ভব। অতএব দেখা যাইতেছে যে এ তিনটি পরস্পর মুখাপেক্ষী।

সংজ্ঞার বিষয় প্রধানতঃ দুইটি—একটি গৌণ আর একটি মুখ্য। সংজ্ঞার মুখ্য বিষয় আত্মা এবং গৌণ বিষয় অনাত্মা। তুমি ঐ মিষ্ট ফলটি আস্বাদন করিতেছ কিন্তু মিষ্টতা আস্বাদন করিতেছ না; তুমি ঐ সুন্দর ছবিখানি দেখিতেছ, কিন্তু সৌন্দর্য্য দেখিতেছ না; তুমি গুণযুক্ত বাহ্যবস্তুই প্রত্যক্ষ করিয়া থাক কিন্তু বস্তু ব্যতীত গুণ প্রত্যক্ষ করিতে পার না। তদ্রূপ মানস জগতেও তুমি যাহা প্রত্যক্ষ কর তাহা ক্রিয়াশীল আত্মা মাত্র—কিন্তু আত্মা ব্যতীত ক্রিয়া নহে। তুমি চিন্তাশীল আত্মা প্রত্যক্ষ করিতেছ কিন্তু মাত্র চিন্তা তোমার প্রত্যক্ষ নহে। তুমি এক্ষণে আনন্দিত তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছ কিন্তু মাত্র আনন্দ তোমার প্রত্যক্ষ নহে; তুমি শোকাতুর ইহাই তোমার প্রত্যক্ষ কিন্তু শোক তোমার প্রত্যক্ষীভূত নহে। অতএব আত্মা ব্যতীত মানসিক অবস্থার সংজ্ঞা অসম্ভব। অবস্থাবিশেষের সংজ্ঞা সময়ে যাহার অবস্থা তাহার সংজ্ঞাও আবশ্যক। চিন্তা অনুভূতি ইচ্ছা ইত্যাদি মানসিক অবস্থা; কিন্তু যখনই আমি চিন্তান্বিত বা অভিভূত বা কর্ম্মরত তখনই আমি বুঝিতে পারি যে আমি চিন্তা করিতেছি, আমি অনুভব করিতেছি, আমি কর্ম্ম করিতেছি। সুতরাং মানসিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমার "আমির" সংজ্ঞা হইতেছে এবং এই "আমির" সংজ্ঞাই আত্ম-সংজ্ঞা। এখানে আত্মাই সংজ্ঞার বিষয়। কিন্তু অনাত্ম-সংজ্ঞা ব্যতীত আত্ম-সংজ্ঞা অসম্ভব। মানসক্ষেত্র যতক্ষণ নিশ্চল নিষ্কম্প ততক্ষণ সংজ্ঞার স্থিতি

সংজ্ঞার বিষয়।

অজ্ঞাত। সুতরাং মানসক্ষেত্রের চাঞ্চল্য উৎপাদন আবশ্যক। আত্মা ঐ চাঞ্চল্যের হেতু নহে। সুতরাং, আত্মা যখন চাঞ্চল্যের হেতু নহে তখন যাহা আত্মা নহে অর্থাৎ অনাত্মাই এই চাঞ্চল্য উৎপাদনের কারণ হইবে। অতএব আত্মা এবং অনাত্মার সংজ্ঞা এককালীন হইয়া থাকে। ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ। কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তদ্বিপরীত বিষয়ের জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। অতএব অনাত্মা ব্যতীত আত্মার জ্ঞান অসম্ভব। এই জন্য অনাত্মাও সংজ্ঞার বিষয়ীভূত।

সংজ্ঞার সহায়ক।

যে বিষয় একবারে অবিচ্ছিন্ন, নিরালম্ব, সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত সে বিষয়ের সংজ্ঞা থাকিতে পারে না। একবারে বিসদৃশ বস্তুর জ্ঞান থাকিতে পারে না। কোন বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সেই বস্তুটি এই বস্তুটির সদৃশ এবং ঐ বস্তু হইতে বিসদৃশ এরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন। সাদৃশ্যানয়ন এবং বৈসাদৃশ্যানয়ন ব্যতীত সংজ্ঞা অসম্ভব। পুরাতনের সাহায্যেই নূতনের জ্ঞান হইয়া থাকে। যাহা একবারে নূতন, যাহা পুরাতনের সহিত সকল সম্পর্কশূন্য তাহার সংজ্ঞা অসম্ভব। সুতরাং নূতনের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পুরাতনের সাহায্য লইতে হইবে। যাহা পুরাতন, যাহা অতীত, তাহা স্মৃতির সাহায্যেই চিন্তনীয় সুতরাং স্মরণশক্তিরও প্রয়োজন। যাহা একক, যাহা নিঃসম্পর্ক, তাহার সংজ্ঞা অসম্ভব। যেখানে বহুত্বে এক, এবং পার্থক্যে সাম্য, সেইখানেই সংজ্ঞার স্থিতি সম্ভব। মনের যদি মাত্র একটি অবস্থা থাকিত তবে সে অবস্থার সংজ্ঞা থাকিত না। কোন একটি অবস্থাকে জানিতে হইলে তাহার সদৃশ অবস্থা এবং বিসদৃশ অবস্থার জ্ঞান আবশ্যক। চিরকাল অন্ধকারের মধ্যে থাকিলে অন্ধকারের জ্ঞান থাকিত না। যাহারা অহরহ কোলাহলের ভিতর বাস করে তাহারা সে গোলমাল শুনিতে পায় না।

যাহারা আজীবন পূতিগন্ধময় স্থানে বাস করে তাহারা সে স্থানের দুর্গন্ধ বুঝিতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে কোন বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তদ্বিপরীত বস্তুরও জ্ঞান প্রয়োজন। সুস্থ স্বাস্থ্যও সংজ্ঞার বিশেষ সহায়। রক্ত প্রবাহের ব্যাঘাত ঘটিলে, শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার বিপর্য্যয় ঘটিলে, শরীর পোষণোপযোগী খাদ্যের অভাব হইলে, রক্তাধিক্য হইলে বা রক্ত অল্প হইলে, সংজ্ঞার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। শ্রোত্র সংজ্ঞা স্পর্শ সংজ্ঞা হইতে পৃথক। একটি সংবিত্তি অপর সংবিত্তি হইতে পৃথক্। পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় যন্ত্র সাহায্যে পৃথক্ পৃথক্ সংবিত্তি লাভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় যন্ত্রের গঠন প্রণালীও পৃথক্। অতএব প্রান্তযন্ত্রের গঠন পার্থক্য হেতু সংজ্ঞার প্রকৃতিতেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আবার সঙ্গ হেতুও সংজ্ঞার পরিমাণে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শ্বেত বর্ণের পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ অধিক কৃষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। দীর্ঘ ব্যক্তির পার্শ্বে বামনকে আরও খর্ব্ব বলিয়া বোধ হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

মেধাশক্তি

টেবিলের উপর একটি লেবু আছে। এই লেবুটি যতক্ষণ দেখিতেছ ততক্ষণ তোমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেছে। এই প্রত্যক্ষজ্ঞানকে ফলজ্ঞান বলা যায়। লেবুটি যখন সরাইয়া লইলাম তখনও তোমার লেবুর জ্ঞান থাকিল কিন্তু এ জ্ঞান ফলজ্ঞান নহে, প্রত্যক্ষজ্ঞান নহে—ইহা স্মৃতিমাত্র। প্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান স্বরূপ জ্ঞান; অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান প্রতিরূপ জ্ঞান। স্বরূপ জ্ঞান অতি সুস্পষ্ট, এরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষ বস্তু সমুৎপন্ন। প্রতিরূপ জ্ঞান তত সুস্পষ্ট নহে, এরূপ জ্ঞান পরোক্ষ বস্তু সমুৎপন্ন। যতক্ষণ বাহ্যবস্তুর স্থিতি, স্বরূপ জ্ঞানের স্থিতি ততক্ষণ। বাহ্যবস্তু অন্তর্হিত হইলে স্বরূপ জ্ঞানের অবসান হয়। কিন্তু প্রতিরূপ জ্ঞানের স্থিতি বাহ্যবস্তুর স্থিতির উপর নির্ভর করে না। স্বরূপ জ্ঞান বহুল পরিমাণে আমাদের ইচ্ছার বশবর্ত্তী নহে। লেবুটি দেখিব অথচ ইহার কথা ভাবিব না এরূপ হইতে পারে না। ইচ্ছা করিয়া লেবুটি না দেখিতে পারি কিন্তু লেবুটি দেখিব অথচ লেবুর বিষয় চিন্তা করিব না, এরূপ হওয়া অসম্ভব। মেঘ ডাকিলে আমি ইচ্ছা করি বা না করি ইহার শব্দ আমাকে শুনিতেই হইবে। প্রতিরূপ জ্ঞান অনেক পরিমাণে আমাদের ইচ্ছার অধীন বলিতে পারা যায়, কারণ, অন্য বিষয়ের চিন্তা করিয়া লেবুর স্মৃতিকে বিস্মরণ করিতে পারি। মনকে এক বিষয়ের চিন্তা হইতে অন্য বিষয়ের চিন্তায় লইয়া যাইবার শক্তি আমাদের আছে এবং যখন একটি বিষয়ের চিন্তা করিতে

প্রত্যক্ষ ও স্মৃতি।

থাকি তখন অপর বিষয়ের চিন্তা আমাদের মনে উদয় হয় না। স্বরূপ জ্ঞানের প্রকাশও যেমন আকস্মিক, তিরোভাবও তেমনি আকস্মিক। যখনই লেবুটি তোমার সম্মুখে ধরিলাম তখনই ইহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইল, আবার যখনই লেবুটি সরাইয়া লইলাম সেই মুহূর্ত্তেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানও অন্তর্হিত হইল। কিন্তু প্রতিরূপজ্ঞানের আবির্ভাব বা তিরোভাব এরূপ আকস্মিক নহে ; ইচ্ছা করিবামাত্রই লেবুর স্মৃতি অন্তর্হিত হয় না ; সময় এবং চেষ্টার প্রয়োজন। এরূপ জ্ঞানের বিকাশ এবং বিলোপ ক্রমিক। স্বরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষ বস্তু এবং স্মৃতবস্তুর সমন্বয় মাত্র। লেবুর বর্ণ প্রত্যক্ষ বস্তু এবং ইহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি স্মৃত বস্তু। কিন্তু প্রতিরূপ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে স্মৃতবস্তু।

স্মৃতি—প্রতিরূপ জ্ঞান। (লেবু অবর্ত্তমান)	প্রত্যক্ষ—স্বরূপ জ্ঞান। (লেবু বর্ত্তমান)
১। নাতি সুস্পষ্ট	১। অতি সুস্পষ্ট
২। বাহ্যবস্তু নিরপেক্ষ	২। বাহ্য বস্তু সাপেক্ষ
৩। ইচ্ছাধীন	৩। অনিচ্ছাধীন
৪। বিকাশ এবং লয় ক্রমিক	৪। বিকাশ এবং লয় আকস্মিক
৫। মাত্র স্মৃতবস্তু	৫। প্রত্যক্ষ বস্তু + স্মৃতবস্তু।

"করিয়াছে হৃদিগৃহ স্মৃতি মাখা ঘর,
তোমাতরে পরবাসে কাঁদিছে অন্তর !
অরূপ স্বরূপ চিত্রে আত্ম সমর্পিয়া
সেই ঘরে বাস করি শোক-দুঃখ নিয়া।"

কোন একটি ফল বা ফলসমূহের চিচ্ছায়াকে স্মৃতি বলে, অথবা অন্তর্হিত ফলের মানস প্রতিবিম্বের নাম স্মৃতি। গানটি যতক্ষণ আমি শুনিতে-ছিলাম ততক্ষণ আমার ইহা প্রত্যক্ষ ছিল কিন্তু গানটি যখন থামিয়া

গেল, তখন আমার মনে যাহা রহিল তাহা প্রত্যক্ষ নহে—তাহা স্মৃতি মাত্র।

"গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া গানটি গেল মরে।
রয়গো স্মৃতি জেগে তাহার অনুরণন হয়া।
মঞ্জরিয়া মঞ্জরিয়া কুসুম ঝরি' পড়ে,
গন্ধ তার বন্ধ থাকে পরাণ মন ভরা।"

তুমি যতক্ষণ সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাক ততক্ষণ তোমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, কিন্তু তুমি যদি হঠাৎ চক্ষুর্দ্বয় বন্ধ কর বা সূর্য্যকে পশ্চাতে রাখ, ক্ষণকালের জন্য সূর্য্যালোক দেখিতে পাইবে; সূর্য্যের অভাব হইলেও অতি অল্প সময়ের জন্য সূর্য্যালোক দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যকে পশ্চাতে রাখিয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তোমার ছায়ার প্রতি তাকাইয়া থাক, পরে মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে যে যে ছায়া তুমি মাটিতে দেখিতেছিলে সেই ছায়া আকাশের গায়ে রহিয়াছে—তবে মাটিতে যে ছায়া দেখিয়াছিলে তাহা হইল কাল, আর এখন আকাশের গায়ে যে ছায়া দেখিতেছ তাহা সাদা। এ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যায় না, কারণ এখানে বাহ্যবস্তুর সম্পূর্ণ অভাব; এ জ্ঞানকে স্মৃতিও বলা যায় না, কারণ বাহ্যবস্তু জনিত শরীর স্পন্দন এখনও বর্ত্তমান। বাহ্যবস্তুর অভাব হইয়াছে সত্য, কিন্তু শরীরের উপর ইহার ক্রিয়া এখনও বর্ত্তমান। সূর্য্যরশ্মির অভাব হইলেও সূর্য্যরশ্মি জনিত স্নায়বীয় স্পন্দন এখনও বর্ত্তমান। অতএব এ জ্ঞান প্রত্যক্ষও নহে, স্মৃতিও নহে। ইহাকে "অনুরণন জ্ঞান" বলা যাইতে পারে। একজন গায়ক একখানি সুন্দর গান শুনাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তোমার বন্ধু আসিলে তুমি বলিলে যে গানটি এত সুন্দর এবং এমন সুন্দর ভাবে গীত হইয়াছিল যে ইহা যেন এখনও তোমার "কাণে বাজিতেছে"—

দূর বীণা মত
এখনো বাজিছে হায়, শ্রবণে আমার,
সেই সরল সঙ্গীত !"

এখন যেমন "কানে বাজিতেছে" কিছুদিন পরে আর এমন বাজিবে না। গানটি অনেকক্ষণ পূর্ব্বে গীত হইয়াছে কিন্তু এখনও আমার "কানে বাজিতেছে।" কিন্তু এই "বাজা" নিশ্চয় কর্ণপটহের স্পন্দন জনিত নহে, কারণ উদ্বোধকের অবর্ত্তমানে শরীর স্পন্দন এতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না। অতএব এ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, কারণ গীত অনেকক্ষণ পূর্ব্বে বন্ধ হইয়াছে; ইহা "অনুরণন জ্ঞানও" নহে, কারণ সঙ্গীতধ্বনি জনিত শরীরস্পন্দনও থামিয়া গিয়াছে। তবে কি ইহা স্মৃতি মাত্র? ইহা যখন শ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীতের মানসিক প্রতিধ্বনি মাত্র তখন ইহাকে স্মৃতি বলিতে পারা যায়, কিন্তু এ স্মৃতিতে মনের কোন আধিপত্য নাই। ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে এ স্মৃতিকে স্মৃতিপটে আনয়ন করা হইতেছে না। ইহা আমরা স্মরণ করিতেছি না, ইহা যেন আপনা আপনি গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া উঠিতেছে—

"এত বলি কবি থামাইল গান
বসিয়া রহিল মুগ্ধ নয়ান,
বাজিতে লাগিল হৃদয় পরাণ
বীণাঝঙ্কার সম !"

এরূপ স্মৃতি বিনা যত্নে, বিনা চেষ্টায় মনের মধ্যে আপনা আপনি উদয় হয়। "অনুরণন জ্ঞান" অপেক্ষা ইহার স্থিতি অধিক হইলেও ইহা ক্ষণস্থায়ী। এরূপ স্মৃতিকে ক্ষণিকস্মৃতি বলিতে পারা যায়। আর যে প্রতিরূপকে চেষ্টা করিয়া স্মরণপটে আনয়ন করা হয়, যাহা আমাদের ইচ্ছা সাপেক্ষ, তাহাকে স্মৃতি বলা হয়।

শারীর
১। প্রত্যক্ষ—বাহ্য উদ্বোধক জনিত।
২। অনুরণন জ্ঞান—বাহ্য উদ্বোধকের অভাবসত্ত্বেও শরীর স্পন্দন জনিত।

মানস
১। ক্ষণিক স্মৃতি—অনিচ্ছাপ্রসূত
২। স্মৃতি—ইচ্ছা প্রসূত।

প্রত্যক্ষ, অনুরণন জ্ঞান, ক্ষণিক স্মৃতি এবং স্মৃতি—এরূপ ক্রম অবশ্য সকল সময়ে সত্য নহে। শিক্ষক মহাশয় একটি পাত্রে অম্লজান নামক বাষ্প রাখিয়া তাহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। ছাত্রেরা দেখিল যে বাষ্প জ্বলিয়া উঠিল, এবং ইহার আলোক অতি তীব্র (প্রত্যক্ষ জ্ঞান)। বাষ্প নির্ব্বাপিত হইল, তবুও ক্ষণেকের জন্য ছাত্রেরা চক্ষে "অন্ধকার" দেখিল (অনুরণন জ্ঞান)। পরদিন ছাত্রেরা শিক্ষকের নিকট উক্ত বিষয় বিবৃত করিল (স্মরণ)। বালকেরা সন্ধ্যার সময় পাঠাভ্যাস করে (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) এবং পরদিন প্রাতে গুরুমহাশয়ের নিকট আবৃত্তি করে (স্মরণ)।

মেধাশক্তির ক্রিয়া।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তদ্বয় হইতে আরও দেখা যাইতেছে যে, মেধাশক্তির তিনটি ক্রিয়া—গ্রহণ, ধারণ, এবং স্মরণ। প্রথমতঃ, জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, অর্জ্জিত জ্ঞানকে রক্ষণ করিতে হইবে, মনে ধারণ করিতে হইবে। জ্ঞান অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই যদি জ্ঞানের লোপ হয় তবে সে জ্ঞান হইতে মানুষের কি উপকার হইতে পারে? সুতরাং অর্জ্জিত জ্ঞানের সংরক্ষণ প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, আবশ্যক হইলে রক্ষিত জ্ঞানকে আবৃত্তি করিতে হইবে, স্মরণ করিতে হইবে। তুমি যাহা জান না তোমার তাহা ধারণা হইতে পারে না; তোমার যাহার ধারণা নাই তুমি তাহা স্মরণ করিতে পার না। অর্থ সঞ্চয় কর, সঞ্চিত অর্থ রক্ষা কর এবং রক্ষিত অর্থের

সদ্ব্যবহার কর। যে শক্তি প্রভাবে অতীত বিষয়গুলি অবিকৃতভাবে মনন করিতে পারা যায় তাহার নাম মেধাশক্তি এবং ঐ প্রকার মনন ক্রিয়ার নাম স্মরণ।

আমি তিন দিন পূর্ব্বে কি কি ব্যঞ্জন দিয়া ভাত খাইয়াছি আজ তাহা আমার মনে নাই কিন্তু ঐ দিন একটি অল্পবয়স্কা বালিকার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে তাহা আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে।

মেধাশক্তির সহায়ক।

মনের সহিত যাহার যত বেশী পরামর্শ হইবে তাহার স্থায়িত্ব তত বেশী হইবে এবং স্মরণও তত বেশী হইবে। একখণ্ড প্রস্তর ফলকের উপর লৌহ শলাকার দ্বারা দুইটি রেখাপাত কর। এই রেখাদ্বয় অঙ্কন করিবার সময় যেটিতে যত বেশী শক্তি প্রয়োগ করিবে সেটি তত বেশী স্থায়ী হইবে। সেইরূপ যে জিনিষটি যত বেশী মনে লাগিবে তাহা তত বেশী স্থায়ী হইবে।

"তুলেছিলাম কুসুম তোমার
হে সংসার, হে লতা,
পরতে মালা বিঁধল কাঁটা
বাজল বুকে ব্যাথা।
হে সংসার, হে লতা।
বেলা যখন পড়ে' এল
আঁধার এল ছেয়ে
দেখি তখন চেয়ে
তোমার গোলাপ গেছে, আছে
আমার বুকের ব্যাথা
হে সংসার হে লতা।"

যেমন কোন প্রস্তরখণ্ডের একই স্থানে অনবরত বারি বিন্দু পতিত

হইলে সেই স্থানে একটি স্থায়ী চিহ্ন পড়িয়া যায় তেমনি কোন বিষয়ের পুনঃ পুনঃ এবং উপর্য্যুপরি আলোচনা করিলে সেই বিষয়টি মনের মধ্যে স্থায়ী হয় এবং উহাকে অতি সহজেই স্মরণ করা যায়। কেবল আলোচনার সংখ্যাধিক্য হইলেই যে স্মরণকার্য্য স্থায়ী এবং সহজ হইবে এমত নহে। তুমি আজ একটি বিষয়ের আলোচনা করিলে আবার একমাস পরে সেই বিষয়টি দেখিলে। আর একজন একমাস অন্তর আলোচনা না করিয়া একদিন অন্তর সেই বিষয়টিই আলোচনা করিল। যদি দুই ব্যক্তিরই স্মরণশক্তি সমান হয়, তাহা হইলে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় ব্যক্তি শীঘ্র ঐ বিষয়টি আয়ত্ত করিয়া ফেলিবে। অতএব সময়ের অন্তর যত কম হইবে স্মরণ কার্য্যও তত সহজ হইবে। মনের স্ফূর্ত্তি এবং শক্তি মেধা শক্তির বিশেষ সহায়। মন যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন স্মরণ শক্তিও ক্ষীণ হয়। অধিকক্ষণ মানসিক ক্রিয়ার পর কোন বিষয় শীঘ্র স্মরণ পথে আইসে না। আবার কোন বিষয় অধিক দিন মনে রাখিতে হইলে সেই বিষয়ে বিশেষ অভিনিবেশের প্রয়োজন এবং ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ব্যতীত অভিনিবেশ থাকিতে পারে না কিন্তু মন হীনবল হইলে ইচ্ছাশক্তিও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

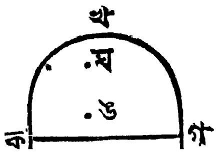
সমাজের প্রত্যেকেই বড় হইবার জন্য যুদ্ধ করিতেছে। এই যুদ্ধে দুর্ব্বলের পরাজয় এবং সবলের জয় হইতেছে। সকলেই "আগে চল, আগে চল, ভাই" মন্ত্রের উপাসক। কেহ পশ্চাতে থাকিতে চায় না। যে যত বড় হইতেছে সে তত লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে; যে যত ছোট হইতেছে সে তত নগণ্য হইতেছে। মানুষের মনের মধ্যেও এইরূপ সংগ্রাম চলিতেছে। মানুষের মন নানা চিন্তা, নানা ভাব, নানা

চিন্তামাত্রেই সংজ্ঞাক্ষেত্রাভিমুখী।

ধারণার লীলাক্ষেত্র। ইহারা কেহই গুপ্ত থাকিতে চাহে না, প্রত্যেকেই প্রকাশিত হইতে চাহে, প্রত্যেকেই উচ্চস্থান অধিকার করিতে চাহে, কেহ নীচে থাকিতে চাহে না। এখানেও সবলের জয় এবং দুর্ব্বলের পরাজয়; এখানেও

"দুর্ব্বলে দলিয়া পায়
সবল বাঁচিতে চায়।"

এখানেও যে যত উচ্চ স্থান অধিকার করিবে সে তত স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে এবং যে যত নিম্নে থাকিবে সে তত অপ্রকটিত থাকিবে। ক খ গ সংজ্ঞাক্ষেত্র। ক গ সংজ্ঞাক্ষেত্রের সীমা। এই সীমার নিম্নভাগ সুপ্ত সংজ্ঞা-



ক্ষেত্র। ঘ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইহা অতি সুস্পষ্ট। ঙ কেবলমাত্র সীমা অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে সুতরাং ইহাও কথঞ্চিৎ স্পষ্ট কিন্তু চ মনের ভিতর থাকিলেও সুপ্তসংজ্ঞাক্ষেত্রে বলিয়া ইহার উপলব্ধি হইতেছে না। তুমি বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" পড়িতেছ। যেখানে দলনী-বেগম আপন মনে বলিতেছে, "তা আমাকে মনে পড়িবে কেন? আমি হাজার দাসীর মধ্যে একজন বৈত নই?" তুমি এখন সেই স্থানটি পড়িতেছ। এখন এই কথাগুলি, এই বিষয়টি, তোমার মনের তুঙ্গ স্থান অধিকার করিয়াছে—যে স্থানে ঘ সেই স্থান অধিকার করিয়াছে, সুতরাং এই কথাগুলি এখন অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু শৈবলিনীর কথা, প্রতাপের কথা, শৈবলিনী এবং প্রতাপের সন্তরণ, প্রতাপের জলে নিমজ্জন, শৈবলিনীর তীরে পলায়ন, চন্দ্রশেখর কর্ত্তৃক প্রতাপের জীবন রক্ষা,

চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর বিবাহ ইত্যাদি বিষয় তুমি একবারে বিস্মরণ হও নাই। ইহারা তোমার সংজ্ঞাক্ষেত্রের তুঙ্গ স্থানে না থাকিলেও সংজ্ঞাক্ষেত্রের বহির্ভাগে নহে। সুপ্তসংজ্ঞাক্ষেত্রে অবস্থিত নহে। ইহারা ঘ এর মত তত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত না হইলেও, চ এর মত অস্পষ্ট নহে। ইহারা ঙর স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বিষয়গুলির সংস্রবেই দলনীবেগমের কথা বোধগম্য। তুমি যদি প্রথমেই দলনী-বেগমের ঐ কথাগুলি পড়িতে, যদি পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সমূহের তোমার কোন জ্ঞান না থাকিত তবে দলনীর কথা তোমার নিকট অত সুস্পষ্ট-ভাবে প্রতীয়মান হইত না।

"আগ দেখিনি, শেষ দেখিনি—
দেখেছি শুধু মাঝ,
অগ্র পিছন মনে করে'
বুঝিনু তারে আজ"।

তুমি পূর্ব্বে ভূগোল পড়িয়াছ, ইতিহাস পড়িয়াছ এবং এ সকল বিষয়ও তোমার মনোমধ্যে রহিয়াছে; কিন্তু তুমি যখন "চন্দ্রশেখর" পড়িতেছ, তখন ভূগোল এবং ইতিহাসের বিষয় তোমার সংজ্ঞাক্ষেত্রের বাহিরে, ইহারা সুপ্তসংজ্ঞাক্ষেত্রে চ এর স্থানে।

সঙ্গ—যৌগপদ্য, সাদৃশ্য, এবং বৈষম্য।

সংজ্ঞাক্ষেত্রে কত ভাবের, কত চিন্তার উদয় হইতেছে এবং লয় হইতেছে; কতভাব কতবার আসিতেছে, যাইতেছে এবং ফিরিতেছে। কেহ বা একবার আসিয়া আর ফিরিতেছে না। যদি কোন ভাব নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় সংজ্ঞাক্ষেত্রে প্রবেশ করে, যদি ইহা অন্য কোন ভাবের সহিত একবারে সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত হয়, যদি অন্য ভাবের স্নেহাকর্ষণে

বঞ্চিত হয়, তবে ইহা অধিকক্ষণ এখানে তিষ্ঠিতে পারিবে না, শীঘ্রই এস্থান ত্যাগ করিয়া ইহাকে পলাইতে হইবে। যদি ইহা পুনরায় প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছুক হয় তবে সময় থাকিতে ইহাকে এখানকার ভাবসমূহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। অপরিচিতের ন্যায় আসিয়া অপরিচিতের মত চলিয়া গেলে হইবে না। অপরের সহিত মিলিতে মিশিতে হইবে, আলাপ পরিচয় করিতে হইবে। মনে কর একজন লোক ইংরাজি জানে না, জানিলেও রসায়ন শাস্ত্রে একবারে অনভিজ্ঞ। তাহাকে তুমি "হাইড্রোজিন ইজ্ এ কাইণ্ড অফ্ গ্যাস" এই ছত্রটি পড়িতে দিলে। সে হয়ত চেষ্টা করিয়া ছত্রটি মুখস্থ করিতে সমর্থ হইল। কিছুক্ষণের জন্য হয়ত ইহা তাহার সংজ্ঞাক্ষেত্রের তুঙ্গ স্থান অধিকার করিল কিন্তু ইহার স্থিতি এখানে কতক্ষণ? শীঘ্রই ইহার পতন হইবে। অচিরাৎ ইহাকে সুপ্ত সংজ্ঞাক্ষেত্রে সমাধি লইতে হইবে। ভবিষ্যতেও ইহার পুনরভ্যুত্থান অসম্ভব; ইহাকে "থেকে যেতে কেহ বলিবে না," কেহই ইহার উদ্ধার করিবার চেষ্টা পাইবে না, কারণ ইহার সহিত কাহারও পরিচয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ কাল, কোকিল কাল, তমাল কাল, যমুনার জল কাল। সুতরাং এই সকল জিনিষের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে। অতএব ইহাদের যে কোনটিকে দেখিলেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ মনে পড়িতে পারে।

"সখিরে! কালবরণ,
আর হেরিব না আমি সে কালবরণ'।
যে যে সখী কাল আছে,
আসিতে দিওনা কাছে,
কৃষ্ণ মনে পড়ে পাছে, হেরিলে বরণ॥

কোকিল তমাল পরে, যদি কৃষ্ণ রব করে,
বলো তারে স্থানান্তরে, করিতে গমন ॥"

শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ আমার নিকট একবারে অপরিচিত নহে, ইহার বর্ণ তমালের মত, কোকিলের মত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে একবারে বিস্মরণ হওয়া অসম্ভব। এক সময়ে হয়ত শ্রীকৃষ্ণের রূপ তোমার বিস্মৃতির গর্ভে—সুপ্তসংজ্ঞাক্ষেত্রে—নিহিত; আবার অন্য সময়ে হয়ত কোকিলের কালবরণ দেখিলে তোমার শ্রীকৃষ্ণের রূপ স্মরণ হইল। এখানে একটি ভাব অন্য ভাবের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ; সুতরাং একটির পতন হইলে অপরে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। মনের যে ভাবটি একবারে সম্বন্ধ সুতরাং সহানুভূতিবিবর্জ্জিত, সেইটিই একবারে নির্ব্বাসিত হয়। কিন্তু কোন ভাবটিই একবারে গুপ্ত থাকিতে চাহে না। একবারে অপরিজ্ঞাত থাকিতে চাহে না। প্রত্যেকেই তুঙ্গ স্থান পাইবার জন্য ব্যস্ত। যে ভাবটির শক্তি অধিক, যে ভাবটির সহিত অপরাপর ভাবের সম্বন্ধ এবং সংস্রবও অধিক সেই ভাবটিই এ সংগ্রামে জয়ী হইয়া তুঙ্গ স্থান অধিকারে সমর্থ হইবে। যমুনার জল দেখিলে, বা কোকিলের স্বর শুনিলে শ্রীরাধিকার মনে বা পরম ভক্তের মনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ মনে হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া কি সকলের মনেই সে ভাবের উদয় হইবে? প্রত্যেক ভাবই সংজ্ঞাক্ষেত্রের অত্যুচ্চ স্থান লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে; দুর্ব্বলকে পদাঘাত করিয়া আত্মোন্নতির পথ পরিষ্কার করিতেছে কিন্তু তাই বলিয়া কেহ স্বার্থপর বা কাপুরুষ নহে। যেই জয়ী হইতেছে, সেই সংজ্ঞারূপ আলোকের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সেই তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে লইয়া যাইতেছে, স্বার্থপরের ন্যায় একক যাইতেছে না। ভক্তের মনে শ্রীকৃষ্ণের কথা উদয় হইল সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গোচারণ, গোবর্দ্ধনধারণ, কালীয়দমন ইত্যাদি লীলার

কথা মনে হইল। কৃষক বালিকার সঙ্গীত শুনিতেছি আর মনে আমার কত কথারই উদয় হইতেছে ; যাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম তাহা আবার মনে আসিতেছে।

"কতই স্মৃতি, কতই কথা,
কতই হাসি, কতই ব্যাথা,
জাগছে, আজি এই সুর সাথে
সে সব কেবল মনই জানে।
আধভোলা এই মেঠো গানে।
যে সব ব্যাথা যাচ্ছে মুছে
যে সব ছবি ফেলছি মুছে
সে সব যে আজ উঠছে ফুটে
স্মৃতির দারুণ তুলির টানে
আধভোলা ওই মেঠো গানে।"

'ক' বলিলে 'খ' মনে পড়ে, কারণ দুইটিই এককালে মনের প্রতিবেশী ছিল, দুইটিরই চিত্র একসঙ্গে চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়াছিলাম। একসঙ্গে বাস হেতু এই দুই এর মধ্যে সখ্যভাব জন্মিয়াছে। যখন ক মনে হইতেছে তখন ইহা ইহার সহচর খ কেও সঙ্গে করিয়া লইতেছে। বালক একটি জন্তু দেখিল এবং জন্তুটিকে "কুকুর" বলিতে শুনিল। এই নাম এবং কুকুরের প্রতিকৃতি একসঙ্গে তাহার চিত্তমধ্যে স্থান পাইল সুতরাং একটি মনে হইলে আর একটি মনে হয়। লেবু দেখিলে লেবুর রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ ইত্যাদি মনে হয়। কারণ একই বস্তুতে এই সকলের একত্র সমাবেশ দেখিয়াছি। একত্রে বা এক সময়ে সহবাসহেতু সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার সম্বন্ধকে যৌগপদ্য সঙ্গ বলে।

যুগপৎ অভিজ্ঞাত বিষয় সমূহের মধ্যে একটি উপস্থিত হইলেই অপর অনুপস্থিত বিষয়গুলিও স্মৃতিপটে উদয় হয়।

যৌগপদ্য সঙ্গ { দৈশিক সঙ্গ, সাময়িক সঙ্গ, শাব্দিক সঙ্গ, গুণ সঙ্গ

একই স্থানে যুগপৎ অভিজ্ঞাত বস্তু-সমূহের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাকে দৈশিক সঙ্গ বলা হয়। চ্যায়ার বলিলেই টেবিল মনে পড়ে, দোয়াত বলিলে কলম মনে পড়ে, কারণ ইহারা একই স্থানে যুগপৎ অভিজ্ঞাত। একই সময়ে অভিজ্ঞাত বিষয় সমূহের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাকে সাময়িক সঙ্গ বলা হয়। অভিজ্ঞাত বিষয়-সমূহের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যত কম হইবে সঙ্গসূত্রও তত দৃঢ় হইবে। বিদ্যুৎ দেখিলেই বজ্র নির্ঘোষের কথা মনে হয় ইহা সাময়িক সঙ্গহেতু। একটি শব্দ শ্রুত হইলে শব্দের আনুষঙ্গিক অনেক কথা মনে হয়। এরূপ সঙ্গকে শাব্দিক সঙ্গ বলা হয়। রাম কথাটি শুনিলে আমার মনে পড়ে এ কথাটি কেমন করিয়া লিখিতে হয়, কথাটি লিখিলে দেখিতে কেমন হয়, ঐ কথাটি উচ্চারণ করিতে কোন পেশীর ক্রিয়া হয় এবং যাহার নাম রাম তাহার প্রতিকৃতিও মনে হয়। এইরূপ সঙ্গকে শাব্দিক সঙ্গ বলে। কোন বস্তুর একটি গুণ মনে হইলে তাহার অপর গুণ গুলিও মনে পড়ে। লেবুর বর্ণ হইতে লেবুর রস গন্ধ ইত্যাদি মনে হয়—এইরূপ সঙ্গকে গুণ সঙ্গ বলে।

যৌগপদ্য সঙ্গের সহায়— { সামীপ্য। অবধান। পৌনঃ পুনঃ।

যুগপৎ অভিজ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে দৈশিক বা সাময়িক ব্যবধান যত কম হইবে সঙ্গ সম্বন্ধও তত দৃঢ় হইবে। সময় বা কালের ব্যবধান কম হইলেই যে সঙ্গ সম্বন্ধ সুদৃঢ় হইবে এমন নহে। অভিজ্ঞাত বিষয়-সমূহের পুনঃ পুনঃ আলোচনা এবং একনিষ্ঠ অবধান আবশ্যক। আলোচনার সংখ্যা এবং অবধান কার্য্যের এক-নিষ্ঠতার উপর যৌগপদ্য সঙ্গ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে। স্মরণকার্য্যের আর একটি সহায়ক সাদৃশ্য সঙ্গ। লোলমাংস, কম্পিত কলেবর এবং দীর্ঘকায় একজন অশীতিপর বৃদ্ধকে দেখিয়া আমার পিতামহকে কেন মনে পড়িল? এই বৃদ্ধকে এবং আমার পিতামহকে আমি কখনও একস্থানে দেখি নাই। ইহাদের উভয়ের কথা আমি কখনও ভাবি নাই। বৃদ্ধকে এই আমি প্রথম দেখিলাম। তবে কেন একজনকে দেখিয়া আর একজনকে মনে পড়িল। উপস্থিত হইতে অনুপস্থিতের স্মৃতি কিরূপে সম্ভব হইল? এই বৃদ্ধের আকার প্রকারের সহিত আমার পিতামহের অনেক সাদৃশ্য আছে; এই বৃদ্ধের বয়স আমার পিতামহের বয়সের সমান। সাদৃশ্য বস্তুর পরিণয় অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেক বস্তুই সদৃশ বস্তুর সহিত মিলিত হইতে চায়। এরূপ মিলনকে সাদৃশ্য সঙ্গ বলে। সাদৃশ্য সঙ্গ-হেতু এই বৃদ্ধকে দেখিয়া আমার পিতামহকে আমার মনে পড়িতেছে। একটি লোক দেখিয়া অপর লোকের কথা অনেক সময়েই মনে হয় তাহার কারণ ইহাদের মধ্যে আকৃতি বা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে।

"হেরি তোমা মনে হয় লো অপরিচিতে!
কোথা যেন দেখেছি ও মু'খানি তোমার।
মোর অন্তরের মাঝে এতকাল বুঝি
লুকায়ে আছিলে বসি নিভৃত নিরালে

যুগ যুগান্তের পরে অকস্মাৎ আজি
ধরিয়া মানসী মূর্ত্তি বাহিরিয়া এলে।"

আবার অনেক সময়ে একটি বিষয় হইতে বিপরীত ধর্ম্ম-বিশিষ্ট অপর বিষয়েরও স্মরণ হইয়া থাকে। ধনী বলিলে দরিদ্র, পাপ বলিলে পুণ্য, পূর্ব্ব বলিলে পশ্চিম, জীবন বলিলে মরণ, আশা বলিলে আশঙ্কা, দিবস বলিলে রজনী, আলোক বলিলে ছায়া, অসীম বলিলে সসীম, সৃষ্টি বলিলে প্রলয় মনে হয়। এখানে একটি আর একটির সঙ্গ লইতেছে—কিন্তু ইহা সাদৃশ্য সঙ্গ নহে—ইহা বৈধর্ম্ম্য সঙ্গ।

জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে
আশার পশ্চাতে ভয়,
ডাকিনীর মত রজনী ভ্রমিছে
চিরদিন ধরে' দিবসের পিছে
সমস্ত ধরণীময়।
যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া
এইত নিয়ম ভবে,
ও রূপের কাছে চিরদিন তাই—
এ ক্ষুধা জাগিয়ে রবে।"

আবার—

"অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ—
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,
বদ্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

অতএব দেখা যাইতেছে যে এই কয়টি স্মরণক্রিয়ার সহায়ক—

১। পরামর্শাতিশয্য।

২। পৌনঃপুন্য।

৩। মনের স্ফূর্ত্তি।

৪। সঙ্গ—

(ক) যৌগপদ্য।

(১) দৈশিক।

(২) সাময়িক।

(৩) শাব্দিক।

(৪) গুণসম্বন্ধীয়।

(খ) সাদৃশ্য এবং

(গ) বৈধর্ম্ম্য।

মস্তিষ্কের অবস্থার সহিত স্মরণকার্য্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। উত্তম স্মরণশক্তির জন্য উত্তম স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। এক একটি মানসিক কর্ম্মের জন্য মস্তিষ্কের এক একটি প্রদেশ নির্দ্দিষ্ট আছে। দর্শন-শাস্ত্র আলোচনা সময়ে মস্তিষ্কের এক দেশ ক্রিয়াশীল হয়, আবার গণিত-শাস্ত্র আলোচনার সময় আর একটি দেশ কার্য্য করে। সেই জন্য বহুক্ষণ ব্যাপিয়া একই বিষয়ের আলোচনা যুক্তিসঙ্গত নহে। বিষয়ের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। অনবরত একই বিষয়ের আলোচনা করিলে, মস্তিষ্কের একই স্থানে অনবরত ধাক্কা লাগিয়া সেই স্থানটি দুর্ব্বল হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিলে মস্তিষ্কের বিশেষ কোন ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা কম। যখন একটি বিষয়ে ব্যাপৃত তখন মস্তিষ্কের একটি দেশের কার্য্য হইতেছে, আবার যখন বিষয়ান্তরে যাইতেছি,

স্মরণ নিয়ামক।

তখন আর একটি দেশ আক্রান্ত হইতেছে কিন্তু পূর্ব্ব দেশটি বিশ্রামলাভ করতঃ পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের অবসর পাইতেছে। আলোচ্য বিষয়ের যেমন পরিবর্ত্তন আবশ্যক তেমনি আবার মস্তিষ্কের পরিমিত ব্যবহারও প্রয়োজন। অপরিমিত ব্যবহারে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া যায়। মস্তিষ্কের পৃথক্ পৃথক্ অংশের যেমন বিশ্রাম আবশ্যক তেমনি সমস্ত মস্তিষ্ক যন্ত্রটিরও সময়ে সময়ে বিশ্রাম আবশ্যক। যে বিষয়ের সম্যক্ এবং সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারা যায়, সেই বিষয়েরই ধারণ এবং স্মরণ সহজসাধ্য হয়। কোন বিষয়ের সম্যক জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে, সেই বিষয়ে বিশেষ স্বার্থ অনুভব প্রয়োজন এবং সেই বিষয়ে একান্ত অবধান অর্পণ করা আবশ্যক। অবধান ক্রিয়া যত সুস্পষ্ট হইবে স্মরণকার্য্যও তত সহজসাধ্য হইবে। যে বিষয়ে সম্যক্ অবধান অর্পণ করা হয় সেই বিষয় যেন মনের সঙ্গে গাঁথা হইয়া যায়। সুস্পষ্ট উপলব্ধি স্মরণকার্য্যের একটি সহায়। যে বিষয়ের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না, সে বিষয় স্মৃতিপটে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না। যেখানে উপলব্ধি অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ সেখানে স্মরণকার্য্যও দুরূহ এবং ক্ষীণ। আবার, যে বিষয় যত বেশীবার আলোচনা করা যায় তাহা তত বেশী দিন স্মৃতিপটে জাগরূক থাকে। কেবল পৌনঃপুন্যের সংখ্যার উপর স্মরণশক্তি নির্ভর করে না; ইহাদের সময়ের ব্যবধানের উপরও বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। পৌনঃপুন্যের ভিতর সময়ের ব্যবধান যত কম হইবে এবং পৌনঃপুন্যের সংখ্যা যত বেশী হইবে, স্মরণকার্য্য তত সহজসাধ্য হইবে। কি প্রকারে বর্ত্তমান বস্তু হইতে অতীত বস্তুর স্মরণ হয়; কি প্রকারে একটি বস্তু হইতে তদ্বিপরীত বস্তুর স্মরণ হয় এবং কি প্রকারে একটি বস্তুর সাহায্যে এক সময়ে বা একস্থানে অভিজ্ঞাত অপর বস্তুর স্মরণ হয় তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সাদৃশ্য সঙ্গ, বৈধর্ম্ম্য সঙ্গ, এবং যৌগপদ্য সঙ্গ

ব্যতীত আরও দুইটি সঙ্গের উল্লেখ করা যাইতে পারে—একটি সাপেক্ষ সঙ্গ অপরটি ঔপমেয় সঙ্গ। তরবারি বলিলে শক্তির কথা মনে হয়, মুকুট বলিলে রাজার কথা মনে হয়, স্বামী বলিলে স্ত্রী মনে হয়, শিক্ষক বলিলে ছাত্র মনে হয়, কারণ বলিলে কার্য্য মনে হয় ইত্যাদি সাপেক্ষ সঙ্গ। আবার নদীপ্রবাহ বলিলে কালস্রোত মনে আসে, বসন্ত বলিলে যৌবনের কথা মনে আসে, শীত বলিলে বার্দ্ধক্যের কথা মনে হয়, শ্বেত বলিলে পবিত্রতা মনে আসে ইত্যাদি সঙ্গ ঔপমেয় সঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে এই সঙ্গদ্বয় উপরি উক্ত ত্রিবিধ সঙ্গের রূপান্তর মাত্র। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে এই কয়টি স্মরণ নিয়ামক—

১। মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় —
- ১। সুস্থ স্বাস্থ্য।
- ২। পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তন।
- ৩। অনতিরিক্ত ব্যবহার।

২। অর্জ্জন সম্বন্ধীয় —
- ৪। একনিষ্ঠ অবধান।
- ৫। সুস্পষ্ট উপলব্ধি।
- ৬। পৌনঃপুন্য।

৩। সঙ্গ স —
- ৭। সাদৃশ্য সঙ্গ।
- ৮। বৈধর্ম্ম্য সঙ্গ।
- ৯। যৌগপদ্য সঙ্গ
- ১০। সাপেক্ষ সঙ্গ।
- ১১। ঔপমেয় সঙ্গ।

সঙ্গত্রয়ের সম্বন্ধ।

যৌগপদ্য এবং সাদৃশ্য এই দুইটি সঙ্গ পরস্পর পরস্পরের সহায়; একটি ব্যতীত অপরটির ক্রিয়া অসম্ভব। ক খ গ ইহাদের সঙ্গ যৌগপদ্য সঙ্গ, কারণ ইহাদিগকে একসঙ্গে অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এবং ক খ গ কে যখন যতবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি তখন ততবার তাহাদের

প্রতিরূপগুলিকেও যথাক্রমে মনোমধ্যে ধারণ করিয়াছি। ক, খ, গ যেন ক খ গএর প্রতিরূপ। এখন, ক দেখিলে খ মনে হয় কেন? কএর প্রতিরূপ ক মনের মধ্যে আছে, সুতরাং স্বরূপ ক হইতে প্রতিরূপ ক এর কথা মনে হইতেছে; কারণ স্বরূপ কএ এবং প্রতিরূপ কএ সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে। এইরূপে সাদৃশ্য সঙ্গ হইতে যখন কএর স্মৃতি উদয় হইল, তখন ক হইতে খ গএর বিষয় যৌগপদ্য সঙ্গ বলে মনে হইল। ক হইতে ক মনে না হইলে খ গ মনে হইত না। অতএব সাদৃশ্য সঙ্গ যৌগপদ্য সঙ্গের সহায়। আবার, তোমার কুকুর দেখিলে আমার কুকুরের কথা মনে হয় কারণ ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য সঙ্গ আছে। কিন্তু তোমার কুকুর এবং আমার কুকুর সম্পূর্ণরূপে সদৃশ নহে তবে কেমন করিয়া এরূপ স্মৃতিকে সাদৃশ্য সঙ্গ সমদ্ভূত বলা যায়? মনে কর তোমার কুকুর ক খ এবং আমার কুকুর ক গ। এখানে ক খ এবং ক গএ সাদৃশ্যও আছে আবার বৈসাদৃশ্যও আছে। যখন ক খ দেখি তখন সাদৃশ্য সঙ্গ হেতু 'ক' মনে আসে এবং যৌগপদ্য সঙ্গ হেতু 'গ' মনে হয়, কারণ, ক গএর সঙ্গ যৌগপদ্য সঙ্গ। অতএব এরূপ স্থানে যৌগপদ্য সঙ্গ সাদৃশ্য সঙ্গের সহায়। আরও দেখা যায় যে, পাপ বলিলে পুণ্যের কথাই মনে হয়, চিনির কথা ত মনে হয় না; অন্ধকার বলিলে আলোকের কথাই মনে হয়, কিন্তু কমলা লেবুর কথা ত মনে হয় না। পাপ পুণ্য উভয়ই চরিত্রবিষয়ক; আলোক অন্ধকার উভয়ই দৃষ্টিবিষয়ক। সুতরাং ইহারা বিপরীত হইলেও ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। অতএব সম্পূর্ণ বিসদৃশ বস্তুর সঙ্গ অসম্ভব। আবার, যৌগপদ্য সঙ্গের মধ্যেও সময় বা স্থানগত সাদৃশ্য আছে, এই জন্য অনেকেই সাদৃশ্য সঙ্গকে মুখ্য সঙ্গ বলিয়া মনে করে।

সঙ্গ স্মরণক্রিয়ার সহায়ও বটে আবার অন্তরায়ও বটে। মনে কর

কোন নগরে যাইবার অনেকগুলি পথ আছে। এরূপ নগরে প্রবেশ করা অতি সহজ। যে পথই অবলম্বন কর না কেন তুমি তোমার গন্তব্য স্থানে পৌছিবে। কিন্তু ঐ নগরের ভিতর হইতে বাহিরের কোন নির্দ্দিষ্টস্থানে আসিতে হইলে একটু বেগ্ পাইতে হইবে, যে কোন পথ অবলম্বন করিলে চলিবে না। তখন ভাবিবে—

আভিমুখী ও বৈমুখী সঙ্গ।

"এ পথ গেছে কোনখানে
কে জানে ভাই কে জানে।"

এখানে বহু পথ সহায়ও বটে, অন্তরায়ও বটে। যখন সকল পথেরই লক্ষ্য একদিকে তখন সহায়, আর, যখন সকলেরই লক্ষ্য বিপরীত দিকে তখন অন্তরায়। তেমনি যখন বহু সঙ্গের লক্ষ্য এক, তখন সঙ্গ স্মৃতির সহায় নচেৎ অন্তরায়। বহু সঙ্গের লক্ষ্য এক হইলে আভিমুখী সঙ্গ এবং পৃথক্ হইলে বৈমুখী সঙ্গ বলে। মনে কর আমি ক খ গ এই তিনটি এক সঙ্গে অনেক সময় মএর সহিত দেখিয়াছি কিন্তু এখন যদি আমি কেবলমাত্র ক দেখি, তবে মএর কথা মনে না হইতে পারে; অথবা যদি খ কিংবা গ দেখি তথাপি ম স্মরণ পথে না আসিতে পারে। কিন্তু যদি ক খ গ এই তিনটিকে একসঙ্গে দেখি, অথবা কোন একটিকে দেখিয়া অপর দুইটির কথা চিন্তা করিতে পারি তবে ম সহজেই মনে উদয় হইবে। এখানে তিনটির সমবেত চেষ্টা একদেশাভিমুখী। গায়ক যখন গীত গায়, তখন সুর লয় তাল মান, প্রভৃতি নানা বিষয় তাহার আবৃত্তি কার্য্যে সহায়তা

ক
↓
গ → ম ← ঘ
↑
খ

করে। আবার এমনও হইতে পারে যে ক হইতে খ, খ হইতে গ, গ হইতে ঘ এবং ঘ হইতে "ম" এর কথা স্মরণ হয়; প হইতে ফ, ফ হইতে ব,

ব হইতে ভ এবং ভ হইতে "ম" এর কথা মনে হয়। সুতরাং ক এবং প একসঙ্গে উপস্থিত হইলে "ম"এর স্মরণ সহজ হয় কারণ ক এবং প এর গতি একদেশাভিমুখী।

ক—▷খ—▷গ—▷ঘ—▷"ম"◁—ভ◁—ব◁—ফ◁—প

আবার, এমনও হইতে পারে যে, ম এর সঙ্গ কখনও বা ক এর সহিত কখনও বা খ এর সহিত, কখনও বা গ এর সহিত এবং কখনও বা ঘ এর সহিত। সুতরাং

ক
|
▽
প—▷ম◁—ঘ
△
|
খ

এরূপ স্থলে ম মনে উদয় হইলে ক খ গ ঘ এই চারিটির কোন একটি স্মরণপথে আসিতে পারে। কিন্তু এখানে একই জিনিষ বিভিন্ন শক্তি কর্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে। ম এর গতি ক এর দিকেও বটে, খ এর দিকেও বটে, কিন্তু এক সঙ্গেই ক খ স্মরণপথে আসিতে পারে না। ম চারিটি বিভিন্নদিকে আকৃষ্ট হইতেছে, এখানে ম এর সঙ্গ বৈমুখী সঙ্গ। আবার কখন কখন এমন দেখা যায় যে ক এর সঙ্গ খ এর সহিত, খ, গ এর সহিত, গ, ঘ এর সহিত এবং ঘ এর সঙ্গ ম এর সহিত; কিন্তু ক এর সঙ্গ প এর সহিত, প, ফ এর সহিত, ফ, ব এর সহিত এবং ব এর সঙ্গ ভ এর সহিত থাকিতে পারে। এরূপ স্থলে ক বা ক উপস্থিত হইলে খ এর কথা মনে আসিতে পারে আবার প এর কথাও মনে আসিতে পারে। এখানে ক এর গতি ম এর দিকেও বটে, আবার ভ এর দিকেও বটে। কিন্তু একসঙ্গেই ম এবং ভ স্মরণপথে আসিতে পারে না। ক দুইটি বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। এখানে ক এর সঙ্গ বৈমুখী সঙ্গ। কএর আসক্তি যে দিকে প্রবল হইবে ক সেই দিকেই ধাবিত হইবে। বালক একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে সুরের সাদৃশ্য হেতু অন্য কবিতা আবৃত্তি করিয়া থাকে।

ভ ◁—ব ◁—ফ ◁—প ◁—ক—▷ খ ▷—গ—▷ ঘ—▷ ম।

বালক তাহার মাকে দুধের সহিত জল মিশাইতে দেখে। এইরূপ কয়েকবার দেখিতে দেখিতে দুইটি ধারণা এমনভাবে সংযুক্ত হয় যে একটি ব্যতীত আর একটি থাকিতে পারেনা। দুধ দেখিলেই বালকের জল মনে পড়ে। এরূপ সংযোগ যৌগপদ্য সঙ্গ। এখানে বিশেষ কোন মানসিক ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই। একটি ধারণা যেন আর একটিতে "লাগিয়া" যাইতেছে। এরূপ সংশ্রবের কোন প্রকৃত অর্থ নাই; এরূপ সংশ্রবের কোন বস্তুগত কারণ নাই। জল এবং দুধ বারংবার একস্থানে দেখিতেছি বলিয়া একটি দেখিলে আর একটি মনে হয়। জল এবং দুধের মধ্যে বালক এমন কিছু দেখিতেছে না যাহা পরস্পর পরস্পরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতেছে। কিন্তু পরে বালক দেখিল যে জল প্রবাহিত হয়, দুগ্ধও প্রবাহিত হয়; জলকে যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করে, দুগ্ধও তদ্রূপ। এই প্রকারে এই দুইটি পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিতে পাইল। দুগ্ধ তরল পদার্থ, জলও তরল পদার্থ, অতএব সাদৃশ্য সঙ্গ হেতুই এখন একটি দেখিলে আর একটি মনে হয়। সাদৃশ্যই দুইটি ধারণার মিলনরজ্জু। এখন ইহাদের সম্মিলনের যথার্থ অর্থ নিরূপিত হইল, ইহাদের প্রকৃতিগত কারণ নির্ণীত হইল। এইরূপ কারণ নির্ণয়ে বালককে পর্য্যবেক্ষণ, স্মরণ এবং যুক্তির আশ্রয় লইতে হইয়াছে। বালক এখন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জল এবং দুধের মত আর অন্য কোন তরল পদার্থ আছে কিনা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেও পারে। অতএব যৌগপদ্য সঙ্গ অপেক্ষা সাদৃশ্য সঙ্গ স্থাপন শ্রেয়ঃ এবং শ্রেষ্ঠ। যৌগপদ্য সঙ্গ অপেক্ষা সাদৃশ্য সঙ্গ লব্ধ স্মৃতি অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। একজন শিক্ষক তাঁহার ছাত্রকে বলিলেন, পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল এবং ইহার পরিধি ২৫০০০

সাদৃশ্য সঙ্গের উপকারিতা।

মাইল। ছাত্র এই দুইটি তথ্য "মুখস্থ" করিয়া লইল। এখানে বালকের ধারণা যৌগপদ্য সঙ্গ সম্ভূত। আর একজন শিক্ষক তাঁহার ছাত্রকে বলিলেন যে, পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত। পরে একটি কমলা লেবু দিয়া তাহার পরিধি মাপিতে দিলেন; পরে কমলাটি কাটিয়া তাহার ব্যাসটিও মাপিতে দিলেন; পরে লেবুর পরিধি এবং ব্যাসের কি সম্বন্ধ স্থির করিতে বলিলেম। বালক দেখিল যে, ব্যাস অপেক্ষা পরিধি তিন-গুণের কিছু বেশী। আবার আর একটি গোলাকার পদার্থ দিয়া পুনরায় ঐরূপ করিতে শিক্ষক আদেশ দিলেন। এবারেও ছাত্র দেখিল যে ব্যাস অপেক্ষা পরিধি তিনগুণের কিঞ্চিদধিক। শিক্ষক এখন বলিলেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল। বালক তৎক্ষণাৎ বলিল তবে পৃথিবীর পরিধি ২৪০০০ হাজারের কিছু বেশী। এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে প্রথম ছাত্র অপেক্ষা দ্বিতীয় ছাত্রের ধারণা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে। আরও, প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় উপায়ে বুদ্ধিবৃত্তির অধিক ঔৎকর্ষ সাধন হয়।

মেধাশক্তির বিকাশ।

তিন বৎসর বয়সের পূর্ব্বে মানব জীবনের ঘটনাবলি কাহারও স্মরণ থাকে না; এই জন্য অনেকেই মনে করেন যে ঐ সময়ের পূর্ব্বে কাহারও স্মৃতিশক্তির বিকাশ হয় না। কিন্তু তিন বৎসরের শিশুও অনেক পরিমাণে তাহার মাতৃভাষা আয়ত্ত করিয়া থাকে এবং কোন ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে নিশ্চয়ই মেধাশক্তির আবশ্যক। আরও, জ্ঞানের প্রারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বর্ত্তমানের সহিত অতীতের তুলনা করিতে সক্ষম হয়; বর্ত্তমানের সহিত অতীতের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য নিরূপণে সমর্থ হয়। অতীতের জ্ঞান ব্যতীত বর্ত্তমানের সহিত অতীতের তুলনা হইতে পারে না এবং মেধাশক্তি ব্যতীতও অতীতের জ্ঞান অসম্ভব। অতএব জীবনের প্রথম

সূচনা হইতেই মেধাশক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। চতুর্থ হইতে পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত মানুষের মন যেন একবারে নির্মুক্ত; ইন্দ্রিয়গণ সতত জ্ঞান অর্জ্জনে সচেষ্ট, আর, মেধাশক্তি অর্জ্জিত জ্ঞানের সংরক্ষণে তৎপর। এই সময় মনের গ্রাহিকা শক্তি অত্যন্ত প্রবল। যাহা যেমন ভাবে গ্রহণ করিতেছে তাহার তেমনি প্রতিবিম্ব মনের মধ্যে থাকিয়া যাইতেছে—

"এ সংসারে হয় যাহা
কাল সব গ্রাসে তাহা
তুমি রাখ ছবি তুলে তায়
দেখাও সে হারানিধি নিকষ-ভাণ্ডার।"

মন যেন এখন এক প্রকার নিশ্চেষ্ট। বাহিরের বস্তু সকল ইন্দ্রিয় গ্রামের ভিতর দিয়া আপনা আপনি মনোরাজ্যে প্রবেশ করে এবং আপনার স্থান আপনি বাছিয়া লয়। এই সময়ের ভাব সকল প্রায়ই যৌগপদ্য সঙ্গ সম্বদ্ধ। পরে দশম হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত যুক্তি-তর্ক শক্তির বিকাশ হইতে থাকে। এখন হইতে অর্থহীন ভাষা বা বিষয় "মুখস্থ" করিবার স্পৃহা ক্রমশঃই কমিয়া যায়। মন এখন বিষয় সমূহের মধ্যে সাদৃশ্য বন্ধন অনুসন্ধানে তৎপর। এখন যৌগপদ্য সঙ্গ অপেক্ষা সাদৃশ্য সঙ্গের প্রাধান্য অধিক।

গ্রহণ ধারণ এবং স্মরণ এই তিনটি মেধাশক্তির উপকরণ। মেধাশক্তি সকল মানুষের একরকম নহে। কেহ অতি সহজে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, যাহা গ্রহণ করে তাহা বহুক্ষণ চিত্তমধ্যে ধারণ করিতে পারে এবং যেমনটি গ্রহণ করিয়াছে তেমনটি অবিকল স্মরণ করিতে পারে। কেহ কেহ অতি গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু তাহাদের ধারণাশক্তি অতি কম। শীঘ্র গ্রহণ

মেধাশক্তির প্রকার।

করে কিন্তু শীঘ্রই ভুলিয়া যায়। আবার কাহাকে কাহাকেও গ্রহণ করিতে বেগ পাইতে হয় কিন্তু যাহা একবার গ্রহণ করিয়াছে তাহা আর শীঘ্র ভুলিয়া যায় না এবং ইহাদের স্মরণ ক্রিয়া সহজ হইলেও প্রমাদশূন্য। আর এক দল লোক আছে যাহারা বহুকষ্টে কোন বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেও ধারণাশক্তির একান্ত অভাব জন্য, স্মরণ করিতে সমর্থ হয় না।

"বেগ-বেগা যে শীঘ্র শেখে শীঘ্র ভুলে যায়,
বেগ-চেরা, যে শীঘ্র শেখে চিরদিন মনে রাখে,
চেরা-বেগা, যে দেরীতে শেখে শীঘ্র ভুলে যায়
চের-চেরা, যে দেরীতে শেখে দেরীতে ভোলে।"

অনেকেই মাত্র যৌগপদ্য সঙ্গ সহায়ে অভিজ্ঞাত বিষয় মনে রাখে। আবার কেহ কেহ বা স্মরণকালে সাদৃশ্য সঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করে। যেখানে প্রকৃত সাদৃশ্যের অভাব সেখানে কৃত্রিম সাদৃশ্যের সাহায্যেও স্মরণ কার্য্য সহজে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব এই প্রকার সঙ্গ সাহায্যানুসারে মেধাশক্তি তিন প্রকারের।

মেধাশক্তি।
- (১) যান্ত্রিক—যৌগপদ্য সঙ্গানুযায়ী।
- (২) যৌক্তিক—সাদৃশ্য সঙ্গানুযায়ী।
- (৩) কৌশলিক—কৃত্রিম সাদৃশ্যানুযায়ী।

যান্ত্রিক ও যৌক্তিক মেধাশক্তির উদাহরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যেখানে যৌগপদ্য বা সাদৃশ্য সঙ্গের অভাব সেখানে আমরা অনেক সময় কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করি। যথা—

থুঞ্চ বীর্দ্দি নকাদনা কেনা মরু হুকাভণী।
ছারে সন্দ নযাথব ত্রান জণ হে তারিব॥

এই শ্লোকের সাহায্যে সতরঞ্চ খেলার ছকের ৬৪ ঘরেই একটি

ঘোঁড়াকে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে। প্রথম কোন ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর কোন ঘরে ঘোঁড়া চালাইতে হইবে মনে রাখিবার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। উক্ত শ্লোকের অক্ষরগুলি ছকের উপর একাদিক্রমে লিখিয়া যাও। পরে, নিম্নলিখিত শ্লোকটি ঘোঁড়ার পদ অনুসারে পড়িয়া ঘোঁড়া চালাইলে ঘোঁড়াটি সমস্ত ঘরে যাইবে।

হে কৃষ্ণ দ্বারিকানাথ কাশী যাদব নন্দন।
মথুরেশ হৃষীকেশ ত্রাতা ভব জনার্দ্দন।

এই শ্লোকটি পড়িয়া ঘোঁড়া চালাইতে হইবে। এই প্রকার স্মৃতিকে কৌশলিক স্মৃতি বলে।

স্মৃতি পার্থক্য।

যখনই আমি কোন বস্তু স্মরণ করিতে চেষ্টা করি তখনই দেখি যে সেই বস্তুটির দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ইত্যাদি প্রত্যক্ষের কোন একটির স্মৃতি আমার সংজ্ঞাক্ষেত্রের তুঙ্গস্থান অধিকার করে। সকল প্রত্যক্ষেরই স্মৃতি সমানভাবে মনোমধ্যে উদিত হয় না। কাহারও মনে দর্শন স্মৃতির প্রাদুর্ভাব অধিক, আবার কাহারও মনে বা শ্রবণ স্মৃতির প্রাদুর্ভাব অধিক। একজন তাহার বন্ধুকে স্মরণ করিতেছে, কিন্তু তাহার স্মরণলব্ধ স্মৃতিতে দর্শন স্মৃতিরই প্রাদুর্ভাব অধিক। স্মরণকালে তাহার বন্ধুর বেশ বিন্যাস, আকার প্রকার ইত্যাদি দর্শন প্রত্যক্ষ লক্ষণগুলিই মনে আসিতেছে; অপরাপর ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ লক্ষণগুলি অন্তরালে থাকিতেছে। এরূপ মেধাকে "দৃষ্টিধর" বলা হয়। আবার যদি বন্ধুর বেশ, ভূষা ইত্যাদি মনে না আসিয়া তাহার কথাবার্ত্তা ইত্যাদি শ্রবণ প্রত্যক্ষ লক্ষণগুলিই মনে আসে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এখানে শ্রবণস্মৃতির প্রাবল্য। এরূপ মেধাকে "শ্রুতিধর" বলা হয়। আবার কাহারও কাহারও স্মৃতিতে স্পর্শ ও গতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ লক্ষণগুলিরই প্রাবল্য অধিক দেখা যায় অর্থাৎ চর্ম্ম, পেশী, সন্ধি

তত্ত্ব, প্রভৃতি লব্ধ জ্ঞানগুলিই তুঙ্গ স্থান অধিকার করে। এরূপ মেধা-শক্তিকে "স্পর্শধর" বলে। যে স্মৃতিতে সকল প্রকার স্মৃতিই বর্ত্তমান সে স্মৃতিকে "মিশ্রস্মৃতি" বলিতে পারা যায়। যে "দৃষ্টিধর" তাহার স্মৃতিতে দর্শন-লক্ষণের প্রাচুর্য্য; যে "শ্রুতিধর"তাহার স্মরণে শ্রবণ লক্ষণের প্রাচুর্য্য, যে "স্পর্শধর" তাহার স্মরণে স্পর্শন-লক্ষণের প্রাচুর্য্য; এবং যাহার স্মৃতি "মিশ্র" তাহার স্মৃতিতে সকল লক্ষণের স্মৃতিই কিছু না কিছু বর্ত্তমান। অতএব স্মৃতি পার্থক্য অনুসারে মেধাশক্তি চারি প্রকার যথা—

মেধাশক্তি
- দৃষ্টিধর।
- শ্রুতিধর।
- স্পর্শধর।
- মিশ্র।

তোমার ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ উন্মুক্ত রাখিয়া "জননী" এই কথাটি স্মরণ করিতে চেষ্টা কর। স্মরণ কালে, তোমার মুখ বন্ধ করিবার যদি বিন্দুমাত্র ও প্রবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে তোমার মেধা হয় শ্রুতিধর, নয় দৃষ্টিধর কিন্তু যদি তুমি ওষ্ঠ কম্পন বা জিহ্বা সঞ্চালন করিবার অদম্য প্রবৃত্তি অনুভব কর তাহা হইলে বুঝিবে যে তোমার মেধা স্পর্শধর। চারিবর্ষ বয়স্ক একটি বালকের নিকট আমি "রাখাল ও নেকড়ে বাঘের" গল্পটি দুই একবার উল্লেখ করিলাম। আমি আবার বালকটিকে ঐ গল্পটি বলিতে বলিলাম। বালকটি বলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে, তাহার স্বরে, তাহার হাবভাবে, আমার বোধ হইতে লাগিল যেন বালকটি প্রকৃতই সেই বাঘ, সেই রাখাল, সেই গরুর পাল, সেই সমস্তই দেখিতেছে; সে যেন তাহাদের চীৎকার শুনিতেছে, সে যেন তাহাদের ছুটাছুটি দেখিতেছে। এখানে বালকটির স্মৃতি নানা স্মৃতির সমন্বয় মাত্র।

এরূপ বালকের মেধাকে মিশ্র বলা যায়। স্বাদ এবং ঘ্রাণের স্মরণ বড়ই বিরল। মিষ্ট দ্রব্যের চিন্তা না করিয়া মাত্র মিষ্টস্বাদ কি স্মরণ করা যায়? গোলাপ ফুলের গন্ধ স্মরণ করিতে চেষ্টা কর, ফুলটির আকৃতি, ফুলটির বর্ণ ইত্যাদি তোমার মনে আসিবে কিন্তু গন্ধ মনে আসিবে না।

আবার কতকগুলি লোক আছে যাহাদের কোন ঘটনা স্মরণ হইলে তৎসম্পর্কীয় শারীর অভিব্যঞ্জক গুলিও পুনঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শারীর স্মৃতি।

শারীর-অভিব্যঞ্জক গুলি বাদ দিয়া কোন ঘটনার স্মরণ এরূপ লোকের পক্ষে অসম্ভব। অবশ্য শারীর অভিব্যঞ্জকগুলি চেষ্টা বা যত্ন করিয়া উদ্বুদ্ধ করা হয় না কিন্তু পূর্ব্ব অভিজ্ঞাত ঘটনা স্মৃতিপথে উদয় হইলেই তৎসম্পর্কীয় অভিব্যঞ্জকগুলিও আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ স্ত্রীলোকটি তাহার ভগ্নীর সহিত কলহ করিয়াছে। আজ সে তোমার নিকট সেই কলহবৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছে। ঐ দেখ তাহার চক্ষুর্দ্বয় আরক্তিম হইতেছে; হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হইতেছে; দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত হইতেছে; আবার দেখ তাহার নয়নযুগল দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে; কণ্ঠস্বর রোধ হইয়া যাইতেছে ইত্যাদি। ঘটনাটির স্মরণ সঙ্গে সঙ্গেই অভিব্যঞ্জক গুলিও স্মৃত হইতেছে। এরূপ স্মৃতিকে শারীর স্মৃতি বলে।

এই প্রকার শারীর স্মৃতি হইতে অনুভূতির উদয় হয় বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে আনুভূতিক স্মৃতি বলেন। কিন্তু অনুভূতির স্মৃতি অসম্ভব।

আনুভূতিক স্মৃতি।

অনুভূতি অবধান করিতে পারা যায় না এবং অবধান ব্যতীত স্মরণ কার্য্যও সম্ভব নহে; অতএব অনুভূতির স্মরণও অসম্ভব। অবশ্য "শারীর স্মৃতি" বলিলেও ঠিক সত্য নির্দ্দেশ করা হয় না; কারণ, শারীর অভিব্যঞ্জক গুলিকে

প্রকৃতপক্ষে স্মরণ করা হয় না; তাহারা আপনা আপনি উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাদের আবির্ভাবে স্মৃতি রূপান্তরিত হইয়া থাকে। অভিব্যঞ্জক ব্যতীত স্মৃতি এবং অভিব্যঞ্জক সহ স্মৃতি এক নহে।

শাব্দিক স্মৃতি।

আমাদের অধিকাংশ স্মৃতি শব্দ-স্মৃতি। আমাদের জীবনের দ্বিতীয় বর্ষ হইতেই আমরা কথা বলিতে শিখি। তীক্ষ্ণধী বালক দুই বর্ষ বয়সেই ৩০০ হইতে ৪০০ পর্য্যন্ত কথা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয়। এই শব্দ-স্মৃতিরও তিনটি মূর্ত্তি আছে—দর্শন মূর্ত্তি, শ্রবণ মূর্ত্তি এবং স্পার্শন-মূর্ত্তি। দর্শন মূর্ত্তি—বাক্যটি লিখিলে বা ছাপাইলে যেমনটি দেখায়; শ্রবণ মূর্ত্তি—বাক্যটি স্বয়ং বা অপরে উচ্চারণ করিলে যেমনটি শুনায়; স্পার্শন মূর্ত্তি—বাক্যটি লিখিবার বা উচ্চারণ করিবার সময় যে পেশীর ক্রিয়া হয়—তাহারই স্মৃতি। বাক্য মাত্রেই ত্র্যবয়বী মূর্ত্তি বিশিষ্ট হইলেও ইহার তিন মূর্ত্তিই সমানভাবে সকলের মনে উদয় হয় না। যাহারা শ্রুতিধর তাহাদের মনে শ্রবণ মূর্ত্তির, যাহারা দৃষ্টিধর তাহাদের মনে দর্শন মূর্ত্তির, এবং যাহারা স্পর্শধর তাহাদের মনে স্পার্শন মূর্ত্তির আবির্ভাব অতি সহজেই হইয়া থাকে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

কল্পনা

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে নদীর উপকূলে পদচারণা করিবার সময় একটি অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকা দেখিয়াছিলে—এখন তুমি তাহার বর্ণনা করিতেছ——

"শতদলনিভ কে ঐ বালিকা?
রূপভরে যেন পড়িছে নুয়ে।
এলান চিকন রেশমের গোছা
কাল চুল পিঠে পড়েছে ছেয়ে।"

বালিকাটি এখন তোমার সম্মুখে নাই, কিন্তু তবুও তাহার রূপ তাহার বর্ণ ইত্যাদি সমস্তই তোমার স্মৃতিপথে উদয় হইতেছে। তোমার মনে বালিকাটির সম্যক্ প্রতিকৃতির উদয় হইতেছে। কিন্তু আমি ত ঐ বালিকাকে কখন দেখি নাই। আমি যখন তোমার বর্ণনা পড়িতেছি আমার মনেও ত তখন একটি প্রতিকৃতির উদয় হইতেছে! তোমার মানস প্রতিকৃতি এবং আমার মানস প্রতিকৃতির মধ্যে কি কোন পার্থক্য নাই? তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহাই ভাবিতেছ, আর আমি যাহা দেখি নাই তাহাই ভাবিতেছি। তোমার মানস প্রতিকৃতি স্মৃতবস্তু মাত্র; কিন্তু আমার মানস প্রতিকৃতি স্মৃতি মাত্র নহে। আমি যদি "শতদল" না চিনিতাম, "রেশমের গোছা" যদি না দেখিতাম, যদি আমার ঐ সকল বস্তুর স্মৃতি না থাকিত, তবে কি আমি তোমার বর্ণিত বালিকার রূপ মনে করিতে পারিতাম? অতএব তুমিও স্মৃতির সাহায্য লইতেছ, আমিও

প্রকৃতপ সাহায্য লইতেছি। কিন্তু তুমি যেমনটি দেখিয়াছ তেমনিটি স্মরণ কিন্তু ‧তছ—তোমার স্মরণে কৃত্রিমতা নাই। আমি যেমনটি দেখিয়াছি অভি‧নিটি স্মরণ করিতেছি না—আমার স্মরণে কৃত্রিমতা আছে। তোমার চিচ্ছায়া অবিকৃত স্মৃতি, আমার চিচ্ছায়া কল্পনা। যখন পড়িলাম "খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্র বদনং লম্বোদরং সুন্দরং" তখন আমার মনে একটি চিচ্ছায়ার আবির্ভাব হইল। এই চিচ্ছায়াটি নিশ্চয় স্মৃতি নহে, কারণ এরূপ বস্তু আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। ইহা আমার পক্ষে একটি নূতন বস্তু। নূতন হইলেও ইহা আমার ধারণাতীত নহে। আমার ইহা কল্পনা মাত্র। আমি হস্তী দেখিয়াছি, মনুষ্যও দেখিয়াছি। হস্তী এবং মনুষ্যের স্মৃতি আমার আছে। হস্তীর শরীর বাদ দিয়া মস্তক, এবং মস্তক বাদ দিয়া মনুষ্যের শরীর চিন্তা করিতে পারি। পরে মনে মনে মনুষ্যের শরীরের উপর হস্তীর মস্তকটি সংযোগ করিয়া দিয়া একটি নূতন বস্তুর ধারণা করিতে পারি। এরূপ ধারণা প্রকৃত বস্তুর স্মৃতি নহে—ইহা কল্পনা মাত্র। স্মৃতবস্তু হইতেই কল্পনার সৃষ্টি হয়। হস্তী এবং মনুষ্যের স্মৃতি না থাকিলে "গণেশের" কল্পনা হইত না। কিন্তু স্মৃতবস্তুর উপর সংযোগ এবং বিয়োগ এই দুইটি মানসক্রিয়ার আবশ্যক। তুমি হস্তী হইতে হস্তীর শরীরটি বাদ দিলে এবং মনুষ্য হইতে মনুষ্যের মস্তকটি বাদ দিলে (বিয়োগ)। পরে হস্তীর মস্তকটি মনুষ্য শরীরে যোগ (সংযোগ) করিয়া একটি নূতন বস্তুর কল্পনা করিলে। স্মৃতবস্তুর সংযোগ এবং বিয়োগের দ্বারা অনভিজ্ঞাত বস্তুর ধারণার নাম কল্পনা। একবারে নূতন বস্তুর কল্পনা অসম্ভব। "সুবর্ণ পর্ব্বৎ" নূতন বস্তু বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা একবারে নূতন নহে। আমাদের নিকট সুবর্ণ নূতন বস্তু নহে, পর্ব্বতও নূতন বস্তু নহে। সুবর্ণ এবং পর্ব্বত এই দুইটি স্মৃতবস্তুর সাহায্যে "সুবর্ণ পর্ব্বতের" কল্পনা সম্ভব।

তুমি যাহা কল্পনা করিতে চাও পূর্ব্ব হইতেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ থাকা প্রয়োজন। পূর্ব্বাভাষের ক্ষীণসূত্র অবলম্বন করিয়া কাল্পনিক চিত্র-অঙ্কনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কল্পিত বিষয়ের জন্য উপকরণের আবশ্যক। স্মৃতিশক্তি হইতে এই উপকরণ সংগৃহীত হয়। সংযোগ এবং বিয়োগ প্রণালীর সাহায্যে উপকরণগুলিকে কল্পনানুযায়ী পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্জ্জন করিয়া একত্র সমাবেশ করিলে তোমার ঈপ্সিত কল্পনার সৃষ্টি হইবে এবং ঈপ্সিত বস্তু পাইলে তোমার সন্তোষলাভ অবশ্যম্ভাবী। অতএব, আভাষ, স্মৃতবস্তু সংগ্রহ, সংযোগ এবং বিয়োগ, একত্র সমাবেশ এবং তুষ্টি—এই কয়টিকে কল্পনা কার্য্যের ক্রম বলা যাইতে পারে। মনে কর তুমি নরকের নদীর চিত্র কল্পনা করিতে চাও—

কল্পনার ক্রম।

১। আভাষ—নরকের নদী।

২। স্মৃতবস্তু—রুধির, অস্থি, নদী, কুম্ভীর, বালুকা, লৌহসূচি ইত্যাদি।

৩। বিয়োগ—জলশূন্য নদী; মাংসশূন্য কঙ্কাল; প্রাণশূন্য দেহ; বালুকাহীন নদীতীর ইত্যাদি।

৪। সংযোগ—রুধির পূর্ণ নদী; অস্থিময় কুম্ভীর; লৌহসূচি পূর্ণ নদীতীর; ভীষণ অন্ধকারেও দর্শন ইত্যাদি।

৫। সমাবেশ—"রুধিরের নদী, গলিত শব, স্রোতোবাহিত কঙ্কাল-মালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ, সকলই ভীষণ অন্ধকারে দেখা যাইতেছে। নদীতীরে বালুকা নাই—তৎ-পরিবর্ত্তে লৌহ সূচিসকল অগ্রভাগ ঊর্দ্ধ করিয়া রহিয়াছে।"

৬। তুষ্টি—এইরূপে কল্পিত চিত্রের সমাধান হইতে সন্তোষলাভ অবশ্যম্ভাবী।

সংভাবিনী ও সংগ্রহণী কল্পনা।

কবি কালিদাস যখন মেঘদূত রচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি কল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমি যখন মেঘদূত পড়িতেছি তখন আমিও তাঁহার কল্পিত চিত্রের কল্পনা করিতেছি—

"অন্ধকার রুদ্ধ গৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত ; গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘ পৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশ দেশান্তরে।"

কবি কালিদাসের কল্পনা এবং আমার কল্পনা এক নহে—অনেক প্রভেদ আছে। কালিদাস আত্মশক্তি প্রভাবে অনভিজ্ঞাত বিষয়ের উদ্ভাবন করিতেছেন ; মেধাশক্তি প্রভাবে পূর্ব্ব পরিচিত বিষয় স্মরণ করিতেছেন এবং তাঁহার ইচ্ছামত সেগুলিকে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়া একটি সম্পূর্ণ মানস চিত্র ফুটাইয়া তুলিতেছেন। আর আমি একপ্রকার নিশ্চেষ্ট, আমাকে কল্পিত বস্তুর উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইতেছে না ; আমার জন্য অপরে সংগ্রহ করিতেছে। সংগৃহীত উপকরণের সমাবেশ আমাকে করিতে হইতেছে না—আমার জন্য অপরে করিতেছে। এখানে কালিদাস স্রষ্টা, আমি দ্রষ্টা মাত্র। অতএব কল্পনা দুই প্রকার—সংগ্রহণী কল্পনা এবং সংভাবিনী কল্পনা। আমার কল্পনা সংগ্রহিণী কল্পনা আর কালিদাসের কল্পনা সংভাবিনী কল্পনা।

* * "এই পুষ্পবণ
তোমারি সৃজিত প্রভু! রচনা তোমার ;
তোমারি কুসুম তুমি করেছ চয়ন।
জ্ঞানের অনন্তাকাশে তুমি প্রভাকর।"

কবি গাহিতেছেন—

সচেষ্ট ও নিশ্চেষ্ট কল্পনা।

"আকাশে চন্দ্রমা হাসে
জ্যোছনায় ধরা ভাসে
চকোর পিয়ায় সুধা পরাণ ভরে।
শিথিল যমুনা বারি
বহে যায় ধীরি ধীরি
গণিতেছে ঢেউগুলি কে বসে' তীরে।"

আর ঐ দেখ, প্রদোষকালে উদ্যান মধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া কুন্দনন্দিনী ভাবিতেছে—"ভাল, মানুষ মরিলে কি নক্ষত্র হয়? তা হ'লে ত বাবা মা, সবাই নক্ষত্র হইয়াছেন? তবে তারা কোন্ নক্ষত্রগুলি? ঐটি? না ঐটি? কোনটি কে? কেমন করিয়া জানিব? তা যেটিই যিনি হউন, আমায় ত দেখতে পেতেছেন? আমি যে এত কাঁদি—তা দূর হউক, ও আর ভাববনা, বড় কান্না পায়। কেঁদে কি হবে? আমার ত কপালে কান্নাই আছে নইলে মা—আবার ঐ কথা! দূর হুউক—ভাল, মরিলে হয় না? কেমন করিয়া? জলে ডুবিয়া? বেশ ত! মরিলে নক্ষত্র হব—তা হ'লে হব ত?" ইত্যাদি। এখানে কবি ও কুন্দনন্দিনী দুই জনেই কল্পনাস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন কিন্তু দুই জনেরই কি কল্পনা এক রকম? কবি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নিজের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন এবং নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করিতেছেন। কবির কল্পনার উদ্দেশ্য আছে, শৃঙ্খলা আছে, যত্ন আছে। আর, কুন্দনন্দিনীর কল্পনা উদ্দেশ্যহীন, অসংলগ্ন এবং অযত্নসিদ্ধ। কল্পনা কবির ক্রীড়নক, কিন্তু এখানে কুন্দনন্দিনীই কল্পনার ক্রীড়নক। কুন্দনন্দিনী নিশ্চেষ্ট। কুন্দ তাহার কল্পনাকে নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করিতেছে না। কবির কল্পনা কবির ইচ্ছানুশাসিত; আর কুন্দনন্দিনীর ইচ্ছা কল্পনানু-

শাসিত। কবির কল্পনা সচেষ্ট কল্পনা; কুন্দনন্দিনীর কল্পনা নিশ্চেষ্ট কল্পনা।

সত্য নিরূপণ, ঐহিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টি এই তিনটি সচেষ্ট কল্পনার উদ্দেশ্য। কোন তথ্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে প্রথমতঃ কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। কল্পনা ব্যতীত অনুসন্ধানকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। কি বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইবে, কি উপায়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে ইত্যাদি পূর্ব্বসূচি কল্পনা করিয়া লইতে হয়। কার্য্যের কারণ নির্ণয় করা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। কিন্তু কাল্পনিক কারণের আশ্রয় না লইলে যথার্থ কারণ নিরূপিত হয় না। নিউটন একদিন দৈবযোগে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী আতা বৃক্ষ হইতে একটি ফল পতিত হইতে দেখিয়া বস্তু মাত্রের পতন নিয়ামক সাধারণ কারণের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি কল্পনা করিলেন যে, হয়ত যে কারণ বশতঃ আতা ভূতলে পতিত হইল, সেই কারণেই চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী স্ব স্ব কক্ষে ব্যবস্থাপিত আছে। পরে বহু পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিলেন যে সেই কারণই পরম অদ্ভুত শক্তি সহকারে অতি সহজে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি নিয়মিত করিতেছে। এইরূপে গুরুত্বের নিয়ম আবিষ্কৃত হইল। কল্পনা বাস্তব পরিণত হইল। কল্পনা আমাদের লক্ষ্য স্থির করিয়া দেয়। কল্পনা আমাদিগকে সত্যান্বেষণের পথে প্রবর্ত্তিত করে। কল্পনা প্রভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম অবধারিত হইতেছে।

কল্পনার উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা।

"আজি কল্পনাদূতি লয়ে যায় মোরে
স্মরণ-সরণি পারে,
যত মৃত্যু-বিজয়ী সাধকের সাথে
সত্যের অভিসারে,

পুণ্যের দীপে দীপালি যেথায়
বিধাতার সেই দ্বারে।"

প্রথমে কল্পনা পরে পরীক্ষা। যে কল্পনা পরীক্ষামূলক এবং যুক্তি-মূলক তাহাই স্বীকার্য্য—অপরগুলি পরিহার্য্য। কল্পিত বিষয় পরীক্ষা এবং আলোচনার দ্বারা সম্যক্ প্রকারে প্রমাণিত হইলে সত্যে পরিণত হয়। কল্পনা কেবল অবাস্তবের স্রষ্টা নহে, বাস্তবেরও স্রষ্টা। আমাদের জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদনের জন্যই কল্পনার প্রয়োজন। মৃত্তিকা জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু। ইহারা আমাদের সুখের হেতুও বটে আবার দুঃখেরও হেতু। কি উপায়ে ইহাদিগকে মানুষের সুখের কারণ করিতে পারা যায় আমরা সতত সেই চিন্তা করিয়া থাকি। এই উপায় নির্দ্ধারণের জন্য উদ্ভাবনী কল্পনার প্রয়োজন। কল্পিত উপায়কে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেই বলিতে পারিব—

"অগ্নিজল অচেতন, নাহি বুঝে কথা
আমার আদেশ হ'লে
তারাও নিয়ত চলে
কিঙ্করের মত, আমি চলি যথা, তথা।"

আরও ছুরি, কাঁচি, ঘড়ি প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলি প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে প্রস্তুত-কর্ত্তাকে কি কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না? কোন্ জিনিষ হইতে আমাদের কি অভাব অপনোদন হইবে, কোন্ জিনিষটি কেমন করিয়া প্রস্তুত করিলে আমাদের উপকারে আসিবে ইত্যাদি কল্পনা করিয়া লইয়া মানুষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ যেমন সত্যের জন্য লালায়িত, সুখের জন্য লালায়িত, তেমনি আবার সৌন্দর্য্যের জন্যও লালায়িত। সেই জন্য মানুষ সৌন্দর্য্যেরও সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু এখানেও মূলে কল্পনা। শিল্পে সৌন্দর্য্য আছে, কাব্যে সৌন্দর্য্য আছে, সঙ্গীতে সৌন্দর্য্য আছে।

শিল্প কাব্য এবং সঙ্গীত সৌন্দর্য্যের ভাষা। কবি সৌন্দর্য্যের কল্পনা করিতেছেন এবং পরে সেই কল্পিত সৌন্দর্য্যকে তাঁহার কবিতায় প্রকাশ করিতেছেন।

"'ব্রজাঙ্গনা' 'বীরাঙ্গনা', নয়নের জলে,
—প্রেম বিগলিত ;—
সাজায়ে সুন্দর ডালা, গাঁথিয়া নূতন মালা,
আদরে তোমার অঙ্গ করিল ভূষিত।"

তেমনি শিল্পী এবং গায়কও তাঁহাদের কল্পিত সৌন্দর্য্যকে শিল্পের নৈপুণ্যে এবং সঙ্গীতের সুললিত স্বরে প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে কল্পনা হইতে সত্যের আবিষ্কার হইতেছে ; সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতেছে। কল্পনা সত্যের স্রষ্টা, কর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং সৌন্দর্য্যের উদ্বোধক। অতএব কল্পনা এই কয় প্রকার—

মনের অবস্থানুযায়ী— { সচেষ্ট কল্পনা। নিশ্চেষ্ট কল্পনা। }

উপকরণ সূত্রানুযায়ী— { সংভাবিনী কল্পনা। সংগ্রহিণী কল্পনা। }

উদ্দেশ্য অনুযায়ী— { সাত্ত্বিক কল্পনা। সৌন্দর্য্য কল্পনা। ব্যবহারিক কল্পনা। }

কল্পনার গতি অতি উচ্চ হইলেও, অবাধ নহে—ইহার সীমা আছে। যাহা ইচ্ছা করি বা যেমনটি ইচ্ছা করি ঠিক তেমনটি কল্পনা করিতে পারি না। কল্পনার গণ্ডি আছে ; এই গণ্ডির বাহিরে কল্পনার স্রোত প্রবাহিত হইতে পারে না।

কল্পনার সীমা।

কল্পনার উপকরণের আবশ্যক। স্মৃতিই ইহার উপকরণ সরবরাহ করিয়া থাকে। উপকরণের অভাব হইলেই কল্পনা প্রবাহ প্রতিহত হইবে।

অন্তরায়—
- ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ
- সংজ্ঞা প্রত্যক্ষ
- তত্ত্ব প্রত্যক্ষ
- ভাবাত্মক বস্তু
- অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ
- মন সম্বন্ধীয় স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম

যাহা আমার অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত তাহারই সমন্বয়ে আমি কল্পনার সৃষ্টি করিতে পারি। কল্পনায় উপকরণ আবশ্যক। জড়জগতে যাহা আমি প্রত্যক্ষ করি তাহাই কল্পনার উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। যাহা আমি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করি নাই তাহা কখনই কল্পনার উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। অন্ধের কল্পনায় বর্ণবিন্যাস থাকিতে পারে না; বধিরের কল্পনায় শব্দবিন্যাস থাকিতে পারে না। অন্ধের কল্পনার, বধিরের কল্পনার সীমা আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অভাবে কল্পনা উন্মুক্ত গতি হইতে পারে না। কল্পনা যেমন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সীমা অতিক্রম করিতে অসমর্থ, তেমনি সংজ্ঞা প্রত্যক্ষের সীমা লঙ্ঘন করিতেও অসমর্থ। ইচ্ছা, অনুভূতি এবং চিন্তা আমার সংজ্ঞা প্রত্যক্ষ এবং আমার কল্পনাতে এই সংজ্ঞা প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত বিষয় থাকিতে পারে না। আমার সংজ্ঞা প্রত্যক্ষ বহির্ভূত অন্য চিচ্ছক্তির কল্পনা আমার পক্ষে একবারে অসম্ভব। আমি দেবতার কল্পনা করি, উপ-দেবতার কল্পনা করি, কিন্তু আমার কল্পিত দেবতা বা উপদেবতা আমারই মত চিন্তা করে, আমারই মত ইচ্ছা করে এবং আমারই মত ইহাদের বেদনা। আমি ঈশ্বরের কল্পনা করি সত্য। জানি ঈশ্বর অনন্ত, ঈশ্বর

অসীম, তাঁহার শক্তি অসাধারণ, কিন্তু তাহা হইলেও ঈশ্বর চিন্তা করেন, অনুভব করেন এবং ইচ্ছা করেন—এই মাত্র বলিতে পারি। চিন্তা অনুভূতি এবং ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন মানসিক শক্তি ঈশ্বরেও অর্পণ করিতে পারি না; তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে তাঁহার চিন্তা অসীম, ইচ্ছা অসীম এবং অনুভূতি অসীম, কিন্তু তাহা হইলেও সংজ্ঞা প্রত্যক্ষ মানস ব্যাপারের অতিরিক্ত অন্য কিছু আমার কল্পনাতিরিক্ত রহিয়া গেল। যেমন সংজ্ঞা প্রত্যক্ষাতিরিক্ত বিষয়ের কল্পনা অসম্ভব তদ্রূপ তত্ত্ব-প্রত্যক্ষাতিরিক্ত বিষয়ের কল্পনাও অসম্ভব। দেশ, কাল, পদার্থ, মন ইত্যাদি তত্ত্বপ্রত্যক্ষের বিষয়। আমি যাহাই কেন কল্পনা করি না তাহা দেশগত কিংবা সময়গত হইবেই। আমি এমন কোন কল্পনা করিতে পারি না যাহা কোন দেশ বা সময়ের অন্তর্গত নহে। আমি এমন কিছু কল্পনা করিতে পারি না যাহা কোন পদার্থের রূপান্তর নহে। আমার কল্পনা দেশ বা কালমধ্যে আবদ্ধ থাকিবেই। দেশ বা কালের বাহিরে আমার কল্পনার গতি নাই। আমার কল্পনা মন এবং পদার্থ ব্যতীত অপর তৃতীয় বস্তুর কল্পনা করিতে পারে না। আবার, আমি যাহা কল্পনা করি তাহা দ্রব্যাত্মক, ভাবাত্মক নহে, তাহা সগুণ বস্তু মাত্র। আমি "লালবর্ণ" চিন্তা করিতে পারি কিন্তু ইহা আমার কল্পনাতীত। আমি যাহা কল্পনা করি তাহা লালবর্ণ নহে, লালবস্তু। বস্তু ব্যতীত বর্ণের কল্পনা, বর্ণ ব্যতীত বস্তুর কল্পনা অসম্ভব। "মানুষ" চিন্তনীয় হইলেও কল্পনীয় নহে; আমি যাহা কল্পনা করি তাহা ব্যক্তিবিশেষ মাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে যে গুণবিশিষ্ট বস্তুবিশেষের কল্পনা সম্ভব কিন্তু বস্তু ব্যতীত গুণের কল্পনা অসম্ভব। আরও, কল্পনা প্রভাবে অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ উচ্ছেদ করিতে পারা যায় না। আকার ব্যতীত বস্তু দেখি নাই, বর্ণ ব্যতীত পদার্থ দেখি নাই। আকার এবং বর্ণের সহিত বস্তুর সঙ্গ অবিচ্ছিন্ন। এই অবিচ্ছিন্ন

সঙ্গ আমি কল্পনা সাহায্যে বিচ্ছেদ করিতে পারি না। যে কখনও বরফ দেখে নাই সে জলের কঠিন অবস্থা কল্পনা করিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি মনসিজ স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম আছে। কল্পনার সে নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষমতা নাই। একই বস্তু ঐকই সময়ে শ্বেত এবং কৃষ্ণ, একই ব্যক্তি একই সময়ে দুই স্থানে উপস্থিত; বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্র বড় ইত্যাদির কল্পনা অসম্ভব।

কল্পনার বিকাশ।

কল্পনা প্রভাবে যাহা আমরা কখনও দেখি নাই বা দেখিব না এমন বিষয়েরও চিন্তা করিতে পারি।

"দেখাইল;—বেড়াইল কল্পনার পক্ষে
লইয়া তোমারে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ধরাতলে, প্রচণ্ড জলধিতলে;
শুনাইল "মেঘনাদ" গভীর ঝঙ্কারে।"

পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, আমরা নূতন বস্তুর কল্পনা করিতে পারিলেও সম্পূর্ণ নূতন বস্তুর কল্পনা করিতে পারি না—

"ছাড়া নাহি পাই, ছেড়ে দিয়ে তাই দেখি
ছেড়ে দিতে বাঁধি,—অজানার স্বাদ পেতে
কল্পনা ফিরে আসেরে আকাশে ঠেকি'—
কল্পলতার সন্ধানে যেতে যেতে।"

কল্পনার জন্য উপকরণের আবশ্যক। স্মৃতবস্তু সমূহই কল্পনার উপকরণ। সুতরাং অভিজ্ঞতা এবং মেধাশক্তির প্রয়োজন। অতএব যখন অভিজ্ঞতা নিতান্ত কম, যখন মেধাশক্তির তেমন বিকাশ হয় নাই, তখন কল্পনাশক্তি অপ্রকাশ থাকে। সুতরাং মনুষ্য-জীবনের প্রারম্ভ হইতেই কল্পনার সূচনা দেখা যায় না। পরে যখন

অভিজ্ঞতার প্রসার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইল, স্মৃতিশক্তির কিঞ্চিৎ উন্মেষ হইল, তখন—

"অলস কল্পনা বুকে, ভাসিয়া বেড়ায় সুখে,
ভাবে বুঝি হেসে খেলে কাটিবে জীবন।"

এই সময় কল্পনা শক্তি বড়ই প্রবল, এমন কি নির্জীব পদার্থকেও সজীব বলিয়া মনে হয়। বালক-বালিকারা পুতুল লইয়া খেলা করে। তাহাদের মাটির পুতুলের ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে; তাহাদের কাঠের ঘোড়া জল খায়; তাদের পুতুলের মা বাপ আছে, ভাই-বোন আছে। এই সময় উপকথা শুনিতে শিশুরা বড়ই ভালবাসে।

"তার পর দিনে দিনে, বাড়িয়াছি, বাসিয়াছি ভাল—
শিয়রে সোণার কাঠি গল্পের সে রাজ-কন্যাটিরে,
আজ যেন মনে হয় রয়েছে সে তোমাতে বিলীন,
তোমারি দু' আঁখি দিয়ে সেই কন্যা দেখিছে আমায়"!

পরে শৈশবের সীমা অতিক্রম করিলাম। অভিজ্ঞতার বলে বাস্তবের সহিত অবাস্তবের তুলনা করিতে শিখিলাম। অবাস্তবে বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল। কল্পনাস্রোত সংযত করিতে শিখিলাম। উপকথা শ্রবণে স্পৃহা কমিয়া গেল। মিথ্যা গল্পে আর আনন্দ পাইলাম না। আমার অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধ বিষয়ে আর আস্থা থাকিল না। আমার কল্পনার রূপান্তর হইয়া গেল। কল্পনা অন্তর্হিত হয় নাই। কল্পনা বর্ত্তমান। যাহা আমার নিকট বাস্তব বলিয়া মনে হয় না তাহা আমাকে আর ভাল লাগে না। কিন্তু বাস্তব ঘটনার নূতন বিন্যাস সমুদ্ভূত গল্প লহরীতে বড়ই আমোদ পাইতে লাগিলাম। উপন্যাস, কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনা বড়ই প্রীতিকর হইয়া উঠিল। কিন্তু এই সুখটুকুও

কয়দিনের জন্য? "অম্বর মাঝে ক্ষণপ্রভা মত" ইহাও শীঘ্রই বিলীন হইয়া গেল। তখন—

"চকিতে দেখিনু চেয়ে সুমুখে সংসার
প্রশস্ত কার্য্যের স্থল চারিদিকে কোলাহল
অনন্ত শিক্ষার দ্বার রয়েছে বিস্তার।"

এইবার কল্পনার রাজ্য ত্যাগ করিয়া বাস্তবের রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। কঠোর কর্ত্তব্যের কষাঘাতে কল্পনার অলীক মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। এখন—

"অন্ধকার জীবনের মাঝে
চেয়ে দেখি সর্ব্বত্র বিষাদ।
নিত্য ঘটে কত অঘটন
নিদ্রিতে জাগ্রতে পরমাদ।
সংসার-কারার মাঝে রহি
যে দিকে বাড়াতে যাই পদ,
সেই দিকে মহা ঝঞ্ঝাবাত
প্রতিপদে ব্যর্থ মনোরথ।"

কল্পনার মোহ কাটিয়া গেল। এখন জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। এইবার কল্পনার পরাজয় হইল, কর্ম্মের জয় হইল। কল্পনা এখন জ্ঞানের সহায়ক, কর্ত্তব্যের প্রবর্ত্তক, সৌন্দর্য্যের উপাসক।

কল্পনা ও স্বপ্ন।

আমি নিদ্রিত। এখন আমার সকল প্রকার সচেষ্ট গতির অভাব। এখন আমার ইন্দ্রিয়নিচয় বাহ্যজগতের সংবাদ অন্তর্জগতে বহন করিতেছে না। ক্রমে আমি স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত। আমি এখন একটি অতি সুন্দর পুষ্পোদ্যানের মধ্যে। আমার অনতিদূরে একটি ফোয়ারা রহিয়াছে।

ফোয়ারা হইতে জলকণা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। উদ্যানের মধ্য-ভাগে একটি নাতিক্ষুদ্র জলাশয় আছে। ঐ জলাশয়ে তিনটি রাজহংস সন্তরণ দিতেছে। এই হংস তিনটির একটি সুবর্ণমণ্ডিত, একটি রৌপ্য-মণ্ডিত এবং অপরটি হীরকখচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ জলা-শয়ের মধ্যভাগে শ্বেত শতদলমণ্ডিত ক্ষুদ্র একখানি তরণীর উপর একটি মনোরমা বালিকা দেববিনিন্দিত স্বরে গীত গাহিতেছে। আর,—এমন সময় কেহ দরজায় ধাক্কা দিল। আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্ন-চিত্র অন্তর্হিত হইল। স্বপ্নরাজ্য হইতে আবার বাস্তবরাজ্যে উপস্থিত। যখন স্বপ্নরাজ্যে ছিলাম তখন সমস্তই বাস্তব বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে উহা প্রকৃত ব্যাপার নহে; একবারে অসম্ভব —স্বপ্ন মাত্র। স্বপ্নকালে প্রকৃত জগৎ অন্তর্হিত হয়; অবাস্তব জগৎ মনোরাজ্য অধিকার করে। স্বপ্নের প্রকৃতি অনুসারে কখনও বা সুখসাগরে সন্তরণ দিতে থাকি, আবার কখনও বা দুঃখের কষাঘাতে নিপীড়িত হইতে থাকি। স্বপ্ন দেশ কাল পারম্পর্য্যের নিয়মাধীন নহে। স্বপ্নরাজ্যে মুহূর্ত্তমধ্যে সমুদ্র পার হইতে পারি; মুহূর্ত্ত মধ্যে যুগ যুগের ঘটনা উপলব্ধি করিতে পারি। বরফের গৃহ গরম বলিয়া বোধ হয়; আবার অগ্নির উত্তাপ শীতল বোধ হয়। স্বপ্নরাজ্যে আমরা দ্রষ্টা মাত্র। এখানে আমরাই আমাদিগকে পীড়িত দেখিতেছি, আমরাই আমাদিগকে মৃত দেখিতেছি, আবার আমরাই আমাদের শবদেহের শ্মশান ঘাটে অনুসরণ করিতেছি। স্বপ্ন আমাদের স্মরণ থাকে না। স্বপ্নরাজ্যের সহিত বাস্তবরাজ্যের সাদৃশ্য অতি কম। সঙ্গ সাহায্যেই স্মরণ সম্ভব। বাস্তব জগতের সহিত স্বপ্নজগতের সঙ্গ সম্বন্ধ নাই, সুতরাং বাস্তব জগতের ঘটনাগুলি স্বপ্ন জগতের ঘটনা সমূহকে আকর্ষণ করিতে পারে না বলিয়া

স্বপ্নের স্মৃতি অসম্ভব। অবধানের আত্যন্তিক অভাব না হইলেও অবধানের অভাব বলিয়া স্বপ্ন মনের উপর কোন স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে না। স্বপ্নকালে মন যেন এক প্রকার নিষ্ক্রিয়। এখানে চেষ্টা নাই, উদ্দেশ্য নাই। কল্পনার পর কল্পনা আসিয়া মনকে আক্রান্ত করে। স্বপ্নে কিন্তু বেদনার অভাব থাকে না। নিদ্রিত শিশু কখন বা কাঁদিতেছে আবার কখন বা হাসিতেছে। হত্যাকারী স্বপ্নে নিজের অন্তিম অবস্থার বিষয় স্বপ্ন দেখিয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। স্বপ্নসময়ে চিন্তার একান্ত অভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু আবার সময় সময় চিন্তা ক্রিয়া বড়ই প্রবল হয়। যে সমস্যার জাগ্রৎ অবস্থায় মীমাংসা করিতে পারি না, নিদ্রাকালে অনেক সময় সে সমস্যার মীমাংসা অতি সহজেই হইয়া থাকে। কল্পনার ন্যায় স্বপ্নেও উপকরণের আবশ্যক। স্মৃতি এবং প্রত্যক্ষ উভয়েই উপকরণ সরবরাহ করিয়া থাকে। স্বপ্ন নিশ্চেষ্ট কল্পনা মাত্র। অতএব—

স্বপ্ন:
১। চালকবিহীন।
২। উদ্দেশ্যবিহীন।
৩। অমূলকতার স্রষ্টা।
৪। কল্পিত চিত্রে বাস্তব জ্ঞান।
৫। স্মরণ অসাধ্য।

কল্পনা:
১। বুদ্ধি পরিচালিত।
২। উদ্দেশ্যমূলক।
৩। আদর্শের স্রষ্টা।
৪। কল্পিত চিত্রে অবাস্তব জ্ঞান।
৫। স্মরণ সাধ্য।

"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী!
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হ'তে। বসি কবিগণ
সোণার উপমা সূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কত বর্ণ কত গন্ধ ভূষণ কত না,
সিন্ধু হ'তে মুক্তা আসে খনি হ'তে সোণা,
বসন্তের বন হ'তে আসে পুষ্প ভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার পরে প্রদীপ্ত বাসনা
অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।"

ঊনবিংশ অধ্যায়

চিন্তা।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে আমরা এক একটি বস্তুর জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, কিন্তু চিন্তাশক্তিপ্রভাবে প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞান সমূহের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করি। চিন্তার প্রধানতঃ তিনটি স্তর—জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে; অর্জ্জিত জ্ঞানকে সংরক্ষণ এবং স্মরণ করিতে হইবে; এবং সঞ্চিত জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

চিন্তার প্রকৃতি ও প্রকার।

অর্জ্জন শক্তি { ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, সংজ্ঞা প্রত্যক্ষ, তত্ত্ব প্রত্যক্ষ

আবৃত্তি শক্তি { স্মরণ, স্বপ্ন, কল্পনা

চিন্তা শক্তি { সামান্য জ্ঞান, বিচার, যুক্তি

এই বিশাল বিশ্বের দ্রব্যসত্তার বহু হইলেও ইহা এক। এখানে পার্থক্যের ভিতর ঐক্য আছে, আবার সাদৃশ্যের মধ্যেও বৈসাদৃশ্য আছে।

এখানে বহুর ভিতর এক আছে, আবার একের ভিতর বহু আছে। এখানে প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক বিষয়, প্রত্যেক ব্যাপার অপর বস্তু বিষয় এবং ব্যাপারের সহিত সম্বন্ধানুবদ্ধ। এবং এই ঐক্য এই সম্বন্ধ নির্ণয়ই চিন্তার কার্য্য।

"প্রজ্ঞা বেঁধেছে প্রথম গ্রন্থি
আনি' একত্রে সূত্র নানা ;
অসম্পূর্ণে প্রজ্ঞা পুরায়,
ভ্রান্তির জালে দেয় হানা।"

সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইলে বিচারের আবশ্যক, তুলনার আবশ্যক, তর্কের আবশ্যক, বুদ্ধির আবশ্যক। সেই জন্য এই শক্তির বহুবিধ—

নাম {
- চিন্তা শক্তি
- তারতম্য্য শক্তি
- তর্ক শক্তি
- সাত্ত্বিক চিন্তা
- বোধি শক্তি
- ভাবনা শক্তি
- সম্বন্ধ নিরূপণ শক্তি
- বুদ্ধি

চিন্তা শক্তিকে সাত্ত্বিক শক্তি বা বোধিশক্তি বা বুদ্ধি বলা হয়, কারণ এই শক্তিই মনুষ্যকে অন্য প্রাণী হইতে পৃথক্ করিয়া দেয় বোধি-শক্তি এবং বুদ্ধি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহা পরিত্যজ্য। চিন্তা শক্তির তিনটি অবস্থা—

চিন্তা শক্তি
- সামান্য জ্ঞান
- বিচার
- যুক্তি

তুমি একটি গাছ, দুইটি গাছ, তিনটি গাছ—অনেকগুলি গাছ দেখিলে। পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিলে যে ঐ সকল বৃক্ষের একটি সাধারণ গুণ আছে—সকল গাছেই আতা ধরিয়াছে। এখন মনে মনে ধারণা করিলে যে যে বৃক্ষে এই প্রকার ফল ধরে তাহাই আতা বৃক্ষ। এই প্রকারে এক জাতীয় বৃক্ষের জ্ঞান হইল। যে শক্তি প্রভাবে এই প্রকার জাতি-জ্ঞান হয় তাহার—

নাম
- সামান্য জ্ঞান
- জাতি জ্ঞান
- সাধারণ জ্ঞান
- বস্তুর সাধারণ প্রতিরূপ জ্ঞান
- শ্রেণী জ্ঞান।

এইরূপে বস্তুর সম্বন্ধ নির্ণয় হইতে সাধারণ বা সামান্য জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। আবার সামান্য জ্ঞানের মধ্যেও সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে পারা যায়। তোমার "রৌপ্যের" জ্ঞান আছে আবার "ধাতুর" জ্ঞান আছে। এই দুইটী সামান্য জ্ঞান। এই জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া বলিলে "রৌপ্য এক প্রকার ধাতু।" যে শক্তি প্রভাবে এই প্রকার সম্বন্ধ নির্ণয় সম্ভব তাহার—

নাম
- বিচার
- বাক্য

এইরূপে বিচার শক্তি প্রভাবে সামান্য জ্ঞানের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে পারা যায়। আবার বিচারের মধ্যেও সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে পারা যায়।

পক্ষী মাত্রেরই পালক আছে; কোকিল এক প্রকার পক্ষী; অতএব কোকিলের পালক আছে। এই প্রকার সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইলে অনেক সময় কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হয়। যে শক্তি প্রভাবে এই কারণ সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে পারা যায় তাহার—

নাম { যুক্তি
তর্ক
ত্র্যবয়বী বাক্য
প্রমাণ
অনুমান* শক্তি }

এই শক্তি কয়টি অতি সহজ কিন্তু অতি মহৎ। মানুষ চিন্তা করে তাই মানুষ জ্ঞানী; মানুষ চিন্তা করে তাই মানুষ জড়জগতের অধিপতি; মানুষ চিন্তা করে তাই মানুষ সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটনে তৎপর; মানুষ চিন্তা করে তাই মানুষ জড়জগতের ও মানসজগতের সম্বন্ধ নির্ণয়ে ব্যস্ত, তাই তত্ত্বান্বেষণে তৎপর।

* "দুই অনন্ত জগৎ,—
মানস ও জড়সৃষ্টি, খদ্যোতের মত,
একটি বালুকা নাহি পারে দেখিবারে,
একটি বালুকা নাহি পারে বুঝিবারে,
সেই দুই অনন্তের। রয়েছে পড়িয়া
কত তত্ত্ব-রত্ন রাশি গর্ভে উভয়ের।"

মানুষের চিন্তা আছে তাই এই "তত্ত্বরত্ন রাশি" সঞ্চয়ে সতত সচেষ্ট। মানুষের পরিপাক যন্ত্র তাহার আহার্য্য বস্তুকে অস্থি মেদ মাংস মজ্জা মস্তিষ্কে পরিণত করিতেছে; আর তাহার চিন্তাশক্তি লব্ধ-জ্ঞানকে সামান্য জ্ঞান, বিচার এবং যুক্তিতে অনূদিত করিতেছে। মানুষ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের

সাহায্যে জড়জগতের জ্ঞান অর্জ্জন করিতেছে; সংজ্ঞা প্রত্যক্ষের সাহায্যে অন্তর্জগতের জ্ঞান লাভ করিতেছে; আর, তত্ত্ব প্রত্যক্ষের সাহায্যে আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভ করিতেছে। তৎপরে চিন্তাশক্তি এই প্রকারে লব্ধ-জ্ঞানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া উচ্চাঙ্গের জ্ঞানের সৃষ্টি করিতেছে। কল্পনা প্রভাবে এই উপাদানগুলির এমন সমন্বয় করিতেছি যে, নিত্য নিত্য অভিনব বস্তুর সৃজন হইতেছে। যাহা চোখে দেখি নাই, কানে শুনি নাই, হস্তে স্পর্শ করি নাই এমন বস্তুর উৎপত্তি হইতেছে। সামান্য জ্ঞান প্রভাবে বিরুদ্ধ বস্তু মধ্যেও সাদৃশ্য উপলব্ধি করিয়া জাতিজ্ঞান লাভ করিতেছি। বিচার শক্তির সাহায্যে জাতিজ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বাক্যের সৃষ্টি করিতেছি। আবার যুক্তির সাহায্যে বাক্যের মধ্যে হেতু সম্বন্ধ বাহির করিয়া সত্য অবধারণে প্রবৃত্ত হইতেছি; বর্ত্তমান হইতে দূর ভবিষ্যতের এবং অতি দূর অতীতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছি; জ্ঞাত বিষয় হইতে এতাবৎ অজ্ঞাত বিষয়ের চিন্তা করিতেছি; প্রত্যক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষের বিষয় ভাবিতেছি। যুক্তি মনের সকল শক্তিরই অধিপতি, সকলেরই দর্শক, সকলেরই চালক। তুমি প্রত্যক্ষ করিতেছ—তখনও যুক্তি; তুমি স্মরণ করিতেছ—তখনও যুক্তি; তুমি কল্পনা করিতেছ—তখনও যুক্তি; তুমি বিচার করিতেছ—তখনও যুক্তি; তুমি সত্য সুন্দর এবং মঙ্গলের আদর্শ চিন্তা জনিত বেদনায় বিভোর—তখনও যুক্তি; তুমি বাসনা করিতেছ, ইচ্ছা করিতেছ, কার্য্য করিতেছ—কিন্তু সেখানেও যুক্তি!

পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ।

চিন্তার শারীর অভিব্যঞ্জক।

মানসিক ব্যাপার মাত্রেরই শারীর অভিব্যঞ্জক আছে সুতরাং চিন্তারও কতকগুলি শারীর-অভিব্যঞ্জক দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

পেশী সম্বন্ধীয়	আকুঞ্চিত ভ্রূযুগ অনিমেষ দৃষ্টি সচঞ্চল দর্শনপেশীর সঙ্কোচ মুখাবয়বের যাবতীয় মাংসপেশীর শিথিলতা চক্ষুর্দ্বয়ের অতিরিক্ত বিস্ফারণ পূর্ণ বা অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু নিম্ন চোয়াল ফুলিয়া যাওয়া ভ্রূদ্বয়ের একটির অতিরিক্ত উন্নমন মুখাবয়বের শিথিলতা
শরীর কাণ্ড সম্বন্ধীয়	শিথিল অঙ্গ নিশ্চল গতি শরীরের পূর্ণ বা আংশিক আক্ষেপ
অঙ্গের গতি সম্বন্ধীয়	মস্তক, ললাট এবং নাসিকা কণ্ডূয়ন কেশ স্পর্শন হস্ত দ্বারা ললাট ঘর্ষণ এক বা উভয় হস্তোপরি মস্তক স্থাপন কপোল বা চিবুক ঘর্ষণ সজোরে চক্ষু ঘর্ষণ শিরঃ কম্পন ছন্দানুযায়ী হস্ত বা বাহুভঙ্গি ছন্দানুযায়ী চরণ ভঙ্গি হস্তদ্বারা কর্ণ বিবরদ্বয় দৃঢ়রূপে বদ্ধকরণ

আমি একটি কমলা লেবু দেখিলাম। পরে একটি বাতাবি লেবু

দেখিলাম। আবার একটি পাতি লেবু দেখিলাম। প্রত্যেকরই পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইল। প্রত্যেকেরই স্মৃতি মনোমধ্যে স্থান পাইল। কিন্তু মনোমধ্যে তাহারা পৃথক্ পৃথক্ থাকিতে পারে না। পৃথক্ পৃথক্ লেবুর স্মৃতি মিশিয়া এক হইতেছে। এইরূপে বহুস্মৃতির সমন্বয় হেতু একটি স্মৃতির নাম "সামান্য জ্ঞান"। কুকুর দেখিলাম, গরু দেখিলাম, ছাগল দেখিলাম, হাতী দেখিলাম—প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইল। প্রত্যেকরই স্মৃতি মনোমধ্যে স্থান পাইল। এবং সকলগুলি মিলিয়া একটি স্মৃতিতে পরিণত হইল। এই সম্মিলিত স্মৃতিকে "জন্তু" নামে অভিহিত করিলাম। এইরূপে সম্মিলন কালে ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়। যাহা সাধারণ, যাহা সকলেরই আছে সেইটিই থাকিয়া যায়।

সামান্য জ্ঞান।

কুকুর—ক খ গ ঘ—প্রত্যক্ষজ্ঞান
গরু — ক খ গ ঙ—প্রত্যক্ষজ্ঞান
ছাগল—ক খ ঙ চ—প্রত্যক্ষজ্ঞান
হাতী—ক ঙ চ ছ—প্রত্যক্ষজ্ঞান
→ ক—স্মৃতি।

'ক' পুনঃ পুনঃ স্মৃতিপটে উদয় হইতেছে, সুতরাং পৌনঃপুন্য হেতু 'ক'এর স্মৃতি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতেছে এবং স্থায়ী হইতেছে। অপরগুলি ক্রমশঃ মুছিয়া যাইতেছে। এখন বুঝিলাম যে 'ক' বিশিষ্ট প্রাণী মাত্রেই জন্তু। জন্তু বলিলে এখন কুকুর বা গরু বুঝি না, কিন্তু জন্তু মাত্রেরই একটা ধারণা হয়। জন্তু এই সামান্য কথা হইতে সকল জন্তুরই জ্ঞান হইতেছে। জন্তু জাতিবাচক শব্দ। যে জ্ঞান অবলম্বনে এই জাতিবাচক শব্দ সৃষ্ট সেই জ্ঞানকে সামান্য জ্ঞান বলে।

বালক কুকুর লইয়া খেলা করে। প্রথমে সে যখন একটি কুকুর দেখে তখন তাহার সেই কুকুরটিরই জ্ঞান হয়, কুকুর জাতির কোন জ্ঞান

সামান্য জ্ঞান প্রণালী।

হয় না। পরে যখন তাহার অভিজ্ঞতার প্রসর বৃদ্ধি হয়, যখন অবধান শক্তি প্রবল হয়, তখন নানা প্রকারের কুকুর দেখে। এইরূপে অনেক কুকুর দেখিতে দেখিতে কোন একটি কুকুরের জ্ঞান তাহার থাকে না; অথচ এক অভিনব জ্ঞানের সৃষ্টি হয় যে, জ্ঞানের বলে সে দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট কুকুরেরও ধারণা করিতে পারে। এইরূপ জ্ঞানকে সামান্য জ্ঞান বলে। এই সামান্য জ্ঞানের সাহায্যে একজাতীয় বহু বস্তুর ধারণা সম্ভব হয়।

প্রথমে বালকটি একটি কুকুর দেখিয়া লক্ষ্য করিল—

১। ইহা দৌড়িতে পারে।
২। ইহার চারিটি পা আছে।
৩। ইহা ঘেউ ঘেউ শব্দ করে।
৪। ইহা প্রকাণ্ড।
৫। ইহার বর্ণ পীত।

আর একটি কুকুর দেখিয়া লক্ষ্য করিল—

১। ইহা দৌড়িতে পারে।
২। ইহার চারিটি পা আছে।
৩। ইহাও ঘেউ ঘেউ শব্দ করে।
৪। ইহা প্রকাণ্ড।
৫। ইহার বর্ণ কাল।

এইবার বালকের সন্দেহ উপস্থিত হইল। তবে কি সকল কুকুর এক রকমের নয়? আবার আর একটি কুকুর লক্ষ্যপথে পতিত হইল। এবার সে দেখিল—

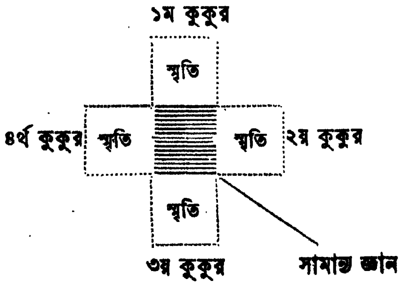
১। ইহা দৌড়িতে পারে।
২। ইহার চারিটি পা আছে।

৩। ইহা ঘেউ ঘেউ শব্দ করে।

৪। ইহা ছোট।

৫। ইহার বর্ণ সাদা।

এইরূপে বহু কুকুর দেখিয়া বালক বুঝিতে পারিল যে কতকগুলি লক্ষণ সকল কুকুরেই আছে; আর কতকগুলি কোনটিতে আছে এবং কোনটিতে নাই। সুতরাং কতকগুলি সাধারণ এবং কতকগুলি অসাধারণ। বালক অনেক কুকুর দেখিয়াছে, কিন্তু সকলেরই সাধারণ এবং অসাধারণ লক্ষণ মনে রাখা সম্ভব নহে। সুতরাং কতকগুলি লক্ষণের বিস্মৃতি অনিবার্য্য। কিন্তু যে লক্ষণ বারংবার স্মৃতিপটে আনীত হয় তাহাদের বিস্মরণ অসম্ভব। সাধারণ লক্ষণগুলি যতবার কুকুর দেখিতেছে ততবারই স্মৃতিপটে আসিতেছে। আর অসাধারণ লক্ষণগুলি কথনও আসিতেছে, আবার কথনও আসিতেছে না। সুতরাং সাধারণ লক্ষণগুলিই মনে থাকে এবং অসাধারণ লক্ষণগুলি ভুলিয়া যায়। এই সাধারণ লক্ষণগুলি অতি সামান্য, কিন্তু এই সামান্য লক্ষণ হইতে সমস্ত কুকুরের বিষয় আমরা ধারণা করিতে পারি। যে বস্তুতে এই সামান্য লক্ষণ বর্ত্তমান তাহাই কুকুর, আর যেথানে ইহার অভাব সেথানে কুকুরেরও অভাব। এই সামান্য লক্ষণ কুকুর জাতি মাত্রের লক্ষণ।



"কুকুর" বলিতে তুমি কোন একটি নির্দ্দিষ্ট কুকুর বুঝিতেছ না। এই কুকুর বা সেই কুকুর বুঝিতেছ না। বুঝিতেছ যে কোন সামান্য গুণ-বিশিষ্ট একটি জন্তু। এই সামান্য জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তুমি কতিপয় কুকুর পর্য্যবেক্ষণ করিলে; তাহাদের গুণাবলি নির্ণয় করিলে, বিশ্লেষণ করিলে, কোন কোন গুণ সকলের আছে, এবং কোনগুলি সকলের নাই, তাহা বিচার করিলে, অসাধারণ গুণগুলি হইতে সাধারণ গুণগুলিকে মনে মনে পৃথক্ করিয়া লইলে—উহাদিগকে নিঃসঙ্গ করিলে, পরে সাধারণ গুণগুলিকে একত্রীভূত করিয়া তাহাতে "কুকুর" নাম আরোপ করিলে। অতএব সামান্য-জ্ঞান লাভের এই কয়টি মানসিক প্রক্রিয়া—

সামান্য-জ্ঞান প্রকরণ।

১। পর্য্যবেক্ষণ।

২। বিশ্লেষণ।

৩। বিচার।

৪। নিঃসঙ্গীকরণ (অসাধারণ লক্ষণ বাদ দিয়া সাধারণ লক্ষণ চিন্তন)।

৫। সাধারণ লক্ষণ একত্রীকরণ।

৬। একত্রীভূত লক্ষণের নামকরণ।

এই প্রকার সামান্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যায় না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সংবিত্তির আবশ্যক। এখানে সংবিত্তির একান্ত অভাব। এরূপ জ্ঞানকে স্মৃতবস্তুও বলিতে পারি না, কারণ স্মৃতি প্রত্যক্ষের প্রতিকৃতি মাত্র। সামান্য জ্ঞানের অনুরূপ কোন স্বরূপ পদার্থ বাহ্যজগতে থাকিলেও তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব নহে। অবশ্য বহু স্মৃতির সমবায়ে এই সামান্য জ্ঞানের উদ্ভব হইতেছে সত্য, কিন্তু এই সামান্য জ্ঞান কোন একটিও স্মৃতির মত নহে। এই সামান্য জ্ঞান কোন স্মৃতিরই

প্রত্যক্ষ, স্মৃতি এবং সামান্য জ্ঞানের সম্বন্ধ।

অবিকল প্রতিকৃতি নহে। ইহাকে কল্পনাও বলা যাইতে পারে না; কারণ কল্পনায় উপকরণের আবশ্যক। পৃথক্ জাতীয় নানা বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে কল্পনার উপকরণ সংগৃহীত হয়; কিন্তু একজাতীয় পৃথক্ বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে সামান্য জ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। কল্পনা এবং সামান্য জ্ঞান এই দুইএরই উপকরণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান সরবরাহ করিয়া থাকে। কিন্তু কল্পনার উপকরণের মধ্যে পার্থক্য প্রবল এবং সামান্য জ্ঞানের উপকরণের মধ্যে সাদৃশ্যই অধিক।

সামান্য জ্ঞান

স্মৃতি

প্রত্যক্ষ

সংবিত্তি

সামান্য জ্ঞানের মূলভিত্তি সংবিত্তি। সংবিত্তি হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে স্মৃতি এবং স্মৃতি হইতে সামান্য জ্ঞানের উদ্ভব হইতেছে। সামান্য জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এক জাতীয় বহুবস্তুর স্মৃতি প্রয়োজন, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত স্মৃতি এবং সংবিত্তি ব্যতীত প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব নহে। কোন একটি বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা স্মৃতি সম্ভব, কিন্তু এককালে একজাতীয় বহুবস্তুর জ্ঞানকে স্মৃতি বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যায় না।

প্রত্যক্ষ বস্তু	স্মৃতি	সামান্য জ্ঞান
অবলম্বন—সংবিত্তি	অবলম্বন—সংবিত্তি	অবলম্বন—স্মৃতি
প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	অতি পরোক্ষ
উপস্থিত বস্তুর জ্ঞান	অনুপস্থিত বস্তুর জ্ঞান	একজাতীয় বহু বস্তুর জ্ঞান
"বাস্তব"	"চিচ্ছায়া"	"চিহ্ন"

বালক দেখিল তাহার পিতার কেশ এবং শ্মশ্রু দীর্ঘ এবং কৃষ্ণবর্ণ। বালক এখন তাহার পিতাকে 'বা' (বাবা) বলিতে শিখিয়াছে। বালক ঐ প্রকার কেশ এবং শ্মশ্রু-বিশিষ্ট অপর লোক দেখিলেও তাহাকে 'বা' বলিয়া থাকে। বালক তাহার বাড়ীতে অনেক লোকই দেখিতে পায় এবং অনেক লোকের মধ্যে যাহার কেশ এবং শ্মশ্রু দীর্ঘ এবং কৃষ্ণবর্ণ তাহাকেই 'বা' বলিয়া থাকে এবং ঐরূপ কেশ এবং শ্মশ্রু-বিশিষ্ট অন্য লোক দেখিলেও 'বা' বলিয়া হাত তুলিয়া তাহার কোলে যাইতে চাহে। বালকের হয়ত মনে হইতেছে যে দীর্ঘ শ্মশ্রু-বিশিষ্ট মানুষই 'বা'। বালকের পিতার এমন অনেক গুণ আছে যাহা অপরের নাই। কিন্তু বালক এখন নিতান্ত শিশু, সুতরাং সেই গুণগুলি বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার শক্তির অধিকারী সে এখনও হইতে পারে নাই। সেই জন্য বালকের ভ্রম হইতেছে। তবে বালকের সামান্য জ্ঞান লাভের সূচনা দেখা দিয়াছে। তাহার পরিবারস্থ বহু লোকের মধ্যে সে এমন একটি লক্ষণ বাছিয়া লইতে পারিয়াছে যাহা তাহার পিতা ব্যতীত অপর কাহারও নাই। বালকেরা অপর স্ত্রীলোককেও নিজের মা বলিয়া ভুল করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু সে ভুল কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। বালক তাহার মাতার প্রতি অধিক আকৃষ্ট; সুতরাং তাহার মাতার বিষয় যত মনোযোগপূর্ব্বক প্রণিধান করিয়া থাকে পিতার বিষয় তত করে না। অনেকেই তিমিকে মৎস্য বলিয়া থাকে। তাহার কারণ মৎস্য জলজন্তু-তিমিও জলজন্তু। তিমি মৎস্য-জাতীয় বটে কি না দেখিতে হইলে ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত; দেখা উচিত যে তিমির সহিত মৎস্যের সাদৃশ্য অধিক কি বৈসাদৃশ্য অধিক। কিন্তু সেরূপ পর্য্যবেক্ষণের সুযোগ অনেকেরই ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং জলে বাস করাটাই মৎস্যজাতির সাধারণ গুণ বলিয়া মনে করিয়া লয়। আমরা

অস্পষ্ট সামান্য জ্ঞানের হেতু।

পয়সা গোল, ডিম্ব গোল, লেবু গোল, বৃত্ত গোল, ছড়িটিও গোল বলিয়া থাকি। এখানে 'গোল' কথাটি বড়ই অসতর্ক ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে এবং অনেক স্থলেই আমরা এই প্রকার অসংযত ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকি। পয়সা, ছড়ি, ডিম্ব, লেবু প্রভৃতিকে যথাযথ পর্য্যবেক্ষণ করা হয় নাই, তাহাদের সদৃশ এবং বিসদৃশ গুণাবলির সম্যক্ বিশ্লেষণ করা হয় নাই; অসাধারণ গুণ হইতে সাধারণ গুণগুলি বাছিয়া লওয়া হয় নাই এবং অবশেষে এই সাধারণ গুণের সমন্বয়কে 'গোল' বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। অতএব অসংযত ভাষা এই অস্পষ্ট সামান্য জ্ঞানের হেতু। সামান্য জ্ঞান স্মৃতি-শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং স্মৃতি-শক্তি দুর্ব্বল হইলে কিংবা সময়ের ব্যবধান হেতু স্মৃতির লোপ হইলে সামান্য জ্ঞান সুস্পষ্ট হইতে পারে না। অতএব—

অস্পষ্ট সামান্য জ্ঞানের হেতু— { অপরিস্ফুট প্রত্যক্ষ, অসম্যক পর্য্যবেক্ষণ, অসংযত ভাষা, সময়ের ব্যবধান, স্মৃতিশক্তির অভাব, অসম্পূর্ণ নিঃসঙ্গীকরণ }

- অপরিস্ফুট প্রত্যক্ষ
- অসম্যক পর্য্যবেক্ষণ
- অসংযত ভাষা
- সময়ের ব্যবধান
- স্মৃতিশক্তির অভাব
- অসম্পূর্ণ নিঃসঙ্গীকরণ

সামান্য জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর মানসিক বৃত্তিনিচয় স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া থাকে। সামান্য জ্ঞান নানা প্রকার মানসিক ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যক্ষ, অবধান, বিশ্লেষণ, স্মৃতি, যুক্তি, বিচার প্রভৃতি বহুবিধ ক্রিয়ার প্রয়োজন। অতএব সামান্য জ্ঞানের ঔৎকর্ষ্য সাধন করিলে, অপরগুলিও অল্প বিস্তর ঔৎকর্ষ্য লাভ করিয়া থাকে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা কত শত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি, কত শত বিষয়ের

সামান্য জ্ঞানের উপকারিতা।

জ্ঞান লাভ করিতেছি কিন্তু এই প্রত্যেকটিই যদি আমাদিগকে পৃথক্ ভাবে মনে রাখিতে হইত তাহা হইলে আমাদের মন একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত। জ্ঞানের প্রকাশ বা বিস্তার সম্ভব হইত না। কিন্তু সামান্য জ্ঞান ভাবসমূহের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করিতেছে। ভাবসমূহের শ্রেণী বিভাগ করিতেছে; অসামান্য গুণগুলি বাদ দিয়া সামান্য গুণগুলি গ্রহণ করিতেছে। অসামান্য গুণগুলির বিয়োগ হেতু স্মৃতির কার্য্য সহজ হইতেছে; অন্য ভাব গ্রহণের পথ প্রশস্ত হইতেছে; জ্ঞানের বিস্তার ইতেছে। সামান্য জ্ঞান হইতে আমারা ভবিষ্যৎ এবং অতীতকে বর্ত্তমানে চিন্তা করিতে পারি; জ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত বিষয়ের অনুমান করিতে পারি। সামান্য জ্ঞানের উপর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ জ্ঞানই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। বিজ্ঞান পৃথক্ পৃথক্ বস্তু পর্য্যবেক্ষণ এবং আলোচনার পর সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে। সামান্য জ্ঞান ব্যতীত শ্রেণী বিভাগ বা নিয়ম প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।

"বহুরে যা এক করে; বিচিত্রেরে করে যা সরস;—
প্রভূতেরে করি, আনে নিজ ক্ষুদ্র তর্জ্জনীর বশ।"

অবগতির ও ইহার উপাদান।

বালক ক্রীড়াশীল
কুকুর গৃহপালিত পশু
মেষ হিংস্র জন্তু নহে

এই বাক্য কয়টি নিম্নলিখিত প্রকারে বিশ্লেষণ করা যায়—

ইহারা এক-একটী পদ	বালক	হয়	ক্রীড়াশীল	ইহারা এক-একটী পদ
	কুকুর	হয়	গৃহপালিত পশু	
	মেষ	নয়	হিংস্রক জন্তু	
	উদ্দেশ্য	সংযোজক	বিধেয়	

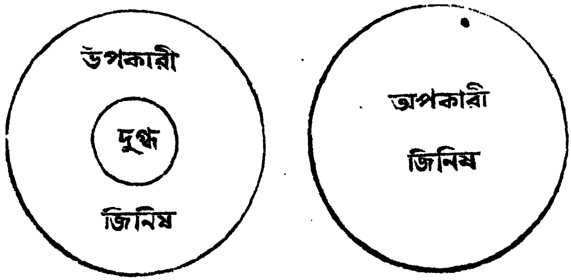
"যে পদের উদ্দেশে অপরটির অন্বয় কিংবা নিষেধ করা হয়, সেইটিকে উদ্দেশ্য বলে। এবং উদ্দেশ্যের সহিত যে পদটির অন্বয় কিংবা নিষেধ করা হয়, সেই পদটিকে বিধেয় বলে। যে শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্যের সহিত বিধেয়ের অন্বয় কিংবা নিষেধ করা হয়, তাহাকে সংযোজক বলে।"

আমরা যখন বলি "কুকুর গৃহপালিত পশু" তখন "কুকুর" এবং "গৃহপালিত পশু" এই দুইটি প্রত্যয়ের সম্বন্ধে জ্ঞান প্রকাশ করি। এইরূপ সম্বন্ধ জ্ঞানরূপ মানসিক ক্রিয়াকে অবগতি বলে। এবং যখন এই মানসিক সম্বন্ধ জ্ঞানকে ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তখন ইহাকে বাক্য বলে।

বাক্য	অবগতি
১। উদ্দেশ্য	১। } দুইটি প্রত্যয়
২। বিধেয়	২। }
৩। সংযোজক	৩। তাহাদের সম্বন্ধ

দুইটি প্রত্যয়ের স্বরূপতা (স্বরূপ সম্বন্ধ) বা বিরূপতা জ্ঞানের নাম অবগতি।

এখানে "ক" এবং "খ" দুইটি সরল রেখা। এই রেখাদ্বয় তুলনা করিয়া আমি মীমাংসা করিলাম যে "ক" "খ" অপেক্ষা ছোট।



"দুগ্ধ বড়ই উপকারী জিনিষ" যখন আমার এইরূপ অবগতি হয় তখন যেন আমি সমস্ত জিনিষকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া ফেলি—উপকারী জিনিষ এবং অপকারী জিনিষ। আমি দুগ্ধকে উপকারী এবং অপকারী জিনিষের সহিত তুলনা করি এবং পরে আমার এই মীমাংসা হয় যে অপকারী জিনিষ অপেক্ষা উপকারী জিনিষের সহিত দুগ্ধের সাদৃশ্য অধিক। অতএব তুলনা এবং মীমাংসা এই দুইটি অবগতির প্রক্রিয়া।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে আমরা এক একটি বস্তুর জ্ঞান লাভ করি। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বিশেষ প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়। সামান্য জ্ঞান হইতে একজাতীয় বহু বস্তুর জ্ঞান হয়। সামান্য জ্ঞান হইতে সাধারণ প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়। দুইটি বিশেষ প্রত্যয়ের অথবা দুইটি সাধারণ প্রত্যয়ের অথবা একটি বিশেষ এবং একটি সাধারণ প্রত্যয়ের সম্বন্ধ নিরূপণ অবগতির কার্য্য। অতএব প্রত্যক্ষ এবং সামান্য জ্ঞান হইতে অবগতির উপকরণ পাওয়া যায়।

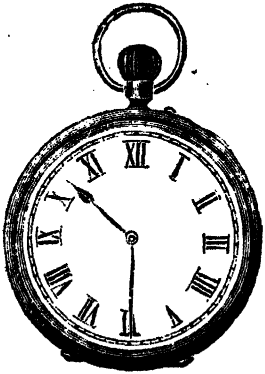
অবগতি, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এবং সামান্য জ্ঞানের সম্বন্ধ।

অবগতি ব্যতীত প্রত্যক্ষ জ্ঞান অসম্ভব; কারণ তুলনা এবং মীমাংসার পরিণামই প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং তুলনা এবং মীমাংসারূপ প্রক্রিয়াকেই অবগতি বলে। একটি শব্দ শুনিয়া বলিলে "কলেজের ঘণ্টা বাজিতেছে"—তোমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইল কিন্তু অবগতি ব্যতীত এ জ্ঞান অসম্ভব। যখন শব্দ শুনিলে তখন বর্ত্তমান শব্দটি অন্য শব্দের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে যে ইহা ঘড়ির শব্দের মত, অন্য শব্দের মত নহে; আরও বুঝিলে যে এই শব্দ তোমার

পূর্ব্বশ্রুত কলেজের ঘড়ির শব্দের মত। অতএব মীমাংসা করিলে যে এটিও কলেজের ঘড়ির শব্দ। অবগতি ব্যতীত সামান্য জ্ঞানও অসম্ভব, কারণ তুলনা এবং মীমাংসার দ্বারাই সাধারণ লক্ষণ নির্ণীত হয়। একজাতীয় বহুবস্তু পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়; পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর লক্ষণাবলি বিশ্লেষণ করিতে হয়। বিশ্লিষ্ট লক্ষণাবলির তুলনা করিয়া সাধারণ লক্ষণের মীমাংসা করিতে হয়। এক কথায় বলিতে হইলে প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়াতেই সমস্ত মানসিক ক্রিয়াগুলি বর্ত্তমান। সকলেই এক মনের ক্রিয়া, আমরা কেবল চিন্তা বলে তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ভাবিয়া থাকি।

দুষ্ট অবগতির হেতু।

দুইটি প্রত্যয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করা অবগতির কার্য্য, সুতরাং প্রত্যয় অস্পষ্ট হইলে অবগতিও অস্পষ্ট হইবে। প্রত্যয়গুলি সংখ্যায় যত বেশী হইবে এবং যত সুস্পষ্ট হইবে অবগতিও তত প্রমাদশূন্য হইবে। বালক বালিকাদের প্রত্যয়-গুলি তত স্পষ্ট নহে, সংখ্যাতেও কম; সেই জন্য তাহাদের বিচারও দোষশূন্য হয় না। দুইটি প্রত্যয়ের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইলে কিঞ্চিৎ সময়ের প্রয়োজন, সুতরাং সময়ের অভাব হইলেও অবগতি ভুল হইতে পারে। প্রথমবারে যাহা সত্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, দ্বিতীয়বারে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। অন্যের কথায় অযথা আস্থা স্থাপন করিলেও অনেক সময় ভ্রমে পতিত হইতে হয়। অনুভূতির প্রাবল্য অনেক সময়ে যথার্থ অবগতির অন্তরায় হইয়া থাকে। আমি যাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি সে মন্দ করিলেও ভাল বলিয়া বোধ হয়; আমি যাহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করি, তাহার ভাল কাজও মন্দ বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্ব হইতে কোন ধারণার বশবর্ত্তী হইলে অবগতির ক্রিয়া নির্দ্দোষ না হইতে পারে।



তোমাকে আজ ১১৷৷০টার সময় কলেজ যাইতে হইবে। তোমার ঘড়িটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তুমি সময় ঠিক করিতে পারিতেছ না। কিছুক্ষণ পরে কাছারির ঘড়ির শব্দ শুনিতে পাইলে। কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় কয়টা বাজিল তাহা তোমার গণনা করা হইল না কিন্তু তোমার মনে হইল ১১টা বাজিল। তাড়াতাড়ি আহারাদি সমাপন করিয়া কলেজে ছুটিলে। কলেজে যাইয়াই ঘড়ির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে। প্রথমেই তোমার মিনিটের কাঁটার দিকে নজর পড়িল। দেখিলে উক্ত কাঁটাটি ৬এর দাগে আছে। বাড়ীতে তোমার বিশ্বাস হইয়াছিল ১১টা বাজিয়াছে আবার এখন দেখিলে যে মিনিটের কাঁটাটি ৬এর দাগে। সুতরাং তোমার আর সন্দেহ থাকিল না। ১১৷৷০টা বাজিয়াছে তোমার এই অবগতি হইল। তুমি আর কালবিলম্ব না করিয়া তোমার গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলে কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিলে শিক্ষক মহাশয় তখনও আসেন নাই, অন্যান্য ছাত্রেরাও আসে নাই। তুমি সে স্থান ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিলে। তোমার মনে সন্দেহ হইল। পুনরায় ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে। পূর্ব্বে ছোট কাঁটাটির দিকে তাকাও নাই; এখন তাকাইলে। দেখিলে ১১৷৷০টা নয়—মাত্র ১০৷৷০টা বাজিয়াছে। বুঝিতে পারিলে তোমার পূর্ব্ব অবগতিতে ভুল ছিল। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান নির্ভুল না হইলেও অবগতি প্রমাদশূন্য হইতে পারে না। সাপে অনেক সময় রজ্জু ভ্রম হয়। অন্ধকার রাত্রিতে আকন্দ-বৃক্ষ ভূত বলিয়া মনে হয়। প্রত্যক্ষ নির্দ্দোষ নহে বলিয়া অবগতিও নির্দ্দোষ নহে। আবার দাসী

মাত্রেই স্ত্রীলোক, রাণী মাত্রেই স্ত্রীলোক অতএব রাণীমাত্রেই দাসী। এখানে অবগতি ভুল, কারণ যুক্তি ভুল। অনেকেই মনে করে যে, জল সকল অবস্থাতেই তরল কারণ তাহারা কখনও বরফ দেখে নাই। তাহাদের মনে জল এবং তরল পদার্থ এই দুইএর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সঙ্গ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া তাহারা জলের অন্য অবস্থা মনে করিতে পারে না। সুতরাং এখানে নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ এই ভুল অবগতির কারণ। অতএব—

দুষ্ট অবগতির কারণ। {
- অস্পষ্ট প্রত্যয়।
- সময়ের অপ্রাচুর্য্য।
- অন্যের মতে অযথা আস্থা।
- অনুভূতির প্রাবল্য।
- দুষ্ট প্রত্যক্ষ।
- দুষ্ট যুক্তি।
- অবিচ্ছেদ্য সঙ্গ।

জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হইতেই বিচার শক্তির বিকাশ হয়। যেখানে জ্ঞান সেইখানে বিচার। বৈসাদৃশ্যানয়ন ব্যতীত জ্ঞান থাকে না। তুলনা এবং মীমাংসা ব্যতীত বৈসাদৃশ্য নিরূপিত হয় না। সুতরাং যখনই জ্ঞানের বিকাশ তখনই বিচারশক্তিরও বিকাশ।

অবগতির বিকাশ।

জীবনের প্রথম অবস্থায় ভাষার অভাব বলিয়া বিচারশক্তিরও অভাব মনে করা ভুল। কথা কহিবার বহুপূর্ব্বে বিচার করিবার ক্ষমতা আসিয়া থাকে। অবশ্য ভাষা অবগতির প্রকাশক। ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিচারশক্তিরও উন্নতি অনুমিত হয়। বালক প্রথমে ভাবে, পরে বলে। প্রথমে 'কুকুর' ভাবিয়া লয়; পরে বলে "কুকুল"; তার পর হয়ত বলে "কুকুল-পা" এবং অবশেষে "কুকুলের পা আথে।" ভাষা বিচার

শক্তির চিহ্ন হইলেও এ চিহ্নকে অভ্রান্ত মনে করা উচিত নয়। বালকেরা অনুকরণপ্রিয়, সুতরাং অনুকরণ করিয়া জ্ঞানীর মত কথা বলিলেও জ্ঞানীর মত উহাদের বিচার শক্তি নাই। বিচার শক্তির যতই উন্মেষ হয়, জ্ঞানেরও ততই বিকাশ হয়। যাহা প্রথমে অস্পষ্ট তাহা পরে সুস্পষ্ট হয়। মনে কর মাকড়শা সম্বন্ধে তোমার বিশেষ জ্ঞান নাই। তবে তুমি এইমাত্র জান যে—

১। ইহা একটি কদর্য্য জীব।

২। ইহা জাল প্রস্তুত করিতে পারে।

পরে এই জন্তুটিকে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে এবং ইহার সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিষয় অবগত হইলে—

৩। ইহার আটটি পা আছে।

৪। ইহার শরীর দুই অংশে বিভক্ত।

৫। ইহার পালক নাই।

এইরূপে যতই তোমার অবগতির সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে, ততই মাকড়শা সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান পরিস্ফুট হইবে।

মন নানাবিধ প্রত্যয়ের আধার। প্রত্যয়গুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। একটি অপরটির সহিত সহজেই মিলিত হয়। 'সম্পূর্ণ' 'অংশ' এবং 'বৃহৎ' এই তিনটি প্রত্যয়। যাহার এই প্রত্যয় তিনটির জ্ঞান আছে সেই ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হইবে। সে মনে করিতে পারিবে "অংশ অপেক্ষা সম্পূর্ণ বৃহৎ"। "অংশ" এবং "বৃহৎ" এই দুইটি প্রত্যয়ের ধারণা না করিয়া "সম্পূর্ণের" ধারণা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। মনে কর "জননী" "কন্যা" এবং "ভালবাসা"—এই তিনটি প্রত্যয়ের তোমার ধারণা আছে। সুতরাং এই

প্রত্যয় সমূহের সম্বন্ধ-নিরূপণ একেবারে ইচ্ছাধীন নহে।

তিনটি প্রত্যয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তুমি একটি বাক্য সৃষ্টি করিতে পার, যথা "জননী কন্যাকে ভালবাসে"। কিন্তু 'জননী' এবং 'কন্যা' উভয়কেই যদি ভালবাসার পাত্র করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে একটি নূতন 'উদ্দেশ্য' খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। মনে কর এই নূতন "উদ্দেশ্যটি" 'মানুষ' কিংবা "জ্ঞানী মানুষ"। এখন তুমি বলিতে পার "জ্ঞানী মানুষ জননী এবং কন্যাকে ভালবাসে"। এই নূতন উদ্দেশ্যটি পাইবার জন্য "মানুষের" কথা কেন ভাবিলে ? আতা কিংবা পয়সার কথা কেন ভাবিলে না ? আতা কিংবা পয়সাকে 'উদ্দেশ্য' বলিয়া গ্রহণ করিলে বর্ত্তমান প্রত্যয়গুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হইত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন নহে। সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রত্যয়গুলির মধ্যে সম্বন্ধ আনয়ন করিতে হইলে প্রত্যয়গুলির স্বাভাবিক সম্বন্ধের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

অতএব প্রত্যয়গুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষমতা থাকিলেও আমাদের অধিকার নাই। যদি ক্ষমতার অপব্যবহার কর সত্যের অপলাপ হইবে। প্রত্যয়ের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবে উহাদের ধারণা যতই প্রবল এবং স্পষ্ট হইবে ততই তাহাদের প্রকৃতিগত সম্বন্ধ নির্ণয়ে সমর্থ হইব। বর্ত্তমান হইতে অতীতের এবং ভবিষ্যতের কথা জানিতে পারিব। আমরা সকলেই জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। এই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক। যখন নূতন অবস্থার মধ্যে পতিত হই, তখন পুরাতন প্রথা কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে করি না। পুরাতনকে পরিহার পূর্ব্বক নূতনকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করি।

যুক্তি।

"ভাঙ্গিতেছে পুরাতন গড়িছে নূতন,
জগতের নীতি এই মহা বিবর্ত্তন।"

সুপ্ত প্রত্যয়সজ্ঘকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহার সাহায্যে নূতন অবস্থাতেও জয়লাভে প্রয়াস পাইয়া থাকি। এইরূপে পুরাতনের সাহায্যে নূতনের সম্মুখীন হইতে হইলে যে শক্তির আশ্রয় লইতে হয় তাহার নাম যুক্তি। যুক্তি বলে নূতন প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয় না কিন্তু পুরাতন প্রত্যয়ের সাহায্যে নূতন জ্ঞানের বিকাশ হয়। সকল মানুষ মরে, যদু মানুষ, অতএব যদু মরিবে। এখানে কোন প্রত্যয়টি নূতন নহে—কিন্তু যদু মরিবে এ জ্ঞানটি নূতন। অথবা রাম মরিয়াছে, শ্যাম মরিয়াছে, যদু মরিয়াছে অতএব সকল মানুষই মরিবে। এখানেও পুরাতনের সাহায্যে নূতনের সৃষ্টি হইল।

মানুষ সতত জ্ঞানান্বেষণে রত। জ্ঞানের যতই বিস্তৃতি হউক না কেন আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে না। যতই জানি না কেন, তৃপ্তি কিছুতেই হইবে না। যাহা জানি না তাহা জানিতে চাই। যাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান অসম্ভব তাহার আনুমানিক জ্ঞান লাভে সচেষ্ট। আমরা বর্ত্তমানে আবদ্ধ থাকিতে পারি না। বর্ত্তমানকে ভেদ করিয়া অতীতে এবং ভবিষ্যতে যাইতে চাই। যে মানসিক ক্রিয়ার সাহায্যে জ্ঞাতপূর্ব্ব সম্বন্ধ হইতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব সম্বন্ধ নিরূপিত হয় তাহাকে যুক্তি বলে।

বিংশ অধ্যায়

অনুভূতি।

বেদনা কাহাকে বলে।

বাহ্যশক্তি ইন্দ্রিয়গ্রামের উপর আঘাত করিতেছে। ঐ আঘাত মস্তিষ্কে পরিচালিত হইয়া মস্তিষ্কের চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতেছে। এই মস্তিষ্ক চাঞ্চল্যের উপর মানসিক প্রতিক্রিয়ার নাম সংবিত্তি। এই সংবিত্তির ক্রিয়া কেবল ইন্দ্রিয় গ্রামেই আবদ্ধ নহে। ইহা সমস্ত শরীর যন্ত্রব্যাপী। বাহ্যশক্তি ইন্দ্রিয় গ্রামের ভিতর দিয়া মস্তিষ্কে উপনীত হইয়া মনকে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সমস্ত শরীর-যন্ত্রটি কি একেবারে নিষ্ক্রিয় থাকে? একেবারে নির্লিপ্ত থাকে? উদ্বোধক যে কেবল ইন্দ্রিয় গ্রাম বিশেষের এবং মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকে তাহা নহে, ইহা হইতে যাবতীয় শরীর-যন্ত্রেরও কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। শরীর যতক্ষণ সজীব ততক্ষণ সংবিত্তি; যতক্ষণ শরীর-যন্ত্রে জীবনী-শক্তি বর্ত্তমান, ততক্ষণই মানুষ সজীব। এই জীবনী-শক্তির অনবরত হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে। সংবিত্তি মাত্রেই সমস্ত শরীর যন্ত্রটির স্থৈর্য্য নষ্ট করিয়া দেয়—হয় ইহার জীবনী-শক্তিকে বৃদ্ধি করে, না হয় ক্ষয় করে। অতএব বাহ্যশক্তি হইতে ইন্দ্রিয়গ্রামের পরিবর্ত্তন হইতেছে, মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তন হইতেছে, মনের পরিবর্ত্তন হইতেছে—সমস্ত শরীরের পরিবর্ত্তন হইতেছে। ইন্দ্রিয় বিশেষের পরিবর্ত্তন হইতেছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ শরীর-যন্ত্রটির

পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ইন্দ্রিয় পরিবর্ত্তন হইতে সংবিত্তি এবং সম্পূর্ণ শরীর-যন্ত্রটির পরিবর্ত্তন হইতে বেদনা হইতেছে। সংবিত্তি শরীরের অংশ বিশেষে আবদ্ধ কিন্তু বেদনা সমস্ত শরীর ব্যাপী।

"পথ ধূলি হ'তে বুকে তুলি' তারে
ভাবে কবি বিস্মিত—
একি কূল-ভাঙ্গা ভাবের প্লাবন!
জীবন উন্মথিত।"

সংবিত্তির শ্রেণীবিভাগ সম্ভব কিন্তু বেদনার শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নহে। সংবিত্তির চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি অনেকগুলি ইন্দ্রিয় আছে—কিন্তু বেদনার একটি মাত্র ইন্দ্রিয়। এ ইন্দ্রিয় শরীরের কোন অংশ বিশেষে নহে, কিন্তু সমস্ত শরীরটিই ইহার ইন্দ্রিয়। এই শরীর-ইন্দ্রিয়ের ক্ষয় বৃদ্ধিরূপ দুইটি ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং বেদনার দুইটি-মাত্র গুণ থাকা সম্ভব। শরীরযন্ত্র ক্রিয়ার সহায় জ্ঞানে সুখের বেদনা হয় এবং অন্তরায় জ্ঞানে দুঃখের বেদনা হয়। অতএব সুখ এবং দুঃখ এই দুইটি বেদনার গুণ। এই সুখ কিংবা দুঃখকে একেবারেই বিশ্লেষণ করা যায় না—ইহা আদৌ জটিল নহে।

সংবিত্তি ও বেদনার পার্থক্য।

সংবিত্তি এবং বেদনার মধ্যে পার্থক্য আছে। সংবিত্তি শরীর অংশ সম্ভূত, বেদনা সমস্ত শরীর সম্ভূত। সংবিত্তি একবারে আমার নিজস্ব সম্পত্তি নহে কিন্তু বেদনা সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব সম্পত্তি। নীল আকাশে দৃষ্টিপাত করিলাম, আমার আনন্দ হইল। এখানে নীলবর্ণ আমার সংবিত্তি এবং আনন্দ আমার বেদনা। মনে হয় যেন নীলবর্ণটি আকাশে আছে, আর আনন্দটি আমাতে আছে। মনে হয় উত্তাপ অগ্নিতে আছে এবং উত্তাপজনিত সুখ আমাতে আছে। অবশ্য বিজ্ঞানের

কথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, নীলবর্ণের সংবিত্তি, উত্তাপের সংবিত্তি এবং সুখের বেদনা সকলই আমার মনে আছে—সকলই আমার মনের অবস্থা মাত্র। কিন্তু সচরাচর আমরা মনে করি একটি বাহিরে আর একটি অন্তরে। প্রকৃতপক্ষে দুইই অন্তরে। কিন্তু তাহা হইলেও একটি বাহিরে আর একটি অন্তরে এমন কথা মনে হয় কেন? অতএব মানিয়া লইতে হইবে যে এই দুইএর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। যখন উদ্বোধক মনুষ্য-শরীরান্তর্গত নহে তখনই যে এই পার্থক্য লক্ষিত হয় এমন নহে। উদ্বোধক শরীরান্তর্গত হইলেও কিছু না কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। দন্তের পীড়া হইলে যন্ত্রণা অপেক্ষা যন্ত্রণাজনিত অশান্তি যেন আমার অধিক নিজস্ব বলিয়া বোধ হয়। 'যন্ত্রণা' দন্তের মূলদেশের, আর 'অশান্তি' আমার—'যন্ত্রণা' দন্তে আর 'অশান্তি' আমাতে। সংবিত্তি এবং বেদনা দুইটিই মনের অবস্থা-তবে বেদনা অপেক্ষা সংবিত্তি অধিক বস্তুবিষয়ক, এবং সংবিত্তি অপেক্ষা বেদনা অধিক মন-বিষয়ক। শরীরের কোন বিশেষ অংশে সংবিত্তির স্থিতি বলিতে পারা যায়, কিন্তু বেদনার স্থিতি সমস্ত সংজ্ঞাক্ষেত্র ব্যাপী। দন্তপীড়ায় যন্ত্রণার স্থিতি দন্তে, শরীরের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশে, কিন্তু যন্ত্রণাজনিত অশান্তি বর্ত্তমান সমস্ত অভিজ্ঞতাটুকু একবারে ছাইয়া ফেলে—সংজ্ঞাক্ষেত্রের যতটুকু বিস্তৃতি ইহারও বিস্তৃতি ততটুকু। সংবিত্তিকে প্রদেশান্তর্গত করিতে পারা যায় কিন্তু বেদনা সমস্ত সংজ্ঞাব্যাপী। আবার অভ্যাস বলে বেদনার লোপ হইতে পারে কিন্তু সংবিত্তির লোপ হয় না। তুমি আজন্ম জনতাপূর্ণ কোলাহলপূর্ণ বৃহৎ নগরীতে লালিত-পালিত হইয়াছ। তুমি কখনও প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্য দেখ নাই। আজ তুমি সামান্য একটি পল্লীগ্রামে আসিয়াছ। এখানে যাহা দেখিতেছ তাহাই তোমার নিকট নূতন, তাহাই তোমার নিকট প্রীতিপ্রদ। তুমি দেখিতেছ—

"বাতাস এসে মধুর হেসে
খেল্‌ছে লুকোচুরি
কাঁপছে পাতা দুলছে লতা
হাসছে ফুলের সারি।
কোথা হ'তে গন্ধটুকু
আসছে ভেসে ধীরি।
ও পারেতে শরষে ক্ষেতে
হলদে বিছানায়,
ঝিকি মিকি কি ও দেখি
ঝলসে আঁখি যায়।
নড়ি হাতে গোপাল সাথে
সাধের ভাষাণ গানে,
রাখাল কত যাচ্ছে দেখ
চেয়ে আকাশ পানে।
ঘোমটা মুখে কলসী কাঁকে
গ্রামের মাঝ হ'তে
বৌ-ছুটিতে যাচ্ছে চলে
বাঁকা সরু পথে।
নীল আকাশে ধীর বাতাসে
পাখী লাখে লাখে
ছড়িয়ে ডানা কোন্ দেশেতে
যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে।"

এখানে তুমি যাহা দেখিতেছ তাহাই তোমাকে ভাল লাগিতেছে, তাহাতেই তুমি আমোদ পাইতেছ। কিন্তু গ্রামবাসীরাও ঐ সব জিনিষ

দেখিতেছে কিন্তু তোমার মত কি তাহাদের আমোদ হইতেছে? তুমি যদি এখানে কিছুদিন অবস্থান কর তবে তুমিও কি এমনি আনন্দ উপভোগ করিবে? তখনও সেই ফুল, সেই গন্ধ, সেই ক্ষেত, সেই রাখাল, সেই গান, সেই সমস্তই থাকিবে, তবুও তোমার তেমনি আনন্দ কেন থাকিবে না? তখন তুমিই বলিবে—

"তখন ছিলাম যেই,
এখনও আছি সেই,
সেই শারদীয় নিশা, সেই উষা হায়!
শুধু নাই সে উল্লাস।"

এখানে সেই সংবিত্তি আছে কিন্তু সেই বেদনা নাই। পুনঃপুনঃ একই বস্তুর সংবিত্তি হইলে তৎসম্পর্কীয় বেদনার লোপ হয়। আরও, সংবিত্তি অবধানান্তর্গত কিন্তু বেদনা অবধান বহির্ভূত। সংবিত্তিকে যতই অভিনিবেশপূর্ব্বক প্রণিধান করা যায় ততই ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; কিন্তু বেদনা অবধান করিতে চেষ্টা কর, দেখিবে বেদনা অন্তর্হিত হইয়াছে। তুমি একখানি সুন্দর আলেখ্য দেখিতেছ এবং আনন্দ উপভোগ করিতেছ। যতক্ষণ তোমার দৃষ্টি আলেখ্যে ততক্ষণ তোমার আনন্দ, ততক্ষণ তোমার বেদনা। বেদনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে বেদনা বিলীন হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টি যতক্ষণ বহির্মুখী ততক্ষণ আনন্দ কিন্তু দৃষ্টি যখন অন্তর্মুখী আনন্দ তখন অন্তর্হিত। যদি তুমি আলেখ্যে চক্ষু সমর্পণ করিয়া আলেখ্য-সমুৎপন্ন বেদনার প্রণিধান মানসে মনোনিবেশ কর—বেদনা জিনিষটি কি? শরীরের না মনের? ইত্যাদি বিষয় যদি আলোচনায় প্রবৃত্ত হও তবে দেখিবে আনন্দের অবস্থা চলিয়া গিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সংবিত্তি এবং বেদনা দুইটি পৃথক্ জিনিষ। কিন্তু ইহাদের পার্থক্যের প্রকৃতি নির্ণয় সহজসাধ্য

নহে। এই পার্থক্য মনে বুঝিবার জিনিষ, ভাষায় ব্যক্ত করিবার জিনিষ নহে।

বেদনার লক্ষণ।

সুখ এবং দুঃখ এই দুইটি বেদনার লক্ষণ। জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকারী উদ্বোধক সুখকর এবং ক্ষয়কারী উদ্বোধক দুঃখকর। কিন্তু কতটুকু সুখে কতটুকু শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং কতটুকু দুঃখে কতটুকু শক্তি ক্ষয় হয় ইহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা এখনও অসম্ভব। সাধারণতঃ আমরা বাহ্যশক্তির মাত্রার সহিত সুখ দুঃখের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া থাকি। বহু পরীক্ষার পর পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে একই অবস্থায় অতি ক্ষীণ উদ্বোধকে বেদনা থাকে না; অতি তীব্র উদ্বোধকে দুঃখের বেদনা হয় এবং নাতিক্ষীণ এবং নাতিতীব্র উদ্বোধকে সুখের বেদনা হয়। "একই অবস্থায়" এই কথাটি অতি প্রয়োজনীয় কথা, কারণ অবস্থাভেদে এই নিয়মের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এক অবস্থায় যে উদ্বোধকে আমি নির্লিপ্ত, অন্য অবস্থায় সেই উদ্বোধকে আমি আস্থাবান্ হইতে পারি। যে উদ্বোধক শারীরিক ক্রিয়া অতিক্রম করিয়া মন পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না তাহাই 'ক্ষীণ' উদ্বোধক; যে উদ্বোধকে শরীর যন্ত্রের কার্য্যাবলী বিধ্বস্ত করিয়া দেয় তাহাই 'তীব্র' উদ্বোধক, আর যে উদ্বোধক শরীরযন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালনে সহায়তা করে তাহাই 'মধ্যবিৎ' উদ্বোধক। কিন্তু ক্ষীণ তীব্র ইত্যাদি অন্যসাপেক্ষ পদ। যাহা আমার নিকট 'ক্ষীণ' তাহা তোমার নিকট 'তীব্র' এবং অপরের নিকট 'মধ্যবিৎ' হইতে পারে। যাহা এখন আমার নিকট 'ক্ষীণ' বোধ হইতেছে, আবার অন্য সময়ে তাহা তীব্র বোধ হইতে পারে। চিনির আস্বাদন তীব্র করিতে হইলে যত পরিমাণ চিনি দরকার তাহা অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণ তিক্ত বস্তুতে তিক্ত বস্তুর তীব্রতা বাড়াইতে পারা যায়। এক রতি চিনিতে আর এক রতি চিনি মিশাইলে চিনির

তীব্রতা বৃদ্ধি হইবে না, কিন্তু এক রতি কুইনিনে আর এক রতি মিশাইলে উহার তীব্রতা বাড়িবে। কেহ কেহ বলেন যে, সুখ বা দুঃখের বেদনাকে সমপরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইলে উহার উদ্বোধককেও সাপেক্ষ পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হয়। যাহার এক হাজার টাকা মাসিক আয়, তাহার এক শত টাকা বেতন বৃদ্ধি হইলে যতটুকু আনন্দ হয়, যাহার মাসিক একশত টাকা আয়, তাহার দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইলে ততটুকু আনন্দ হয়। এটি সাধারণ নিয়ম হইলেও ইহাকে সার্ব্বজনিক নিয়ম বলা যায় না। উদ্বোধক এবং উদ্বুদ্ধ বেদনার সম্বন্ধে অনুপাত আছে এই মাত্র বলা যায়। কিন্তু এ অনুপাতেরও ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। শিশুর যে বস্তুতে প্রীতি হয় তোমার তাহাতে অপ্রীতি হইতে পারে। বেদনার স্থায়িত্ব নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। কখন একটি বেদনার আরম্ভ হইতেছে আবার কখন বা উহার শেষ হইতেছে বলা বড় সহজ নহে। সংবিত্তি এবং বেদনা একসঙ্গে প্রবাহিত হয় এবং একটি আর একটিতে মিশিয়া যায় এবং প্রকৃতি এক বলিয়া একটিকে আর একটি হইতে পৃথক্ করা যায় না। অনেকদিন ধরিয়া তুমি তোমার বন্ধুর প্রতীক্ষা করিতেছ, আজ তুমি সহসা তাহার সাক্ষাৎ পাইলে, তোমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। দর্শনানুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই বেদনানুভূতি হইল। কিন্তু এই দর্শনজনিত বেদনা অবিমিশ্র নহে। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার উদ্রেক হইল এবং চিন্তার সঙ্গে চিন্তাসম্বন্ধীয় অনুভূতি দেখা দিল। বেদনা এবং ভাব একসঙ্গে দেখা দিল। বন্ধুর হাব-ভাব দেখিয়া তোমার কত কথাই মনে হইল, কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলে। জিজ্ঞাসা করিলে—

আঁখি ছল ছল নিশি-দিবা ভর
কাঁহে তু বিরস ভেল ?

কি দুঃখ জাগল পরাণে তুঁহার
কাঁহে লো নয়নে লোর ?
মেরা জান দিয়া মিটাইব তুয়া
বহুত পিয়াস ঘোর।

বহুদিন পরে আজ তুমি তোমার জন্মভূমি দর্শন করিলে। আনন্দে তোমার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। ইহা দর্শনজনিত বেদনা।

"এই কি সে জন্মভূমি সুখময় স্থান ?
শান্তিময় শৈশবের ক্রীড়া-নিকেতন
জননী জনম-ভূমি
এই কি সে স্থান তুমি
স্বর্গাদপি গরীয়সী তোমারি কি নাম ?
ধরায় ত্রিদিবালয় এই কি সে স্থান ?"

তারপর তোমার শৈশবের সুখ স্মৃতি মনে হইল, কত চিন্তা, কত ভাবের উদয় হইল, হয়ত আক্ষেপ করিয়া বলিলে—

"আমারও সাথে কি জন্মভূমি তব ?
গিয়াছে ফুরায়ে সবি সাধের বিভব।
সেই খেলা হাসি-খুসি
গেছে কি অনন্তে মিশি
সেদিনের সাথে হায় তোদের এখন,
হয়েছে কি অস্তমিত সে সুখ তপন।"

এই প্রকারে বেদনার সহিত ভাব মিশিয়া গেল। তুমি সান্ধ্য-ভ্রমণের সময় তোমার পকেটে হাত দিলে, দেখিলে এক টুকরা কাগজ আছে। বাহির করিয়া দেখিলে সেখানি একখানি এক শত টাকার নোট। তোমার হৃদয় উৎফুল্ল হইল—এটি বেদনা। কিন্তু এই বেদনা অবিমিশ্র

নহে। যেমন কাগজখানি দেখিলে অমনি তোমার মনের ভিতর আনন্দের তড়িৎ প্রবাহিত হইয়া গেল সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সংশয়, বিস্ময়, সন্দেহ তোমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এ নোটখানি কেমন করিয়া তোমার পকেটে আসিল? কে রাখিল? কেন রাখিল? ইত্যাদি চিন্তায় তোমার মন অভিভূত হইয়া গেল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কোথায় বেদনার প্রান্ত এবং ভাবের প্রারম্ভ বলা অসম্ভব।

ভাব।

শকটে আরোহণ করিয়া তুমি বায়ু সেবনে বহির্গত হইয়াছ। অশ্বের পদধ্বনি এবং রথচক্রের ঘরঘর শব্দ অনবরত তোমার কর্ণপটহে আঘাত করিতেছে। তুমি কিছু না কিছু চিন্তা করিতেছ। হঠাৎ একটী চীৎকারধ্বনি শ্রুত হইল। তোমার চিন্তাস্রোত প্রতিহত হইল। ভাবসমূহের বিপর্য্যয় ঘটিল। তোমার মনে হইল হয়ত কোন লোক গাড়ীর নীচে পড়িয়া গিয়াছে। এই প্রকার চিন্তা হইতে তোমার মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। করুণা এবং ভয়ে তোমার হৃদয় উদ্বেলিত হইল। এই নূতন অনুভূতির নাম ভাব। মানুষের মন কখনও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে না। ইহা কখন চিন্তাশূন্য বা ভাবশূন্য নহে। এই চিন্তাস্রোত কখন বা ক্ষীণ আবার কখন বা খরতর। আবার মনের অবস্থা সকল সময়েই হয় সুখের না হয় দুঃখের এবং এই সুখ কিংবা দুঃখ কখনও সুপ্রকটিত আবার কখনও নিষ্প্রভ। মন সকল সময়েই নানা ভাবের লীলাক্ষেত্র। সময়ে সময়ে এই ভাবস্রোত অন্য ভাবের সংঘাতে সহসা প্রতিহত হইয়া যায় এবং আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের মন আকর্ষণ করে। আবার এই নূতন আকস্মিক পরিবর্ত্তনে নানা ভাবের নানা চিন্তার যুগপৎ আবির্ভাব হয়। ভাবসমূহ শৃঙ্খলাবদ্ধ। কোন একটি ভাবের আবির্ভাব বা তিরোভাব সম্ভব নহে। যখন যে ভাবটি সংজ্ঞাক্ষেত্রের তুঙ্গস্থান

অধিকার করে, তখন সে একক আইসে না; তাহার সহচরগণকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে। এই প্রকারে নূতন এবং পুরাতন, বর্ত্তমান এবং অতীত ভাব সমূহের সমাবেশে এক অভিনব ভাবের সৃষ্টি হয়। এই নূতন অনুভূতির নাম ভাব। প্রত্যেক ভাবের উত্থানের সহিত শরীর যন্ত্রের পরিবর্ত্তন হইতেছে, আবার শারীরিক পরিবর্ত্তনে ভাবের রূপান্তর হইতেছে।

সংবিত্তি ও ভাব।

যেমন সংবিত্তি এবং বেদনার মধ্যে পার্থক্য আছে, তেমনি আবার সংবিত্তি এবং ভাবের মধ্যেও পার্থক্য আছে। ছুরিতে আমার হাত কাটিয়া গেল; শারীরিক যন্ত্রণার অনুভূতি হইল—ইহা সংবিত্তি। তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিলে; আমার ক্রোধের অনুভূতি হইল—ইহা ভাব। ছোট ছোট শিশুদের শারীরিক সুখ দুঃখের অনুভূতি আছে কিন্তু মান অপমানের অনুভূতি নাই। তাহাদিগকে আঘাত কর কাঁদিয়া উঠিবে, কিন্তু মিথ্যাবাদী বলিলে ভ্রূক্ষেপও করিবে না। সুতরাং সংবিত্তি আশৈশব বর্ত্তমান, কিন্তু ভাব সেরূপ নহে। ইহার বিকাশ অনেক পরে। মস্তিষ্ক স্পন্দনের উপর মনের প্রতিক্রিয়ার নাম সংবিত্তি, অতএব ইহা একটি সামান্য সরল মানসিক ক্রিয়া মাত্র—ইহা আদৌ জটিল নহে। কিন্তু ভাব জটিল, ইহা একাধিক অনুভূতির সমন্বয়। ক্রোধ একটি ভাব হইলেও ইহাতে অপমান, ঘৃণা, প্রতিহিংসা প্রভৃতি অপর অনুভূতিরও আভাষ আছে। সংবিত্তি শরীরের কোন দেশে অবস্থিত বলিতে পারা যায়, কিন্তু ভাবের সময় এরূপ দেশ নির্ণয় করা সম্ভব নহে।

সংবিত্তি।	ভাব।
১। উদ্বোধক—বাহ্যিক।	১। উদ্বোধক—আন্তরিক।
২। অবলম্বন—শরীরস্পন্দন।	২। অবলম্বন—চিন্তা।

৩। শারীরিক অবস্থাজ্ঞান।	৩। মানসিক অবস্থাজ্ঞান।
৪। মৌলিক।	৪। লব্ধ।
৫। অমিশ্র।	৫। জটিল।
৬। দেশ নির্ণয় সম্ভব।	৬। দেশবদ্ধ নহে।
৭। নির্লিপ্ত।	৭। লিপ্ত।
৮। অব্যবহিতরূপে বোধগম্য।	৮। ব্যবহিতরূপে বোধগম্য।

ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা, ভালবাসা প্রভৃতি ভাব। ইহাদের মধ্যে কেহ সুখদায়ক এবং কেহ দুঃখদায়ক। অতএব সুখ দুঃখের অনুভূতিকেও ভাব বলিতে পারা যায়। কিন্তু মানুষের কি এমন অনুভূতি নাই যাহা সুখও নয়, দুঃখও নয়? বিস্ময় অনেক স্থানে সুখের এবং অনেক স্থানে দুঃখেরও হয়, কিন্তু কখন কখন 'বিস্ময়' এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় না কি যখন ইহাকে সুখ বা দুঃখ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসম্ভব হইয়া উঠে? সুখ দুঃখ বিবর্জ্জিত মানসিক অবস্থা আছে কি না বলা কঠিন। ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা, আনন্দ, ভালবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি অনুভূতি আমাদের ইচ্ছা প্রণোদিত নহে। মানসিক চিন্তা এই প্রকার অনুভূতির কারণ।

ভূত ভাবী বর্ত্তমান একটি পলকে
মিলিল বিষাদ স্নিগ্ধ আনন্দ পুলকে
আমার অন্তর তলে; অনির্ব্বচনীয়
সে মুহূর্ত্তে জীবনের যত কিছু প্রিয়,
দুর্লভ বেদনা যত, যত গত সুখ,
অনুদ্গত অশ্রুবাষ্প, গীত মৌনমুক
আমার হৃদয় পাত্রে হয়ে রাশি-রাশি
কি অনলে উজ্জ্বলিল!"

কোন চিন্তা হইতে ক্রোধ, কোন চিন্তা হইতে ঘৃণা, কোন চিন্তা হইতে

ভালবাসার উদ্রেক হইতেছে। ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে চিন্তাস্রোত প্রতিহত করিতে পারি, এবং প্রতিহত চিন্তা হইতে তৎ সম্পর্কীয় অনুভূতিরও দমন হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে এই প্রকার অনুভূতির উদ্বোধন করাও যেমন অসম্ভব, উদ্বুদ্ধ অনুভূতির বিসর্জ্জন দেওয়াও তেমনি অসম্ভব। মস্তিষ্ক স্পন্দনের উপর মানসিক প্রতিক্রিয়ার নাম যেমন সংবিত্তি, তেমনি চিন্তার উপর মানসিক প্রতিক্রিয়ার নাম ভাব। মস্তিষ্ক স্পন্দনের উপর যেমন মনের প্রতিক্রিয়া হয়, চিন্তাক্রিয়ার উপরও তেমনি প্রতিক্রিয়া হয়, এবং এই উভয়বিধ প্রতিক্রিয়াই অনিচ্ছা সম্ভূত। অনুভূতি মাত্রেই—সংবিত্তি বল, বেদনা বল বা ভাব বল—মনের অবস্থা, কিন্তু এ অবস্থা মনের নিষ্ক্রিয় অবস্থা।

শিশুদিগের অনুভূতি স্বভাবতঃ স্বার্থময়—শারীরিক সুখ দুঃখ জড়িত। ক্ষুধার্ত্ত শিশুর যতক্ষণ ক্ষুন্নিবৃত্তি না করিয়াছ ততক্ষণ সে সকল বিষয়েই বীতস্পৃহ। এখন ইহাদের ইন্দ্রিয় লালসা প্রবল। নিজের সুখ ভিন্ন আর কিছুই জানে না। ভয়, বিস্ময়, ক্রোধ, শোক প্রভৃতির বিকাশ এখনও হয় নাই, তবে ইহাদের আভাষ মাত্র দেখা যায়। উচ্চাঙ্গের অনুভূতির আভাষ পর্য্যন্তও এখন দৃষ্ট হয় না। এখন উহাদের বুদ্ধিবৃত্তি তেমন পুরিপুষ্ট হয় নাই। স্মৃতি শক্তি ক্ষীণ। অতীতকে স্মরণ বা ভবিষ্যৎ অনুমান করিতে পারে না। সুতরাং এ অবস্থার অনুভূতি মাত্রেই প্রত্যক্ষ বস্তু সমুদ্ভূত। প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্থানান্তরিত কর, তৎ সম্পর্কীয় অনুভূতিও প্রায় বিলুপ্ত হইবে—ইহা স্মৃতিপটে ধারণ করিবার ক্ষমতা এখনও হয় নাই। এখন ইচ্ছাশক্তিও দুর্ব্বল সুতরাং আত্ম-সংযমের অভাব। শিশু এখন অনুভূতির দাস। অনুভূতিকে সংযত করিবার সামর্থ্য ইহার নাই। যখন যে অনুভূতির উদ্রেক হইতেছে সেইটিই প্রবল এবং প্রচণ্ড হইতেছে। হাঁসি আসিলে

শিশুর অনুভূতির লক্ষণ।

হাসিতেছে ; কান্না আসিলে কাঁদিতেছে। হাসি কান্না দমন করিবার শক্তি ইহার নাই। কিন্তু এই প্রচণ্ড অনুভূতির স্থায়িত্ব অধিক হইলে ফল বিষময় হইত। হঠাৎ অনুভূতির উদ্রেক হয়, আবার সহসা ইহার বিনাশ হয়। প্রস্তরখণ্ডে বীজ নিপতিত হইলে সে বীজ যেমন "শিকড় গাড়িতে" পারে না, বালক হৃদয়ে অনুভূতিও তেমনি স্থায়ী হয় না। বালক তোমার উপর ক্রোধান্বিত হইয়াছে, আবার পরক্ষণেই দেখ হস্তপ্রসারণ করিয়া তোমার কোলে আসিতে চাহিতেছে। কিন্তু তোমার হৃদয়ে ক্রোধের উদ্রেক হইলে শীঘ্র ইহা উৎপাটিত হয় না। তুমি চিন্তা এবং স্মৃতির দ্বারা ইহাকে সজীব রাখ। অতএব শৈশব কালের অনুভূতির—

লক্ষণ {
- স্বার্থময়।
- প্রত্যক্ষবস্তু সমুদ্ভুত।
- উগ্র।
- ক্ষণিক।

জ্ঞান হইতে উদ্দৃপ্ত অনুভূতি মাত্রেই ভাব। জ্ঞানের উত্তেজনায় অনুভূতির প্রকাশ পায় বলিয়া ইহাকে জ্ঞানানুভূতি বলা হয়। সচরাচর অন্তঃকরণ এবং মন একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আনুভূতিক ক্ষমতা সমূহকে অন্তর বলা হয়। অনুভূতি মাত্রেই অন্তঃকরণের জিনিষ। অতএব জ্ঞান হইতে উদ্দৃপ্ত অনুভূতির—

ভাবের প্রকার ভেদ।

নাম {
- ভাব।
- জ্ঞানানুভূতি।
- অন্তঃকরণানুভূতি।

ভাবরূপ মন স্বতঃই বহির্মুখী। যে সকল ভাব আত্ম অনুগামী তাহাদিগকে আত্মসম্পৃক্ত ভাব বলা হয়; যে সকল ভাব পরানুগামী তাহা-

দিগকে পরানুসন্ধায়ী ভাব বলা হয়; আর যে সকল ভাব সত্য সুন্দর এবং শুভানুধ্যায়ী তাহাদিগকে রস বলা হয়। বর্ত্তমান ভাবকে অব্যাহিত ভাব, ভবিষ্যৎ চিন্তা সমুদ্ভূত ভাবকে ভাবিদর্শী ভাব এবং অতীত চিন্তা সমুৎপন্ন ভাবকে পশ্চাদ্দর্শি ভাব বলা হয়। ভাব প্রথমতঃ স্বার্থময়—আত্মসম্পৃক্ত। এই আত্মসম্পৃক্ত ভাব হয় সুখমূলক কিংবা দুঃখমূলক। শৈশবাবস্থাতেও এই সুখ দুঃখের বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে। ক্ষুধা তৃষ্ণার অশান্তি বালকের ক্রন্দনে প্রকাশ পায়। ক্রন্দনের মধ্যেও আবার অনেক সময়ে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ক্ষুধাজনিত ক্রন্দন এবং যন্ত্রণা-জনিত ক্রন্দন বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে ক্রমশঃ সুখ দুঃখের পার্থক্য জ্ঞান হইতে সুখের প্রকারভেদ জ্ঞান এবং দুঃখের প্রকারভেদ জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় নিজের সুখ অর্জ্জন এবং নিজের দুঃখ বর্জ্জন জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। নিজের অভাব অপনোদন এবং নিজের বাসনার তৃপ্তি হইলেই হইল। পরের সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখি না। নিজের স্বার্থ ব্যতীত দ্বিতীয় লক্ষ্য থাকে না। এই অবস্থায়—

"আপনা লইয়া ব্যস্ত
সবাই সংসার মাঝে
ভ্রমিতেছে নিরন্তর
যে যাহার নিজ কাজে।"

পরে যখন জ্ঞানের বিকাশ হইল, তখন বুঝিলাম যে, অপরের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটিলে নিজের স্বার্থেরও হানি হয়, সুতরাং নিজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে অপরের স্বার্থের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নিজের স্বার্থের জন্য পরের স্বার্থেরও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে।

"এ সুখ ধরণীতে কেবলি চাহ নিতে
জান না হবে দিতে আপনা।"

এখন নিজের খাতিরে পরের জন্য অনুভূতি হইল। এইরূপ অনুভূতিকে আত্ম-পরসম্পৃক্ত ভাব বলা যায়। এখানে আত্মই লক্ষ্যস্থল হইলেও পরের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বাধ্য হই। এখানে পরের স্বার্থে দৃষ্টি করি কিন্তু সে দৃষ্টি পরের স্বার্থের খাতিরে নহে, সে দৃষ্টি নিজের স্বার্থের জন্য। নিজের স্বার্থ লক্ষ্য, পরের স্বার্থ উপায় মাত্র।

"সাগর ছেঁচে মুক্তা তুলে, পাহাড় খুঁড়ে কুড়িয়ে এনে মাণিক;
বড়াই করে' তোমায় পরাই; তুমি বসে' ভাব তখন খানিক
তোমায় কত ভালবাসি। সত্য কথায় পেলে নাক আভাষ,—
গর্ব্বদীপ্ত তৃপ্তস্বরে আমি কেমন আমায় বলি 'সাবাস'!
তুমি নাকি নিরেট বোকা,—বোঝনা তাই, মুড়িয়ে তোমায় সোণায়
আমি করি আত্ম-পূজা; যদিও এটা উল্টা রকম শোনায়।"

কিন্তু মানুষ সমাজ ছাড়া থাকিতে পারে না। মানুষ অপরের সহবাস স্বভাবতঃই বাঞ্ছা করে, অপরের সহিত সৌহার্দ্দস্থাপনের জন্য স্বভাবতঃই লালায়িত। যখন জ্ঞানের আরও উন্মেষ হইল তখন ভালবাসা, সহানুভূতি, সম্মান প্রভৃতি ভাবের বিকাশ দৃষ্টিগোচর হইল। এই প্রকার অপরের সুখ দুঃখ সম্পৃক্ত অনুভূতিকে পরানুসন্ধায়ী ভাব বলে।

"ভেবেছিলাম, ছলের বলে কর্ব্ব শুধু ভালবাসা আদায়;
কিন্তু তোদের ভালবাসা বুকে এসে আজ যে আমায় কাঁদায়!
ঐ যে করুণ কণ্ঠধ্বনি আমার প্রাণের কঠিন পাষাণ গলায়!
আশীর্ব্বাদে নত মাথা লুটিয়ে সুখী পরের পায়ের তলায়।
আত্ম-প্রেমের স্বার্থে আমার তোদের প্রীতির-ফোয়ারা গেল খুলে!
বিশ্বপ্রেমের উৎস আজি উৎসরিছে আমার প্রাণের মূলে।"

পরে যখন আরও জ্ঞানের উন্মেষ হয়, মানুষ যখন সত্য সুন্দর এবং সত্যের ধারণা করিতে সমর্থ হয়, তখন আর এক প্রকার ভাবের উদয়

হয়। এ ভাব ব্যক্তিগত নহে, আপনার বা পরের চিন্তা সমুদ্ভূত নহে; হইয়া আত্মসম্পর্কীয় নহে, পরানুসন্ধানীও নহে। এবম্প্রকার ভাবের নাম রস। সত্য সুন্দর এবং মঙ্গলের আদর্শ চিন্তা সম্পর্কীয় ভাবের নাম রস। অতএব ভাব মোটা-মুটি এই কয় প্রকার—

১। আত্মসম্পৃক্ত।

২। পরসম্পৃক্ত।

৩। রস।

(ক) বুদ্ধিবিষয়ক।

(খ) সৌন্দর্য্য বিষয়ক।

(গ) শীল বিষয়ক।

ভাবের ঔৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন।

বালক-বালিকাগণের অনুভূতির স্ফুরণে বাধা প্রদান না করিয়া যাহাতে উহার উত্তরোত্তর ঔৎকর্ষ সাধনে হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। অনুভূতিই বালক-বালিকাগণের সুখের একমাত্র হেতু। সুখ দুঃখ অনুভূতির অবস্থা মাত্র। যে বিষয় হইতে কোন অনুভূতির উদ্রেক হয় না সে বিষয়ের স্বার্থও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। বালক-বালিকাদের অনুভূতি স্বার্থময়, উগ্র এবং ক্ষণস্থায়ী। কোন কোন অনুভূতির উগ্রতা নষ্ট করিতে হয়, এবং কাহারও বা উগ্রতা বৃদ্ধি করিতে হয়। কোন অনুভূতির স্থিতি এবং কোন অনুভূতির বিনাশ বাঞ্ছনীয়। এই সকল কারণে অনুভূতির ঔৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন। আবার, উদ্দেশ্য ব্যতীত কর্ম্ম নাই এবং অনুভূতিই কর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং অনুভূতিই কর্ম্মোদ্দীপক—

* * * "কর্ত্তব্য কি প্রেম বড় ?

আমি মূর্খ, আমি বুঝি, প্রেম উচ্চ, প্রেম শ্রেষ্ঠতর।

প্রেম পথ দেখায় কর্ত্তব্য চলে সেই পথ বহি'
প্রেম দেয় বিধি, নিত্য কর্ত্তব্য পালন করে তাহে।
প্রেম নহে ভ্রম, মহাভাগ! বাতুলের স্বপ্ন নহে;
প্রেম সত্য, প্রেম পূণ্য, প্রেম কভু, মিথ্যা নাহি কহে।"

আরও, কর্ম্ম হইতেই চরিত্র গঠন হয়, সুতরাং অনুভূতি চরিত্র গঠনের বিশেষ সহায়। সুখের আশা বা দুঃখের আশঙ্কাই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। অনুভূতি সংক্রামক। যুক্তি অপেক্ষা অনুভূতিতে মন সহজে আক্রান্ত হয়। একের অনুভূতি অপরকে সহজেই স্পর্শ করে। কতকগুলি নরাধম পাষণ্ড তাহাদের স্বার্থ পরিতৃপ্তির অন্তরায় ভাবিয়া একজন দীন হীনের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। তুমি উহাদিগকে ঐ কর্ম্ম হইতে বিরত করিতে চাও। তুমি উহাদের, নিকট ধর্ম্মের কথা, জ্ঞানের কথা, কর্ত্তব্যের কথা বল হয় ত তাহাদের মন বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইবে না— কিন্তু তুমি যদি বল—

"মায়ের সন্তান তোরা ভগিনীর ভাই
তোদের কি পুত্রস্নেহ পত্নীপ্রেম নাই?
তা যদি থাকিত হায়
তবে কি পাষাণ প্রায়
দীন হীন অনাথের বধিতে জীবন,
নর পিশাচের রূপ করিতে ধারণ"।

তখন তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইবে; তখন তাহারা ঐ কুকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিবে। ঐ দেখ মহাবিপদের সময়, ঘোর দুর্দ্দিনের সময়, জন্ম-ভূমির রক্ষা হেতু, শোকবিহ্বল নাগরিকগণ করযোড়ে রুদ্ধকণ্ঠে মহাবীর পুরঞ্জয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে কিন্তু তথাপি পুরঞ্জয় তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া সদম্ভে বলিতেছেন—

"বিস্মৃত বর্জ্জিত সেই সৌভাগ্যের সুখময় দিনে
বিপদের দিনে হায় আসা কেন তাহার দুয়ারে ?
ফিরে যাও ; ফিরে যাও ; রাখ দেশ পার যে উপায়ে।"

কিন্তু পরক্ষণেই দেখ ভাবের বন্যা আসিয়া পুরঞ্জয়ের কঠিন প্রতিজ্ঞাকেও ভাসাইয়া লইয়া গেল। জ্যেষ্ঠক যখন জলদগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন—

"স্মর তবে একবার তোমার সে মৃত প্রেয়সীরে,—
বৈশালীরে বাসিত সে ভাল ; জন্ম তার এইখানে,
এইখানে তব সনে পরিণয় তার, পুরঞ্জয় ;
সে যদি থাকিত বেঁচে আজ, তবে সে কি অনুরোধ
করিত না তব পাশে, জনমভূমির রক্ষা হেতু ?
প্রিয় তার ছিল এই পুরী, এই সব অলি-গলি
গৃহ অভিমুখী, আর, এই সব চিরপরিচিত
উর্দ্ধ্বী-সমন্বিত অট্টালিকা গিরিসম উর্দ্ধগামী,—
এ দেশ বাসিত ভাল প্রেয়সী তোমার, পুরঞ্জয় !
তারে স্মরি,—আমাদের বাঁচাইতে নহে—তারে স্মরি—
যুদ্ধে চল ; ওই শোন জয়ধ্বনি করিছে লিচ্ছবি।"

এইবার ভাব আসিয়া পুরঞ্জয়ের অন্তঃকরণে আঘাত করিল। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া গেল—বলিলেন—

"তাই হোক ; আজিকার যুদ্ধ নহে বৈশালীর তরে,
তারে স্মরি অস্ত্র ধরি—অস্থি যার এ নগরী ধরে।"

অনুভূতির ঔৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন—কিন্তু সকল অনুভূতির নহে। যে সকল অনুভূতি সমাজদ্রোহী, যে সকল অনুভূতি সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে, যে সকল অনুভূতি সমাজ হইতে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করিতে চায়, দূরে লইয়া যায়, তাহাদের উচ্ছেদ সাধন কর। মন্দ অনুভূতি সকল

উন্মূলন করিয়া ভালগুলির পুষ্টিসাধনে যত্নবান হও। অতএব অনুভূতির আলোচনার প্রয়োজন। কারণ—

১। অনুভূতি সুখের হেতু।

২। অনুভূতি প্রথমে অসংযত এবং অপরিপক্ক।

৩। অনুভূতি কর্ম্মোদ্দীপক।

৪। অনুভূতি সংক্রামক।

৫। অনুভূতির দমন আবশ্যক।

৬। অনুভূতির ঔৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন।

কিন্তু অনুভূতির ঔৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধনে অন্তরায় আছে। প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভূতিকে সংযমিত করা যায় না। উদ্দৃক্ত অনুভূতিকে দমন করিতে হইলে, মনকে বিষয়ান্তরে চালিত করিতে হয়। যে বিষয় হইতে বর্ত্তমান অনুভূতির সঞ্চার হইতেছে, সে বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া বিষয়ান্তরে ন্যস্ত করিতে হয়। আবার সদনুভূতির সঞ্চার করিতে হইলে তাহার অনুকূল উদ্বোধক বিষয়গুলির চিন্তা করিতে হয়। অতএব বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় অনুভূতিকে প্রত্যক্ষ ভাবে ইচ্ছাধীন করা যায় না। আরও, ভাব মাত্রেই জটিল, সুতরাং ইহার উন্নতি সাধনে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। এক এক সময় ভাব সকল এমন বদ্ধমূল হইয়া পড়ে যে, তাহাদিগকে উন্মূলিত করা অসম্ভব হয়। কৃপণ সুখের আশায় অর্থ সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু এমন দিন আইসে যখন সে আর সুখের জন্য অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে অক্ষম হয়, তখন সে অর্থ সঞ্চয়েই সুখ পাইয়া থাকে—সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে কষ্ট বোধ করে।

ভাবের ঔৎকর্ষ সাধনে অন্তরায়।

সুখ দুঃখ অনুভূতির অবস্থা এবং এই অবস্থাদ্বয় কতকগুলি নিয়মবদ্ধ। জীব ধারণের অর্থাৎ পোষণ বর্দ্ধনের পক্ষে যাহা কিছু অনুকূল তাহাই

সুখ দুঃখ নিয়ামক নীতি।

সুখ এবং যাহা কিছু প্রতিকূল তাহাই দুঃখ। এই নিয়মটিকে জীব-ধারণী নীতি বলে। কেহ কেহ বলেন যে মানুষের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি অসম্ভব কিন্তু ইহার সদসদ্ব্যবহার সম্ভব। ইহার অসদ্ব্যবহার করিতে পারা যায় আবার অতিরিক্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়, কিন্তু দুইটিই অন্তিম পন্থা এবং দুইটিরই পরিণাম দুঃখ। জীবনীশক্তির অসদ্ব্যবহার কর দুঃখ পাইবে, অতিরিক্ত ব্যবহার কর তবুও দুঃখ পাইবে। এই দুইটি অন্তিমের মধ্য পথ অবলম্বন কর, জীবনীশক্তির সদ্ব্যবহার কর, সুখ তোমার পুরস্কার হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, অনবরত জীবনীশক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হইতেছে। জীবনীশক্তির বৃদ্ধি হইলে সুখ এবং ইহার হ্রাস হইলে দুঃখ। আরও যাহাই সুখদায়ক তাহাই জীবনী-শক্তি বৃদ্ধির সহায় এবং যাহা দুঃখদায়ক তাহাই অন্তরায়। যাহা হউক, সুখ দুঃখের মূল কারণ নির্ণয় করা মনোবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। উত্তেজক এবং উদ্দীপক কারণ সমূহ বর্ত্তমান থাকিলে সুখের পরাকাষ্ঠা হয় কিন্তু তাহার সীমা আছে—তদতিরিক্ত অবস্থা দুঃখজনক। এই নিয়মকে উদ্দীপনী নীতি বলে। মানুষের শক্তি এবং বৃত্তি মাত্রেই উদ্দেশ্যমূলক। যে উত্তেজক এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায় তাহাই সুখদায়ক এবং যাহা অন্তরায় তাহাই দুঃখদায়ক। উদ্বোধকের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত সুখ দুঃখের সম্পর্ক আছে এবং ইহার পরিবর্ত্তনের উপরও বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। অনুভূতিকে সজাগ রাখিতে হইলে নব নব উদ্বোধকের প্রয়োজন। ইহাই বৈচিত্র নীতি। অবশ্য একই উদ্বোধকের হ্রাস-বৃদ্ধিরূপ পরিবর্ত্তন আছে, কিন্তু এ পরিবর্ত্তন সকল সময় যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। নূতন নূতন উদ্বোধকের প্রয়োজন। একই উদ্বোধক অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে তাহা বিরক্তিকর হইয়া উঠে নাকি? একই সঙ্গীত বারংবার গীত

হইলে তাহা বিরক্তিকর হইয়া উঠে নাকি? একই পুস্তক কতক্ষণ পড়িতে পার? ' অনেকক্ষণ যাবৎ উপন্যাস পাঠ করিতে পার সত্য কিন্তু একই উপন্যাসে কত নূতন নূতন বিষয়ের সমাবেশ আছে। একই উপন্যাস হইতে কখন ক্রোধ, কখন ঘৃণা, কখন আশা, কখনও আশঙ্কা প্রভৃতি কত ভাবের আবির্ভাব তিরোভাব হইতেছে। অনবরত ভাবের পরিবর্ত্তন হেতু উপন্যাস পাঠে বীতস্পৃহ হইতেছ না। অতএব সুখ সম্ভোগের নিমিত্ত ভাবের পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

"মধুপান করি, শুধু মধু-সরোবরে
সন্তরণ নিরন্তর, সে বড় যাতনা।
অবিমিশ্র ভোগ সুখ প্রবাহ প্রহারে,
ক্লান্তিতে ইন্দ্রিয়কুল হারায় চেতনা।"

মানুষের আর একটি গুণ আছে। সে যেমন অবস্থাতেই পড়ুক না কেন, সে সেই অবস্থাকে নিজের অনুকূল করিয়া লইতে পারে। ইহা গ্রাহিণী-নীতি। সকল অবস্থাকে সপক্ষে, ক্রমে অনুকূল ভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায়। তুমি কাল স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলে, আজ তুমি সিংহাসনচ্যুত পথের ভিখারী। কাল যাহা অসম্ভব মনে করিয়াছিলে আজ দেখিতেছ তাহা নিতান্ত অসম্ভব নয়। ক্রমে ক্রমে তুমি এই নূতন অবস্থাকে আপনার করিয়া লইতেছ। তুমি কখনও বিদেশে যাও নাই। বিদ্যাভ্যাসের জন্য তুমি আজ প্রথম বিদেশে আসিয়াছ। এখানকার সবই তোমার নিকট নূতন। সবই যেন তোমার অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু এ অপ্রীতি বেশী দিন থাকিবে না। যাহা প্রতিকূল মনে করিতেছ তাহা ক্রমশঃ অনুকূল হইবে। তুমি তিক্ত দ্রব্য খাইতে পারিতে না, কিন্তু কিছু দিন বাধ্য হইয়া তোমাকে খাইতে হইয়াছিল— এখন আর তোমার নিকট তিক্ত দ্রব্য তিক্ত বলিয়া বোধ হয় না—বরং

খাইতে বোধ হয় ভালই লাগে। অতএব দুঃখকেও সুখে পরিণত করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে। আবার অভ্যাস বলে সুখেও আমরা বীতস্পৃহ হইয়া থাকি। ইহা সংস্কার-নীতি। সুখকর বিষয়কেও দীর্ঘকাল যাবৎ উপভোগ করিলে সে বিষয়ে বিগতস্পৃহ হইতে হয় ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত বৈচিত্র-নীতি অনুসারে সত্য। দীর্ঘকাল স্থায়ী বলিয়া সুখের বিনাশ হইলেও ইহা দুঃখে পরিণত হয় না কিন্তু আর এক নূতন ভাবের সৃষ্টি হয়। যদিও ইহা আর সুখদায়ক নয় কিন্তু ইহার অভাব অত্যন্ত দুঃখদায়ক। তোমার ধাত্রী এখন বৃদ্ধা হইয়াছে, তাহার মেজাজ অত্যন্ত কর্কশ হইয়াছে। সে এককালে তোমাকে বড়ই স্নেহ করিত, বড়ই ভালবাসিত। কিন্তু এখন সে আর তোমায় দেখিতে পারে না—তোমায় দেখিলে যেন সে এখন বিরক্ত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তবুও সে তোমাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারে না, তোমাকে একতিল না দেখিলে সে অধীরা হইয়া উঠে। তুমিও তাহাকে এখন আর তত ভালবাস না কিন্তু তথাপি তোমার নিকট তাহার অদর্শনও অসহ্য বোধ হয়।

"নিবনা তাহায়,
পোড়ামুখী নিত্য গালি দেয় বাপ মায়।
না নিলেও অভাগী যে যাইবে মরিয়া
না পারে থাকিতে একতিল না দেখিয়া।
মুহূর্ত্তেক যদি আমি থাকি লুকাইয়া,
বৎসহারা গাভীর মত মরে গরজিয়া।
আমিও যে পারিব না, কি যে সর্ব্বনাশী,
এত দেয় গালি তবু কত ভালবাসি!"

তোমার ভগ্নীকে তুমি এককালে বড়ই ভালবাসিতে। তাহাকে

দেখিলেই তোমার আনন্দ হইত কিন্তু এখন আর তাহা হয় না। আজ সে তাহার শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গেল। কেন তুমি এখন এত বিষণ্ণ? অতএব দেখা যাইতেছে যে নানা কারণে আমাদের সুখ দুঃখের উদয় হয়। জীবনীশক্তির ঔৎকর্ষে বা অপকর্ষে, উদ্দীপনী শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধিতে বা পরিবর্ত্তনে আমাদের সুখ দুঃখ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আবার গ্রাহিণী-শক্তি প্রভাবে আমরা দুঃখকে সুখে পরিণত করিতে পারি এবং অভ্যাস বলে যে সুখে বিগতস্পৃহ হই তাহার অভাবে নূতন দুঃখের সৃষ্টি হয়। অতএব সুখ দুঃখের—

নিয়ামক।
- জীব-ধারণী নীতি
- উদ্দীপনী নীতি
- গ্রাহিণী নীতি
- সংস্কার নীতি

সুখ দুঃখের শারীর অভিব্যঞ্জক—

দুঃখের অভিব্যঞ্জক—

পেশী সঙ্কুঞ্চন সম্বন্ধীয়।
- মুখাবয়বের পেশী সঙ্কুঞ্চন
- গ্রীবাদেশের পেশী সঙ্কুঞ্চন
- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পেশী সঙ্কুঞ্চন
- কেশমূলের পেশী সঙ্কুঞ্চন
- কম্পন
- আক্ষেপ

পেশীর অসাড়তা সম্বন্ধীয়।
- মুখাবয়বের কোন কোন পেশীর শিথিলতা
- কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শিথিলতা
- সচেষ্ট গতির বিপর্য্যয়

শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শব্দ সম্বন্ধীয়।

- সচেষ্ট শ্বাস-প্রশ্বাস রাহিত্য
- নিশ্চেষ্ট শ্বাস-প্রশ্বাস রাহিত্য
- দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ
- সবিরাম শ্বাস-প্রশ্বাস
- দীর্ঘ নিঃশ্বাস
- জৃম্ভণ
- ফোঁপাইয়া ক্রন্দন
- গোঁ গোঁ শব্দ
- চীৎকার

নিঃসরণ এবং পরিপাক-সম্বন্ধীয়।

- অশ্রু
- লোলাস্রবের অভাব
- অতর্কিতে মূত্র স্খলন
- বমন
- উদরাময়
- ঘর্ম্ম

রক্তকোষ সম্বন্ধীয়

- বিবর্ণ মুখ
- বিবর্ণ শরীরাবয়ব
- আরক্তিম বদন
- ত্বকের বাহ্যরক্তিমা
- বলোপচয় জনিত দৃঢ় ভাব

মন-সম্বন্ধীয়।	অনভ্যস্ত পরহিতৈষণা ঘৃণা প্রভৃতি রিপুর আধিক্য ধর্ম্মভাব মূকতা অনভ্যস্ত তথাচ অনর্গল বাগ্মিতা প্রলাপ চিন্তা ও বাক্যবিন্যাস

সুখের শারীর অভিব্যঞ্জক :—

মুখ এবং শ্বাস-যন্ত্র সম্পর্কীয় পেশীর সঙ্কুঞ্চন।	ওষ্ঠপ্রান্তের উন্নমন নিম্ন অক্ষি পর্দ্দার সঙ্কুঞ্চন স্ফীত গণ্ডদেশ বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র হাস্য নিমীলিত চক্ষু আবেশ নয়ন দন্ত নিষ্পেষণ

রক্তকোষ সম্বন্ধীয়।	আরক্তিম বদন উজ্জ্বল চক্ষু অশ্রু প্রচুর লোলাস্রব অতর্কিতে মূত্রস্খলন

গ্রীবা স্কন্ধ এবং অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পেশী-সঞ্চালন।

- গ্রীবা ভঙ্গিমা
- উন্নত স্কন্ধদেশ
- শরীর কাণ্ডের নানা প্রকার ভঙ্গিমা
- বাহুদ্বয়ের নানা প্রকার ভাবব্যঞ্জক সঞ্চালন
- করতালি
- বিস্ফারিত পদদ্বয়
- দৃঢ়ভাবে পাদবিন্যাস
- নানা প্রকার উল্লম্ফন
- নর্ত্তন

স্বর সম্বন্ধীয়।

- স্বহুভাষ।
- দীর্ঘ নিঃশ্বাস
- চীৎকার
- ফোঁপান
- গীত
- মূকতা
- অনভ্যস্ত তথাপি অনর্গল বাগ্মিতা
- প্রলাপ
- অনভ্যস্ত হৃদ্যতা

পেশীর অসাড়তা সম্বন্ধীয়।

- মুখাবয়বের পেশীর শিথিলতা
- নিম্ন চোয়ালের শিথিলতা
- মূর্চ্ছা

একবিংশ অধ্যায়

আত্ম-সম্পৃক্তানুভূতি

আত্মসম্পৃক্ত ভাব।

মাত্র নিজের ভাবনা হইতে যে সকল অনুভূতির উদয় হয় তাহাদিগকে আত্মসম্পৃক্ত ভাব বলে। এই সকল ভাবের লক্ষণ ব্যক্তিগত বলিয়া ইহাদিগকে ব্যক্তিগত ভাবও বলা হইয়া থাকে এবং ইহারা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে সতত আত্ম-শুভানুধ্যায়ী বলিয়া ইহাদিগকে আত্মভাবও বলা হইয়া থাকে। ভাব যখন আত্মসম্পর্কীয় অতীত চিন্তা সমুদ্ভূত তখন ইহাকে পশ্চাদ্দর্শী ভাব বলা হয়; ইহা যখন আত্ম-সম্পর্কীয় বর্ত্তমান চিন্তা সমুদ্ভূত তখন ইহাকে অব্যবহিত ভাব বলা হয়; আবার ইহা যখন আত্ম সম্পর্কীয় ভবিষ্যৎ চিন্তা সমুদ্ভূত তখন ইহাকে ভাবিদর্শী ভাব বলা হয়। অতএব আত্মচিন্তানুগামী ভাবের—

নাম	আত্ম-সম্পৃক্ত ভাব	পশ্চাদ্দর্শী
	আত্ম ভাব	অব্যবহিত
	ব্যক্তিগত ভাব	ভাবিদর্শী

তুমি আমাকে ভীরু কাপুরুষ বলিলে, আমার ক্রোধ হইল; হঠাৎ আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলাম; আমার আনন্দ হইল; তুমি আমার প্রসংসা করিলে, আমার অহঙ্কার হইল—এই প্রকারের অনুভূতিকে আত্ম-সম্পৃক্ত ভাব বলে।

ভীতি একটি আত্মসম্পৃক্ত ভাব। এই ভাব সকলের অন্তঃকরণেই

বর্ত্তমান। অজ্ঞাত বিষয় হইতে এই ভাবের উৎপত্তি হয়। মনের দুর্ব্বলতা, অভিজ্ঞতার স্বল্পতা, এবং স্বাবলম্বনের অভাব হইতে অজ্ঞাত বিষয় ভয়াবহ বলিয়া বোধ হয়। ভয় আকাঙ্ক্ষার অন্তরায়; প্রেমের প্রত্যবায়; উদ্ভাবনীর বিঘ্ন। ভয় দ্বিবিধ শুভ এবং অশুভ। যে ভয়ের মূলে বিশ্বাস, যে ভয় আশার উদ্দীপক, ভগবৎ-প্রীতির প্রবর্ত্তক তাহাই শুভ; আর, যে ভয়ের মূলে সন্দেহ, যে ভয় আমাদিগকে নৈরাশ্যের তমোময় গর্ভে নিক্ষেপ করে সেই ভয়কে অশুভ বলা হয়। ভয়কালে শরীর এবং মনের কতকগুলি পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এই সকল পরিবর্ত্তনকে ভীতিব্যঞ্জক লক্ষণ বলা যায়। তুমি একটি ভীষণাকৃতি জন্তুর সম্মুখে পতিত হইয়াছ, তুমি অনিষ্ট আশঙ্কা করিলে, তোমার ভীতির সঞ্চার হইল। তোমার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; তোমার শরীর কাঁপিতে লাগিল; তোমার মাংসপেশী শিথিল হইল; তোমার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন শিথিল হইয়া গেল; তোমার জিহ্বা শুষ্ক হইল, এবং শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল।

ভীতি।

"কেশব! কেন হৃদয় আমার
ভীত আজি, মরুসম বিশুষ্ক বদন,
কাঁপিতেছে অঙ্গ মম, অবসন্ন প্রাণ?"

ভয় হইতে যে কেবল শারীরিক ক্রিয়াই বিপর্য্যস্ত হয় এমন নহে—মনের মধ্যেও মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। এখন আর দ্বিতীয় বস্তুতে মনোযোগ দিতে পারা যায় না—সমস্ত অবধানশক্তি এখন সেই একই বস্তুর উপর, সেই ভীতিপ্রদ বস্তুর উপর নিহিত। এখন স্মৃতিশক্তি বড়ই প্রবল এবং দ্রুতক্রিয়াশীল। কিন্তু এ স্মৃতি হইতে কেবল অতীত ভয়ের কথাই মনে হয়, অন্য বিষয় মনে স্থান পায় না। কল্পনাশক্তির গতিও

ক্ষিপ্র—ভবিষ্যৎ বিপদের কত প্রকার চিত্র মনোমধ্যে উদয় হয়। কিন্তু তাহা হইলেও কোন ক্রিয়ার উপর মনের কিছুমাত্র আধিপত্য থাকে না। ইচ্ছাশক্তি এখন হীনবীর্য্য, মানসিক ক্রিয়াকে সংযত করিতে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু অন্যদিকে ইহার কার্য্য বড়ই প্রবল। ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মন সমস্ত শক্তি আকর্ষণ করে এবং কোন উপায় দৃষ্টিগোচর হইলে, সেই উপায়কে কার্য্যকরী করিবার জন্য সাধ্যাতিরিক্ত চেষ্টা করে। কিন্তু আত্মরক্ষা যদি একবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় তবে ভয় আরও ভীষণাকার ধারণ করে। বিপদের আশঙ্কা এবং পরিত্রাণ লাভের অনিশ্চয়তা হেতু সমস্ত শক্তি শিথিল হইয়া পড়ে।

"—আশঙ্কা অজ্ঞাত
ছাইবে হৃদয়, বল হরিবে বাহুর ;
করিবেক সিংহ-শিশু বিষাক্ত দুর্ব্বল।"

ভীতির উপাদান।

তুমি সন্ধ্যার প্রাক্কালে ময়দানে ভ্রমণ করিবার সময় আকাশে একখণ্ড মেঘ দেখিলে। মেঘখানি ক্রমে ক্রমে বড় হইল ; বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল ; ঘন ঘন গর্জ্জন আরম্ভ হইল। তখন তোমার মনে হইল—

"ঐ মেঘ করে বুঝি গগনে !
আঁধার ছাইল রজনী আইল,
ঘরে ফিরে যাব কেমনে !"

এখানে প্রথমে তোমার মেঘের প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হইল, পরে স্মৃতির

উদয় হইল। পূর্ব্বে তুমি এই প্রকার মেঘ দেখিয়াছিলে; সেই মেঘের সময় অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি হইয়াছিল; পথ ঘাট তখন জলে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। এইরূপে তোমার অতীত স্মৃতি জাগরিত হইল। বর্ত্তমান মেঘকে অতীত মেঘের ধারণার সহিত তুলনা করিয়া অনুমান করিলে যে এ মেঘ হইতেও সেই প্রকার ঝড় বৃষ্টি হইতে পারে। এইবার তুমি কল্পনার আশ্রয় লইলে। অতীতকে অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তায় মগ্ন হইলে। সেইরূপ ঝড় বৃষ্টি হইতে পারে; তোমার পরিধেয় বৃষ্টিতে সিক্ত হইতে পারে; এই সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডা লাগিয়া তোমার জ্বর হইতে পারে। এখন আবার জ্বরের যন্ত্রণা কল্পনা করিতে লাগিলে। এই প্রকার চিন্তা লহরি হইতে তোমার ভয়ের সূচনা হইল। অতএব ভয়ের

কারণ	অনবজ্ঞান	প্রত্যক্ষ জ্ঞান	উপাদান
	অনভিজ্ঞতা	অবধান	
	দুর্ব্বলতা	স্মরণ	
	পৈত্র	কল্পনা	
		অনুমান	

ভয়ের একটি পরিণাম কাপুরুষতা—ইহা ভীতি এবং নীচতার সংমিশ্রণ।

"যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে;
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে,—তখনি সে
পথ কুক্কুরের মত সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে;

দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে !"

ক্রোধ মানুষের একটি মৌলিক বৃত্তি। অপমান জ্ঞান এই বৃত্তির উৎপাদক। ছোট ছোট শিশুদের মধ্যেও ক্রোধের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তাহাদিগকে শারীরিক যন্ত্রণা দাও স্বভাবতঃই তাহারা প্রতিবাদ করিবে। এই প্রতিবাদই ক্রোধের সূচনা। শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণা ব্যতীত ক্রোধ হয় না। ক্রোধের সময় কতকগুলি শারীরিক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হয়, হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হয়, শ্বাস প্রশ্বাস প্রবল হয়, স্বর কর্কশ হয় এবং হৃৎপিণ্ড সজোরে আঘাত করে। মনও অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়ে। চিন্তাশক্তির লোপ হয়। কিন্তু কতকগুলি চিন্তা অত্যন্ত প্রবল হয়। আমার অনিষ্ট করিয়াছে, আমার অপমান করিয়াছে, আমি কি এতই হেয়? আমি কি এতই হীনবল? কি উপায়ে প্রতিশোধ লইব? ইত্যাদি চিন্তা মনের মধ্যে যুগপৎ উদয় হয়।

ক্রোধ ও ইহার উপাদান

"সে ভীষণ জ্বালা
রাজ্য লাভে পারি যদি, পারি নিবাইতে!
হায়! যদি রণরঙ্গে, শত্রুর শোণিতে,
প্রতিহিংসা-সুরামৃতে নিবেরে সে জ্বালা!

*　　*　　*

কিন্তু তোর অপমান, এ ঘোর নিগ্রহ!"

ক্রোধে অপমান জ্ঞান আছে, আবার ক্রোধ কালে প্রতিশোধ চিন্তা অত্যন্ত প্রবল হয়।

"প্রতিজ্ঞা করিনু শেষে যন্ত্রণায় জ্বলি
একদিন—একদিন নেব প্রতিশোধ!
সেই দিন হ'তে পশি গুহার মাঝারে
সাধিয়াছি মহা হত্যা আঁধারে বসিয়া।"

যদি প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হই তখন ক্রোধ অন্তর্হিত হয় এবং ক্রোধের স্থানে সুখের উদয় হয়। অপরে আমার অপমান করিলে আমিও যদি তাহার অপমান করিতে পারি, অপরে আমার অনিষ্ট করিলে আমিও যদি অপরের অনিষ্ট করিতে পারি তাহা হইলে আমার আনন্দ হয়।

"তোরি রঙ্গভূমি মাঝে বেড়াব গাহিয়া
অপার আনন্দময় প্রতিশোধ গান।"

এই প্রকার প্রতিশোধ জনিত সুখ মানুষের নিজস্ব সম্পত্তি। ইহা অন্য জীবে দৃষ্ট হয় না। দোষী ব্যক্তি যদি ত্রুটি স্বীকার করে, কিংবা ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহা হইলেও ক্রোধের উপশম হয়। দোষী ব্যক্তিকে নিজেই নিজের পরাভব স্বীকার করিতে দেখিলে আনন্দেরও উদয় হয়। ক্রোধ যে কেবল কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর আবদ্ধ থাকে তাহা নহে। সেই ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট অপর ব্যক্তির উপরও পতিত হয়। যিনি আমার ক্রোধের প্রকৃত হেতু, যদি আমি প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার প্রতিহিংসা করিতে না পারি তখন তাঁহার সহচরদের উপর ক্রোধ পতিত হয়। ক্রোধের

ভীষণতা অনেক সময় জড় বস্তুকেও আক্রমণ করে। ক্রোধান্ধ বালক তাহার শত্রুকে আক্রমণ করিতে না পারিলে শত্রু বালকের ক্রীড়নকগুলি নষ্ট করিয়া দেয়।

ক্রোধের প্রকার ভেদ।

ক্রোধ নানাবিধ। কোন কোন ক্রোধের হঠাৎ উদ্রেক হয়। এরূপ ক্রোধ ভয়াবহ এবং অনিষ্টকর। এরূপ ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। এরূপ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইলে আগে কাজ—পরে চিন্তা বা অনুতাপ। আবার কোন কোন ক্রোধ অল্পে অল্পে প্রধূমিত হয়, দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে না। এরূপ স্থলে ক্রোধকে হৃদয়ে পোষণ এবং পরিবর্দ্ধন করা হয়। ইচ্ছা এবং চিন্তা একেবারে লুপ্ত হয় না, বরং ক্রোধের পোষকতা করে। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে যখন ইহা বেশ পরিপুষ্ট হয় তখন ইহা প্রতিহিংসা রূপে পরিণত হয়। তখন

"ক্রোধ মহিষীর উত্তপ্ত রুধিরে
জনমিল হিংসাসুর,"

যেমন করিয়াই হউক প্রতিশোধ লইতেই হইবে এই চিন্তা তখন প্রবল। ইচ্ছা এবং চিন্তা উভয়েই ইহার সহায়তা করে। কি উপায়ে প্রতিশোধ লইতে পারা যায় এবং কেমন করিয়াই বা তাহা কার্য্যে পরিণত করা যায়? চিন্তা উপায় নির্দ্ধারণ করে আর ইচ্ছাশক্তি তাহা কার্য্যে পরিণত করে। প্রতিশোধ সাধনে যতই বিলম্ব ঘটে, প্রতিশোধের পরিতৃপ্তি ততই সুখকর হয়। আবার ক্রোধ যখন হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় তখন ইহা বিরাগে পরিণত হয়। ইহার পরিমাণ কম হইলেও ইহার বিস্তৃতি অধিক। অন্য ক্রোধ অপেক্ষা এই ক্রোধের অন্তর্গত বিষয়ের

সংখ্যা অধিক। ইহা সংক্রামক—একসঙ্গে অনেক বিষয় আক্রমণ করে। আমাদের কুৎসিত বিষয়ে বিরাগ আছে, অপকারী বিষয়ে বিরাগ আছে, অপ্রীতিকর বিষয়ে বিরাগ আছে। আবার কোন বিশেষ মতে বা ধর্ম্মে বা জাতিতেও বিরাগ থাকিতে পারে। বিরাগের যখন মাত্রা অধিক হয় তখন ইহা ঘৃণায় পরিণত হয়। ঈর্ষা ক্রোধের আর একটি আকার, ইহা যেন "তিক্ত মধুর" সংমিশ্রিত। ইহাতে ক্রোধ অপেক্ষা উৎফুল্লতার মাত্রা অধিক।

ক্রোধ	ভীতি
১। সক্রিয় অনুভূতির প্রতিনিধি	১। নিষ্ক্রিয় অনুভূতির প্রতিনিধি
২। সহজাত	২। সহজাত
৩। দুঃখ-সমুদ্ভূত	৩। দুঃখ সমুদ্ভূত
৪। ইহাতে সুখ আছে (হিংসার তৃপ্তি)	৪। ইহাতে সুখ নাই
৫। স্বাভাবিক আত্মসংরক্ষণ-প্রবৃত্তি ইহার মূল	৫। স্বাভাবিক আত্ম-সংরক্ষণ প্রবৃত্তি ইহার মূল
৬। কর্ম্ম প্রবর্ত্তক	৬। কর্ম্মসংহারক
৭। সমাজদ্রোহী বৃত্তি।	৭। সমাজদ্রোহী বৃত্তি।

প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগিতা আর একটি আত্ম-সম্পৃক্ত অনুভূতি। যখনই কতকগুলি লোক এক কার্য্যে লিপ্ত হয় তখনই এই অনুভূতির উদয় হয়। মানুষ স্বভাবতঃই কর্ম্মশীল। কর্ম্মের সহিত এই অনুভূতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কর্ম্মক্ষেত্রে একজন আর একজনকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিতেছে; একজন আর একজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভে যত্ন করিতেছে। এই অনুভূতিটি স্বার্থময়

এবং সমাজদ্রোহী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহা মানুষকে অনেক সময় উন্নতির দিকে লইয়া যায়। অনেক সময় হয়ত এই অনুভূতির অস্তিত্ব বোধগম্য হয় না, কিন্তু প্রতিযোগিতায় জন্মলাভ করিলে ইহা আর অপ্রকাশ থাকে না। যেখানে অকৃতকার্য্যে শাস্তির ভয় নাই বা কৃতকার্য্যে পুরস্কারের আশা নাই সেইখানেই সাধারণতঃ এই অনুভূতির প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়। অপরের উপর নিজের প্রাধান্য স্থাপনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নাম প্রতিযোগিতা। মানুষ স্বভাবতঃই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপ্রিয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রোধ সম্পর্ক শূন্য নহে। উচ্চাঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেও ক্রোধ থাকে কিন্তু এ ক্রোধ হইতে অনিষ্টের সূচনা হইতে পারে না। প্রতিযোগিতায় অনুকরণ আবশ্যক। আমি যাহার প্রতিযোগিতা করিব আমাকে তাহার অনুকরণ করিতে হইবে কিন্তু আমি অনুকরণ করিয়াই ক্ষান্ত হই না। প্রতিযোগিতা অনুকরণের নামান্তর নহে। অনুকরণের সীমা অতিক্রম করিতে চাই; যাহার অনুকরণ করিলাম তাহা অপেক্ষা বড় হইতে চাই। অপরের প্রতিযোগিতা করিতে হইলে চেষ্টার প্রয়োজন কিন্তু বাসনা পরিচালিত না হইলে চেষ্টা থাকে না। সুতরাং প্রতিযোগিতায় বাসনার প্রয়োজন। প্রতিযোগিতায় প্রতিহিংসার লেশ মাত্র থাকেনা—এখানে কেবল মানুষ নিজের কৃতিত্ব সপ্রমাণে যত্নবান। তবে প্রতিযোগিতায় অনুভূতি দীর্ঘকালব্যাপী হইলে শত্রুতার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নহে।

স্বভাবতঃই আমরা অপরের চরিত্র অনুশীলন করি। এইরূপ অনুশীলন হইতে কতকগুলি স্বার্থময় অনুভূতির সৃষ্টি হয়। আমরা অপরের কার্য্য নিপুণতায় প্রশংসা করি; পরের কষ্টে অনুকম্পা প্রকাশ করি; পরের কৃতকার্য্যে আনন্দ প্রকাশ করি, পরের গুণের মর্য্যাদা করি এবং পরের বন্ধুত্বের সমাদর করি। এখন আমাদের অবধান বহির্মুখী কিন্তু ইহা

শীঘ্রই অন্তর্মুখী হয়। এই সকল গুণের যদি কোন একটিও আমি নিজের মধ্যে দেখিতে পাই, আমি নিজেও যদি উল্লিখিত কোন একটি গুণের অধিকারী হই, তাহা হইলে আমারও আনন্দ হয়। অপরের প্রতি আমি যে অনুভূতি বর্ষণ করিয়াছিলাম এখন তাহা আমার নিজের উপরই বর্ষিত হইতেছে। অপরের কার্য্যতৎপরতার প্রশংসা করিয়াছিলাম এখন সেইরূপ কার্য্যতৎপরতা নিজেতে দেখিয়া নিজের প্রশংসা নিজেই করিতেছি; পরের কৃতকার্য্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম এখন নিজের কৃতকার্য্যে নিজেই আনন্দ প্রকাশ করিতেছি; পরের গুণের মর্য্যাদা করিয়াছিলাম এখন নিজের গুণের মর্য্যাদা নিজেই করিতেছি। যে অনুভূতি পরানুগামী ছিল তাহা এখন আত্মানুগামী হইল।

আমরা অপরের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করি, কে কোন্ গুণের অধিকারী বিচার করি। একজনকে আর একজনের সহিত তুলনা করি। কাহাকেও বড় এবং কাহাকেও ছোট বলিয়া অনুভব করি। এই অনুভূতি আবার নিজের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করে। এখন নিজের সহিত অপরের তুলনা করি। হয় নিজেকে নয় অপরকে বড় বলিয়া অনুভব করি। এখানে স্বার্থপরতার মাত্রা অধিক সুতরাং নিজেকেই বড় বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক মানুষেরই নিজের নিজের গণ্ডি আছে। নিজের নিজের গণ্ডির মধ্যে নিজেকে সকলেই বড় বলিয়া মনে করে। নিজের গুণ সামান্য হইলেও বড় বলিয়া মনে হয় এবং অপরের গুণ বড় হইলেও সামান্য বলিয়া মনে হয়—

"ঘটিজল বলে, ওগো মহাপারাবার
আমি স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল, তুমি অন্ধকার।

ক্ষুদ্র সত্য বলে মোর পরিষ্কার কথা,
মহাসত্য তোমার মহান্ নীরবতা।"

"চন্দ্র কহে খদ্যোতেরে
'গর্ব্ব যে তোর দেখছি ভারি
সত্যি আছে রত্তি আলো
কীর্ত্তি দেখে হেসে মরি!'
জোনাকি কয় 'সত্য বটে
রশ্মি সে তোর বিশ্ব জোড়া,
বিত্ত সে যে আত্ম নহে
ধর্ম্ম যে তোর ভিক্ষা করা' ॥"

আত্ম-তুষ্টি।

জগতের নানা লোকে নানা পদে প্রতিষ্ঠিত। কেহই নিজের পদে সন্তুষ্ট নহে, সকলেই উচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্য লালায়িত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সকলেই আবার নিজের পদ-মর্য্যাদা রক্ষণে যত্নশীল। নিজের পদ নিজের নিকট নীচ বলিয়া মনে হইলেও অপরের নিকটও সেইরূপ প্রতিভাত হউক ইহা কেহই মনে করিতে পারে না। পরন্তু মনে হয় অপরে আমার পদকে সম্মানের চক্ষে দেখুক। এখানে নিজের ব্যক্তিগত গুণের বিষয় চিন্তা করি না। আমার গুণানুযায়ী আমি এই পদের উপযুক্ত তাহা মনে করি না। আমি মনে করি আমি অন্য পদেরও উপযুক্ত কিন্তু এই কারণে আমি বর্ত্তমান পদটি পছন্দ করিয়াছি বা করিতে বাধ্য হইয়াছি; কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে যে সকল গুণ আছে তাহা অন্যটিতে নাই। আমার চাকুরীতে টাকা কম কিন্তু পরিশ্রমও কম আবার সম্মানও বেশী। অমুকের চাকুরীতে টাকা বেশী কিন্তু বড় পরিশ্রম।

আমার বেতন কম হইলেও অতিরিক্ত পাওনা এত বেশী যে অমুকের অপেক্ষা ধরিতে গেলে আমার বেতন বেশী। আমার ঘরখানি তোমার অপেক্ষা ছোট হইলেও ইহাতে বেশ বায়ু চলাচল করে। এই প্রকার চিন্তা দ্বারা মানুষ আত্ম-তুষ্টি লাভ করে।

"দেখ ক্ষমতাটা তা ছিল নাক অমন্দ-বিশেষ,
কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চলে' যেতাম বেশ,
হ'তাম পেলে সুযোগ এও, বুঝি একটা যেও সেও,
কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে আমি হ'তাম নিঃসন্দেহ,
কিন্তু প্রথমে সে ধাক্কাটি আমায় দিল না কেহ,
তাই যা ছিলাম তা র'য়ে গেলাম আমি চটে-মোটেইত।"

আত্ম-সম্মান আর একটি স্বার্থময় অনুভূতি—ইহাতে স্বার্থপরতা আছে আবার পরার্থপরতাও আছে। এখানে আত্মাই যদিও লক্ষ্যস্থল তবুও ইহা মনুষ্যের একটি মহৎ গুণ। সকলেরই হৃদয়ে এই অনুভূতির স্থিতি বাঞ্ছনীয়। নিজেকে নিজের লক্ষ্যস্থল করিলেই আত্ম-সম্মান জ্ঞান হয় না। যে গুণের জন্য অপরে আমাদের সম্মানার্হ সেই গুণের অধিকারী না হইলে আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে না।

আত্ম-সম্মান।

আত্ম-সম্মানের সহিত আর একটি অনুভূতি সংশ্লিষ্ট। এটিকে অহঙ্কার বলা যাইতে পারে। নিজের উন্নত অবস্থার জ্ঞান হইতে এই অনুভূতির উৎপত্তি হয়। আমি কতকগুলি গুণের অধিকারী, ইহা অসাধারণ গুণ, অপরে এ গুণ দৃষ্ট হয় না, এইরূপ জ্ঞান হইতে অহঙ্কারের অনুভূতি হয়। এই অনুভূতি চিন্তানুমোদিত না হইলে ফল বিষময় হয়।

অহঙ্কার।

"উত্তরে কি ভাগ্য তোর! কি ভাগ্য আমার!

ষোড়শ বৎসর মম, সেনাপতি পদে
করেছেন ধর্ম্মরাজ এ দাসেরে বরণ
আজি রণে। এই দেখ উষ্ণীষে আমার
আশীর্ব্বাদ, গলে বীর-বাঞ্ছনীয় হার।
দ্রোণ-প্রতিদ্বন্দ্বী আমি! ষোড়শ বৎসরে
ফলিয়াছে এ গৌরব, এ ইন্দ্রত্ব ভার,
কোন্ ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যে, কোন্ ক্ষত্রিয়ার?"

অহঙ্কারের শারীর অভিব্যঞ্জক—

বর্দ্ধিষ্ণু বা তুষ্ট অহঙ্কার।

- উন্নমিত ভ্রূযুগ।
- " মস্তক।
- " গ্রীবা।
- " শরীরকাণ্ড।
- ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি।
- নিম্নাধর প্রক্ষেপণ।
- তেজবদ্ধ মুখ।
- দীর্ঘ প্রসারিত হস্ত প্রদর্শন।
- হস্তাঙ্গুলি ঘূর্ণন।
- মস্তকোপরি হস্তোত্তোলন।
- স্ফীত বক্ষ।
- কটিদেশ বা বক্ষে হস্ত স্থাপন।
- পা ছড়াইয়া নির্ব্বোধের ন্যায় চলন।
- সপরিশ্রম নিশ্বাস ত্যাগ।
- মৃদু হাস্য।
- উচ্চ হাস্য।

দলিত অহঙ্কার :

- নমিত ভ্রূযুগ।
- নমিত অক্ষিপুট।
- নত মস্তক।
- নত গ্রীবা।
- নত শরীর।
- নিম্ন দৃষ্টি।
- নিস্তেজ চক্ষু।
- লুকাইবার বা পলাইবার চেষ্টা।

তুষ্ট অহঙ্কারের ভাব।

- নমিত মস্তক।
- উজ্জ্বল চক্ষু।
- ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি।
- ধন্যবাদ দেওয়ার ভঙ্গি।
- আরাধনা করার ভঙ্গি।
- অশ্রু ও হাস্য।
- ওষ্ঠদ্বয় কুঞ্চন (মুখাবয়বের আকৃতি ছোট করিবার নিমিত্ত)
- কম্পন এবং স্বর দমন।

অহঙ্কার হইতে আত্মনির্ভরতার সৃষ্টি হয়। আমি অসাধারণ গুণের অধিকারী এই জ্ঞান থাকিলে নিজের ক্ষমতায় সহজেই বিশ্বাস জন্মে। নিজের উপর নিজের ভাল ধারণা না থাকিলে আত্মনির্ভরতা আইসে না। আমার শক্তি আছে, অপরের সাহায্য ব্যতীত আমি নিজের কাজ নিজেই করিতে পারি, অপরকেও আমি সাহায্য করিতে পারি—এই প্রকার জ্ঞান হইতে আত্মনির্ভরতা আইসে।

"আর্য্যঋষির অনাদি গভীর, উঠিল যেথানে বেদের স্তোত্র,
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি, নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র!
তাদের গরিমা স্মৃতির বর্ম্মে, চলে যাব শির করিয়া উচ্চ—
যাদের গরিমায় এ অতীত, তারা কথনই নহে তুচ্ছ।"

"শক্তিশালী তুমি করি অবশ্য স্বীকার,
কিন্তু আমি পিতার আজ্ঞায়
আসিয়াছি একাকী দমিতে তক্ষশীলা।

*　　*　　*

না লব সাহায্য কারো—অধীনতা করি।
রুষ্ট হও তুষ্ট হও তাহা নাহি গণি,
জীবনে প্রতিজ্ঞা মম হবে না লঙ্ঘন।

*　　*　　*

হইব ধরণীপতি নাহিক সংশয়।
বেগবান নদে কেবা রোধে
কে বারে উদ্যমশীল পুরুষের গতি!
তক্ষশীলা নিশ্চয় করিব অধিকার।"

আত্মনির্ভরতা যে একটি সদ্‌গুণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ব্যতীত এই অনুভূতি থাকিতে পারে না; কিন্তু বিশ্বাসের সীমা আছে; এই সীমা লঙ্ঘন করিলে আত্মনির্ভরতা উন্নতির অন্তরায় হয় এবং অনিষ্টের কারণ হয়।

আমরা সকলেই অপরের প্রশংসা পাইতে ইচ্ছা করি। অপরের

প্রশংসা বড়ই প্রীতিকর। আত্মরক্ষা এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক বাসনা হইতে এই অনুরাগের সৃষ্টি। আমি যখন অপরের প্রশংসা ভালবাসি, তখন নিশ্চয়ই আমি মনে করি যে অপরে আমার গুণ অবধান করুক এবং প্রশংসা করুক। এখানে "আমার" চিন্তাও আছে, "পরের" চিন্তাও আছে। অপরের প্রশংসায় অনুরাগ সহজাত অনুভূতি। বালক তাহার মাতার হাসি এবং ললাট কুঞ্চনের পার্থক্য অনুভব করিতে পারে। অপরের প্রশংসাভাজন হইলেই যে আমি সুখী হই তাহা নহে, আমি প্রশংসার উপযুক্ত এ জ্ঞানটুকু থাকা আবশ্যক। আমি প্রশংসার পাত্র না হইলেও, প্রশংসা কর্ত্তার অজ্ঞতা হেতু প্রশংসা পাইতে পারি এবং এরূপ প্রশংসালাভে সুখও হয় সত্য, কিন্তু এ সুখ অনাবিল নহে। আমি নিজের অনুপযুক্ততা বুঝিতে পারিতেছি এবং সুখের মধ্যেও নিজের নিকট নিজেই লজ্জিত হইতেছি। এরূপ সুখে লজ্জা আছে আবার আশঙ্কাও আছে—ভয় হয় পাছে আমার অনুপযুক্ততা প্রকাশ হইয়া পড়ে। যদি আমি বুঝিতে পারি যে বাস্তবিক আমি প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত, যাহারা প্রশংসা করিতেছে তাহারা আমার গুণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে তখন আমি প্রকৃত সুখের অধিকারী হই। আবার আমি যদি বুঝিতে পারি যে আমাকে প্রশংসার অনুপযুক্ত মনে করিয়াও আমাকে প্রশংসা করিতেছে তখন আমার আনন্দ হওয়া দূরে থাকুক বরং বিরক্তির সঞ্চার হয়। আমি যাঁহাকে যত ভক্তি করি তাঁহার প্রশংসা তত আদরণীয়। যখন মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় তখন একের প্রশংসা উপেক্ষা করিয়া অপরের প্রশংসা আলিঙ্গন করি। প্রশংসা কর্ত্তার সংখ্যার উপরও আমার সুখের মাত্রা নির্ভর করে। যত বেশী লোকে আমার সুখ্যাতি করিবে তত বেশি আমার আনন্দ হইবে। যিনি আমার মতের পোষকতা করেন

প্রশংসানুরাগ

তাঁহাকে আমি বড় বলিয়া মনে করি আর যিনি তাহা করেন না— তাঁহাকে নগণ্য মনে করিয়া দুঃখ লাঘব করিতে চেষ্টা করি।

আত্ম-সম্পৃক্ত ভাব—

ভাবিদর্শী ভাব।	আশা বা আশঙ্কা, প্রতীক্ষা বা উৎকণ্ঠা, প্রত্যয় বা ত্রাস। সাহস বা ভীতি; শালীনতা বা নির্লজ্জতা। আত্মজ্ঞান, আত্মৈশ্বর্য্য আত্মশক্তি আত্মসম্মান প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষা।
অব্যবহিত ভাব।	উল্লাস বা শোক, হর্ষ বা বিষণ্ণতা, হর্ষোন্মাদ বা অবসাদ। তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি, মনের স্থৈর্য্য বা বৈকুল্য। দর্প বা বিনয়, ধৈর্য্য বা অধৈর্য্য, বৃথাগর্ব্ব বা নম্রতা।
পশ্চাদ্দর্শী ভাব।	পরিতোষ বা পরিবেদনা, প্রসন্নতা বা অপ্রসন্নতা। আত্মাভিনন্দন বা আত্মগ্লানি, আত্মপ্রশংসা বা আত্মনিন্দা, সুখ বা দুঃখ স্মৃতি সমুদ্ভূত ভাবসমূহ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

পরানুসন্ধায়ী ভাব।

পরানুসন্ধায়ী ভাব।

অপরের চিন্তা হইতে যে সকল অনুভূতির উদয় হয়, তাহাদিগকে পরানুসন্ধায়ী ভাব বলে। পরের জন্য এবং পরের সহবাসে যে সকল অনুভূতির উদয় হয় তাহারা সহানুভূতি, স্নেহ, ভালবাসা, অনুরাগ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়, আর যে সকল অনুভূতি অপরের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়, অপরের সহবাস হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যায়, তাহাদিগকে বিরোধ বিদ্বেষ ঘৃণা প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। অতএব পরানুগামী ভাবের—

নাম	পরানুসন্ধায়ী ভাব সহানুভূতি এবং বিরোধ অনুরাগ এবং বিরাগ ভালবাসা এবং ঘৃণা	পশ্চাদ্দর্শী অব্যবহিত ভাবিদর্শী

একটি বালক দারিদ্র্যের কষাঘাতে উৎপীড়িত হইতেছে, তাহার অবস্থায় আমার করুণার উদয় হইল, তাহার জন্য আমার দুঃখ হইল, তাহার প্রতি আমার সহানুভূতি হইল। ঈশ্বরের নিকট নিবেদন পাইলাম যে, তাহার দুঃখের অবসান হউক। অবশেষে তাহার দুঃখের মেঘ কাটিয়া গেল।

সুখ-সূর্য্যের উদয় হইল। তাহার সুখে আমারও আনন্দ হইল। এই করুণা এই দুঃখ, এই সহানুভূতি, এই আনন্দ—পরানুসন্ধায়ী ভাব।

"ও হৃদয়ে কভু না বিরাজে
স্বার্থ চিন্তা—কামনা-বাসনা।
চিরদিন বিস্মরি' আপনা,
আপনারে দিয়াছ ডুবায়ে
অন্তহীন পরার্থ-চিন্তায়।"

ভালবাসা।

ভালবাসা একটি পরানুসন্ধায়ী ভাব। ইহা মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতি। একজন আর একজনকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না।

"হের সহচরী শোভার লহরী
বহে যায় এ নিখিলে,
একা দেখে সুখ জাগে না পরাণে,
তুমি যদি না দেখিলে।"

মানুষ একা থাকিতে জানে না, একজন আর একজনের সহিত মিলিত হইতে চায়। এই মিলনের বাসনা হইতে ভালবাসার সৃষ্টি হয়। ভালবাসাই একজনকে অন্যের সহিত বন্ধন করিয়া রাখে। ভালবাসা মানবের মিলন-রজ্জু। ভালবাসাই সমাজ সমষ্টির হেতু। ভালবাসা হইতে অন্যকে রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। ভালবাসা পালনী শক্তি। যাহাকে ভালবাসি তাহার সহায়তা করিতে, আপদে বিপদে তাহাকে রক্ষা করিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়।

"যদি কেহ নাহি চায়,
আমি লইব।
তোমার সকল দুখ
আমি সহিব।
আমার হৃদয় মন
সব দিব বিসর্জ্জন,
তোমার হৃদয় ভার
আমি বহিব।"

নানা কারণে এই অনুরাগের পুষ্টিবর্দ্ধন হয়। বালক-বালিকারা একবারে নিরাশ্রয় এবং নিঃসহায় বলিয়া উহাদের মাতৃপ্রেম এত অধিক। যাহাদের নিকট হইতে আমরা সদ্ব্যবহার পাই, যাহারা আমাদের প্রতি সদয়, আমরা তাহাদের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হই। যখন আমরা সুখের হিল্লোলে সন্তরণ দিতে থাকি, তখন যেন আমাদের অনুরাগের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যখন কোন একটি সুসংবাদ পাই, যখন আমাদের হৃদয় আনন্দে মাতোয়ারা হয়, তখন সকলকেই আমরা প্রীতির চক্ষে দেখি, তখন সকলই যেন সুশোভন বলিয়া মনে হয়; তখন—

"আমার চোখেতে সকলি শোভন,
সকলি নবীন, সকলি বিমল,
সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন,
বিশদ জোছনা, কুসুম কোমল,
সকলি আমারি মত!
* * *
সুখী হৃদয়ের সুখের গান।"

অপরের দুঃখ দৈন্য দেখিলে অনুকম্পার উদয় হয়, পরে এই অনুকম্পা ভালবাসায় পরিণত হয়। সুখ দুঃখ উভয়ই ভালবাসার কারণ। ভালবাসা কষ্টের কঠোরতা হ্রাস করে এবং সুখের শান্তি বৃদ্ধি করে—

"এ জগৎ মুকুরের গৃহ হেথা শত প্রতিবিম্ব ঘিরে,
তোমার সকল ভঙ্গিভাব তোমাকেই নিত্য দেয় ফিরে
প্রসন্ন মধুর মুখগুলি চারিদিকে যদি প্রয়োজন,
প্রসন্ন সহাস মুখে তবে এ গৃহেতে করো বিচরণ।"

সুখে যেমন অনুরাগের মাত্রা বৃদ্ধি হয়, দুঃখের আতিশয্যেও তেমনি বিরাগের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

"অবস্থায় হবে দয়া ঘোর নির্দ্দয়তা,
পিতৃ ঘৃণা,
ভ্রাতা, যার বার বার রক্ষিল জীবন,
করিতেছে মরণ-কামনা অশোকের,
নির্ব্বাসিত তাহারি কৌশলে।
মাতা-পত্নী-ভ্রাতা-পুত্র কারাগারবাসী,
পিতৃরাজ্যে উপহাস ভাজন সবার,
ঘৃণ্যালোকে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত বলি।
হেন অবস্থা পীড়নে এক বুদ্ধ বিনা
কাহার হৃদয়ে আর দয়া পাবে স্থান!"

তাই এখন অশোক বলিতেছে—

"না না তিলমাত্র নাহিক চিন্তা,
কর ঘোর প্রলয় গর্জ্জন মেঘদল,

করি নিজ হৃদয়ের ছায়া দরশন ;
বহ বহ প্রবল পবন,
প্রবল ঝটিকা যথা—
আলোড়িত করিছে অন্তর,
আলোড়ন কর ধরাতল।
চূর্ণ কর সুন্দর যে বস্তু আছে যথা,
ধ্বংস হোক মানব মণ্ডল,
মম কোপানল অনুরূপ প্রলয়দামিনী
সহস্র দলকে দলি উগার প্রলয় ধারা,
বজ্র হৃদয়ের মম হেরি ছায়ারূপ।"

ভালবাসার শারীর অভিব্যঞ্জক—

মৌলিক আকর্ষণী গতি	চক্ষুর গতি।
	ওষ্ঠদ্বয়ের গতি।
	মস্তকের গতি।
	শরীর কাণ্ডের গতি।
	বাহুর গতি।

সংস্পর্শন	হস্তের দ্বারা আদর।
	চুম্বন।
	নাসিকা সংযোগে আদর।
	জিহ্বা সংযোগে আদর।
	হস্তে হস্ত স্থাপন।
	নানা প্রকারে আলিঙ্গন।

সহানুভূতিসূচক ব্যাপার—
- মৃদু হাস্য।
- উচ্চ হাস্য।
- অশ্রু।
- গলাগলি উপবেশন ও চলন।
- বশ্যতার লক্ষণ
  - নতজানু।
  - ভূমিস্পর্শ।
  - পদ চুম্বন।
- অথবা কথোপকথন।
- একই কথার পুনঃপুনঃ উল্লেখ।
- গীত বাদ্য।

ভালবাসার প্রকার—

(১) মুখ্য প্রেম—ঈশ্বরানুরাগ।
(২) বাৎসল্য প্রেম।
(৩) দাম্পত্য প্রেম।
(৪) পুত্র-ধর্ম্মক প্রেম।
(৫) ভ্রাতৃ প্রেম।
(৬) সুহৃৎ প্রেম।
(৭) স্বদেশ প্রেম।

ভাল বস্তু মাত্রেই আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করে। যাহা মন্দ তাহাতে আমরা বীতশ্রদ্ধ। অতএব ভাল এবং মন্দের পার্থক্য জ্ঞান না থাকিলে শ্রদ্ধা ভক্তির উদয় হইতে পারে না।

ভক্তি।

যতক্ষণ তোমাকে আমি শ্রদ্ধার পাত্র, ভক্তির পাত্র বলিয়া না বুঝিতে পারিব ততক্ষণ তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বা

ভক্তি কোন ভাবেরই উদয় হইবে না। অতএব অভিজ্ঞতা ব্যতীত, বুদ্ধিবৃত্তির পরিপুষ্টি ব্যতীত, শ্রদ্ধা ভক্তিরূপ অনুভূতির উন্মেষ হইতে পারে না। যিনি জ্ঞানী, যিনি ন্যায়বান্, যিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং যিনি সংযমী তিনিই আমাদের ভক্তির পাত্র।

"কেন পূজে বৎস! নর ওই সবিতারে?
ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, বীর্য্য,—কে না পূজে বল?
করে দেবত্বের পূজা কি স্বর্গ ভূতল।"

কিন্তু ন্যায়পরায়ণতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সংযমশীলতা কাহাকে বলে যতক্ষণ না বুঝিব ততক্ষণ তাঁহাকে ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিতে পারিব না। এই জন্য বালক-বালিকাদের মধ্যে এই প্রকার অনুভূতির প্রাবল্য কম। ভক্তিতে আত্মোৎসর্গ আছে এবং ইহা স্নেহকণা মিশ্রিত। যে ভক্তি সস্নেহ ভক্তি নহে সে ভক্তিকে প্রকৃত ভক্তি বলা যায় না।

ছোট ছোট বালক-বালিকাদের অন্তঃকরণে সহানুভূতির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দুই মাস মাত্র বয়স্কের বালকও তাহার মাতাকে হাসিতে দেখিলে হাসিয়া থাকে। ইহাও আর একটি সহজাত অনুভূতি। ইহা নিশ্চেষ্টানুভূতি, ইচ্ছাধীন বা শিক্ষালব্ধ নহে। আমাদের অনুকরণ প্রবৃত্তি আছে—এই প্রবৃত্তি বলে পরের অনুভূতি আমাদের অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হয়। কোন কোন অপরিচিত লোক দেখিলে আমাদের মনে আনন্দ হয়, আবার কোন কোন লোক দেখিলে সহজেই বিরক্তি জন্মে। কোন কোন নূতন জিনিষে আমাদের সহজেই অনুরাগ জন্মে আবার কোন কোন জিনিষে সহজেই বিরাগ উপস্থিত হয়। কেন এইরূপ অনুরাগ বা বিরাগের উদয় হয় জানি না। ইহা আমাদের অজ্ঞাতসারে এবং অনভিমতে আমাদের

সহানুভূতি।

হৃদয় অধিকার করে। অনুভূতির কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ আছে। ঐ লক্ষণের সহিত অনুভূতির সঙ্গ আছে বলিয়া লক্ষণ দেখিয়া অপরের অনুভূতি অনুমান এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। কিন্তু অনুভূতি বিশেষের লক্ষণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, কোন অনুভূতির কোন লক্ষণ জানিতে হইলে, সময় এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

সহানুভূতির উপাদান।

ইন্দ্রিয়শক্তির যেমন বিকাশ হয় সহানুভূতিও তেমনি পরিপুষ্টি লাভ করে। ইন্দ্রিয়শক্তি ক্ষীণ হইলে সহানুভূতিও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বৃদ্ধ বয়সে ইন্দ্রিয়সকল শিথিল হয়। বৃদ্ধদের সহানুভূতিও কম। কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ের অভাব হইলেও সহানুভূতির সীমা সঙ্কীর্ণ হয়। যাহারা বধির তাহাদের যেন আত্মম্ভরিতা অধিক বলিয়া মনে হয়। ইন্দ্রিয় শক্তি যতই প্রবল হয় অনুভূত বিষয়গুলিও ততই অধিক হয়। নূতন নূতন বিষয়ের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতিরও প্রসার বাড়িয়া যায়। কল্পনা সহানুভূতির আর একটি উপাদান। অপরের অনুভূতি স্মরণ করিলেই সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। কল্পনাবলে আরও নূতন অনুভূতির চিন্তা করিয়া নিজের অনুভূতিকে উদ্বোধন করিতে হয়। কাহারও দুঃখে দুঃখী এবং সুখে সুখী হইতে হইলে বুদ্ধি বৃত্তিরও আবশ্যক। পরের অনুভূতিকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে সেই অনুভূতির লক্ষণ সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহার প্রকৃতি এবং পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয়। সুতরাং পর্য্যবেক্ষণ এবং অনুমান এই দুই শক্তির আবশ্যক। সাদৃশ্য সম্বন্ধ সহানুভূতির আর একটি হেতু। যাহার সহিত আমার ভাবের বা চিন্তার বা কর্ম্মের বা অন্য কোন প্রকার সাদৃশ্য আছে, সেই আমার সহানুভূতির পাত্র, তাহার প্রতি আমার সহানুভূতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। অপরের অনুভূতিকে হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতার নাম সহানুভূতি।

"তোমার হৃদয় কম্প অঙ্গুলির মত
আমার হৃদয় তন্ত্রী করিবে প্রহত।"

সহানুভূতির অন্তরায়।

সহানুভূতির কতকগুলি অন্তরায় আছে। যেখানে কর্ম্মের আধিক্য সেখানে সহানুভূতির হ্রাস অবশ্যম্ভাবী। কর্ম্মের মাত্রা অধিক হইলে সহানুভূতির পরিধি সঙ্কীর্ণ হইবে। কর্ম্মে একান্ত লিপ্ত থাকিলে পরের জন্য সহানুভূতি প্রকাশের অবকাশ কম হয়। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধনে রত থাকিলে, নিজের সুখই জীবনের মূলমন্ত্র বলিয়া জ্ঞান করিলে, সহানুভূতির উদয় হইতে পারে না, এমত অবস্থায় মন নিজের মায়াবন্ধন উচ্ছেদ করিয়া পরের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া সুখমাত্রেই অন্তরায় নহে, বরং হৃদয় যখন আনন্দাপ্লুত হয় তখন যেন সহানুভূতির অমৃতধারা আপনিই উথলিয়া পড়ে, আবার যখন দুঃখে আক্লিষ্ট হই তখন যেন সহানুভূতির উৎস শুষ্ক হইয়া যায়। সুখে সহানুভূতি আসে, আবার সহানুভূতিতে সুখ আসে।

সুলোচনা।

"অভাগি! এরূপে কি লো অনিদ্রায় অনাহারে
খোয়াইবি দেহ আপনার?
নাহি রাত্রি নাহি দিন থাক প্রলেপের মত
লাগি অঙ্গে আহত সবার!

* * * *

এইরূপে রাত্রিদিন মরিয়া মড়ার তরে
নাহি জানি পাও কিবা সুখ?"

সুভদ্রা। "ততোধিক রমণীর আছে কিবা সুখ"?

ইন্দ্রিয় শক্তির স্বল্প বিকাশ বা হ্রাস এবং শারীরিক অসুস্থতা, ক্রোধ, লোভ, বিরাগ প্রভৃতি স্বার্থসম্পর্কীয় অনুভূতি, শিক্ষার পার্থক্য, সমাজগত পার্থক্য, মতের পার্থক্য, ধর্ম্মের পার্থক্য, জাতিগত পার্থক্য ইত্যাদি সকল প্রকার পার্থক্য সহানুভূতির অন্তরায়। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেইখানে সহানুভূতির অভাব। এক ব্যবসায়ী লোকের মধ্যে সহানুভূতি কম।

সুখ দুঃখের সহিত সহানুভূতির সম্বন্ধ।

দুঃখ সহানুভূতির সহায়ও বটে আবার অন্তরায়ও বটে। যিনি আশৈশব সুখের ক্রোড়ে লালিত পালিত, যিনি কখনও দুঃখ এবং দৈন্যে অভিভূত হন নাই, তাঁহার হৃদয়ে সহানুভূতির মন্দাকিনী প্রবাহিত হয় না।

"সুখে আছে যারা, সুখে থাক্ তারা,
সুখের বসন্ত সুখে হোক্ সারা,
দুখিনী নারীর নয়নের নীর
সুখী জনে যেন দেখিতে না পায়!
তারা দেখেও দেখে না
তারা বুঝেও বুঝে না
তারা ফিরেও না চায়!"

দুঃখের কষাঘাতেই সহানুভূতির বিকাশ হয়। কিন্তু নিজে যখন দুঃখ ও কষ্টে জর্জ্জরিত তখন নিজের দুঃখ কষ্ট অপনোদনের জন্যই মন ব্যস্ত থাকে, অপরের বিষয় ভাবিবার অবকাশ থাকে না। যিনি নিজে সুস্থ শরীরে এবং প্রফুল্ল মনে থাকেন তাঁহার পক্ষে সহানুভূতি প্রদর্শন সহজ হয়। সহানুভূতির বাসনা হইতেই সহানুভূতির অস্তিত্ব অনুভব করা উচিত হয় না। আমি অপরের সহানুভূতি পাইতে ইচ্ছা করি বলিয়াই

যে অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনেও সমুৎসুক মনে করা ভুল। অপরের অনুভূতিকে অপরের সুবিধার জন্য আপনার অনুভূতি বলিয়া মনে করার নামই সহানুভূতি। সহানুভূতিতে অপরের সুখের বৃদ্ধি এবং অপরের কষ্টের লাঘব হয়। এখানে দাতা অপেক্ষা গ্রহীতার সুখ অনেক বেশী সুতরাং স্বার্থপর লোকের হৃদয়েও সহানুভূতির বাসনা থাকিতে পারে।

"জ্ঞান, এক নদীস্রোত বহিলে দ্বিতীয় পথে,
হয় পূর্ব্ব স্রোতোবেগ মৃদু মৃদুতর।
দুঃখের করিলে অংশী হয় দুঃখ প্রশমিত,
শোকে সমহৃদয়তা বড় শান্তিকর"।

সুতরাং স্বার্থপর ব্যক্তি নিজ দুঃখ অপনোদনের নিমিত্ত অপরের সহানুভূতির আকাঙ্ক্ষা করিবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? সহানুভূতি স্বভাবতঃই দুঃখের অনুগমন করে। অপরের সুখে সুখী হওয়া অপেক্ষা অপরের দুঃখে দুঃখী হওয়া সহজসাধ্য। অপরের অবস্থার সহিত নিজের অবস্থার তুলনা স্বাভাবিক। অপরকে দুঃখক্লিষ্ট দেখিলে নিজের দুঃখ রাহিত্যের কথা সহজেই মনে হয়। অপরে দুঃখক্লিষ্ট আর আমি দুঃখ: বিনির্মুক্ত, এই প্রকার জ্ঞান হইতে মনে কিঞ্চিৎ আনন্দের উদয় হয়, এই আনন্দটুকু সহানুভূতির সহায়, অন্তরায় নহে। অপরের সুখকে নিজের সুখ মনে করা বিশেষ সহজসাধ্য নহে। অপরের উন্নতি দেখিলে স্বভাবতঃই মনে হিংসার উদ্রেক হয় এবং এই হিংসাটুকু দমন রাখিতে শিক্ষা এবং সাধনার আবশ্যক। মানুষ হইলেই পরের দুঃখে দুঃখী হইতে পারে কিন্তু দেবতা না হইলে পরের সুখে সুখী হইতে পারে না।

সহানুভূতি মানুষকে জ্ঞানের দিকে, কর্ম্মের দিকে এবং ধর্ম্মের দিকে

লইয়া যাইতেছে। যাহা আর পাঁচজনে করে আমারও তাহাই করিতে প্রবৃত্তি হয়। ছাত্রাবাসে যখন সকল বালক পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করে তখন নিতান্ত দুরন্ত বালকেরও পুস্তক খুলিয়া বসিবার বাসনা জন্মে। এক পরিবারস্থ সকলেই কোন কর্ম্মে রত হইলে একজনের পক্ষে সেই কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়া কষ্টকর। একজন জ্ঞানবান হইলে সকলেরই সেইরূপ হইবার বাসনা জন্মে। যেখানে সহানুভূতি সেইখানেই দয়া এবং ভালবাসা। যাহাকে আমি স্নেহ করি, যাহাকে আমি ভালবাসি, তাহার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার, অন্যায় ব্যবহার করিতে পারি না। অতএব সহানুভূতি ন্যায়ের সহায় এবং অন্যায়ের অন্তরায়। অবশ্য মানুষ সুখের জন্য লালায়িত কিন্তু নিজে সুখী হইলেই সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সুখী মনে করিতে পারে না, সে অপরকেও নিজের সুখের অংশ দিবার জন্য ব্যস্ত। অপরে তাহার সুখের অংশীদার হইলেই সে নিজেকে প্রকৃত সুখী বলিয়া মনে করে। তোমার সুখের কথা, তোমার দুঃখের কথা তুমি আর একজনকে না বলিয়া কতক্ষণ নিজের হৃদয়ে পোষণ করিতে পার ?

সহানুভূতির উপকারিতা।

"এসেছি বড় সাধ ক'রে।
করি গান মনের টানে, শোনাই যার মনে ধরে ॥
যে বোঝে বেদনা, তার থাক্‌বো কেনা সদাই বাসনা,
গানে জানাই ব্যথিত জনে, কত ব্যথা অন্তরে ॥
দরদী বিনে দরদ কে জানে
বেদরদীর দরদ নাই প্রাণে ;
ব্যথায় ব্যথিত হ'লে পরে, ব্যথার ব্যথা নেয় হরে"।

একই মন্ত্রের উপাসক, একই পথের পথিক, একই চিন্তার ভাবুক দেখিলে

কি আমাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে না? অতএব সহানুভূতিই সামাজিক সুখের কারণ।

"নরদেহে তবে কেন এসেছি ভবে
যদি ভালবাসা নরে বিলাতে নারি।
আছে মানব হৃদয়, তবে দিব পরিচয়,
অনাথে হৃদে যদি ধরিতে পারি॥

হেরি দুঃখ নিশিদিন, যদি রহি উদাসীন,
মুছাতে নয়নবারি নারি যতনে!
কর বিফলে দোলে, কেন চরণ চলে,
জনহিত ব্রত যদি না থাকে মনে॥"

মনের ভাবের সহিত শারীর অভিব্যঞ্জকের সঙ্গকেও সহানুভূতি বলা হইয়া থাকে। এরূপ সহানুভূতি সাধারণতঃ চারিপ্রকার—

দৈহিক-সহানুভূতি।

দৈহিক সহানুভূতি
- অনুকারী সহানুভূতি।
- যান্ত্রিক সহানুভূতি।
- অধিকারগত সহানুভূতি।
- কেন্দ্র সহানুভূতি।

অপরে জৃম্ভণ করিলে আমিও জৃম্ভণ করি, অপরে দৌড়াইয়া পলাইলে আমিও তাহাদের অনুসরণ করি, অপরে কোনদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমিও সেইদিকে দৃষ্টিপাত করি—এইরূপ ক্রিয়া সকলকে অনুকারী

সহানুভূতি বলে। প্রথমতঃ মস্তক সঞ্চালনের দ্বারা 'না' এই কথাটি প্রকাশ করি, পরে হস্তান্দোলনের সাহায্যে এবং অবশেষে যদি আবশ্যক হয় তবে শরীরকাণ্ডের পরিচালনের দ্বারাও এই ভাব প্রকাশ করিয়া থাকি। মুখ ব্যাদান করিয়া বা বক্রদৃষ্টিতে বা হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বা কখন কখন পদোত্তোলন করিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকি। এইরূপ ভাবানুযায়ী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন যন্ত্রগত সহানুভূতির কার্য্য। পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি বা অধিকার আছে এবং সেই বৃত্তি অনুযায়ী সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। হস্তের দ্বারা আদর, চক্ষুর দ্বারা অনুরাগ, ওষ্ঠ দ্বারা প্রেম প্রকাশ পায়।—এইপ্রকার সহানুভূতিকে অধিকারগত সহানুভূতি বলে। আবার মস্তক কণ্ডুয়নে চিন্তা, চক্ষু নিমীলনে কষ্ট বা শঙ্কা, নাসিকা বিস্ফারণে ঘৃণা সূচিত হয়—এরূপ সহানুভূতি স্নায়ুকেন্দ্র সম্বন্ধীয়।

পরানুসন্ধায়ী ভাব—

ভাবিদর্শী { অব্যবহিতি ভাবের অনুরূপ কিন্তু ভবিষ্যৎ চিন্তা সমুৎপন্ন

অব্যবহিত {
ভালবাসা বা ঘৃণা; মিত্রতা বা বৈরিতা;
শ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস; সহানুভূতি বা বিদ্বেষ;
অনুকম্পা বা উপেক্ষা; প্রশংসা বা ঈর্ষা; পূজা বা নিন্দা; ভক্তি বা অবজ্ঞা।
অনুরাগ বা বিরাগ; পক্ষপাত বা অপক্ষপাত;
হৃদ্যতা বা অহিতৈষিতা; কৃতজ্ঞতা বা অকৃতজ্ঞতা;
বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বনিন্দা; করুণা বা ক্রূরতা;
রসিকতা বা ক্রোধপরায়ণতা; আদর বা অনাদর ইত্যাদি।

- পশ্চাদ্দর্শী — অব্যবহিত ভাবের অনুরূপ কিন্তু অতীত চিন্তা সমুৎপন্ন।

আত্মপর-সম্পৃক্ত ভাব

- সিদ্ধিবিষয়ী
  - ইষ্ট সিদ্ধিকালীন
    - আশা
    - আনন্দ
    - তুষ্টি
  - স্বয়ং লব্ধ
    - অহঙ্কার
    - গর্ব্ব
    - সাহস
    - আস্থা
  - পর সাহায্য লব্ধ
    - কৃতজ্ঞতা
    - শুভ কামনা
    - আনুগত্য
  - অপর লব্ধ
    - প্রশংসা
    - সম্মান
    - প্রতিযোগিতা

- অসিদ্ধিবিষয়ী
  - অসিদ্ধিকালীন
    - ভয়
    - নৈরাশ্য
    - নিরুৎসাহ
  - স্বলব্ধ
    - নম্রতা
    - লজ্জা
    - মর্ম্মপীড়া
  - পরসাহায্য লব্ধ
    - ক্রোধ
    - বিরক্তি
    - ঘৃণা
    - ঈর্ষা
    - হিংসা
    - অবজ্ঞা
    - দ্বেষ
  - অপর লব্ধ
    - ঘৃণা
    - অনুকম্পা
    - করুণা

ঘৃণা

ঘৃণা সামাজিক বন্ধনের অন্তরায় এবং মানুষের দুঃখের বিশেষ কারণ হইলেও ঘৃণার উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। যাহা মন্দ যাহা কুৎসিত তাহাই আমরা ঘৃণা করি। কিন্তু এই ভাবটির অপব্যবহার করিলে ফল বড়ই বিষময় হয়, সমাজের শান্তির প্রত্যবায় ঘটিয়া থাকে। পাপকে ঘৃণা কর সমাজের

মঙ্গল হইবে কিন্তু পাপীকে ঘৃণা কর সমাজের অশান্তি বৃদ্ধি পাইবে। সমাজ শরীর হইতে পাপ উন্মূলনের জন্য সচেষ্ট হও কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না, তাহাকে তোমার হৃদয় দিয়া, ভালবাসা দিয়া আলিঙ্গন কর, সে যাহাতে নিরয়গামী না হয় সে জন্য যত্নবান হও। কিন্তু-মানুষের মনে ঘৃণা প্রায়ই বিরাগে পরিণত হয় বলিয়া ইহাকে সমাজ-দ্রোহী ভাব বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ঘৃণার শারীর অভিব্যঞ্জক

মৌলিক প্রত্যাবর্ত্তি গতি —
- মস্তক ফিরান
- সমস্ত শরীর ফিরান
- হস্ত প্রসারণ (যেন ঘৃণিত পদার্থ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত)
- চক্ষু কুঞ্চন
- চক্ষু নিমীলন
- নাসিকা কুঞ্চন
- ওষ্ঠ উন্নমন

তর্জ্জন সম্বন্ধীয়	ভ্রূদ্বয়ের অস্বাভাবিক আকুঞ্চন চক্ষু বিস্ফারণ দন্ত প্রদর্শন দন্ত ঘর্ষণ চোয়াল কুঞ্চন মুখব্যাদান জিহ্বা নিষ্কাসন মুষ্টিবদ্ধ হস্ত ভীতি ব্যঞ্জক হস্ত সঞ্চালন পদাঘাত দমকা নিঃশ্বস ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ একই কথার পুনরুচ্চারণ স্বর কম্পন অকস্মাৎ স্বর বসিয়া যাওয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ
রক্তকোষ এবং সহানুভূতি সম্বন্ধীয়	ওষ্ঠ কম্পন শরীর কম্পন স্বগাত্রে নখাঘাত কেশোৎপাটন ওষ্ঠে দন্তাঘাত হস্তে দন্তাঘাত কষ্টে হাস্য আরক্তিম মুখ আকস্মিক বিবর্ণ মুখ নাসা বিস্ফারণ দণ্ডায়মান কেশ

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

বুদ্ধিবিষয়ক রস।

যে সকল অনুভূতি সত্যের আদর্শ বা মঙ্গলের আদর্শ বা সৌন্দর্য্যের আদর্শ চিন্তা হইতে উৎপন্ন তাহাদিগকে রস বলা হইয়া থাকে। এই প্রকার অনুভূতি বিবেকী জীব মাত্রেই সম্ভব বলিয়া ইহাদিগকে বিবেকী ভাব বলা হয়। এই সকল ভাব আমাদিগকে উন্নতির দিকে আকর্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে শ্রেষ্ঠ ভাব বলা হয়। এই সকল ভাব হইতে পরমাত্মার উৎকর্ষ লাভ হয় বলিয়া ইহাদিগকে আধ্যাত্মিক ভাব বলা হয়। এইরূপ ভাব আদর্শ চিন্তা সমুদ্ভূত বলিয়া ইহাকে সাত্ত্বিক ভাব এবং ইহা সার্ব্বজনিক বলিয়া ইহাকে বিশ্ব ভাবও বলা হয়। অতএব এই প্রকার রসের—

রস কাহাকে বলে।

নাম—
- বিশ্ব ভাব
- বিবেকী ভাব
- শ্রেষ্ঠ ভাব
- আধ্যাত্মিক ভাব
- সাত্ত্বিক ভাব

পশ্চাদ্দর্শী
অব্যবহিত
ভাবিদর্শী

এই রস আবার ত্রিবিধ। ইহা যখন সত্যানুসন্ধায়ী তখন ইহা বুদ্ধিবিষয়ক রস; যখন ইহা সৌন্দর্য্যানুশীলনোদ্ভাবী তখন ইহা সৌন্দর্য্য রস এবং যখন ইহা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যানুগামী তখন ইহা শীলরস নামে অভিহিত হয়।

সত্যজ্ঞান উদ্দীপ্ত ভাবকে সত্যরস বলা হয়। বস্তুনিচয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় হইতে এই ভাবের উদ্রেক হয় বলিয়া ইহাকে বিজ্ঞান রস বলা হয়; আবার জ্ঞানের আলোচনায় এই রসের উদ্রেক হয় বলিয়া ইহাকে জ্ঞান রসও বলা হইয়া থাকে। অতএব এই রসের—

বুদ্ধি বিষয়ক রস।

নাম— { সত্য রস
জ্ঞান রস
বিজ্ঞান রস }

সত্যই আত্মার খাদ্য সুতরাং সত্য নির্দ্ধারণে আত্মা বিমল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়। সত্য রস আমাদিগকে তত্ত্বান্বেষণের জন্য উত্তেজিত করে। জ্ঞান পিপাসা আমাদের মজ্জাগত সুতরাং এ পিপসার শান্তি হইলে সুখ অনিবার্য্য। যাহারা সত্যের জন্য অনশন ব্রত অবলম্বন করে তাহারাই ধন্য, তাহারাই সুখী।

"প্রকৃতি! ঘোম্‌টা খোলো, দেখি কি সহজ সত্য
রাখিয়াছ আবরণে ঢাকি
লুকায়ে স্বরূপ, ছি ছি, কেন গো আকুল কর,
চিত্তপটে মায়া চিত্র আঁকি।"

যখন আমরা জ্ঞানের উপাসনায় রত থাকি, তখন আমাদের হৃদয়ে এক প্রকার অনুভূতির উদয় হয়, এই অনুভূতিকে বুদ্ধি বিষয়ক রস কহে। জ্ঞানারাধনায় যে দুঃখের লেশ মাত্র নাই এমন কথা বলা চলে না। জ্ঞানারাধনায় চিন্তার প্রয়োজন, বিচারের প্রয়োজন। চিন্তায় কষ্ট আছে, বিচারে অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে। কিন্তু সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলে আবার সুখও আছে। এই সুখের তুলনায় চিন্তাজনিত কষ্ট এবং অসামঞ্জস্য জনিত দুঃখ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যখন সংশয়ের ঘনান্ধকার

ভেদ করিয়া সত্য নির্ণয়ে সমর্থ হই তখন প্রীতির বিমল প্রভায় আমাদের চিত্ত উদ্ভাসিত হয়।

"আঁধারে আবৃত ঘন সংশয়
বিশ্ব করিছে গ্রাস,
তারি মাঝখানে সংশয়াতীত
প্রত্যয় করে বাস।"

জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে অবধান শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক কিন্তু অবধান ইচ্ছাশক্তির প্রকার বিশেষ অতএব বুদ্ধিবিষয়িণী প্রীতিতে জ্ঞান আছে, অনুভূতি আছে এবং ইচ্ছাও আছে।

বুদ্ধিবিষয়ক রসের বিশ্লেষণ।

যখন আমি নূতনের সম্মুখে উপস্থিত হই, তখন আমি আমার অজ্ঞতা বুঝিতে পারি। যাহা আমি জানি না, তাহাই আমার অজ্ঞাত তাহাই আমার নিকট নূতন। প্রত্যেক অজ্ঞাত বিষয়, প্রত্যেক নূতন বস্তু, আমার মূর্খতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। আমাকেই আমার বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিতেছে। যখনই আমি আমার অজ্ঞতার পরিচয় পাইলাম, যখনই আমি নিজেকে অজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে পারিলাম, তখনই আমার দুঃখের অনুভূতি হইল—এবং এই দুঃখই জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করে। নূতন বস্তু দেখিলে যদি সহজেই আমাদের বিরাগ উপস্থিত না হয়, তবে সে বস্তুতে আমরা কিঞ্চিৎ আনন্দ পাই সত্য কিন্তু সে আনন্দ কতক্ষণ স্থায়ী? সে বস্তু সম্বন্ধে আমাদের আরও অধিক জানিবার স্পৃহা হয় না কি? সেই বস্তু সম্বন্ধে যাহা জানি না, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়, এবং এই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞতা নিবন্ধন বিরক্তির উদয় হয়।

"একি আশঙ্কা একি উদ্বেগ
ছিঁড়িল মর্ম্মবীণ্

কহে সংশয় 'একি পরাজয়' ?
একি লাভ ? একি ক্ষয় ?
ফিরিবার পথ ক্রমশঃ দীর্ঘ,
একি প্রেম ! একি জয় ।"

নূতন দেখিলে বিস্ময় উৎপন্ন হয় এবং বিস্ময়ে সুখ আছে। আবার এই সুখ হইতে লালসার সৃষ্টি হয়। এই লালসার নাম—

কৌতূহল { তৃপ্ত—সিদ্ধ চিন্তা। অতৃপ্ত—অসিদ্ধ চিন্তা। প্রত্যাখ্যাত—দমিত চিন্তা। }

কৌতূহল হইতে আরও জানিবার স্পৃহা হয়, কিন্তু নিজের অজ্ঞতা হেতু এই কৌতূহল শীঘ্রই বাধা প্রাপ্ত হয়।

"চারিদিকে কি মহাবিস্ময়
প্রগাঢ় রহস্যে ঢাকা ! যত ভাবি, এ ক্ষুদ্র হৃদয়
ততই ব্যাকুলভাবে গুমরিয়া কেঁদে হয় সারা ;
চিন্তা সনে ভ্রান্ত মন ধীরে ধীরে হয় দিশাহারা !"

কিন্তু বাধা প্রাপ্ত হইলেও মানুষের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না ; বাধা প্রাপ্ত হইলেও "মহান বিস্ময় আকুল করিয়া দেয়, স্তব্ধ এ হৃদয় প্রকাণ্ড রহস্য ভারে।" মানুষ অজ্ঞান তিমিরে অধিকক্ষণ আবদ্ধ থাকিতে পারে না। মানুষ অজ্ঞানকে পরিহার পূর্ব্বক জ্ঞানের আলোকে যাইবার নিমিত্ত সতত সচেষ্ট এবং এই চেষ্টা যতই ফলবতী হয়, তাহার প্রীতিও ততই বর্দ্ধিত হয়।

"যখন মানব
দেখে সেই ইন্দ্র, চন্দ্র, নিয়মের দাস,

সুন্দর শৃঙ্খলে গাঁথা। মানব হৃদয়
হইয়া পিপাসাতুর চাহে বুঝিবারে
সুদর্শন নীতিচক্র, নিয়ন্তা তাহার,
মহান্ বিজ্ঞান বিশ্ব !"

জ্ঞানের অনুশীলনে আনন্দ আছে। এ আনন্দ সকলের পক্ষে সমান নহে। মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা এবং বুদ্ধির প্রখরতা অনুসারে আনন্দও পৃথক্। যতই নূতন নূতন তথ্যের আস্বাদন পাওয়া যায় আনন্দ ততই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বারংবার একই তথ্যের আলোচনা করিলে আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হয়। নূতন আমাদিগকে অজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন করে। নিজের অজ্ঞতা জ্ঞানে দুঃখের সৃষ্টি হয় সত্য কিন্তু এ দুঃখ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। দুঃখ নিবারণের আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বাভাবিক সুতরাং যাহা জানি না, তাহা জানিবার জন্য, অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার জন্য যত্নবান হই। নূতন আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। বিস্ময় হইতে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়; সত্য নিরূপণের আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

"শুধু বসি ভূধর শিখরে,
দূর হ'তে দৃষ্টি দিয়ে,
তোমার ছবিটি নিয়ে,
তৃপ্ত নহে প্রাণ মোর;
কি অমিয় তোমার ভিতরে,
পান করি লব প্রাণ ভরে'।"

কিন্তু যখন অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হইল, কৌতূহল নিবৃত্তি হইল তখন প্রীতির পবিত্র আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হইল। তখন বলিলাম—

"এবার মোদের যাত্রার পথে
হাসি আর আলো সাথী;

জয় জয় জয় নূতন সূর্য্য !
জয় সূর্য্যের ভাতি !"

যাহা নূতন বলিতেছি বাস্তবিক তাহা একবারে নূতন নহে, যাহা অজ্ঞাত বলিতেছি বাস্তবিক তাহা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত নহে। নূতনের মধ্যেও পুরাতন আছে; অজ্ঞাত বিষয়ের মধ্যেও অনেক জ্ঞাত বিষয় আছে। যতই আমাদের অভিজ্ঞতার পুষ্টি এবং জ্ঞানের বিকাশ হয়, ততই আমরা নূতনে পুরাতন দেখিতে পাই; ততই আমরা বর্ত্তমানে অতীতকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি—

"দিনান্তের মুখ চুম্বি' রাত্রি ধীরে কয়,
আমি মৃত্যু তোর মাতা, নাহি মোরে ভয় !
নব নব জন্মদানে পুরাতন দিন
আমি তোরে কোরে দিই প্রত্যহ নবীন।"
"অতীতের কথা তুলি'—পতিত, আদর্শচ্যুত
বোলো না গো, বোলো না মোদের।
এইটুকু মেনো সখা, স্থির ইহা জেনো সখা,
বর্ত্তমান—অতীতের জের।"

নূতনের ভিতর যতই আমরা পূর্ব্ব-অভিজ্ঞাত বিষয়ের সাদৃশ্য দেখিতে পাই, বিশৃঙ্খলার মধ্যে যতই শৃঙ্খলা দেখিতে পাই ততই আমাদের হৃদয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়। আমি যেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, সেই দিকেই দেখিতেছি আমার জানিবার বিষয় অনন্ত। কিন্তু এত বিষয়ের এত বস্তুর তথ্য কি প্রকারে সংগ্রহ করিব? কত বিষয় আমার শিখিবার আছে—কিন্তু এত বিষয় আমি কি প্রকারে আয়ত্ত করিব? কোন একটি জিনিষের সহিত আর একটির মিল নাই। আজ যাহা সত্য কাল তাহা মিথ্যায় পরিণত হইতেছে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, চারিদিকে অসামঞ্জস্য—

প্রথমতঃ আমাদের এই প্রকার মনে হয়। এই প্রকার চিন্তা হইতে মন যেন ভারাবনত হইয়া পড়ে, মন যেন অনেকটা হতাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু জ্ঞানের প্রভাবে যখন বহুত্বে এক, পার্থক্যে সাদৃশ্য, এবং বিশৃঙ্খলায় শৃঙ্খলা দেখিতে পাই তখন আমাদের মন আশ্বস্ত হয়, তখন আমাদের মনে প্রীতির উদয় হয়। তখন প্রাণের আবেগে বলিয়া উঠি—

"মহাযন্ত্র বিশ্বরাজ্য কর দরশন!
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, দেখ অগণন!
আকৃতি, প্রকৃতি, গতি, স্বতন্ত্র সকল,
নিত্য বিবর্ত্তিত বিশ্ব তবু সুশৃঙ্খল
এক মহানীতি বলে; * *
* * এই বিবর্ত্তনে
ঝরে যথা শোক-অশ্রু মানব-নয়নে,
ফুটে তথা সুখ-হাসি মানব-বদনে।"

এইরূপে—

"সাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
* * * তার পরে
সত্য দেখা দেয়, ভূষণ-বিহীনরূপে
আলো করি অন্তর বাহির।"

কেবলমাত্র সত্য আবিষ্কার হেতুই যে প্রীতি লাভ হইয়া থাকে তাহা নহে। জ্ঞানের আবিষ্কারে সুখ আছে কিন্তু সেই জ্ঞানের অধিকারী হওয়া কি কম সুখ? আমি জ্ঞানবলের অধিকারী হইয়াছি, আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি, আমি বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছি, অপরে যাহা পারে নাই আমি তাহা করিয়াছি—ইত্যাদি জ্ঞান কি কম আনন্দের

বিষয়! যখন মন হইতে অসামঞ্জস্য, সন্দেহ বিরুদ্ধ ভাব প্রভৃতি অপসৃত হয়, যখন যুক্তি তর্ক ভ্রম প্রমাদশূন্য বলিয়া মনে হয়, তখন বাস্তবিকই চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে। তখন—

"সংশয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব দলিয়া
চিরপ্রত্যয়ে পূর্ণ প্রাণ।"

বুদ্ধি বিষয়ক রসকে নিম্নলিখিত উপায়ে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে—

জ্ঞেয়বিষয়ক	ঐক্য (প্রচ্ছন্ন) বিরোধ	বস্তুগত	সত্য (অনিশ্চয়তা) মিথ্যা	জ্ঞাতাবিষয়ক
	সহজ (গোলযোগ) শক্ত	মনোগত	বিশ্বাস (সংশয়) অবিশ্বাস	

প্রচ্ছন্ন—ঐক্য এবং বিরোধের; গোলযোগ—সহজ এবং শক্তের; অনিশ্চয়তা সত্য এবং মিথ্যার; সংশয়-বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মধ্য অবস্থা।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

সৌন্দর্য্য রস।

তুমি ঐ গোলাপ ফুলটি দেখিতেছ, আস্তে আস্তে ফুলটি প্রস্ফুটিত হইল, তুমি আবেগভরে বলিয়া উঠিলে "আহা ফুলটি কি চমৎকার!" এই যে ফুলের সৌন্দর্য্য হইতে তোমার যে ভাব হইল এই ভাবের নাম সৌন্দর্য্য রস। রূপের সৌন্দর্য্যে, বর্ণের মাধুর্য্যে, অঙ্গের সৌষ্ঠবে, শব্দের বিন্যাসে, গতির ভঙ্গিমায় কে না মুগ্ধ হয়, কাহার অন্তঃকরণে না ভাবের উদ্রেক হয়! এই প্রকার ভাবকেই সৌন্দর্য্য রস বলে। আমার চারিদিকেই সৌন্দর্য্য—বৃক্ষ-লতা, পাহাড়-পর্ব্বত, বন-উপবন, নদী-তড়াগ, চন্দ্র-সূর্য্য যাবতীয় বস্তুই সুন্দর। যখন আমি ঐ তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের উপর দণ্ডায়মান হইয়া অস্তগামী তপনদেবের অদ্ভুত সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করি, তখন আমি যেন মাতোয়ারা হইয়া যাই, আমি নিজেকে তখন যেন ভুলিয়া যাই, আমি তখন আমাতে থাকি না, আমি তখন যেন বিশ্বে বিলীন হইয়া যাই। এইরূপে সুন্দরের সম্মুখে যে আনন্দ হয়, যে সুখ হয়, যে তৃপ্তি হয় তাহাই সৌন্দর্য্য রস।

সৌন্দর্য্য কি? সুন্দর কাহাকে বলে? এ প্রশ্ন বড়ই জটিল। আমরা সকলেই জানি, সকলেই বুঝি তবু বলিতে পারি না সুন্দর কাহাকে বলে।

সৌন্দর্য্য রসের লক্ষণ।

সৌন্দর্য্য কি বুঝিতে পারি; ইহার রূপে মুগ্ধ হই; ইহার শক্তিতে অভিভূত হই তবু কিন্তু বলিতে পারি না ইহা কি? বলিতে পার যাহাতে শৃঙ্খলা

আছে, সৌষ্ঠব আছে তাহাই সুন্দর কিন্তু এখানে তুমি অসংখ্য গুণের মধ্যে দুই একটি উল্লেখ করিতেছ মাত্র, কিন্তু 'সুন্দর' কি তাহা ত বলিতে পারিতেছ না। আমি স্ফুটনোন্মুখ গোলাপ ফুলটি দেখিতেছি আর সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ হইতেছি; ক্ষুদ্র পক্ষীটির সুললিত স্বর শুনিতেছি আর সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইতেছি; আমি মেঘদূত পড়িতেছি আর সৌন্দর্য্যমুগ্ধ হইতেছি; মহাবীর ভীষ্মের জীবনচরিত পড়িতেছি আর সৌন্দর্য্যমুগ্ধ হইতেছি। এইরূপে—

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছায়া।"

সুন্দর বস্তু হইতে মনে উল্লাস জন্মে এই উল্লাসের নাম সৌন্দর্য্য রস। এই রস একবারে নিরাবিল। ইহাতে দুঃখের লেশ মাত্র নাই। এরূপ পবিত্র প্রীতি আর কোন বস্তু হইতে পাওয়া যায় না।

"মৃত্যু কহে পুত্র নিব, চোর কহে ধন,
ভাগ্য কহে সব নিব যা তোর আপন!
নিন্দুক কহিল লব তব যশোভার,
কবি কহে কে লইবে আনন্দ আমার!"

পুত্রে সুখ আছে, ধনে সুখ আছে, ভাগ্যে সুখ আছে, যশে সুখ আছে কিন্তু এ সুখ অনাবিল নহে, একবারে দুঃখ বিরহিত নহে কিন্তু শিল্পের সৌন্দর্য্যে, কাব্যের সৌন্দর্য্যে, চরিত্রের সৌন্দর্য্যে যে সুখ তাহা বিমল, তাহা পবিত্র।

"দেখি ওই হাসি সমান রয়েছে;
নাহিক জোয়ার ভাটা,
জানি তুমি কবি, কবির প্রাণে কি
বাজে না দুখের কাঁটা?"

আহারে সুখ আছে কিন্তু ক্ষুধা না থাকিলে আহারে সুখ কি? আবার

অতিরিক্ত মাত্রায় আহার করিলে নানা ব্যাধির সৃষ্টি হয় এবং শরীরের স্ফূর্ত্তি নষ্ট হয়। যতক্ষণ ক্ষুধার তৃপ্তি না হইয়াছে ততক্ষণ আহারে সুখ পাওয়া যায় কিন্তু যেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল সুখও অন্তর্হিত হইল। কিন্তু সুন্দরে প্রীতি সকল সময়েই সমান। দুঃখ ইহার উৎপাদক নহে; দুঃখ ইহার পরিণাম নহে। অভাব বা বাসনা হইতে যে সুখের উৎপত্তি তাহা অনাবিল হইতে পারে না। সৌন্দর্য্যপ্রীতি একবারে স্বার্থ সম্পর্ক শূন্য প্রীতি। সুন্দর জিনিষে আমার উপকার হয়, সুন্দর বস্তু হইতে আমার উদ্দেশ্য সাধিত হয় বলিয়াই ইহা আমার নিকট প্রীতিপ্রদ নহে। সুন্দর বস্তু আমার উপকারে আসুক বা না আসুক, আমার উদ্দেশ্য সাধিত হউক বা না হউক, ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে না, ইহা আমার নিকট অপ্রীতিকর হইবে না। ইহা প্রীতিপ্রদ বলিয়াই সুন্দর নহে, সুন্দর বলিয়াই প্রীতিপ্রদ। ইহার সৌন্দর্য্য ইহাতেই আছে, ইহার প্রীতি ইহাতেই আছে। ইহা আপনা আপনি সুন্দর, আপনা আপনি প্রীতি-প্রদ। অর্থ সুখের হেতু তাই অর্থ আমাদের নিকট প্রীতিপ্রদ। কিন্তু সুন্দর সুখের হেতু বলিয়া প্রীতিপ্রদ নহে। সুন্দর কোন জিনিষের হেতু নহে সুন্দরের কোন উদ্দেশ্য নাই, ইহা নিজেই নিজের উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্য-প্রীতি সার্ব্বজনিক প্রীতি। এ প্রীতি উপভোগে ক্ষয় হয় না; একজনের উপভোগের সময় অপরের উপভোগ অসম্ভব হয় না। যত ইচ্ছা যত জনে ইচ্ছা অনুভব কর ইহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সকলেই ইহা সমান ভাবে উপভোগ করিতে পারে।

"এখনও গায় ঋক্-গায়ক সকল,
বাজে বীণা বাল্মীকির জগৎ মোহিয়া।
দ্বাপর হইবে স্বপ্ন, এই রঙ্গভূমি
কুরুক্ষেত্র কৃষিক্ষেত্রে হবে পরিণত;

মানব অনন্তকাল করিবেক পান
মহর্ষির গীতামৃত আনন্দে সতত।

* * *

সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য্য বীর্য্য জগৎ নশ্বর;
কবিতা অ-মৃত, আর কবিরা অমর।"

দর্শন এবং শ্রবণ এই দুইটি ইন্দ্রিয় সৌন্দর্য্য প্রীতির বিশেষ সহায়। অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলি অধিক মাত্রায় স্বার্থবিজড়িত বলিয়া সৌন্দর্য্য বিষয়িণী প্রীতিতে তাহাদের করণীয় নিতান্ত কম। বাহ্যশক্তি কর্ত্তৃক এই দুইটি ইন্দ্রিয় পূর্ণমাত্রায় উদ্বুদ্ধ হইলে মনে প্রীতির সঞ্চার হয়। সুন্দর বর্ণে, উজ্জ্বল আলোকে, সুঠাম গঠনে, সুললিত স্বরে আমাদের আনন্দ হয়।

সৌন্দর্য্যরসের উপাদান।

"মরি! মরি! কি সুন্দর! * *
কিবা রূপ নয়ন মোহিয়া,
প্রাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিছে মম,
প্রাণে প্রাণে অমৃত ঢালিয়া।"

বাল্যাবস্থায় সুন্দর এবং সুখকর এই দুইএর পার্থক্য বিশেষ বুঝিতে পারি না। অভিজ্ঞতার সাহায্যে দুইএর ব্যবধান হৃদয়ঙ্গম হয়। ইন্দ্রিয় উদ্বোধকের অভাব হইলে আর ইন্দ্রিয় সুখ থাকে না কিন্তু উদ্বোধকের অভাবেও সৌন্দর্য্য প্রীতির লোপ হয় না। সুনির্ম্মল পানীয় সুখকর আবার সুললিত সঙ্গীতও সুখকর—কিন্তু এই দুই সুখের মধ্যে ব্যবধান আছে। ঐ প্রস্তর মূর্ত্তিটি সুন্দর—কিন্তু এ সৌন্দর্য্য কি প্রস্তরের সৌন্দর্য্য? যখন আমরা একটী ক্ষুদ্র পুষ্প অবলোকন করি, বা একটি সঙ্গীত শ্রবণ করি তখন এক সঙ্গে মনে নানা অনুভূতির উদয় হয়। কিন্তু অনুভূতি বহু হইলেও তাহারা অসংলগ্ন নহে, সম্পর্ক বিরহিত নহে, একটি

অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। বহু হইলেও বিরোধ নাই, বিশৃঙ্খলা নাই। সকলের সমবায়ে একটি সম্পূর্ণ সুন্দরের সৃষ্টি হইতেছে। নানা শব্দের সমন্বয়ে একটি সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়।

"চেয়ে দেখ বীণা যন্ত্র কত ভিন্ন তার।
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বর, স্বতন্ত্র সবার।
কিন্তু সর্ব্ব তার হয় এক স্বরে লয়,
সেই মূল স্বরে তার বাঁধা সমুদয়।"

কিন্তু এই শব্দগুলি যদি একমুখী না হইয়া বহুমুখী হইত, যদি সুশৃঙ্খল না হইয়া বিশৃঙ্খল হইত, যদি উহাদের সদ্ভাবের পরিবর্ত্তে বিরোধ থাকিত তবে সে সঙ্গীতে প্রীতির পরিবর্ত্তে বিরক্তি জন্মিত। অতএব ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয় সমূহের সুশৃঙ্খল সমাবেশ সৌন্দর্য্যের একটি বিশেষ লক্ষণ। এবং সুশৃঙ্খলা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রত্যক্ষজ্ঞান, পর্য্যবেক্ষণ, তারতম্যজ্ঞান, সাদৃশ্যজ্ঞান, বৈসাদৃশ্যজ্ঞান প্রভৃতি মানসক্রিয়ার প্রয়োজন। অনেক সময়ে আবার ভাবশৃঙ্খলার উপর সৌন্দর্য্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। যে জিনিষ আমাদের অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দেয় সে জিনিষ সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভাবের এবং ভাষার সুন্দর সমাবেশ হইলে কবিতাটি সুন্দর হয় সত্য কিন্তু সেই কবিতাটি যদি আমার অতীত কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয় তবে কি সেটি আরও সুন্দর বোধ হয় না ?

"তোমার মহিমা জ্যোতি তব মূর্ত্তি হ'তে
আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে।

* * *

এ নীল আকাশ এত লাগিত কি ভালো,
যদি না পড়িত মনে তব মুখ আলো ?

অপরূপ মায়া বলে তব হাসি গান
বিশ্বমাঝে লভিয়াছে শত শত প্রাণ।
তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।"

অতি দূর বিদেশে বাসকালীন কাকের কর্কশ স্বরও তোমার নিকট সুন্দর বলিয়া মনে হয় না কি? তাহার কারণ কাকের স্বরে তোমার "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমির কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই—

"ফুল তরু সুশোভন
শ্যামল সুন্দর মঞ্জু নিকুঞ্জ কানন।
মধুময় সুললিত বিহগ কূজন।"

সৌন্দর্য্য রসে উপকরণের আবশ্যক, উদ্বোধকের আবশ্যক। শ্রবণ বা দর্শনেন্দ্রিয়জনিত অনুভূতি এই উপকরণ সরবরাহ করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ উপকরণ হইতে মাত্র অনুভূতিই হইয়া থাকে। সৌন্দর্য্য অনুভূতি হয় না। অনুভূতি মাত্রেই সৌন্দর্য্য প্রীতি নহে। অনুভূত বিষয়ের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং সামঞ্জস্য লক্ষিত হইলে সৌন্দর্য্য প্রীতি হয়। অতএব সংবিত্তি, শৃঙ্খলা এবং ভাবশৃঙ্খলা এই তিনটি সৌন্দর্য্যের উপাদান।

পরিণত বয়সেই সৌন্দর্য্যে প্রকৃত উল্লাস উপভোগ করা যায় কিন্তু তাহা হইলেও এই প্রীতির সূচনা বাল্যাবস্থাতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

সৌন্দর্য্য বিকাশ।

শিশুগণ লাল নীল বর্ণ দেখিলে আনন্দ পায়; গোলমালও ভালবাসে। ইহা বাস্তবিক সৌন্দর্য্য প্রীতি নহে। ইহা সংবিত্তি জনিত সুখ। এখন উহারা আকৃতির দিকে সৌষ্ঠবের দিকে, শৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টি রাখে না, রাখিবার শক্তিও উহাদের নাই। পরে যখন অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হয়, তখন বিশৃঙ্খলার ভিতর শৃঙ্খলা দেখিবার ক্ষমতা জন্মে। তখন আকারগত সৌন্দর্য্যের জ্ঞান হয়।

এইরূপে ক্রমশঃই যেমন জ্ঞানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইতে থাকে তেমনি সৌন্দর্য্য রসের বিকাশ হইতে থাকে। পরে একবস্তু হইতে নানা ভাবের উদয় হইতে থাকে এবং এই উদ্বুদ্ধ ভাবসমূহ আবার সুন্দরের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিয়া দেয়।

"জাগি আজি বিশ্বপটে প্রকৃতি সুন্দরী,
ছন্দোবন্ধে শোভিতেছে কবিতার সম,
কি সৌন্দর্য্য কি মাধুরী ঢলে অঙ্গ ভরি,
বর্ণে বর্ণে তালে তালে লাস্য মনোরম।
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সুষমা বিকাশে,
কত অলঙ্কারে সেজে রয়েছে ভূষিয়া,
কূজনে সঙ্গীতে, মন্দ্রে নানা অনুপ্রাসে,
করিতেছে সুধাবৃষ্টি শ্রবণে পশিয়া,
ফুলে ফুলে নারী নরে বিটপী লতায়,
লহরে লহরে কি বা নীহারে নীহারে,
কি সুন্দর মিল আহা সিন্ধু জোছনায়,
জগৎ উঠেছে মাতি মিলন ঝঙ্কারে।"

পরস্পর একতা সৌন্দর্য্যের একটি বিশেষ লক্ষণ। দুইটি হস্ত, দুইটি চক্ষু, একই বৃত্তের দুই গোলকার্দ্ধ প্রভৃতি পরস্পর ঐক্য আছে বলিয়া সুন্দর। যে বিভাগে ঐক্য আছে, যে বিভাগ-সুক্রমিক তাহাই সুন্দর। কোন আকৃতিকে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ অংশে ভাগ কর। বৃহৎ অংশটির ক্ষুদ্র অংশের সহিত যে সম্বন্ধ, সমস্ত আকৃতিটি যদি বৃহৎ অংশের সহিত সেই সম্বন্ধ হয় তাহা হইলে আকৃতিটি সুন্দর দেখাইবে। এই প্রকার অনুপাতে যে বিভাগ হয় তাহাকে "সুবর্ণ বিভাগ" বলে।

সৌন্দর্য্যের অতি বিশেষ নিয়ামক।

এই 'সুবর্ণ বিভাগের' অনুপাত সাধারণতঃ ৩:৫। কোনও জমীর উপর মাত্র একটি ঝাউ গাছ দেখিলে ঝাউগাছটি তত সুন্দর দেখায় না কিন্তু সেখানে যদি দুইটি ঝাউগাছ থাকিত তাহা হইলে দৃশ্যটি মনোরম হইত। ময়দানে দুইটি গাভী দেখিলে যত সুন্দর দেখায় একটিতে তত দেখায় না। সমুদ্রতীরে দুইটি মনুষ্য দেখিলে যত সুন্দর দেখায় একটিতে তত সুন্দর দেখায় না। আবয়বিক বাহ্য রেখার প্রকৃতির উপরও সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। সরল রেখা অপেক্ষা বক্র রেখার সৌন্দর্য্য অধিক বলিয়া মনে হয়। দুইটি সরল রেখা দুই দিক হইতে আসিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ করতঃ যদি একটি কোণের সৃষ্টি করে তাহা হইলে তাহা তত নয়নমুগ্ধকর হয় না—কারণ ঈক্ষণগতির অতর্কিত পরিবর্ত্তন হেতু মনে যেন হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগে। বর্ণ-বিন্যাসও সৌন্দর্য্যের হেতু। এই বর্ণ-বিন্যাস দুই প্রকারে সাধিত হইতে পারে। যথা—

১। একই বর্ণের বিবিধ বিন্যাস।

২। বিবিধ বর্ণের বহু বিন্যাস।

(ক) বর্ণের সুক্রমিকতা।

(খ) পূরণকারী বর্ণের সমাবেশ।

যখন বিবিধ বর্ণের সমন্বয়ে একটি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে হয় তখন প্রধানতঃ দুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হয়। বিবিধ বর্ণের পার্থক্য যেন ক্রমিক হয়। বিশেষ আবশ্যক না হইলে যেন দুইটি বর্ণের পার্থক্য ব্যবধান অধিক না হয়। আর, এক বর্ণের পার্শ্বে উহার পূরণকারী বর্ণের সমাবেশ করিলে সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়। যদি কৃষ্ণবর্ণ কাগজের উপর একটুকরা ধূসরবর্ণের কাগজ রাখা হয় এবং আর একটুকরা ধূসরবর্ণের কাগজ শ্বেতবর্ণ কাগজের উপর রাখা হয় তাহা হইলে প্রথম ধূসর বর্ণ

অপেক্ষা দ্বিতীয়টি আরও গভীর দেখাইবে। সবুজের উপর ধূসরবর্ণ কিঞ্চিৎ রক্তাভ দেখায়, নীলের উপর ধূসরবর্ণ কিঞ্চিৎ পীতাভ দেখায়, পীত এবং নীল, সবুজ এবং বেগুনিয়া, লাল এবং নীলাভ সবুজ, বাদামি এবং সবুজাভ নীল—যদি এই প্রকার বর্ণদ্বয় পাশাপাশি রাখা হয় তাহা হইলে প্রত্যেকেরই বর্ণের আভা অধিকতর বৃদ্ধি হইবে।

সৌন্দর্য্যরস অপেক্ষা বিরাট রস আরও জটিল। বিরাট বলিতে প্রধানতঃ দুইটি বিষয় বুঝায়—

বিরাট রস।

বিরাট { ১। ইহা সুন্দর।
২। ইহা মহৎ।

বিরাট রস সুখদায়ক হইতে পারে আবার দুঃখদায়কও হইতে পারে। যদি ইহা অতি বৃহৎ হয়, যদি ইহা আমাদের অবধান শক্তি বহির্ভূত হয় তাহা হইলে ইহা দুঃখদায়ক। ইহা সুন্দর তাই ইহা জানিবার বাসনা হইতেছে কিন্তু ইহা এত বড় যে ইহা আমার জ্ঞানাতিরিক্ত। অতএব এখানে ভীতি এবং অশান্তি আসিয়া ইহার সৌন্দর্য্যজনিত সুখটুকু হরণ করিয়া লইতেছে। ঐ পক্ষীটি সুন্দর কিন্তু ঐ পর্ব্বত বিরাট; ঐ নদীর গতি সুন্দর কিন্তু সমুদ্র বিরাট; যোদ্ধাগণের শোভা-যাত্রা সুন্দর কিন্তু যুদ্ধ বিরাট। যাহাই মনকে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডির পরপারে লইয়া যায়, যাহাই সসীমের গতি উল্লঙ্ঘন করিয়া অসীমের নির্দ্দেশ করে তাহাই বিরাট এবং এই বিরাট জ্ঞান হইতে যে ভাবের উদ্রেক হয় তাহাই বিরাট রস।

যাহা করুণ রসোদ্দীপক তাহাতে ও দুইটি ভাব বর্ত্তমান—

করুণ-রস { ১। ইহা সুন্দর।
২। ইহা অসঙ্গত।

করুণ-রস সৌন্দর্য্য এবং শীলরসের সমন্বয়—এখানে সৌন্দর্য্যের জ্ঞান আছে, আবার অন্যায়েরও জ্ঞান আছে। ইহাতে যখন সৌন্দর্য্যের প্রাধান্য অধিক তখন ইহা সুন্দর, আর যখন অন্যায়ের প্রাধান্য অধিক তখন ইহা দুঃখের কারণ।

করুণ-রস এবং হাস্যরস।

যাহা হাস্যরসোদ্দীপক তাহাতেও দুইটি ভাব বর্ত্তমান—

হাস্যরস { ১। ইহা সুন্দর।
২। ইহা পরস্পরবিরোধি।

এখানে সৌন্দর্য্যজনিত সুখ এবং বিরোধজনিত দুঃখের পারম্পর্য্য বর্ত্তমান। একবার সুখ একবার দুঃখ—এইরূপে অতি দ্রুতগতিতে মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে।

সৌন্দর্য্যের প্রায় সকল লক্ষণই মনুষ্যদেহে বর্ত্তমান। একটি হস্ত অপর হস্তের অনুকৃতি; একটি পদ অপর পদের অনুকৃতি, কটিদেশ গ্রীবাদেশের অনুকৃতি, উদর বক্ষদেশের অনুকৃতি, পদ হস্তের অনুকৃতি। অতএব এখানে অংশবিশেষের ঐক্য এবং অনুক্রমিকতা বর্ত্তমান। আবার নাভিদেশকে শরীরাবয়বের কেন্দ্রস্থান ধরিলে শরীরাংশের মধ্যেও "সুবর্ণবিভাগ" প্রণালী দৃষ্ট হয়। শরীরের উর্দ্ধদেশ গ্রীবাদেশে বিভক্ত এবং নিম্নদেশ জানুদেশে বিভক্ত এবং এই বিভাগের অনুপাত মোটামুটি ৩:৫। মানুষের গতিতে ছন্দ আছে, শ্বাস প্রশ্বাসে ছন্দ আছে, মানুষের স্বাভাবিক স্বরে উচ্চ নিম্ন ক্রম আছে—রাগিণী আছে। মানুষের স্বরে যখন মেল থাকে তখন ইহা সঙ্গীত তখন ইহা সুখদায়ক, আবার এই মেলের যখন অভাব তখন ইহা কর্কশ।

মনুষ্যদেহের সৌন্দর্য্য।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে যেখানে একের মধ্যে বহু এবং বহুর মধ্যে এক দৃষ্ট হয় সেইখানেই সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি কিন্তু ইহা ব্যতীত সহানুভূতি হইতেও সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আপনারই মনের বেদনা যখন বাহ্য-জগতে, ব্যক্তিতে বা বস্তুতে, প্রকটিত হয় তখনই ইহা সৌন্দর্য্য রস। আমার শক্তিতে আমার উন্নতিতে যে রমণীর আনন্দ হয় সেই রমণীই আমার নিকট সুন্দরী। যে দৃশ্যের "আস্যে" হাস্য পরিলক্ষিত হয় সেই দৃশ্যই আমার নিকট সুন্দর। যে কুটীর কুটীর-নির্ম্মাতার আত্ম-তুষ্টির আভাস সেই কুটীরই আমার নিকট সুন্দর। জড়জগতে মানবীয় গুণের আরোপ করা মানুষের একটি স্বাভাবিক মৌলিক প্রবৃত্তি।

সৌন্দর্য্য ও সহানুভূতি।

রসের মোটামুটি বিভাগ—

রস।
- ১। সুন্দর।
- ২। কুৎসিত।
- ৩। বিরাট।
- ৪। হাস্যরস।
- ৫। করুণ রস।

সুন্দর। কুৎসিত।
- ১। চাক্ষুষ আকৃতি।
  - (ক) সুক্রমিক বিভাগ।
  - (খ) আবয়বিক বাহ্যরেখা।
- ২। বর্ণ বিন্যাস।
- ৩। ছন্দ।
- ৪। মেল।
- ৫। রাগিণী।

যাহাতে শৃঙ্খলা আছে, সৌষ্ঠব আছে তাহাই সুন্দর আর যাহাতে শৃঙ্খলার অভাব, সৌষ্ঠবের অভাব তাহাই কুৎসিত। সুন্দর সুখ দেয়, কুৎসিত দুঃখ দেয়; সুন্দরে অনুরাগ জন্মে, কুৎসিতে বিরাগ জন্মে। চরিত্র-সৌন্দর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য। যে চরিত্রে ন্যায়ের সহিত দয়ার সমাবেশ, যে চরিত্রে কর্ত্তব্যের সহিত প্রেমের সমাবেশ, ভালবাসার সহিত ত্যাগের সমাবেশ, স্বার্থের সহিত পরার্থপরতার সমাবেশ, ধর্ম্মের সহিত সুখের সমাবেশ, সত্যের সহিত সহানুভূতির সমাবেশ—সেই চরিত্রই সুন্দর। চরিত্রের সৌন্দর্য্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। শরীরাবয়ব যতই কেন কুৎসিত হউক না চরিত্র যদি সুন্দর হয় তবে সে সৌন্দর্য্যের দীপ্তি প্রস্ফুটিত হইবেই এবং চরিত্রের সৌন্দর্য্যে অবয়বের কদর্য্য প্রচ্ছন্ন হইয়া যাইবে।

চরিত্র-সৌন্দর্য্য।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শীল রস।

মানুষের জীবন কর্ম্মময়। মানুষ সতত কর্ম্মরত। কর্ম্ম দ্বিবিধ—সৎ এবং অসৎ, ভাল এবং মন্দ। কোন কর্ম্মটি ভাল এবং কোন কর্ম্মটি মন্দ মানুষ তাহা বিচার করিতে পারে। মানুষের সদসৎ বিচার শক্তি আছে। এই কাজটি ভাল এবং এই কাজটি মন্দ এ কথা না বলিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। মন্দ কাজে আমাদের বিরাগ হয়; ভাল কাজে আমাদের অনুরাগ হয়। এই সৎকর্ম্মে অনুরাগের নাম শীলরস। মানুষের কাজকেই ভাল মন্দ বলা যায়। মনুষ্যেতর বস্তুর কার্য্যকে ভাল মন্দ বলা যায় না। পঙ্গপালে শস্য খাইয়া গেল—এখানে পঙ্গপালের কার্য্য মন্দ বলি না। আবার মনুষ্য কর্ম্ম মাত্রেই সদসৎ বিচারের অন্তর্গত নহে। যে কর্ম্ম আমার অনিচ্ছা প্রসূত, যে কর্ম্মের উপর আমার কোনরূপ ক্ষমতা থাকে না, যে কর্ম্মের জন্য বাস্তবিক আমি দায়ী নহি, যে কর্ম্ম আমার শীল বিষয়ক নহে সে কর্ম্মকে ভাল বা মন্দ বলা যায় না, সে কর্ম্মে শীলবিষয়িনী প্রীতির উদ্রেক হয় না। যে কর্ম্মে আমাদের চরিত্রের উন্নতি হয়, যে কর্ম্মে মানুষের মঙ্গল সাধিত হয় তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। এবং এই কর্ত্তব্যানুরাগের নাম শীলরস।

শীলরস।

হে ব্রাহ্মণ! তুমি চলে' যাবে স্বর্গলোকে
সগৌরবে, আপনার কর্ত্তব্য পুলকে
সর্ব্ব দুঃখ শোক করি দূর পরাহত।"

সমাজের সহিত এই রসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কারণ, সমাজকে উপেক্ষা করিয়া আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি না। সমাজের মঙ্গল সাধন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত যেন আমাদের "বাধ্য বাধকতা" সম্বন্ধ আছে। কর্ম্ম ভালই হউক বা মন্দই হউক, কর্ম্মকে উপেক্ষা করিবার আমাদের শক্তি আছে। কিন্তু কোন কর্ম্মকে যখন ভাল বলিয়া মনে করি, তখন যেন সেই কর্ম্মটি সম্পন্ন করিতে আমরা বাধ্য হই। কোন বাহ্যশক্তি, জ্ঞাতই হউক বা অজ্ঞাতই হউক, যেন আমাদিগকে বাধ্য করে। বাধ্য হই বা না হই কর্ম্মটি সম্পন্ন করা উচিত এ জ্ঞানটুকু আমাদের মনে উদয় হইবেই হইবে। এই রসের প্রভাবে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে, অন্যায় পদদলিত হইতেছে এবং ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতেছে। যখন আমরা কর্ম্মের যাথার্থ্য উপলব্ধি করি বা মঙ্গলের চিন্তা করি তখন আমাদের মনের মধ্যে যে ভাবের উদয় হয় তাহার—

নাম {
বিবেক রস।
ন্যায় রস।
মঙ্গল রস।
কর্ত্তব্য রস।
শীল রস।
নীতি রস।
}

এই রস যাহা সৎ, যাহা শুভ, যাহা কর্ত্তব্য তাহারই অনুগামী। যে শক্তি প্রভাবে সদসৎ নির্ণয় করিতে পারি, মঙ্গলামঙ্গল বিচার করিতে পারি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারি, তাহার নাম বিবেক ; আর, মঙ্গলামঙ্গল সদসৎ চিন্তাজনিত ভাবের নাম শীল রস।

বিবেক আমাদিগকে অনবরত ন্যায়ের দিকে চালিত করিতেছে।

বিবেকের অনুজ্ঞা।

ন্যায়ের অনুভূতিই বিবেকের একমাত্র কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ বিবেকের তিনটি মাত্র অনুজ্ঞা—

বিবেকের অনুজ্ঞা
- ১। ন্যায় উপলব্ধি কর।
- ২। ন্যায় সম্পন্ন কর।
- ৩। ন্যায় রক্ষা কর।

বুদ্ধি ন্যায়ের অনুসন্ধান করে কিন্তু বিবেক সেই অনুসন্ধানে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে। প্রথমে ন্যায় স্থির কর, পরে উহা সম্পাদনে দৃঢ় সঙ্কল্প হও। আমি অক্ষক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক কিন্তু ইহা কি আমার উচিত? সুরাপানে আমার বাসনা হইয়াছে কিন্তু ইহা কি আমার উচিত? অপরের দ্রব্যে আমার লোভ হইতেছে কিন্তু ইহা কি আমার উচিত? আমাদের প্রতি পদবিক্ষেপেই এইরূপ কতশত প্রশ্ন আসিয়া আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে। বুদ্ধির সাহায্যে ইহাদের সদসৎ নির্ণয় করিয়া কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হওয়া উচিত। মাত্র আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিলে সে কার্য্য ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। সূর্য্য কিরণ দিতেছে, তুমি অন্ধ তাই বলিতেছ সূর্য্য নাই ; কিংবা থাকিলেও তুমি তাহা দেখিতেছ না। অতএব "ন্যায় নির্ণয় কর" ইহাই বিবেকের প্রথম অনুজ্ঞা।

"কর্ত্তব্য সম্পন্ন কর" ইহাও একটি বিবেকের আদেশ। তুমি যথা-

সাধ্য অনুসন্ধান করিয়াছ তাই তোমার বিশ্বাস হইয়াছে সুরাপান অন্যায়। তোমার দৈহিক ক্ষুধা সুরাপানের জন্য লালায়িত কিন্তু তোমার বিবেক বলিতেছে "ইহা স্পর্শ করিও না, ইহা আস্বাদন করিও না, ইহাতে দৃষ্টিপাত করিও না—ইহা পৃথিবীর অভিশপ্ত জিনিষ। তুমি এখানে তোমার পাশবিক আবেগকে দমন করিতেছ এবং বিবেক আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতেছ। ন্যায়কে আলিঙ্গন করিয়া বিবেকানুমোদিত কার্য্য করিতেছ। অতএব "যাহা উচিত তাহাই কর" ইহাই বিবেকের দ্বিতীয় অনুজ্ঞা।

অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হও; ন্যায় কর্ম্মে জীবনপাত কর। ন্যায় কর্ম্ম কর শান্তি তোমার পুরস্কার হইবে; অন্যায় কর্ম্ম কর অশান্তিতে তোমার জীবন জ্বালাময় হইবে—ইহাই বিবেকের বাণী। এই বাণীই অন্যায়কে পরাহত করিতেছে; এই বাণীই ন্যায়ের প্রসর বৃদ্ধি করিতেছে; এই বাণীই আমাদিগকে বিপদে ধৈর্য্য, কষ্টে সহিষ্ণুতা, আশঙ্কায় সাহস প্রদান করিতেছে। যখন কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হই তখন হৃদয় আমাদের আনন্দ রসে আপ্লুত হয়, আর যখন কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিরত হই তখন অনুতাপানলে হৃদয় আমাদের দগ্ধ হয়। এই অনুতাপ, এই আনন্দ, এই বিবেক বেদনাই, আমাদের কর্ত্তব্য সংরক্ষণের বিশেষ সহায়। অতএব "সতত কর্ত্তব্য সংরক্ষণ কর—" ইহাই বিবেকের তৃতীয় অনুজ্ঞা।

বুদ্ধি, বিবেক এবং ইচ্ছা।

বিবেক জ্ঞান নহে, কারণ বুদ্ধিই জ্ঞানের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে; বিবেক মননকারী নহে, কারণ, ইচ্ছাশক্তিই এ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে; অতএব বিবেক ন্যায়ানুভব শক্তি মাত্র। ন্যায় সম্বন্ধে সাধারণতঃ তিনটি বিষয়ের আবশ্যক—

১। ন্যায় জ্ঞান।
২। ন্যায় অনুভব।
৩। ন্যায় সম্পাদন।

এখানে প্রথমটি বুদ্ধির কার্য্য, দ্বিতীয়টি বিবেকের কার্য্য, তৃতীয়টি ইচ্ছার কার্য্য।

ন্যায় জ্ঞানের স্তর।

যে প্রণালীতে জড়জগতের জ্ঞানার্জ্জন সম্ভব, সেই প্রণালীতে নৈতিক জগতেরও জ্ঞানার্জ্জন সম্ভব। জড়জগতে আমাদের জ্ঞানের গতি যেমন অবাধ নৈতিক জগতেও তদ্রূপ। ন্যায় জ্ঞানের প্রধানতঃ চারিটি স্তরের উল্লেখ করা যাইতে পারে—

১। ন্যায় প্রত্যক্ষ।
২। ন্যায় জাতিজ্ঞান।
৩। ন্যায় বিচার।
৪। ন্যায় নিয়ম।

তত্ত্ব প্রত্যক্ষ বলে আমরা প্রত্যেক কার্য্যেরই ন্যায় অন্যায় বুঝিতে পারি। একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একজন অতি বৃদ্ধ বুভুক্ষিত ব্যক্তির সেবা করিতেছে। তুমি স্ত্রীলোকটির দয়া এবং বৃদ্ধটির কৃতজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করিতেছ। তুমি তোমার বোধিশক্তি প্রভাবে তৎমুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলে যে দয়া একটি ধর্ম্ম, কৃতজ্ঞতা একটি ধর্ম্ম। এখানে তোমার ন্যায় প্রত্যক্ষ হইল। পরে অনেকগুলি দয়ার কার্য্য প্রত্যক্ষ করিলে, অনেকগুলি কৃতজ্ঞতার কার্য্যও প্রত্যক্ষ করিলে এবং বুঝিলে যে ইহাদের প্রত্যেকটি সৎ। সাদৃশ্যানুযায়ী দয়ার কার্য্যগুলিকে এক শ্রেণীভুক্ত করিলে এবং কৃতজ্ঞতার কার্য্যগুলিকে আর এক শ্রেণীভুক্ত করিলে।

একটি শ্রেণীকে "দয়ালুতা" এবং আর একটি শ্রেণীকে "কৃতজ্ঞতা" নামে অভিহিত করিলে। এইরূপে তোমার ন্যায় জাতিজ্ঞান হইল। আবার "ধর্ম্ম" ধারণার সহিত "কৃতজ্ঞতা" ধারণার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া যখন জানিলাম যে ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে তখন আমার জ্ঞান হইল—"কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম"। সেই প্রকারে "অকৃতজ্ঞতার" সহিত "ধর্ম্মের" সম্বন্ধ নির্ণয়ে বুঝিলাম যে ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য নাই তখন জ্ঞান হইল "অকৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম নহে।" ইহাই ন্যায় বিচার। আমি আলোকের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি, আলোকের তথ্য নির্ণয় করিতেছি। দেখিলাম যে আলোক এই এই স্থলে দূরত্বের বিপরীত ভাবে বৃদ্ধি হয়। প্রকৃতি একই অবস্থায় একই ভাবে ক্রিয়া করে। অতএব প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে স্থির করিলাম যে "আলোকের হ্রাস বৃদ্ধি দূরত্বের বিপরীতগামী।" সেইরূপ নৈতিক জগতেও প্রত্যক্ষ করিতেছি যে এখানে সেখানে ওখানে সততা শুভফলপ্রদ, সুতরাং "সততা সতত মঙ্গল", এই নিয়ম আবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইলাম। ইহাকে ন্যায় নিয়ম বলে।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

ইচ্ছা

মানুষ স্বভাবতঃই কর্ম্মশীল। মানুষের শক্তি হইতে এই কর্ম্মের উৎপত্তি। এই শক্তি শরীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না, সামান্য উত্তেজনাতেই বিনির্মুক্ত হয়। এই বিনির্মুক্ত শক্তির নাম ইচ্ছা। এক একটি উদ্বোধক হইতে এক একটি ইচ্ছার উদ্রেক হইতেছে।—

ইচ্ছা।

"সংসারের প্রলোভন কামনা করে সৃজন
করিয়া ইন্দ্রিয় বিমোহিত।"

উদ্বোধকের সংখ্যা নাই ইচ্ছারও অবধি নাই, কিন্তু শক্তির সীমা আছে। সুতরাং এককালীন প্রত্যেক উদ্বোধকের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া সমান হইতে পারে না। যে উদ্বোধকের আক্রমণ প্রবল তাহার উপর শক্তির প্রতিক্রিয়াও প্রবল। একই সময়ে একই শক্তি বহু উদ্বোধকের দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে কিন্তু মন প্রত্যেকটিকেই সমান ভাবে গ্রহণ করিতেছে না, প্রত্যেকটিরই উপর সমান শক্তি প্রয়োগ করিতেছে না। একটি অপরটি অপেক্ষা প্রবল হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে এক শক্তি অপর শক্তিকে প্রতিহত করিতে পারে। একটি ইচ্ছা অপর ইচ্ছাগুলিকে দমন করিতে পারে। সুতরাং ইচ্ছার প্রতিরোধ শক্তি আছে। কিন্তু একটি ইচ্ছা অপরগুলি অপেক্ষা বলবতী হয় কেন? অবশ্য উদ্বোধকের প্রাবল্য একটি কারণ। বালকটি মনোনিবেশ সহকারে পাঠাভ্যাস

করিতেছে আর সেই সময় রাস্তা দিয়া একটি বিবাহ উৎসব চলিয়া যাইতেছে। এখন বালকের উৎসব দর্শনের ইচ্ছা বলবতী, কারণ উদ্বোধক শক্তিও প্রবল। বালকের পিতা সেই সময় ঈশ্বর উপাসনায় রত, তিনি উৎসবের দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না। ইঁহার নিকট উদ্বোধক প্রবল হইলেও পরাস্ত হইল। অতএব উদ্বোধক প্রবল হইলেই যে ইচ্ছা প্রবল হইবে এরূপ নহে। নানাবিধ উচ্চ শব্দের মধ্যেও জননী তাহার শিশুর ক্ষীণ ক্রন্দন শুনিতে পায়। অতএব অভ্যাস দ্বারাও আমাদের ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়—

"সুভদ্রে! ডাকিলা কৃষ্ণ উচ্ছ্বাস-কম্পিত কণ্ঠে।
পশে নাই যেই কর্ণে শঙ্খের গর্জ্জন
শত শত, প্রবেশিল মৃদু সম্ভাষণে।"

মানুষের যতই জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হয় ততই সে তাহাকে তাহার নিজের অধীনে রাখিতে পারে।

আমাদের কতকগুলি ইচ্ছা শিক্ষালব্ধ, অভ্যাসজাত। আবার কতকগুলি সহজাত। সদ্যজাত শিশুর মুখে স্তন প্রদান করিলেই জিহ্বা দ্বারা শিশু তাহা চোষণ করিতে আরম্ভ করে। শিশুর এই ইচ্ছা অভ্যাসপ্রসূত নহে, ইহা সহজাত প্রবৃত্তি। আমাদের জীবনের প্রারম্ভে এরূপ প্রবৃত্তির সংখ্যা খুব কম। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার সংখ্যা বাড়িয়া যায়। যদিও এই প্রবৃত্তিগুলি অনেক বিলম্বে প্রকাশ হয় তথাপি ইহারা সহজাত প্রবৃত্তি কারণ এগুলি অভ্যাস বা অভিজ্ঞতালব্ধ নহে। এ প্রবৃত্তিগুলির প্রকাশ পরে হইলেও, শিশুর দন্ত বা শ্মশ্রুর ন্যায় জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের জন্ম। এরূপ প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতালব্ধ না হইলেও অভিজ্ঞতায় ইহাদের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

শিক্ষালব্ধ ও অভ্যাসজাত ইচ্ছা।

সুখের পুরস্কারে এবং দুঃখের কষাঘাতে সহজাত প্রবৃত্তির সংস্কার সংঘটিত হয়। জননী তাঁহার শিশুপুত্রটি ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। পুত্রটি একদৃষ্টে অদূরস্থিত কুকুরটি দেখিতেছে। জননী তাহার মুখটি ফিরাইয়া দিলেন। শিশু কাঁদিতে লাগিল। জননী আবার শিশুর মুখ কুকুরের দিকে ঘুরাইয়া দিলেন। শিশুর ক্রন্দন থামিল। তাহার মুখে আনন্দের রেখা দিল। কিন্তু জননী যদি শিশুর মুখ পুনরায় কুকুরের দিকে ফিরাইয়া না দিতেন তাহা হইলে শিশুর বিরক্তির বিরাম হইত না। সে চঞ্চল হইয়া উঠিত। হস্ত পদ মস্তক এদিক ওদিক সঞ্চালন করিত। এইরূপ অসংযত অঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা হয়ত কুকুরটি দৃষ্টিগোচর হইল। বালক দৈবাৎ কৃতকার্য্য হইল, দৈবাৎ তাহার পূর্ব্ব সুখের অবস্থা ফিরিয়া আসিল। দৈবাৎ যেমন করিয়া মুখ ফিরাইয়া সে কুকুরটি দেখিতে পাইয়াছিল, আবার তেমনি করিয়া ফিরিয়া গেল—এইরূপে কয়েকবার ফিরিতে ফিরিতে যাহা দৈবাৎ সংসাধিত হইয়াছিল তাহা এখন স্বেচ্ছানুযায়ী হইল। যাহা শক্ত ছিল তাহা এখন সহজ হইল। যাহাতে সন্দেহ ছিল তাহা এখন নিঃসন্দেহ হইল।

অনুভূতির সহিত ইচ্ছার সম্বন্ধ।

এখন এই উদাহরণটি বিশ্লেষণ করিলে ইচ্ছার সহিত অনুভূতির সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যাইবে। বালকটি কুকুরের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। এই ব্যাপারে বালকের ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ পাইতেছে। এই শক্তির কারণ কি? অবশ্য উদ্বোধকের প্রাবল্য একটি কারণ। বাহ্যবস্তু বালকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে সত্য, কিন্তু এ বস্তুতে কি বালক কোন সুখ অনুভব করিতেছে না? বালকটি অতক্ষণ ধরিয়া সেই একই বস্তু কেন দেখিতেছে? অন্য উদ্বোধক বর্ত্তমান কিন্তু তথাপি বালকের চিত্ত সে দিকে আকৃষ্ট হইতেছে না। কুকুরটি

তাহাকে ভাল লাগিয়াছে, সেই জন্য সে সেটিকে দেখিতেছে। অতএব উদ্বোধকের শক্তি প্রাচুর্য্য ইচ্ছার কারণ হইলেও সুখের অনুভূতি ইচ্ছাকে আরও বলবতী করিয়া তুলে—

"কিবা মূর্ত্তিখানি
কিবা মুখ! কিবা রূপ! রূপের সাগরে
খেলে কি তরঙ্গ-ভঙ্গ সঞ্চারি আবেগ
যজ্ঞকুণ্ড সম মম যোগীন্দ্র হৃদয়ে।"

কুকুরটি যখন বালকের দৃষ্টান্তরাল হইল তখন বালকটি কাঁদিয়া উঠিল। কুকুরের অভাবে বালকের দুঃখ হইল। এই দুঃখের কারণ কি? বর্ত্তমান সুখের অভাবই কি এই দুঃখের কারণ? ইহা কারণ হইলেও অতি সামান্য কারণ। পূর্ণমাত্রায় প্রবাহিত ইচ্ছাশক্তির আকস্মিক প্রতিবন্ধক ইহার প্রধান কারণ। এই প্রকার প্রতিবন্ধক মানুষের অনেক দুঃখের হেতু—

"অভিশপ্ত তৃষাতুর যথা
সুশীতল বারি হেরিয়ে অদূরে,
ব্যগ্রচিত্তে যেই যায় করিবারে পান,
অমনি সে মায়া বারি সরে যায় দূরে,
সেই মত কনোজ কুমারী,
দিয়ে দেখা তৃষা শুধু বাড়ায়ে দ্বিগুণ,
যাবে চলি জীবনের শান্তিটুকু হরি।"

বস্তুবিশেষের প্রকৃতি হইতে দুঃখের সৃষ্টি হয় না। কোন বস্তু হইতে প্রবৃত্তির উদ্রেক হইলে যদি সেই প্রবৃত্তি প্রতিহত হয় তবে দুঃখ অনিবার্য্য। তুমি আমার বাসনা জাগাইয়া দিলে আবার সেই বাসনার

কার্য্যকালেই তাহাতে বাধা প্রদান করিলে কি আমার মনে বিরক্তি জন্মে না ?

"সুখের বিদ্যুৎ দিয়া করিয়া আঘাত
দুঃখের ঘনান্ধকারে দেছিস ফেলিয়া !
বাসনারে ডেকে এনে প্রলোভন দিয়ে
নিয়ে গিয়েছিস্ মহা দুর্ভিক্ষ মাঝারে।"

যেমন উদ্রিক্ত বাসনার অন্তরায়ে দুঃখের উৎপত্তি হয় তেমনি আবার উহার সহায়ে সুখের উৎপত্তি হয়। কুকুরটি যখন পুনরায় বালকের দৃষ্টিগোচর হইল তখন সে আবার হর্ষোৎফুল্ল হইল। সংহৃত সুখ পুনঃ প্রাপ্ত হইল বলিয়া সে সুখী হইল। কিন্তু এ সুখের আর একটি কারণ আছে। পূর্ব্বে বালকের বাসনা প্রতিহত হওয়ায় বাসনা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। বাসনার ভোগকালে বাধা প্রাপ্ত হইলে সে বাসনার তীব্রতা বড়ই প্রবল হয়, আবার সেই প্রবল বাসনার অনুকূল বিষয় পাইলেই সুখের সৃষ্টি হয়।

"বুঝেছি সম্রাজ্ঞি! তুমি চাহ পিপাসিত
জনে, অযাচিত বারি দানে পিপাসার
তীব্রতা বাড়ায়ে দেখিতে কৌতুক।"

এইরূপে বাসনার সহায় বা অন্তরায় জনিত সুখ দুঃখকে বাসনাজাত অনুভূতি বলে। কেহ কেহ বলেন যে সুখ দুঃখ অনুভূতি মাত্রেই আকাঙ্ক্ষাজাত অনুভূতি। শিরঃপীড়ায় যন্ত্রণা আছে কিন্তু এ যন্ত্রণা কি তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রতিরোধ জনিত? আবার অবগাহনে সুখ আছে কিন্তু আকাঙ্ক্ষার সহায় বলিয়াই কি এ সুখ? যখন তোমার শরীর সুস্থ, তখন আকাঙ্ক্ষার অভাব সত্ত্বেও ঈষদুষ্ণ জলে অবগাহন করিতে

সুখ পাও না কি ? কোন কোন বিষয় কোন পূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার সহায় বা অন্তরায় না হইলেও সুখ দুঃখ মূলক নহে কি ? অনেক সময় সংবিত্তির মাত্রার উপর সুখ দুঃখের মাত্রা নির্ভর করে না কি ? অতএব কতকগুলি সুখ দুঃখ মানুষের প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে, আবার কতকগুলি প্রবৃত্তি, সম্পর্ক বিরহিত। কতকগুলি বাসনাজাত আর কতকগুলি স্বভাবজ।

সুখ দুঃখ বাসনাজাতই হউক বা স্বভাবজই হউক, ক্রিয়াশীল ইচ্ছার উপর ইহাদের প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট। সুখেই যে প্রবৃত্তির তীব্রতা বৃদ্ধি হয়, সুখই যে প্রবৃত্তিকে স্থায়ী করে এমত নহে, দুঃখেও প্রবৃত্তির ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়। কুকুরটি যখন বালকের দৃষ্টান্তরাল হইল, বালক তখন কাঁদিয়া উঠিল, হাত পা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। এখানে বালকের ক্রন্দনে বালকের দুঃখের সূচনা হইতেছে এবং তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আস্ফালনে বালকের ইচ্ছার তীব্রতা প্রকাশ পাইতেছে। এই বর্ত্তমান তীব্র ইচ্ছা কি পূর্ব্ব ইচ্ছার (কুকুর দেখিবার) রূপান্তর মাত্র ? পূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার প্রতিরোধ হওয়ায় শরীরের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য কিন্তু প্রতিহত আকাঙ্ক্ষা এই চাঞ্চল্যের একমাত্র কারণ নহে। আকাঙ্ক্ষা প্রতিহত না হইলেও কেবলমাত্র দুঃখ হইতে এইরূপ চাঞ্চল্য আসিয়া থাকে। অজীর্ণহেতু পাকস্থলীর যন্ত্রণাতেও মানুষ ছট্‌ফট্ করিয়া থাকে। রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা এরূপ অঙ্গসঞ্চালনের কারণ নহে। অঙ্গসঞ্চালনে ইচ্ছার প্রয়োজন।

বাসনার বিশ্লেষণ।

আমার শীত বোধ হইতেছে ; বস্ত্রদ্বারা অঙ্গ আচ্ছাদন করিবার বাসনা হইল। এই বাসনা ক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহাতে তিনটি উপাদান আছে।

১। বুদ্ধি সম্বন্ধীয় উপাদান

(ক) অব্যবহিত উপাদান

(অ) শীত অনুভব করিলাম } প্রত্যক্ষ
(আ) বস্ত্র দেখিলাম }

(খ) ব্যবহিত উপাদান

(অ) স্মরণ—পূর্ব্বে বস্ত্রাচ্ছাদনে শীত নিবারণ হইয়াছিল।

[(আ) কল্পনা—একজন আমার নিকট ছায়াচিত্রের বর্ণনা করিল আর আমার তাহা দেখিবার বাসনা হইল।]

২। অনুভূতি সম্বন্ধীয় উপাদান

পূর্ব্বে বস্ত্রাচ্ছাদনে শীত নিবারণ হেতু সুখ অনুভব করিয়াছিলাম।

৩। ইচ্ছা সম্বন্ধীয় উপাদান

(অ) মানসক্রিয়া—ব্যবহিত উপাদানের অবধান।

(আ) শারীর ক্রিয়া—বাঞ্ছিত বস্তু লাভের জন্য অঙ্গ সঞ্চালন।

এখন আমি শীত অনুভব করিতেছি কিন্তু বস্ত্রের দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিলে শীত নিবারণ হইবে। বর্ত্তমান অবস্থাটি দুঃখের, ভবিষ্যৎ অবস্থাটি সুখের। বর্ত্তমান অবস্থার সহিত ভবিষ্যৎ অবস্থার তুলনা করিলে আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়। এই আকাঙ্ক্ষার নাম বাসনা।

"দাও পরিচয়—ওরে মায়াদূত সুন্দর সুতরুণ,
তাপস হৃদয় বিরোধ ঘর্ষে ফেনায়ে উঠিল অসীম হর্ষে,
তোমার সঙ্গ লাগি এ পিপাসা কেন জাগে সকরুণ?"

মনের যে কোন প্রকার শক্তি প্রয়োগের নাম ইচ্ছা। এই শক্তি প্রয়োগ হয় উদ্দেশ্য পরিচালিত কিংবা উদ্দেশ্য বিহীন। হয় ইচ্ছা-প্রসূত নয় অনিচ্ছাপ্রসূত। শক্তি প্রয়োগ হয় তোমার অনুমোদন সাপেক্ষ, না হয় অনুমোদন নিরপেক্ষ। অতএব ইচ্ছা দুইপ্রকার—সচেষ্ট ইচ্ছা এবং নিশ্চেষ্ট ইচ্ছা। এই শক্তি প্রয়োগ মনের মধ্যে হইতে পারে আবার মনের বাহিরেও হইতে পারে। যখন কোন বিষয় স্মরণ বা মনন বা কল্পনা করি তখন মনের শক্তি মনেই প্রযুজ্য হয়। আবার যখন হস্ত পদ সঞ্চালন করি বা গমনাগমন করি তখন মনের শক্তি মনের বাহিরে যায়। মানসিক শক্তি প্রভাবে মনের, শরীরের, এবং বাহ্য জগতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। মানসিক শক্তি যখন মনের ব্যাপারে প্রযুক্ত হয়, ইচ্ছা যখন মানস ব্যাপারের পরিবর্ত্তন সংসাধিত করে তখন ইহার নাম অবধান, এবং অবধান হয় সচেষ্ট কিংবা নিশ্চেষ্ট। অবধান সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। আবার ইচ্ছা যখন শরীরের তথা বাহ্যজগতের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকে তখন ইহার নাম গতি এবং গতি হয় সচেষ্ট নয় নিশ্চেষ্ট। ইচ্ছা বলিতে গতি এবং অবধান দুইই বুঝায় এবং ইচ্ছা হয় সচেষ্ট কিংবা নিশ্চেষ্ট কিন্তু ইহা সচরাচর সচেষ্ট ইচ্ছা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরাও ইচ্ছার এই সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রহণ করিব।

ইচ্ছার প্রকার।

বেগ সংবিত্তি অসম্ভব।

কোন একটি স্বাধীন ক্রিয়া বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি সচরাচর দৃষ্ট হয়—

দৈহিক প্রণালী।

১। ইন্দ্রিয় গ্রামের উপর উদ্বোধকের ক্রিয়া।
২। ইন্দ্রিয় স্পন্দন অন্তর্বাহী স্নায়ুকর্তৃক কেন্দ্র যন্ত্রে আনয়ন।
৩। কেন্দ্র যন্ত্রের কোন বিশেষ স্নায়ুকোষের উদ্বোধন।
৪। উদ্বুদ্ধ শক্তির উদ্দীপন।
৫। উদ্দীপ্ত শক্তি বেগকোষে প্রেরণ।
৬। বেগ কোষ হইতে ঐ শক্তির বহির্বাহী স্নায়ুতে গমন।
৭। বহির্বাহী স্নায়ু কর্তৃক উক্তশক্তি পেশীতে আনয়ন।
৮। পেশীর সঙ্কুঞ্চন হেতু প্রান্ত যন্ত্রের পুনরুদ্দীপন।
৯। প্রান্ত যন্ত্রের চাঞ্চল্য পুনরায় কেন্দ্রযন্ত্রে আনয়ন।
১০। কেন্দ্রযন্ত্রের অপর কোষের উদ্দীপন।

মানস প্রণালী।

১। সংবিত্তি (সংবিৎ কোষের উদ্দীপন)।
২। অবধান (উদ্বুদ্ধ শক্তির উদ্দীপন)।
৩। সুখ বা দুঃখানুভূতি (সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীর উপর উক্ত শক্তির ফল)।
৪। ব্যাপক সংবিত্তি (পেশী সঙ্কুঞ্চন হেতু)।

উপরি উক্ত বিশ্লেষণ হইতে এই জানা যাইতেছে যে বেগ কোষের উদ্দীপন বা বহির্বাহী স্নায়ু কর্তৃক আনীত বেগপ্রবাহের সহগামী কোন

মানস ক্রিয়া নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কেন্দ্রযন্ত্রের অপর কোষ উদ্দীপ্ত না হইতেছে ততক্ষণ অপর কোন মানস ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে না। প্রথমতঃ মনের মধ্যে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে কতকগুলি প্রক্রিয়া চলিতেছে, পরে কার্য্য, তৎপরে আবার মনের এবং মস্তিষ্কের প্রক্রিয়া। কিন্তু এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী অবস্থার (যে অবস্থা হইতে কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে) সহগামী কোন মানস ক্রিয়া সংজ্ঞাক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় না। নিম্নলিখিত উদাহরণটি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে বেগ-কোষ-ক্রিয়া-সংবিত্তি বলিয়া কোন জিনিষ নাই। পেশীর ক্রিয়া উদ্দীপ্তকারী বেগ প্রবাহের সংবিত্তি আমাদের হয় না। এক টুকরা গোলাকার কঠিন কাষ্ঠ লও। ইহার ব্যাস এক ইঞ্চি এবং ওজন মাত্র ৫০ রতি হইবে। আবার সেই জাতীয় কাষ্ঠ হইতে আর এক টুকরা গোলাকার কাষ্ঠ বাহির করিয়া লও। ইহার ব্যাস পূর্ব্বোক্ত গোলাকার বস্তুটির ব্যাসের ⅙ হইবে। এক্ষণে ইহার মধ্য-ভাগটি ফাঁপা কর। মুখটি সুন্দররূপে বন্ধ করিবার নিমিত্ত একটি উক্ত কাঠের ছিপি প্রস্তুত কর। পরে ছিদ্রটির মধ্যে কয়েকটি লৌহগুলি রাখিয়া ইহার ওজন ৫০ রতি কর। এক্ষণে মুখটি বেশ করিয়া ছিপি দ্বারা বন্ধ করিয়া দাও এবং যদি আবশ্যক হয় তবে ভিতরে তুলা দিয়া গুলি গুলি আঁটিয়া দাও যেন নড়াইলে শব্দ না হয়। দুইটি বস্তুই একই কাষ্ঠের এবং দুইটিরই ওজন এক। এক্ষণে কোন ব্যক্তিকে একখানি নীচু টেবিলের উপর তাহার হস্তখানি চিৎ করিয়া রাখিতে বল। পরে তাহার হস্তের উপর প্রথমে বড়টি পরে ছোটটি রাখিয়া তাহাকে হাত তুলিয়া বস্তুদ্বয়ের ওজন নির্ণয় করিতে বল। হাত উঠাইবার সময় কনুই টেবিলে সংলগ্ন থাকা চাই। যদি ঐ ব্যক্তিকে পূর্ব্ব হইতে ওজন বলা না হইয়া থাকে তাহা হইলে সে ছোটটিকে বড়টি অপেক্ষা ভারি বলিয়া স্থির করিবে। ঐ ব্যক্তি মনে করিতেছে যে দুইটি ওজনই এক পদার্থ নির্ম্মিত

সুতরাং সে আশা করিতেছে যে ছোটটি অপেক্ষা বড়টির ওজন অধিক হইবে; কিন্তু সে যখন ছোটটিকে ভারি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছে তখন মনে করিতেছে যে ছোটটি বড় অপেক্ষাও ভারি—যদিও বাস্তবিক দুইএরই ওজন এক। অবশ্য বলিতে পার যে ইহা হইতে বুঝা যায় না যে আমাদের বেগ সংবিত্তির অভাব। আচ্ছা যদি তাহাই হয় তবে আমাদিগকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। লোকটিকে বল যে ওজন দুইটি সমান এবং যদি আবশ্যক হয় তবে তুলাদণ্ড সাহায্যে দেখাইয়া দাও যে বাস্তবিক উহাদের ওজন এক। পরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাহাকে আবার উহাদের ওজন নির্ণয় করিতে বল। কিন্তু এবারেও সে বলিবে যে বড়টি অপেক্ষা ছোটটির ওজন অধিক। বলিতে পার যে আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ প্রভাবে পূর্ব্বে উহার বিচার বিভ্রম ঘটিয়াছিল কিন্তু এবারেও উহার বিচারে ভুল হইল কেন? যদি বেগ সংবিত্তি সাহায্যেই সে উহাদের ওজন নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে তাহা হইলেও ভুল হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। যখন সে পূর্ব্ব হইতেই জানে যে দুইটির ওজনই সমান তখন সে ইহাও জানে যে উহাদিগকে উঠাইতে সমানই বেগ প্রয়োগ করিতে হইবে। সুতরাং এখানে আভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ এবং ভাবি প্রত্যক্ষের সংঘাতে প্রমাদ ঘটিবার কোন কারণ নাই। সে জানে যে দুইটিতেই সমান বেগ প্রয়োগ করিতে হইবে অর্থাৎ দুইএরই বেগ সংবিত্তি সমান হইবে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বহির্বাহী সংবিত্তি এ ভ্রমের কারণ নহে, ইহার কারণ অন্তর্বাহী সংবিত্তি। দুইটি বস্তুই আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিতেছে। বড়টি স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিকস্থানব্যাপী বলিয়া ইহার উত্তেজনা ক্ষীণ কিন্তু ছোটটি ঐ ইন্দ্রিয়ের স্বল্পস্থানব্যাপী বলিয়া ইহার উত্তেজনা তীক্ষ্ণ। অতএব উত্তেজনার পার্থক্য এই ভ্রমের কারণ।

নিশ্চেষ্ট গতি নানা প্রকারের। ছোট ছোট বালকেরা বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে চীৎকার করে। সদ্যজাত শিশু ক্রন্দন করে; হাত পা সঞ্চালন করে। এই প্রকার কার্য্যে কোন বাহ্য উদ্বোধকের প্রয়োজন হয় না। ইহা আপনা আপনি হইয়া থাকে। ইহা লক্ষ্যহীন। ইহা উদ্দেশ্যবিহীন। শরীরের মধ্যে শক্তি রুদ্ধ থাকিলে অশান্তি হয়। রুদ্ধ শক্তি মুক্ত হইলেই চীৎকার, ক্রন্দন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন প্রভৃতি কার্য্য হইয়া থাকে। বালকগণ বিদ্যালয়ে অনেকক্ষণ আবদ্ধ ছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া বন্ধ ছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাদের শক্তি ক্ষয় হয় নাই। এখন রুদ্ধ শক্তি মুক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত। বিদ্যালয়ের ছুটি হইল; রুদ্ধ শক্তি মুক্ত হইল। সঞ্চিত শক্তির ব্যয়ে শান্তি পাইল। এই প্রকার গতির পরিনাম শুভ। আবদ্ধ শক্তির মুক্তিতে সুখ আছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে স্নায়ু এবং পেশী সমূহ পরিপুষ্টি লাভ করে। ক্ষুদ্র শিশুর হস্তপদ সঞ্চালন তাহার অবয়বের পুষ্টি সাধনের একটি হেতু। আবার এই প্রকার গতিই সচেষ্ট ইচ্ছায় পরিণত হইবে কিন্তু ইহার ফল শুভ হইলেও ইহা একেবারে উদ্দেশ্যবিহীন। শুভ ফলের কামনা হইতে এই প্রকার গতির উৎপত্তি হয় না। ফলের বিষয় সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত থাকে। কোন বাহ্যশক্তি এ গতিকে পরিচালিত করে না, ইহা স্বপরিচালিত। এ গতির জন্য উদ্বোধক অনাবশ্যক। এইরূপ ক্রিয়ার নাম স্বৈরিণী ক্রিয়া।

স্বৈরিণী ক্রিয়া।

পথিপার্শ্বে তুমি একটি সর্প দেখিলে আর অমনি থমকিয়া দাঁড়াইলে। মেঘগর্জ্জন হইল অমনি তুমি চমকিত হইলে। বালকের গায়ে শীতল জল নিক্ষেপ করিলে সে কাঁদিয়া উঠিল। বালকের হস্তে তোমার

অঙ্গুলি স্থাপন করিলে সে তাহার অঙ্গুলি দ্বারা ইহা জড়াইয়া ধরিল।

প্রত্যাবর্ত্তি ক্রিয়া।

এই প্রকার ক্রিয়া উপরি উক্ত ক্রিয়া হইতে পৃথক্। এই গতিগুলি উদ্দেশ্যবিহীন কিন্তু উদ্বোধকশূন্য নহে। বাহ্যশক্তি কর্ত্তৃক এই গতি সকল উদ্বুদ্ধ হইতেছে। বাহ্যশক্তি ইন্দ্রিয়গ্রামে আঘাত করিতেছে। অন্তর্ব্বাহী স্নায়ুর সাহায্যে সংবিত্তির উদয় হইতেছে। সংবিত্তির সঙ্গে সঙ্গে বহির্ব্বাহী স্নায়ুর সাহায্যে শরীরের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। উদ্বোধক এবং উদ্বোধকের উপর শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কেবল সংবিত্তির সময় মাত্র থাকে—চিন্তা করিবার অবসর মাত্র থাকে না। এই প্রকার কার্য্যেরও পরিণাম শুভ। এই প্রকার গতি আবার দুই রকম। কতকগুলির সহিত আমাদের সংজ্ঞার সম্বন্ধ আছে আর কতকগুলি সংজ্ঞাসম্বন্ধ বিবর্জ্জিত। শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া, পরিপাক প্রণালী, রক্তপ্রবাহ ইত্যাদি ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে; কিন্তু সর্পদর্শনে স্তম্ভিত হওয়া, মেঘগর্জ্জনে চমকিত হওয়া ইত্যাদি কার্য্যের সহিত সংজ্ঞার সংস্রব আছে। এইরূপ ক্রিয়ার নাম প্রত্যাবর্ত্তি ক্রিয়া এবং ইহা দ্বিবিধ—অন্তর্জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত। একটি ভেকের মস্তক উচ্ছেদ কর। অবশ্য শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইলে ভেকটির সংজ্ঞা থাকিবে না। এক্ষণে এক ফোঁটা তীব্র "য়্যাসিড" ভেকটির কোন অঙ্গে নিক্ষেপ কর, দেখিবে যে ভেকটি পদদ্বারা উত্তেজক পদার্থটি সরাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রকার গতি অজ্ঞাত প্রত্যাবর্ত্তি ক্রিয়া। এখানে সংজ্ঞার অভাব কিন্তু গতি বর্ত্তমান। একজন বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাস করিতেছে। তুমি একটি পেন্‌সিল লইয়া অতি ধীরে ধীরে এবং অতি সন্তর্পণে তাহার অঙ্গুলি স্পর্শ কর দেখিবে সে তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত সরাইয়া লইবে। এই ক্রিয়া প্রত্যাবর্ত্তি কিন্তু ইহা একবারে অজ্ঞাত নহে।

অঙ্গুলিতে একপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে এ জ্ঞানের আত্যন্তিক অভাব নাই।

হঠাৎ মেঘ গর্জ্জন হইল। বালকটি চমকিত হইল, চীৎকার করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে লুক্কায়িত করিবার চেষ্টা করিল। তাহার মায়ের নিকট হামাগুড়ি দিয়া ছুটিয়া গেল এবং মায়ের বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদন করিল। বালকের একদিকে ভীতি এবং অপরদিকে আত্মরক্ষার চেষ্টা। একদিকে অনুভূতি, আর একদিকে প্রবৃত্তি—দুইএরই যুগপৎ উদয় হইয়াছে। এই প্রবৃত্তিটি স্বভাবজ প্রবৃত্তি। এইরূপ ক্রিয়ার নাম নিয়ামক ক্রিয়া। এইরূপ ক্রিয়া পূর্ব্ববর্ণিত ক্রিয়াদ্বয় হইতে পৃথক্। এখানেও উদ্বোধকের আবশ্যক। উদ্বোধকের সাহায্যে অনুভূতি প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই প্রয়াসের সৃষ্টি হয়। সুখদায়ক অনুভূতির সম্ভোগ বা দুঃখদায়ক অনুভূতি পরিহারের স্বাভাবিক প্রয়াসের নাম নিয়ামক গতি বা ক্রিয়া। ইহার পরিণাম শুভ। ইহার শুভফল অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে নিশ্চয়তা আছে। এ ফল মাত্র একটি সহজ গতি লব্ধ নহে। এ ফল লাভ করিতে বহুবিধ গতির প্রয়োজন। সুতরাং নৈসর্গিক গতি জটিল। এ গতির লক্ষ্য এবং প্রথা চিরনির্দ্দিষ্ট কিন্তু তথাপি অজ্ঞাত। এ গতি একই প্রকারে, একই নিয়মে পরিচালিত হয় কিন্তু ইহা পরিচালকের ইচ্ছাধীন নহে। যে বস্তু হইতে ভীতির সঞ্চার হয়, যে বস্তুর উপর আমাদের কোন ক্ষমতা বা আধিপত্য নাই সে বস্তু হইতে নিজেদের দূরে রাখিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। বাহ্যবস্তু এ প্রবৃত্তির প্রত্যক্ষ উৎপাদক নহে। বাহ্য উদ্বোধক হইতে অনুভূতি এবং অনুভূতি হইতে এই গতির উদ্রেক হয়। মনের মধ্যে কোন অশান্তির উদয় হইলে সেই অশান্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কতকগুলি শারীরিক ক্রিয়া আপনা

নিয়ামক গতি।

আপনি সম্পাদিত হইয়া থাকে। এবম্বিধ ক্রিয়ার গতি নির্দ্দিষ্ট এবং অভ্রান্ত। ফলও নির্দ্দিষ্ট এবং নিশ্চয় লভ্য। ফল লাভের জন্য একটির পর একটি করিয়া নানাবিধ শারীরিক ক্রিয়ার প্রয়োজন এবং সেগুলি নির্দ্দিষ্ট উপায়ে ক্রমান্বয়ে আপনা আপনি সম্পাদিত হইয়া থাকে। নিয়ামক গতি ব্যক্তিগত নহে—ইহা জাতিগত। এরূপ গতি তোমার আছে আমার নাই এরূপ নহে—ইহা সকলেরই আছে এবং সকলেরই এক রকম। এ গতি সহজাত—শিক্ষা, অভ্যাস বা অনুকরণ লব্ধ নহে।

নিয়ামক গতি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট।

বিবর তাহার গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে। প্রথমতঃ নদীর ধারে তাহার গৃহ নির্ম্মাণ উপযোগী স্থান নির্ণয় করিতেছে; সে স্থানটি পরিষ্কার করিতেছে; সে স্থানের প্রত্যবায়গুলি অপসৃত করিতেছে; কাষ্ঠগুলি আহরণ করিয়া যথাস্থানে সংগ্রহ করিতেছে; ইহাদিগকে উপর্য্যুপরি সন্নিবেশ করিয়া অতি সুশৃঙ্খল ভাবে সাজাইতেছে—এই প্রকারে বিবর তাহার গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে। বিবরের এই প্রকার কার্য্যাবলি তাহার স্বভাবসিদ্ধ। সে এ কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার স্নায়ুমণ্ডল এমনি ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে যে, কতকগুলি উদ্বোধকের অধীনস্থ হইলেই তাহাকে কতকগুলি কার্য্য করিতেই হইবে। এখানে শিক্ষার দরকার নাই, অভ্যাসের আবশ্যক নাই, যুক্তি-বিচারের প্রয়োজন নাই। এই প্রকার ক্রিয়াবলির নিয়মবিধি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট।

নিয়ামক গতি বুদ্ধি পরিচালিত নহে।

জননী কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত। একটি শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল, ভাবিলেন তাঁহার সুপ্ত শিশু কাঁদিতেছে। তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া তাঁহার শিশুর নিকট উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ বাৎসল্য প্রেমে আকৃষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন শিশু তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতেছে। তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পুনরায় তাঁহার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। আবার আর একটি শব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তিনি আবার সন্তানের নিকট ছুটিলেন। কেন তিনি আবার ছুটিয়া চলিলেন? পূর্ব্ববারের অভিজ্ঞতা হেতু দ্বিতীয় বার তথায় তিনি যাইতে কেন বিরত হইলেন না? এবারেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বাৎসল্য প্রেম তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। সহজ গতির নিকট স্মৃতি-শক্তি পরাভূত হইল। ভাবিলেন সন্তান হয় ত জাগিয়াছে এখন তাঁহার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। শব্দ হইল; স্নায়ুমণ্ডল শব্দানুবর্ত্তী কার্য্যে ব্যাপৃত হইল—এখানে স্মৃতির অভাব, যুক্তির অভাব, চিন্তার অভাব।

নিয়ামক গতি উদ্দেশ্য-বিহীন নহে।

পশু মাত্রেই আমাদের বিস্ময়ের বস্তু। জ্ঞানের প্রারম্ভ হইতে প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত আমরা এই বিস্ময় উপভোগ করিতেছি। এ বিস্ময়ের বিরাম নাই। মানুষ তাহার শিক্ষা দীক্ষা অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও যাহা করিতে অক্ষম পশু তাহা অতি সহজেই সম্পন্ন করিয়া থাকে। মধুমক্ষিকা গণিতশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ তবুও সুনিপুণতার সহিত তাহার বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে; রসায়ন শাস্ত্র তাহার অনধিত হইলেও সে অতি উপাদেয় মধু প্রস্তুত করিতেছে; মানচিত্র বা দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের সাহায্য না লইয়াও কত নদ-নদী পাহাড় পর্ব্বত উপত্যকার উপর দিয়া কত দূরদেশে চলিয়া যাইতেছে; অর্থনীতি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও ভবিষ্যতের নিমিত্ত আহার্য্য সংগ্রহ করিতেছে। পশুর ক্রিয়া অন্ধশক্তি পরিচালিত কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন নহে; উদ্দেশ্যবিহীন না হইলেও উদ্দেশ্য সতত অজ্ঞাত। মনুষ্যজীবনেও এরূপ কর্ম্মের অভাব নাই তবে শিক্ষা এবং অভ্যাসের বলে কতকগুলিকে দমন এবং কতকগুলিকে একবারে সংহার করা হইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে নিয়ামক ক্রিয়া অন্ধ কিন্তু অন্ধ হইলেও

ইহা পরিচালক। পিপীলিকা শাসনপ্রণালীর বিষয় অবগত না হইয়াও প্রজাতন্ত্রের সৃজন করিতেছে; স্থপতি বিদ্যায় অনভিজ্ঞ হইয়াও তাহারা নগর নির্ম্মাণ করিতেছে। অন্ধ উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতেছে। কিন্তু ফল শুভ হইতেছে। এই পরিচালন শক্তি অন্ধ হইলেও অভ্রান্ত। এই শক্তি স্বভাবসিদ্ধ। প্রথম বিকাশ হইতেই ইহা সম্পূর্ণ। বুদ্ধির কার্য্যে সংশয় আছে, দ্বিধা আছে, ভ্রম আছে, প্রমাদ আছে। কিন্তু এই নিয়ামক গতির ক্রিয়া অভ্রান্ত এবং নিঃসংশয়। বুদ্ধিক্রিয়ার উন্নতি আছে, অবনতি আছে—কিন্তু এই ক্রিয়ার এরূপ হ্রাস বৃদ্ধি নাই। এই ক্রিয়া বুদ্ধি পরিচালিত না হইলেও ইহা একবারে অজ্ঞাত কর্ম্ম নহে। যেথানেই এই গতির বিকাশ সেইখানেই সংজ্ঞার আভাস পাওয়া যায়। এই ক্রিয়া মানসিক আবেগ সম্ভূত। বৃক্ষলতার জীবন আছে কিন্তু মন নাই; পশুপক্ষীর জীবন আছে, মন আছে, কিন্তু আত্ম-সংজ্ঞা নাই। মানুষের জীবন আছে, মন আছে এবং আত্ম-সংজ্ঞা আছে।

নিয়ামক গতি অভ্রান্ত পরিচালক।

এইরূপ গতি শিক্ষা বা প্রথা পরিচালিত নহে—কারণ অনেক জীবই আজন্ম পিতৃমাতৃহীন। মুরগী ডিমে তা দিতেছে এবং সেই ডিম হইতে ছানা হইতেছে। আবার তন্দুরের অভ্যন্তরে রাখিলেও ডিম হইতে ছানা হয় এবং এই দ্বিবিধ উপায়ে প্রাপ্ত ছানাদ্বয় একই নিয়ামক গতি প্রকাশ করিয়া থাকে। এরূপ গতিকে অভিজ্ঞতা প্রসূতও বলিতে পারা যায় না। কারণ একই পক্ষী তাহার জীবনে যতবারই কুলায় নির্ম্মাণ করুক না কেন তাহার নির্ম্মাণ কৌশলের বা প্রণালীর কোন প্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। অতএব নিয়ামক গতির এই কয়টি বিশেষ লক্ষণ—

নিয়ামক গতি অশিক্ষা লব্ধ।

নিয়ামক গতির লক্ষণ
১। অন্ধ হইলেও ইহা পরিচালক।
২। ইহার পরিচালন শক্তি অভ্রান্ত।
৩। ইহার ক্রিয়াবলি ক্রিয়াকালে অজ্ঞাত নহে।
৪। ইহা উদ্দেশ্যবিহীন না হইলেও উদ্দেশ্য ইহার অজ্ঞাত।
৫। ইহা শিক্ষা বা প্রথা পরিচালিত নহে।
৬। ইহা অভিজ্ঞতা লব্ধ নহে।

বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে যেখানে বুদ্ধির বৃদ্ধি সেইখানে নিয়ামক গতির হ্রাস, আবার যেখানে নিয়ামক গতি অধিক সেখানে বুদ্ধির ক্রিয়া কম।

স্বৈরিণী ক্রিয়া।	প্রত্যাবর্ত্তি ক্রিয়া।	নিয়ামক ক্রিয়া।
১। সরল।	১। সরল।	১। জটিল।
২। উদ্বোধক আন্তরিক।	২। উদ্বোধক বাহ্যিক।	২। উদ্বোধক আন্তরিক এবং বাহ্যিক।
৩। ফল শুভ।	৩। ফল শুভ।	৩। ফল শুভ।
৪। ফল অব্যবহিত।	৪। ফল অব্যবহিত।	৪। ফল ব্যবহিত।
৫। বাসনার একান্ত অভাব।	৫। বাসনার একান্ত অভাব।	৫। বাসনার সামান্য ভাব।

বালক একটি টুকটুকে খেলনা দেখিয়া সেটি লইবার চেষ্টা করিতেছে। বালকের এই ক্রিয়াটি উপরি উক্ত তিন প্রকার ক্রিয়া হইতে পৃথক্। বালকের এই চেষ্টাতে উদ্দেশ্য আছে, বাসনা আছে। বালক চেষ্টা করিতেছে—হস্ত প্রসারণ করিতেছে কিন্তু হয় ত ঠিক জিনিষটি ছুঁইতে পারিতেছে না। সুতরাং বালকের চেষ্টা যে ফলবতী হইতেছে এরূপ

বলা যায় না। কিন্তু দুই একবার চেষ্টা করিতে করিতে যদি সে কৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে যে গতির সাহায্যে সে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছে সেটি মনে করিয়া রাখে। একবার কৃতকার্য্য হইলে হয় ত ভাল মনে থাকে না কিন্তু বারংবার কৃতকার্য্য হইলে এমন হয় যে খেলনা দেখিলেই কিরূপ গতির সাহায্যে ঐ খেলনা হস্তগত হইতে পারে তাহা সহজেই মনে আসে।

মানুষের যে কেবল সংবিত্তির উদ্বোধক বস্তুর গ্রহণের চেষ্টা আছে এমত নহে। মানুষের আর একটি প্রবৃত্তি আছে—এটি গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি নহে, এটি হইবার প্রবৃত্তি। যেটি দেখিব সেটি গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি নহে, কিন্তু যেমনটি দেখিব তেমনটি হইবার প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তিটি অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি। বালকবালিকাদিগকে অপরের গতি বিধি অনুকরণ করিতে দেখা যায়। অবশ্য প্রথমতঃ উহারা কৃতকার্য্য হয় না, কারণ অনুকরণে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কোন্‌টি অনুকরণ করিতে কিরূপ গতির প্রয়োজন জানা উচিত। বালক তাহার পিতাকে লিখিতে দেখিতেছে। বালকও তাহার পিতার মত কলম ধরিতে চায়। কিন্তু তাহার পিতার মত কলম ধরিতে পারিবার পূর্ব্বে বালকের গতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা থাকা চাই এবং কিরূপে সেই গতির সদ্ব্যবহার করিতে পারা যায় তাহাও জানা আবশ্যক। বালক তাহার স্বভাব হেতু কতবার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়াছে, কতবার কত রকমে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়াছে, কখনও সম্প্রসারণ আবার কখনও বা সঙ্কুঞ্চন করিয়াছে। এই প্রকার গতি বিধির স্মৃতি তাহার মনোমধ্যে থাকিয়া গিয়াছে। এখন সে যখন তাহার পিতাকে এক প্রকারে অঙ্গুলি সঙ্কুঞ্চন করিতে দেখিল তখন তাহার অঙ্গুলি সঙ্কুঞ্চনের স্মৃতি জাগরিত হইল। নিজের গতির সহিত পিতার গতির সাদৃশ্য দেখিল।

অনুকরণ ক্রিয়া।

এবং এইরূপে সাদৃশ্য জ্ঞান হইতে আনন্দের সঞ্চারও হইল। এই আনন্দের ছায়া তাহার অনুকরণ প্রবৃত্তিকে আরও প্রবল করিয়া দিল। অনুকরণে প্রয়াস পাইল। দুই একবার হয় ত বিফলকাম হইল। পরে হয় ত কৃতকার্য্য হইল কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়। অবশেষে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইল। পৌনঃপুন্য হেতু অসম্পূর্ণ সম্পূর্ণ হইল। শক্ত সহজ হইল। অনুভূতি ব্যতীত অনুকরণ অসম্ভব। যেখানে গতি সেইখানে কার্য্য এবং সুপরিচালিত কার্য্যের পরিণাম সুখ। অপরে যাহা করে বালক তাহাই করিতে চায়, সুতরাং অনুকরণে সহানুভূতি আছে। আমি যাঁহাকে ভক্তি করি সম্মান করি আমি তাঁহাকে অনুকরণ করি—আমি তাঁহার মত হইতে চাই।

"ওই জনক আমার
করিছেন কি ভীষণ যুদ্ধ অনিবার!
কত অস্ত্রাঘাত, ভীম বজ্রাঘাত কত,
সহিছেন অবিকল হিমাদ্রির মত!
তাঁহার তনয় আমি রমণী অঞ্চল
ধরিয়া রহিব এইরূপে অবিচল?
না, না, প্রিয়ে! কালি আমি প্রবেশিব রণ,
দেখাইব অভিমন্যু অর্জ্জুন-নন্দন"॥

অনুকরণের প্রবৃত্তি মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী। কেহ সহজেই অপরকে অনুকরণ করিতে পারে আবার কেহ তত সহজে পারে না। যাহারা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচেতা তাহাদের অনুকরণ শক্তি কম। আমি দুর্ব্বল, আমি অজ্ঞ, এই প্রকার জ্ঞান হইতেই অনুকরণ প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। অনুকরণে বুদ্ধি-বৃত্তিরও আবশ্যক। গতির সহিত গতিলব্ধ ফলের সঙ্গ জ্ঞান আবশ্যক। কোন্ গতি হইতে কোন্ ফল পাওয়া যায় জানা উচিত।

অবধান ব্যতীত অনুকরণ অসম্ভব। নিজের গতিবিধি এবং অপরের গতি-বিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবধান করিতে হয়। যে যত অবধান শক্তির প্রয়োগ করিবে তাহার তত অনুকরণ করিবার ক্ষমতা হইবে। পৌনঃপুণ্য হেতু অনুকরণ কার্য্য সহজ হইলেও প্রথম অবস্থায় যথেষ্ট অবধান শক্তির প্রয়োজন। অনুকরণে স্মরণশক্তি প্রয়োজন। অনুকরণ করিতে হইলে কোন্ পেশীর কিরূপ প্রয়োজন, কোন্ অঙ্গের কিরূপ সঞ্চালন আবশ্যক, ইত্যাদি বিষয়ের স্মৃতি আবশ্যক। যাহা অনুকরণ করিব তাহা নূতন। পুরাতনের সাহায্যে নূতনের অনুকরণ করি। আমার যাহা আছে তাহার সাহায্যে আমার যাহা নাই তাহাই অনুকরণ করি। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে নূতনের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চাই—সুতরাং কল্পনার আবশ্যক। শৈশবাবস্থায় অনুকরণ বুদ্ধি পরিচালিত বা ইচ্ছানুশাসিত নহে এই সময়ে বুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্তি দুইই কম থাকে। এখনকার অনু-করণ নিশ্চেষ্ট অনুকরণ। অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাসের সাহায্যে ইহা সচেষ্ট অনুকরণে পরিণত যায়। অনুকরণে উদাহরণ আবশ্যক, কারণ যাহা অনুকরণ করা যায় তাহাই উদাহরণ। অনুকরণ, উদাহরণ এবং সহানু-ভূতি এই তিনটি একসূত্রে গ্রথিত। পাঁচজনে মিলিয়া যেটি অনুকরণ করা যায় সেটিকে শীঘ্র এবং সহজে অনুকরণ করা যায়। তুমি যদি পাঁচ জনের সহিত মিশিয়া সাঁতার শিখিতে চাও তবে তুমি শীঘ্র কৃতকার্য্য হইবে, কিন্তু তুমি যদি একা চেষ্টা কর তবে বিলম্ব এবং কষ্ট হইবে।

সচেষ্ট কর্ম্ম।

মানুষ অসম্পূর্ণ। যেখানে অসম্পূর্ণতা সেইখানে অভাব। মানুষ অহরহ অভাব পরিবেষ্টিত। এই অভাব হইতে সচেষ্ট কর্ম্মের সৃষ্টি হইতেছে।

"মানব অপূর্ণ, মাত্র পূর্ণ নারায়ণ!
পূর্ণব্রহ্ম মহাদর্শ রাখিয়া সম্মুখে,

অপূর্ণ আমরা, প্রভো, যাইব ভাসিয়া
সেই পূর্ণতার দিকে, নিব ভাসাইয়া
সমস্ত মানব জাতি উন্নতির পথে" ॥

যেখানে অভাব সেইখানে অশান্তি। মানব হৃদয়ে অশান্তি পোষণ করিতে পারে না। অভাব হইলেই অভাব অপনোদনের চেষ্টা করিয়া থাকে। মানুষের বুদ্ধি আছে। এই বুদ্ধিবলে কিসে তাহার অভাব দূরীভূত হইবে স্থির করিয়া লয়। অভাব অনুভব করিল; অভাব অপনোদনের বিষয় স্থির করিল; উক্ত বিষয় লাভে কিরূপে শান্তি পাইবে তাহাও ভাবিয়া লইল। একদিকে অভাব এবং অন্যদিকে শান্তির আশা। এইবার আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল, অভাবকে দূর করিয়া শান্তিকে আলিঙ্গন করিবার বাসনা জন্মিল। যাহাতে অভাব অপসৃত হইবে সেইটি পাইবার বাসনা হইল।

"বাসনার বহ্নিময় কষাঘাতে হায়
পথে পথে ছুটিয়াছি পাগলের মত।"

কিন্তু একই অভাবের তৃপ্তি নানা বিষয়ে হইতে পারে। আমি শীত অনুভব করিতেছি। বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া শীত নিবারণ করিতে পারি, অগ্নিসন্তাপে শীত নিবারণ করিতে পারি, আবার ঔষধ সেবনেও শরীরকে উষ্ণ করিতে পারা যায়। এই তিনটিরই ধারণা মনের মধ্যে যুগপৎ উদয় হইতেছে। পরস্পরের মধ্যে যেন যুদ্ধ বাধিয়া গেল। প্রত্যেকেই অপরকে পরাভূত করিয়া নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চায়। বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে শান্তি স্থাপনের প্রয়োজন। মন এখন প্রত্যেক বিষয়ের ফলাফল, শুভাশুভ আলোচনা করিল, পরস্পরকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিল এবং ইহাদের মধ্যে কোনটি বাঞ্ছনীয় বিচার করিল। এই প্রকার

বিচারের নাম মনন। এইরূপে অভিলষিত বস্তু স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু একই অভিলষিত বস্তু নানা উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন কোন্ উপায়টিকে গ্রহণ এবং কোন্‌টিকে প্রত্যাখ্যান করিব? সুতরাং এখানে তেমনি আলোচনা,তেমনি তুলনা এবং তেমনি বিচারের প্রয়োজন। এইরূপে যখন কোন বস্তুটি বাঞ্ছনীয় এবং কি উপায়ে বাঞ্ছনীয় বস্তু গ্রহণীয় স্থির হইল তখন অন্যান্য বস্তু এবং উপায়গুলি প্রত্যাখ্যান করিয়া একটি বস্তু এবং একটি উপায়ের উপর চিত্তসংযোগ করিলাম। অনেকের মধ্যে একটিকে পছন্দ করিলাম। এখন যাহা পছন্দ করিলাম তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। এইবার শারীরিক ক্রিয়ার প্রয়োজন। বহির্বাহী স্নায়ুর সাহায্যে মাংসপেশী এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিতর শক্তিপ্রয়োগ করিয়া ইষ্ট বস্তু গ্রহণোপযোগী শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করিলাম। এতক্ষণে কর্ম্মের শেষ হইল। এতক্ষণে ইষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু কর্ম্মফল যে কেবলমাত্র ইষ্ট বস্তু প্রাপ্তি এমন নহে—ইহার আনুষঙ্গিক ফলও আছে। ইষ্ট বস্তু প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি ফল ফলিয়া থাকে। সে ফলগুলি বাঞ্ছনীয় না হইলেও অনিবার্য্য। কর্ম্মের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইষ্ট বস্তু লক্ষ্য হইলেও আনুষঙ্গিক ফলগুলি বাসনার বিষয়ীভূত না হইলেও অদৃষ্টপূর্ব্ব নহে। কোন বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আমার লক্ষ্য এবং যখন উত্তীর্ণ হইলাম তখন দেখিলাম যে আমি নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছি। আনুষঙ্গিক ফল মাত্রেই যে দৃষ্টপূর্ব্ব এমন নহে—ইহার মধ্যে অনেকগুলি অদৃষ্টপূর্ব্ব এবং সেগুলি আমাদের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও হইয়া যায়। অতএব সচেষ্ট কর্ম্মের ক্রম নিম্নলিখিতরূপে বিশ্লেষণ করা যায়—

১। মানসিক অবস্থা

(ক) অভাব

(খ) অভাবমোচনোপযোগী বস্তুর ধারণা

(গ) বাসনা

(ঘ) মনন

(ঙ) পছন্দ

(২) শারীরিক অবস্থা

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন।

(৩) ফল—

(ক) ইষ্ট বস্তু

(খ) দৃষ্টপূর্ব্ব আনুষঙ্গিক ফল,

(গ) অদৃষ্টপূর্ব্ব আনুষঙ্গিক ফল।

সচেষ্ট কর্ম্ম প্রথমতঃ বড়ই সরল এবং সামান্য। ক্রমশঃ ইহা জটিল হয়। প্রথমতঃ ইহা বহির্মুখী ক্রমশঃ ইহা অন্তর্মুখী হয়। প্রথমতঃ শারীরিক ক্রমশঃ ইহা মানসিক কর্ম্মে পরিণত হয়। ইহা যখন শারীরিক তখনও মানস-ক্রিয়ার প্রয়োজন—অবধান আবশ্যক। আবার ইহা যখন মানসিক তখনও শারীরিক ক্রিয়ার প্রয়োজন, তবে শারীরিক ক্রিয়ার সময় মানসিক ক্রিয়ার প্রাধান্য কম এবং মানসিক ক্রিয়ার সময় শারীরিক ক্রিয়ার প্রাধান্য কম। প্রথমতঃ এই কর্ম্ম বাহ্য বস্তু এবং প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়। এইরূপ কর্ম্মকে অব্যবহিত কর্ম্ম বলা হয়। পরে ইহা অপ্রত্যক্ষ বস্তুর ধারণা হইতে উৎপন্ন হয়। ভাবি সুখের চিন্তা পরে আমাদের কর্ম্ম প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তোলে। এরূপ কর্ম্ম ব্যবহিত কর্ম্ম। বালক রাঙ্গা ফুলটি দেখিল আর গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল—এটি অব্যবহিত কর্ম্ম, আর—

ব্যবহিত ও অব্যবহিত কর্ম্ম।

"আমি, বসায়ে হৃদয়াসনে
প্রেম-অশ্রু জলে
নিত্য তারে পূজি গো গোপনে।
ভকতি প্রসূন দলে
দিই পুষ্পাঞ্জলি
সেই চিরবাঞ্ছিত চরণে।"—এটি ব্যবহিত কর্ম্ম।

কার্য্য যতই জটিল হয়, ততই মনন কার্য্যের প্রয়োজন হয়। যখন কামনার পর কামনা, বাসনার পর বাসনা "মানবের সুপ্ত হিয়া যেন দেয় জাগাইয়া" যখন "সুপ্ত সাধ জেগে উঠে অতীতের স্মৃতি ফুটে" তখন মানুষের মন বিচলিত হয়, কর্ত্তব্য নিরূপণে ব্যস্ত হয়। আমি চাই কার্য্য কিন্তু বাসনার পর বাসনা, অভাবের পর অভাব আসিয়া মনকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে, মনকে চিন্তাকুল করে, কার্য্যস্রোত ক্ষণকালের জন্য প্রতিরোধ করে। প্রত্যেক বাসনাই মনের সম্মতি প্রার্থনা করিতেছে, প্রত্যেক বাসনাই কার্য্যকরী হইতে চাহিতেছে। সুতরাং বাসনার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে।

মনন।

"কি কষ্ট না দিয়েছিস্ রাক্ষসী প্রকৃতি
অসহায় ছিনু যবে তোর মায়া ফাঁদে!
আমার হৃদয় রাজ্যে করিয়া প্রবেশ
আমারি হৃদয় তুই করিলি বিদ্রোহী।"

মন এখন প্রত্যেকের বিষয় বিচার করিতেছে; কোন্‌টি সুসঙ্গত ও কোন্‌টি অসঙ্গত আলোচনা করিতেছে, কোন্‌টি বাঞ্ছনীয়, কোন্‌টি অবাঞ্ছনীয় নির্ণয় করিতেছে। এইরূপ বিচার, এইরূপ আলোচনা, এইরূপ নির্ণয়ের নাম মনন। মননে অভিজ্ঞতার আবশ্যক, জ্ঞানের আবশ্যক।

বালক যে কায করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করে না, কি কিঞ্চিন্মাত্রও সঙ্কুচিত হয় না, প্রবীণের সে কার্য্যে দ্বিধা হইতে পারে, সঙ্কোচ বোধ হইতে পারে। বালকের যাহা অ-দৃষ্ট প্রবীণের তাহা দৃষ্ট। বালকের লক্ষ্য আশু ফল, প্রবীণের লক্ষ্য ভাবী ফল। হঠকারিতার ফল অনেক সময়ই বিষময়। সুতরাং বাসনার উদ্রেক মাত্রেই কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া কিছুক্ষণ কার্য্য স্থগিত রাখিয়া বিচারের অবসর লওয়া উচিত। বিচারের পর মনন, মননের পর কার্য্য।

সঙ্কল্প।

"যে পথে যাইতে সখী করেছি মনন
শত বাধাবিঘ্ন রাশি,
যদি তাহা রোধে আসি;
তথাপি ফিরাতে মোরে নারিবে কখন।"

অভি। "আমারো এ সাধ প্রিয়ে! লইয়া তোমায়—
রণান্তে যাইব সেই বনে দুজনায়!
কি আনন্দ অশ্রু মাতা করিবে বর্ষণ!
কি আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে কানন!
বড় সাধ মনে প্রিয়ে! রণান্তে সে বনে
সুন্দর আশ্রম এক সৃজিব দুজনে।"

* *
*

উত্তরা। "কি সুখের ছবি আহা! চল নাথ! চল,
এই কল্পনার স্বপ্ন করিগে পূরণ।"

*
*

অভি। "পূরাইব; কিন্তু অগ্রে এই রণস্থল,
করিতে হইবে প্রিয়ে! স্বধর্ম্ম পালন।"

বাসনার উদ্রেক হইলেই কার্য্যে পরিণত হয় না। বাসনাটি বাঞ্ছনীয় কি না দেখা উচিত। আবার যাহা বাঞ্ছনীয় মনে করি তাহা যে তখনই পাইতে চেষ্টা করি এমন নহে। অনেক সময়ে বাঞ্ছিত বাসনার পরিতৃপ্তি সময় সাপেক্ষ। উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় বাঞ্ছিত বাসনার পরিতৃপ্তি স্থগিত রাখি। মনের বাসনা মনেই থাকে। এই প্রকার বাসনার নাম সংকল্প। অভিমন্যু তাঁহার প্রিয়ার সহিত বনে যাইয়া সিন্ধুতীরে মনোহর শৈলে সুন্দর আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া

"রবিকরে, জ্যোৎস্নায়, চাহি সিন্ধুশোভা,
চাহি বন প্রকৃতির শোভা মনোলোভা;
গাঁথিবে কবিতাহার; গাঁথিবে উত্তরা—
কাছে বসি ফুলমালা, বীণা সপ্তস্বরা,
বাজাইবে বীণাকণ্ঠে গাইবে কখন
পূরিয়া সুধায় সেই নির্জ্জনকানন।"

ইহাই অভিমন্যুর বাসনা, কিন্তু অভিমন্যু প্রিয়ার অনুরোধ সত্ত্বেও এ বাসনার পরিতৃপ্তি এখনই করিতেছেন না। ইহার পরিতৃপ্তির উপযুক্ত সময় এখনও আসে নাই। এখন তাঁহার সম্মুখে মহাকর্ত্তব্য স্বধর্ম্ম পালন। পূর্ব্বে স্বধর্ম্ম পালন পরে অন্য বাসনা তৃপ্তির চিন্তা। সুতরাং যতদিন কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত না হইয়াছে ততদিন তাঁহার মনের বাসনা মনেই থাকিবে, ততদিন তাঁহাকে এই আশা মনের মধ্যে পোষণ করিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত থাকিল। মনের এই অবস্থার নাম সংকল্প। সংকল্পে চিন্তা এবং কল্পনার প্রয়োজন। সংকল্পিত বিষয় যত দিন দুষ্প্রাপ্য থাকে ততদিন মনে অশান্তি বিরাজ করে। ভবিষ্যৎ ফল প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা এবং কল্পিত সুখ সম্ভোগে বিলম্ব—এই দুইটি এই অশান্তির কারণ।

বাসনা এবং ইচ্ছা দুইটি পৃথক্ বস্তু। বাসনা ইচ্ছার ভিত্তি মাত্র। সকল বাসনাই ইচ্ছায় পরিণত হয় না। যেখানে বিশ্বাস সেইখানে ইচ্ছা। বাসনার বিষয় হয় প্রাপ্য না হয় দুষ্প্রাপ্য। বিষয়টি প্রাপ্য বলিয়া যদি বিশ্বাস জন্মে তবেই বাসনা ইচ্ছায় পরিণত হইবে। প্রাপ্য বলিয়া বিশ্বাস হইলেই যে সেটি পাওয়া যাইবে এমন নহে। কিন্তু পাই বা না পাই, পাইব বিশ্বাস না থাকিলে চেষ্টার উদ্রেক হইবে না, ইচ্ছার প্রকাশ হইবে না।

বাসনা এবং ইচ্ছা।

"তুমি জান মোর মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা,
দিবসনিশি।"

বালকটির পুরস্কার পাইবার বাসনা আছে কিন্তু সে পাইবে না ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট আছে, আর একটি বালক পাইবে মনে করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। একজনের ইচ্ছার উদয় হইল না, আর একজনের হইল।

বাসনায় অনুভূতি আছে এবং অনুভূতিতে বাসনা আছে। তবে বাসনায় অনুভূতি কম এবং অনুভূতিতে বাসনা কম। বাসনায় আবেগ আছে, অনুভূতিতে আবেগ নাই। কিন্তু অনুভূতি হইতেই আবেগের উৎপত্তি। অনুভূতি মনের নিষ্ক্রিয় অবস্থা। এই নিষ্ক্রিয় অবস্থা হইতে সক্রিয় অবস্থার উৎপত্তি হইতেছে। অনুভূতি যদি সুখের হয় তবে সে অনুভূতিকে স্থায়ী করিবার বাসনা হয়, কিন্তু ইহা যদি দুঃখের হয় তবে তাহাকে বর্জ্জন করিবার বাসনা হয়। অপ্রত্যক্ষ সুখানুভূতিকে প্রত্যক্ষীভূত করিবার কিংবা প্রত্যক্ষ সুখানুভূতিকে স্থায়ী করিবার বাসনা মানবের স্বাভাবিক।

বাসনা এবং অনুভূতি।

অতএব যেখানে বাসনা সেইখানে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সুখানুভূতি। বাসনাতে যে কেবল সুখানুভূতি বিদ্যমান আছে এমন নহে। দুঃখানুভূতিও আছে। যেখানে বাসনা সেইখানে অভাব এবং যেখানে অভাব সেইখানে দুঃখ। আমার অভাব আছে তাই আমার অভাব পূরণের বাসনা। আমার দুঃখ আছে তাই আমার সুখের লালসা। যদি অভাব জ্ঞান না থাকিত, যদি দুঃখানুভূতি না থাকিত, যদি মাত্র সুখানুভূতি থাকিত তবে সে অনুভূতিতে আবেগ থাকিত না। এটি একেবারে নিষ্ক্রিয় ভোগের অবস্থা ইহাতে আবেগ নাই বাসনা নাই। সুতরাং বাসনার মূলে অনুভূতি, পরিণামেও অনুভূতি।

বুদ্ধি ও বাসনা।

বাসনায় বুদ্ধির প্রয়োজন। বিষয় ব্যতীত বাসনা অসম্ভব। যে বিষয় আমাদের ধারণাতীত, কল্পনাতীত সে বিষয়ের বাসনা থাকিতে পারে না। অতএব যেখানে বাসনা সেইখানে ধারণা এবং কল্পনার প্রয়োজন। বুদ্ধিবলেই বাসনার বিষয় নির্ণীত হয়। বুদ্ধির যেমন বিকাশ হইবে বাসনারও তেমনি প্রকাশ হইবে।

বাসনা ও অবধান।

বাসনা এবং অবধানের সম্বন্ধ নিতান্ত ঘনিষ্ঠ। আমার ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করিবার নিমিত্ত আমি কতকগুলি টাকা পাইয়াছি। প্রাপ্ত মাত্রেই কি উদ্দেশ্যে ঐ অর্থ ব্যয় করা যাইতে পারে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি পুস্তক পাঠে সুখ পাই তাই একবার পুস্তক ক্রয় করিবার বাসনা জন্মিল; আমি শিল্পানুরাগী তাই একবার কতকগুলি চিত্র ক্রয় করিবার বাসনা জন্মিল; এ স্থানে আমার স্বাস্থ্যহানি হইতেছে তাই একবার স্থান পরিবর্ত্তন করিবার বাসনা জন্মিল। এইরূপে বাসনার পর বাসনা আসিয়া আমার মনকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। এই সকল নানা বাসনার মধ্যে

কোনটি আমার অধিক আদৃত? ইহাদের মধ্যে যেটির উপর অবধান শক্তি কেন্দ্রীভূত করিব সেইটিই অধিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইবে। যেটির উপর অবধান শক্তি প্রয়োগ করিব সেইটিই অপরগুলি অপেক্ষা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। এইরূপে একটি, চিত্তের সম্মুখীন হইবে অপর-গুলি, চিত্তান্তরালে লুক্কায়িত হইবে।

স্মরণশক্তির সহিত বুদ্ধির যে সম্বন্ধ, অভ্যাসের সহিত ইচ্ছার সেই সম্বন্ধ; সচেষ্ট কর্ম্মের পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠানে নিশ্চেষ্ট কর্ম্মের সৃষ্টি হয়।

স্বভাব ও প্রকৃতি।

সচেষ্ট কর্ম্ম মাত্রেই উদ্দেশ্যমূলক। একই উদ্দেশ্যে একই কার্য্যের বারংবার অনুষ্ঠান করিলে সেই কার্য্যটি অভ্যাসে পরিণত হয়, মনে একটি প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হয়। এবং সেই উদ্দেশ্যটির আভাস মাত্রেই বিনা চেষ্টায় বিনা যত্নে বিনা মনোযোগে সে কার্য্যটি আপনা আপনি সংসাধিত হইয়া যায়। এই প্রকার অভ্যাসলব্ধ অযত্ন সাপেক্ষ কর্ম্মের নাম স্বভাব। পৌনঃপুন্য হেতু লক্ষ্য এবং কার্য্যের সহিত সুদৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সুতরাং লক্ষ্যের আভাসমাত্রেই কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। যে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে নিদ্রা যায়, দৈব গতিকে যদি কোন দিন নিরূপিত সময়ের ব্যতিক্রম ঘটে তবে অভ্যাসের কতটুকু শক্তি প্রাচুর্য্য বুঝিতে পারে। যে প্রত্যহই নিয়মিত সময়ে ঘড়িতে দম দেয় না, সে হয় ত কোন কোন দিন একেবারে দম দিতে ভুলিয়া যায়, কিন্তু যাহার সময় ধার্য্য তাহার এরূপ ভুল কচিৎ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং কেবল মাত্র পৌনঃপুন্য হইতেই স্বভাবের উৎপত্তি হয় না। পৌনঃপুন্য নিয়মিত হওয়া আবশ্যক। প্রথম ব্যক্তি যতবার দম দেয় দ্বিতীয় ব্যক্তি ততবার দম দেয় কিন্তু প্রথম ব্যক্তির কার্য্য স্বভাবে পরিণত হয় নাই, কারণ ইহার কার্য্য কোন নিয়মানুগামী নহে। প্রত্যেক স্বভাবের প্রারম্ভ আছে। প্রত্যেক স্বভাবই উদ্দেশ্যমূলক। প্রথমে

চেষ্টার আবশ্যক কিন্তু শেষে চেষ্টার আর দরকার হয় না। একটি কাজ যখন প্রথম করিলাম তখন বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হইল, দ্বিতীয়বার কম চেষ্টাতেই হইল, তৃতীয়বার চেষ্টা আরও কম করিতে হইল, এইরূপে ক্রমশঃই চেষ্টা কমিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে বিনা চেষ্টায় কার্য্য সম্পাদিত হইল। কেবল নিয়মিত পৌনঃপুন্যই স্বভাবের একমাত্র হেতু নহে; মানুষের মনের প্রকৃতি ও শরীরের অবস্থার উপরও নির্ভর করে। বাল্যকালে যত শীঘ্র স্বভাবের সৃষ্টি হয়, পরিণত বয়সে তত সহজে হয় না। যতই আমাদের বয়োবৃদ্ধি হয়, ততই নূতন স্বভাব গঠনের ক্ষমতা হ্রাস হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি স্বভাবের সৃষ্টি হয়, এবং নূতন স্বভাব লাভ করিতে হইলে পুরাতন স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে হয়। কিন্তু স্বভাব অর্জ্জন করা অপেক্ষা লব্ধ স্বভাব পরিবর্জ্জন করা অধিক দুষ্কর। পুরাতনকে বর্জ্জন বা পরিবর্ত্তন না করিলে নূতনকে গ্রহণ করা যায় না। যতই বয়োবৃদ্ধি হয়, ততই পুরাতনের সংখ্যা বাড়িয়া যায়, সুতরাং নূতনকে গ্রহণের শক্তি কমিয়া আইসে। বালকে নূতন বেশী পুরাতন কম; বৃদ্ধে পুরাতন বেশী নূতন কম। সুতরাং বালকের পক্ষে যাহা সহজ বৃদ্ধের পক্ষে তাহা শক্ত।

"বৎসে! তুমি নাহি জান, বৃদ্ধ হৃদয়ের কি দুর্দ্দশা
পরিশ্রান্ত, অবসন্ন, নূতনে আপন করি নিতে
কত যে আয়াস তার! পুরাতনে প্রাণপণ বলে
আঁকড়িয়া ধরে থাকে; ভুলেছিনু সন্তানের লয়ে
এত দিন তাহারেও দিতে হবে নূতনেরে সঁপে,
সময় এসেছে, আ—আ! নূতনে ও পুরাতনে, হায়;
দ্বন্দ্ব যদি বেধে যায় নূতনেরি হবে জয়, জানি।

পোড়া চোখে আসে জল, মনে কিছু কর না মা তুমি,
বুড়া বয়সের এই ধারা।"

কর্ম্ম হইতে স্বভাবের সৃষ্টি হইতেছে। সৎকর্ম্ম হইতে সৎস্বভাবের সৃষ্টি হইলে সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান সহজসাধ্য হয়। তখন সদনুষ্ঠানের জন্য যত্ন চেষ্টা করিতে হয় না। স্বভাবের সহায়তায় আমাদের শক্তির অপব্যবহার কম হয়। প্রথমে একটি কার্য্য শিক্ষা করিতে শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। পরে অভ্যাসবলে যখন সে কার্য্যটি স্বভাবে পরিণত হইল, তখন আর শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক হইল না। ঐ শক্তিকে এখন অন্য কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারি। সচেষ্ট কর্ম্ম আমাদের শক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, এবং যতক্ষণ শক্তি বর্ত্তমান ততক্ষণ ঐ কর্ম্ম বর্ত্তমান। শক্তিকে হরণ কর কর্ম্মও শিথিল হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বভাব কর্ম্মকে অপ্রতিহত রাখিয়া আবদ্ধ শক্তিকে মুক্ত করে। আবার এই মুক্ত শক্তি অন্য কর্ম্মের সৃষ্টি করে, অন্য কর্ম্মে আবদ্ধ হয়। এইরূপে স্বভাবের বলে কর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু শক্তির ক্ষয় হইতেছে না। অল্পব্যয়ে অধিক আয় হইতেছে।

"অদৃষ্টেরে শুধালেম—চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে ?
সে কহিল ফিরে দেখ। দেখিলাম আমি
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে—পাশ্চাতের আমি!"

মানুষের চরিত্রকে অভ্যাস সমষ্টি বলা হয়। অভ্যাসের প্রধানতঃ তিনটি নিয়ামক দৃষ্ট হয়। প্রথমটি পৈত্র। বংশপরম্পরানুযায়ী আমরা কোন বিশেষ আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হইতে পারি এবং সেই বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হইতে বিশেষ স্বভাবের সৃষ্টি হইতে পারে। আমার যাহা পৈত্র, যাহা

আমি আমার পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে পাইয়াছি, তাহা আমার স্বভাব নহে। স্বভাবের আকার মাত্র। অভ্যাসের বলে, শিক্ষার সাহায্যে অপর নিয়ামকের সাহায্যে, এরূপ আকাঙ্ক্ষার বিনাশ বা দমন সম্ভব। অতএব তোমার প্রকৃতি মন্দ হইলেও, সে প্রকৃতি পারম্পর্য্যানুগত হইলেও, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের নিন্দা করা তোমার উচিত হয় না। কারণ ঐ প্রকৃতির বিনাশসাধন তোমার ইচ্ছাধীন। স্বভাবের দ্বিতীয় নিয়ামক পারিপার্শ্বিক অবস্থা। যে বালক পাপের সংসারে লালিত-পালিত তাহার মতি-গতি পবিত্র সংসারে বর্দ্ধিত বালক অপেক্ষা নিশ্চয় বিভিন্ন হইবে। স্বভাবের তৃতীয় নিয়ামক ইচ্ছা। এই ইচ্ছা প্রভাবেই পৈত্র্য প্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারি। এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারি। বংশপরম্পরানুগত বিশেষ মানসিক গতির নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি নানা প্রকারের। প্রকৃতি বেদনানুযায়ী। স্বভাব বেদনা এবং ক্রিয়াশক্তি অনুযায়ী।

প্রকৃতির প্রকার—

- সুপ্রত্যাশী
  - শারীর লক্ষণ
    - সুপুষ্ট পরিপাক যন্ত্র।
    - সুপুষ্ট রক্ত সঞ্চালন।
    - লোহিতবর্ণ কেশ।
    - নীলবর্ণ চক্ষু।
    - সুন্দর চর্ম্ম।
    - তেজোব্যঞ্জক আনন।
  - মানস লক্ষণ
    - প্রফুল্ল।
    - ক্ষিপ্র।
    - সহজে উত্তেজিত হওন।
    - বেদনার প্রাবল্য।

- ক্রোধী
  - শারীর লক্ষণ
    - পেশী সুদৃঢ় এবং সুপুষ্ট।
    - কৃষ্ণবর্ণ কেশ।
    - কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু।
    - পাণ্ডুবর্ণ চর্ম্ম।
    - ক্রোধব্যঞ্জক বদন।
  - মানস লক্ষণ
    - দৃঢ় নিশ্চয়।
    - আত্মপ্রত্যয়।
    - ইচ্ছা শক্তির প্রাধান্য।

- জড় প্রকৃতি
  - শারীর লক্ষণ
    - উদর বৃহৎ।
    - মুখাবয়ব গোলাকার।
    - অভিব্যঞ্জক শূন্য মুখ।
    - ওষ্ঠদ্বয় মোটা।
    - আয়াস কাতর দেহ।
  - মানস লক্ষণ
    - মন অসাড় এবং আড়ষ্ট।
    - সহিষ্ণু।
    - ধীর।
    - আত্মনির্ভরশীল।

- রসিক
  - শারীর লক্ষণ
    - মস্তক বৃহৎ।
    - চক্ষু উজ্জ্বল।
    - চক্ষু ভাব প্রকাশক।
    - আকৃতি কোমল এবং ক্ষীণ।
    - গতি ক্ষিপ্র।
  - মানস লক্ষণ
    - কাব্যানুরাগ।
    - সঙ্গীতানুরাগ।
    - প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুরাগ।
    - জীবনের প্রাত্যহিক কর্ম্মে বিরাগ।
    - বেদনার আধিক্য।
    - ইচ্ছাশক্তি অতি ক্ষীণ।
    - কল্পনা শক্তি অতি প্রবল।

কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম।

যে বালক নিত্য নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে আইসে এবং নিয়মিতরূপে পাঠ অভ্যাস করে, তাহাকে কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিতে পারা যায়। কিন্তু সে যদি নিষ্ঠুর হয়, এবং অপরের সহিত অসদ্ব্যবহার করে তাহা হইলে তাহাকে ধর্ম্মশীল বলা যায় না। যে ব্যক্তি নিজের ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত অর্থব্যয় করে, তাহাকে কর্ত্তব্যশীল বলা যায়, কিন্তু সে ব্যক্তি যদি অপরের ঋণ পরিশোধের জন্য অর্থব্যয় করে তবে তাহাকে ধর্ম্মশীল বলা হয়। অতএব যাহা করা উচিত তাহাকেই কর্ত্তব্য বলা হয়। সৎকর্ম্ম মাত্রেই আমাদের করা উচিৎ, অতএব, সৎকর্ম্ম মাত্রেই কি আমাদের কর্ত্তব্য? ক্ষুধায় আহার্য্য গ্রহণ, তৃষ্ণায় পানীয় গ্রহণ, সৎকর্ম্ম হইলেও এরূপ কর্ম্মকে কর্ত্তব্য বলে না। যে কর্ম্ম নীতি প্রণোদিত নহে, যে কর্ম্ম

শীল বিষয়ক নহে সে কর্ম্মকে কর্ত্তব্য বলা হয় না। শীল বিষয়ক নীতি প্রবর্ত্তক মাত্রেই কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মের পার্থক্য বিচার একটি বিশেষ সমস্যা। চরিত্রের সহিত কর্ম্মের যে সম্বন্ধ ধর্ম্মের সহিত কর্ত্তব্যের ও সেই সম্বন্ধ। কর্ম্ম চরিত্রের অভিব্যঞ্জক। কর্ত্তব্য ধর্ম্মের অভিব্যঞ্জক। একটি আন্তর, অপরটি বাহ্য।

কর্ত্তব্য—
১। কর্ম্ম-বিষয়ক
২। নিরূপিত
৩। সসীম (কর্ত্তব্যাতিরিক্ত কর্ম্ম করা দুরূহ)
৪। করণে বাধ্য (অনিচ্ছাধীন)
৫। পুণ্য অপেক্ষা কম

ধর্ম্ম—
১। চরিত্র বিষয়ক
২। অনিরূপিত
৩। বর্দ্ধনশীল
৪। ইচ্ছাধীন
৫। কর্ত্তব্য অপেক্ষা বেশী

ধর্ম্ম

(ক) নৈতিক—(১) আত্মসম্পৃক্ত—
১। পবিত্রতা
২। ইন্দ্রিয়সংযম
৩। সাহস
৪। শ্রমশীলতা
৫। পরিণামদর্শিতা
৬। আত্মসম্মান

(২) পরসম্পৃক্ত—

১। ন্যায়পরতা

২। হিতৈষিতা

(অ) ব্যক্তির প্রতি

১। পিতৃভক্তি

২। ভ্রাতৃপ্রেম

৩। পুত্রবৎসলতা

৪। বন্ধুতা

৫। শিষ্টতা

৬। সাধুতা

(আ) দশের প্রতি

১। সর্ব্বহিতৈষিতা

২। সত্যতা

৩। সাধুতা

(ই) দেশের প্রতি

১। স্বদেশানুরাগ

২। রাজভক্তি

(ঈ) মনুষ্যত্বের প্রতি

১। সহানুভূতি

২। হৃদ্যতা

(খ) জ্ঞান সম্পর্কীয়—

(১) সত্যানুশীলনে—

১। সরলতা

২। নিরপেক্ষতা

(২) সত্যজ্ঞাপনে—

১। সত্যতা

২। স্পষ্টবাদিতা

(৩) সত্যপ্রয়োগে—

১। পরিণামদর্শিতা

২। বিজ্ঞতা।

৩। মনোযোগিতা ৩। সংরক্ষণশীলতা

৪। প্রমাদশূন্যতা ৪। সদ্বিবেচনা

(৩) সত্য প্রয়োগে—

১। পরিণামদর্শিতা ২। বিজ্ঞতা

মানুষের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মেরও জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মানুষের যতই বুদ্ধির বিকাশ এবং ভাবের উন্মেষ হইয়া থাকে ততই তাহার কর্ম্মোদ্দীপনী অনুভূতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যখন একই কর্ম্মের বহু উদ্দীপনী পরস্পর সহায় হয়, তখন সে কর্ম্ম সুখের হেতু হইয়া থাকে। আবার যখন একই কর্ম্মের উদ্দীপনী নিচয় পরস্পর বিরোধী হয়, তখন সে কর্ম্ম হইতে দুঃখের সৃষ্টি হয়। একই সময় একস্থানে গীত বাদ্য হইতেছে, আর এক স্থানে ব্যায়াম ক্রীড়া চলিতেছে। বালকের যখন দুইটিই দেখিবার বাসনা জন্মে, তখন দুইটী সদ্যউদ্দীপনীর মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। বালকটীকে একটী সুমিষ্ট ফল দিয়া ইহার কতকটুকু এখন খাইতে বলিলে, আর বাকিটুকু পর দিবসের জন্য রাখিয়া দিতে বলিলে। এখন বালকের মনে সংঘাত উপস্থিত হইল। এখানে এক দিকে সদ্য মিষ্ট রসাস্বাদনের বাসনা আর একদিকে নিজেকে সেই বাসনা হইতে বঞ্চিত করিয়া ভবিষ্যতের চিন্তা। এখানে সদ্যউদ্দীপনী এবং দুরোদ্দীপনীর মধ্যে বিরোধ বাধিয়া গেল। যখন একদিকে অতিরিক্ত আহারের প্রলোভন এবং আর একদিকে উদরাময়ের আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তখন বাসনা এবং বাসনালভ্য ফলের চিন্তায় বিরোধ উপস্থিত হয়। আবার যখন যশের মন্দিরে স্বাস্থ্যের বলি দিতেছি, যখন যশের জন্য স্বাস্থ্যহানি করিতেছি, তখন বাসনা এবং জীবনের স্থায়ী লক্ষ্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে কর্ম্মের জটিলতার হেতু—

কর্ম্মের জটিলতা।

১। উদ্দীপনীর পরস্পর সহায়তা

২। উদ্দীপনীর পরস্পর বৈরতা

(ক) সদ্য উদ্দীপনীর মধ্যে

(খ) সদ্য উদ্দীপনী এবং দূরোদ্দীপনীর মধ্যে

(গ) বাসনা এবং বাসনা লভ্য ফলে

(ঘ) বাসনা এবং লক্ষ্যে

একটী বালকের সম্মুখে একখানি অতি বৃহৎ প্রস্তরফলক রাখিয়া উহাকে ঐ প্রস্তরখণ্ড উঠাইয়া স্থানান্তর করিতে আদেশ কর। বালক প্রথমতঃ তোমার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহার ক্ষমতাতিরিক্ত বলিয়া অপারগ হইল। আবার আর একখানি তদ্বৎ প্রস্তর তাহার সম্মুখে রাখিয়া উহাকে স্থানান্তর করিতে বল দেখিবে, বালক এবার তোমার আদেশ পালন করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। একবার সে অকৃতকার্য্য হইয়াছে, এবারেও বোধ হয় সে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না, এই প্রকার চিন্তা আসিয়া তাহার মনকে আন্দোলিত করিতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে অকৃতকার্য্যতা এবং কষ্টের অভিজ্ঞতা হইতে সন্দেহের সৃষ্টি হইতেছে এবং এরূপ সন্দেহ কর্ম্মের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। যখন ভাবি সুখের আশায় সম্প্রকষ্টসাধ্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হই, যখন ভাবি দুঃখের আশঙ্কায় সদ্য মধুর সুখ হইতে বিরত হই, যখন এক সঙ্গে সুখ দুঃখের ভাবনায় আক্রান্ত হই, কিংবা যখন দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী বাসনার বশবর্ত্তী হই, তখন মনের মধ্যে স্বতঃই বিরোধ ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। যখন শীতকালে কার্য্যব্যপদেশে অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতে হয়, তখন একদিকে শয্যাত্যাগজনিত দুঃখের চিন্তা এবং আর এক দিকে কর্ত্তব্য-সম্পন্ন-জনিত ভাবি সুখের আশা মনকে চঞ্চল করিয়া তুলে। যখন চর্ম্ম রোগে আক্রান্ত হইয়া গাত্র কণ্ডূয়নে

প্রবৃত্ত হও, তখন পরিণাম ভাবিয়া সদ্য সুখ হইতে নিজেকে বিরত করিতে চেষ্টা কর। গাত্র কণ্ডূয়নে সুখ আছে, কিন্তু পরিণাম ইহার কষ্টদায়ক। গুরুজনের উপদেশ উপেক্ষা করিয়া কোন কার্য্য করিতে গেলে, নানাবিধ আশঙ্কা আসিয়া মনকে আলোড়িত করে। সুতরাং প্রধানতঃ কর্ম্মের এই কয়টী প্রতিবন্ধক—

১। আশঙ্কা

২। সদ্য দুঃখ এবং ভাবি সুখের বিরোধ

৩। সদ্য সুখ এবং ভাবি দুঃখের বিরোধ

৪। কর্ম্মের ফলাফল

৫। প্রতিদ্বন্দ্বী বাসনা

মনন, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় প্রভৃতি আত্ম-সংযমের সহায়। আত্ম-সংযম করিতে হইলে কর্ম্মোদ্দীপক বাসনা নিচয়ের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়। শ্রেষ্ঠ উদ্দীপনীর সহায়তায় নীচ উদ্দীপনীগুলিকে সংযম করিতে হয়। যেগুলি শ্রেষ্ঠ তাহাদের ঔৎকর্ষ সাধন করিতে হয় এবং যেগুলি নীচ তাহাদিগকে দমন করিতে হয়। জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়া লক্ষ্যানুযায়ী বাসনা সমূহকে পরিচালিত করিতে হয়। অনুভূতি দমনের দুইটী প্রকৃষ্ট উপায় আছে। আত্ম-সংযম করিতে হইলে সহানুভূতির বিকাশ এবং অসহানুভূতির দমন করিতে হয়। অনুভূতির শারীর অভিব্যঞ্জকগুলিকে দমন করিতে হয় এবং অনুভূতি-উদ্বুদ্ধকারী চিন্তা স্রোতের গতি প্রতিহত করিতে হয়। প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভূতিকে দমন করা যায় না। আত্ম-সংযমে চিন্তাশক্তির সংযম আবশ্যক। চিন্তাস্রোত সংযত করিতে হইলে অবধান শক্তির আশ্রয় লইতে হয়। যে চিন্তার উপর অবধান শক্তি প্রয়োগ না করিব সেই চিন্তা ক্রমশঃ ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল

আত্ম-সংযম।

হইয়া অবশেষে একবারে বিলীন হইয়া যাইবে। আর যে চিন্তার উপর অবধান শক্তি প্রয়োগ করিব, তাহা ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইবে এবং মনের উপর স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইবে। অতএব যে চিন্তার ঔৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন, সেই চিন্তায় অবধান শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক।

কর্ম্ম সংযম—কর্ম্মোদ্দীপক বাসনা নিচয়ের সুশৃঙ্খল সমন্বয়

আত্ম সংযম- বেদনা সংযম—শারীর অভিব্যঞ্জকের দমন এবং চিন্তাস্রোত নিবারণ

চিন্তা সংযম—অবধান শক্তির প্রয়োগ

আত্ম-বিকাশে বুদ্ধি বৃত্তির আবশ্যক। কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কর্ম্মের ফলের বিষয় চিন্তা করি। চিন্তা-শক্তি সাহায্যে কর্ম্মফলের বিষয় চিন্তা করিয়া লই। যে কর্ম্মে সুখ সম্ভোগ সম্ভব, সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। আর যে কর্ম্মে তাহা অসম্ভব সে কর্ম্ম হইতে বিরত থাকি। জীবনের প্রারম্ভে যখন আমার বুদ্ধিবৃত্তি অতি ক্ষীণ ছিল, যখন আমি নিজে ভাবী সুখের কল্পনা করিতে অক্ষম ছিলাম, তখন আমাকে অপরের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। যিনি আমা অপেক্ষা বড়, অভিজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠ, তাঁহারই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। যিনি আমার সম্মুখে ভবিষ্যতের প্রকৃত চিত্র ধরিতে সক্ষম, তাঁহারই উত্তেজনায় আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতাম। পরে যখন জ্ঞানের বিকাশ হইল, তখন বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে, স্মৃতির সহায়তায়, ভবিষ্যৎ কল্পনা করিতে শিখিলাম। তখন অপরের সাহায্যের অপেক্ষা করিলাম না। তখন আর বাহ্যিক উদ্বোধকের প্রয়োজন হইল না। নিজের আদর্শ নিজেই স্থির করিতে পারিলাম। নিজের শুভাশুভের পরিস্ফুট চিত্র সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। তখন বুদ্ধির সাহায্যে পরের প্রত্যাশা না করিয়া আত্মপ্রণোদিত হইয়া স্বীয় বুদ্ধি-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পথে নিজেকে চালিত

করিতে লাগিলাম। আত্মবিকাশে যেমন বুদ্ধির প্রয়োজন তেমনি ভাবেরও প্রয়োজন। প্রথমে আমি সদ্য সুখের জন্য লালায়িত ছিলাম। কেবল বর্ত্তমান আমার লক্ষ্য ছিল, অতীতের কথা ভাবিতাম না। ভবিষ্যতের চিন্তা আমার মনকে ব্যাকুল করিত না। বর্ত্তমান আমার লক্ষ্য ছিল। বর্ত্তমান আমার উপাস্য ছিল। পরে জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি পাইল। বুঝিলাম অতীতের স্মৃতি ভিন্ন, ভবিষ্যতের কল্পনা ভিন্ন, বর্ত্তমানের সুখ-সম্ভোগ অসম্ভব। প্রথমে আমি নিজের সুখের জন্য লালায়িত ছিলাম। আমার লক্ষ্য আমি ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি বা বস্তু ছিল না। পরে অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতে বুঝিলাম পরের সুখ ব্যতীত আত্ম-সুখ অসম্ভব। এই রূপে ভাবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্ম্মক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রথমে আমার কর্ম্মের লক্ষ্য বর্ত্তমানে আবদ্ধ ছিল, এখন আমার কর্ম্মের মূল অতীতে এবং ফল ভবিষ্যতে। প্রথমে আমার কর্ম্ম স্বার্থপর ছিল, এখন আমার কর্ম্ম পরার্থপরতায় পরিণত হইয়াছে। আবার আত্মবিকাশে আত্মসংযম প্রয়োজন। অমঙ্গলকে বিসর্জ্জন দিয়া মঙ্গলকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। অমঙ্গলকে অপহৃত করিয়া ন্যায়কে আদর করিতে হইবে। অনিষ্টের সংহার সাধন করিয়া ইষ্টের সাধন করিতে হইবে।

শারীরিক সংযম আত্মসংযমের প্রথম সোপান। প্রথমতঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন শক্তিকে, মাংসপেশীর ক্রিয়াবলীকে, সংযত করিতে হয়। উক্ত কার্য্যটী বিশেষ সহজসাধ্য নহে। পশু মাত্রেরই শারীরিক ক্রিয়াবলী আজন্ম সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। কিন্তু মানুষকে এইসকল ক্রিয়া অভ্যাস করিতে হয়। মানুষের ক্রিয়াবলী সহজলব্ধ নহে, শিক্ষালব্ধ। আমাদিগকে কলম ধরিতে শিক্ষা করিতে হয়, বস্ত্র পরিধান করিতে অভ্যাস করিতে হয়। আমাদের অধিকাংশ কার্য্যই শিক্ষালব্ধ এবং চেষ্টা ও সময় সাপেক্ষ। তাহার পর আত্মসংযমের দ্বিতীয় অবস্থা—অনুভূতির সংযম। ইহা প্রথম

সংযম অপেক্ষা আরও কঠিন। কারণ এখানে শরীর এবং মন দুইয়েরই সংযম আবশ্যক। অভিজ্ঞতার প্রথম অবস্থায় যখন আমি সঙ্গীদের সহিত ক্রীড়া করিতাম, তখন বুঝিতাম যে, অনুভূতির কবাট উন্মুক্ত রাখিলে বিপদ আছে, বিড়ম্বনা আছে। তখন যদি আমি আমার অনুভূতি দমন না করিতাম, যাহা অনুভব করিতাম তাহাই যদি প্রকাশ করিতাম, তাহা হইলে আমাকে বিশেষ লাঞ্ছিত হইতে হইত। ঠাট্টা বিদ্রূপ প্রভৃতির কঠোর কষাঘাতে আমাকে আমার অনুভূতির শারীর অভিব্যঞ্জকগুলি দমন করিতে হইত। এইরূপে অভিজ্ঞতার বিদ্যালয়ে কঠিন শাসনের অধীনে থাকিয়া অনুভূতি দমন করিতে শিক্ষালাভ করিলাম। অবশ্য কখন কখন অনুভূতির প্রবল আবেগ দমন করিতে অক্ষম হইতাম। কিন্তু ক্রমশঃই এরূপ উচ্ছল আবেগের পৌনঃপুন্য কমিয়া আসিতে লাগিল। উদ্দাম আবেগ মন্দীভূত হইল। আত্ম-সংযমের তৃতীয় অবস্থা চিন্তা-সংযম। ইহা পূর্ব্বকথিত উভয়বিধ সংযম অপেক্ষাও কঠিন, কারণ এরূপ সংযম কেবল অবধান-শক্তির সাহায্যেই সম্ভব। প্রথমতঃ অবধান-শক্তি আমাদের অধীনে থাকে না। ইহা অবস্থার দাস, ক্রমে যখন ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়, তখন একটি চিন্তাচ্ছায়াকে মানসপটে রাখিয়া অপরগুলিকে অন্তরালে রাখিতে সমর্থ হই। আমাদের চিন্তারাজ্যে অবিরাম যুদ্ধ চলিয়াছে। ভাবরাজ্যে অবিশ্রান্ত ঘাত প্রতিঘাত চলিয়াছে। ক্ষুধা খাদ্যের জন্য চীৎকার করিতেছে। আত্মসম্পৃক্ত ভাব আত্মসুখের জন্য যুদ্ধ করিতেছে। প্রেম পরের জন্য প্রাণপাত করিতেছে। বিবেক ন্যায়ের জন্য ঘোর সংগ্রাম করিতেছে। প্রজ্ঞাশক্তি ইহাদের শুভাশুভ বিচার করিতেছে। আর সকলের সম্রাট ইচ্ছাশক্তি, কাহারও শক্তির উচ্ছেদ করিতেছে, কাহারও বা শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে।

অনুভূতি ইচ্ছার উদ্বোধক আবার ইচ্ছা অনুভূতির পরিচালক। ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে অনুভূতিকে সংযত করিতে পারা যায়। সংহার এবং সংযম এক কথা নহে। উচ্চ প্রবৃত্তিবলে নীচ প্রবৃত্তিকে, সৎ-প্রবৃত্তির সাহায্যে অসৎ প্রবৃত্তিকে দমন করাকেই সংযত করা বলে। প্রথম হইতেই আত্মসংযম-প্রবৃত্তি থাকে না। সংযম, শিক্ষা এবং অভ্যাসের ফল। মানুষের প্রথম অবস্থা আবেগময়। এই আবেগ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা কর, ইহা আরও উদ্দাম হইয়া উঠিবে। কিন্তু শিক্ষাকার্য্য চলিতে লাগিল, অভিজ্ঞতা বাড়িতে লাগিল। স্বাভাবিক আবেগের সহিত লব্ধ জ্ঞানের বিরোধ উপস্থিত হইল। আবেগের সহিত কর্ত্তব্যের সংঘাত আরম্ভ হইল ; তখন বলিলাম—

"এস মন, এস, তোমাতে আমাতে
মিটাই বিবাদ যত।
আপনার হয়ে কেন মোরা দোঁহে
রহি গো পরের মত ?
আমি যাই একদিকে, মন মোর,
তুমি যাও আর এক দিকে।
যার কাছ হতে ফিরাই নয়ন
তুমি যাও তার দিকে !!

বুঝিলাম অনুভূতির দমন প্রয়োজন। বুঝিলাম কর্ত্তব্যের মন্দিরে অনুভূতির একাধিপত্য অসম্ভব। অনুভূতিকে দমন করিবার চেষ্টা করিলাম। প্রথমে এ চেষ্টা ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ। প্রথম প্রথম কর্ত্তব্যের পরাজয় হইল, অনুভূতির জয় হইল। বুঝিলাম, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না। ক্রমে পরানুসন্ধায়ী অনুভূতির বিকাশ হইল। ঐ দেখ বালকের মাতা পীড়িতা বলিয়া বালক আর তাহার ঢোলক

বাজাইতেছে না। আত্মসম্পর্কীয় অনুভূতির উপর পরানুসন্ধায়ী অনুভূতির জয় হইল। খেলা করিবার প্রবৃত্তি এখন বড়ই প্রবল। কিন্তু কাযের সময় আর খেলা করি না। এখন একটী সন্দেশ পাইলে আর আমি লুকাইয়া একা খাই না—অপরকে ভাগ দিতে শিখিয়াছি। এইরূপে ক্রমশঃ নিজেকে সংযত করিতেছি। কিন্তু এখনও আমি নিমন্ত্রণে অধিক আহার করি। লেখাপড়ায় যথেষ্ট মনোযোগ দিই না। এখনও আমি আমার খেয়ালের বশবর্ত্তী। কিন্তু অন্য চিন্তাও আমার মনে ধাক্কা দিতেছে। অতিরিক্ত আহারে আমার স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। লেখাপড়ার অনবধানতা হেতু আমার খ্যাতি নষ্ট হইতেছে। খেয়ালের বশবর্ত্তী বলিয়া আমার শান্তি হইতেছে না। বুঝিলাম স্বাস্থ্য দরকার, যশ দরকার, শান্তি দরকার। স্বাস্থ্য বাঞ্ছনীয় সুতরাং আহারে সংযমী হইলাম। যশ বাঞ্ছনীয় সুতরাং বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগ দিলাম। শান্তি বাঞ্ছনীয় অতএব রিপু দমনে প্রবৃত্ত হইলাম। এইরূপে অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতে যতই জ্ঞানের সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলাম ততই কর্ত্তব্যের পর কর্ত্তব্যের আদর্শ চিত্তপটে উদয় হইতে লাগিল। কর্ত্তব্যের মন্দিরে অনুভূতি সকল আনত হইল!—

"নিঃশব্দ গমনে
চলে যাব কর্ম্মক্ষেত্র মাঝখান দিয়া
বহিয়া অসংখ্য কার্য্যে একনিষ্ঠ হিয়া;
সঁপিয়া অব্যর্থগতি সহস্র চেষ্টায়
একনিত্য ভক্তিবলে; নদী যথা ধায়
লক্ষ লোকালয় মাঝে নানাকর্ম্ম সারি
সমুদ্রের পানে লয়ে বন্ধ হীন বারি॥"

পরে দেখিলাম কর্ত্তব্য বহু হইলেও লক্ষ্য সকলেরই এক। সমস্ত কর্ত্তব্য মিলিয়া এক মহা কর্ত্তব্যে পরিণত হইল। এখন সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাবকে সংযত করিয়া সেই একদিকে, একই আদর্শের অনুকূল করিয়া চালাইতে লাগিলাম। তখন বুঝিলাম—

"এ কামনা সিন্ধুগর্ভে, কামনা জাহ্নবী নয়
শত মুখে করিয়া বিলীন,
করি ক্ষুদ্র মানবের অতি ক্ষুদ্র আত্মসুখ
জগতের সুখের অধীন,
উন্মেষিয়া আত্মশক্তি, জগতের সুখ পথে
যত নর হবে অগ্রসর,
আপন সুখের ভার সিন্ধু গামী নদমত
ক্রমশঃ বাড়িবে পরিসর।
কামনা জগৎ-হিত, সাধনা জগৎ-হিত—
একমাত্র ধর্ম্ম-সনাতন!!"

ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে আমি আমার অনুভূতি দমন করিতে পারি আবার চিন্তা-ক্রিয়ার গতিকেও সংযত করিতে পারি। মনোযোগ শক্তিকে এক বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া অন্য বিষয়ে ন্যস্ত করিতে পারি। প্রত্যেক অনুভূতির শারীরিক অভিব্যঞ্জক আছে। ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে এই অভিব্যঞ্জকগুলি দমন করিতে পারি এবং অভিব্যঞ্জক দমিত হইলে অভিব্যঞ্জক সম্পর্কীয় অনুভূতি সংযত হয়। আবার অনুভূতি যখন চিন্তাপ্রসূত, তখন অবধানশক্তিকে এক চিন্তা হইতে চিন্তান্তরে লইয়া যাইতে পারি। এইরূপে অনুভূতির মূলচিন্তাকে অপসৃত করিলে অনুভূতি অপসৃত হয়—

"চিত্ত মোর বশংবদ বিমুক্ত স্বাধীন,
সংযত করেছি যত্ন করি বহুদিন,
প্রবেশ করে না পাপ আমার অন্তরে,
বর্ষ বৃষ্টি যত খুসি যত ক্ষণ ধরে।"

এখন আমি—

"অন্যায়ে আজি হাস্যের তোড়ে করিব বিসর্জ্জন।"

আত্মসংযমের সহায়ক { আত্মোৎকর্ষ, আত্মরক্ষণ, আত্মদমন

মনের কোন একটী বৃত্তির বিকাশ হইলে সঙ্গে সঙ্গে অপরগুলিরও বিকাশ হইয়া থাকে। প্রথমে একটীর বিকাশ পরে আর একটীর বিকাশ এরূপ ক্রম নহে।

আত্মোৎকর্ষ {
১। বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ
২। রুচির উৎকর্ষ
৩। নীতি ভাবের উৎকর্ষ
৪। ধর্ম্ম ভাবের উৎকর্ষ
৫। মার্জ্জিত মতের সৃষ্টি
৬। স্বভাব গঠন

আত্মরক্ষণ {
১। জীবন সংরক্ষণ
২। স্বাস্থ্যোন্নতি
৩। অর্থ সঞ্চয়

আত্মদমন

১। ক্ষুধা—

(১) বুভুক্ষা—খাদ্যের জন্য ক্ষুধা
(২) পিপাসা—পানীয়ের জন্য ক্ষুধা
(৩) নিদ্রালুতা—নিদ্রার জন্য ক্ষুধা
(৪) চঞ্চলতা—বিশ্রাম বা ব্যায়ামের ক্ষুধা
(৫) কাম—সংসর্গ ক্ষুধা
(৬) শ্বাসপ্রশ্বাস—বায়ুর ক্ষুধা

২। বাসনা—

(১) জীবনের
(২) সম্পত্তির
(৩) শক্তির
(৪) সম্মানের
(৫) জ্ঞানের
(৬) সৌন্দর্য্যের
(৭) সম্পূর্ণতার

৩। জীবনের উপদ্রব—

(১) সহিষ্ণুতা
(২) ধৈর্য্য
(৩) উদারতা
(৪) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা
(৫) নির্ভরতা

} উপদ্রব দমনের সহায়

৪। প্রকৃতি—

(১) সৌভাগ্য
(২) দুর্ভাগ্য
(৩) স্বাস্থ্য
(৪) পীড়া

} প্রকৃতি পরিবর্ত্তন-হেতু

শব্দানুক্রমণিকা

উপক্রমণিকা।

এই বিশাল জগতের এ পর্য্যন্ত কেহ সীমা-নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। একদিকে দূর-হইতে-দূরতর-বস্তুদর্শন-সহায় অতি প্রবল দূরবীক্ষণ, অপরদিকে সূক্ষ্ম-হইতে-সূক্ষ্মতর-বস্তু-দর্শনোপায় সুতীক্ষ্ণ অণুবীক্ষণ নানা দেশে ও নানা স্থানে নিয়ত এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত নির্ণয় করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। তথাপি ইহার তথ্যসমূহ যেমন একদিকে দূর হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে, অপরদিকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া আমাদের জ্ঞানের অগোচর রহিয়া যাইতেছে। অনন্ত বস্তু লইয়া এই জগৎ। ইহার মধ্যস্থ প্রত্যেক বস্তুই পুনরপি অনন্ত-গুণ-সম্পন্ন ও অসীম-ক্রিয়াশীল। দৃশ্যতঃ, এই অনন্তের মধ্যে প্রত্যেক বস্তু স্বীয় গুণাবলি ও ক্রিয়াবলি দ্বারা অপর সকল বস্তু হইতে পৃথকভাবে অবস্থান করিতেছে ও প্রত্যেকেই স্ব-স্ব পথে যেন অপর কাহারও অপেক্ষা না করিয়া চলিতেছে। সর্ব্বত্রই স্বাতন্ত্র্য, সর্ব্বত্রই অকথনীয় বিশৃঙ্খলা! অল্পসংখ্যক ব্যক্তি একত্র থাকিয়া স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, কাহারও কার্য্য সম্পন্ন হয় না; কিন্তু অনন্ত ব্যক্তি, অনন্ত দ্রব্য, অনন্ত শক্তি, একত্র সমাবিষ্ট হইয়া স্বতন্ত্রভাবে স্ব-স্ব গন্তব্য পথে চলিতেছে, তথাপি প্রত্যেকের কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে; কোন গণ্ডগোল নাই। ইহার অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? সহজেই ইহা হইতে অনুমান হয় যে, বাহ্যতঃ যে স্বাতন্ত্র্য এমন কি বিরোধভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহার অভ্যন্তরে পারতন্ত্র্য ও বিরোধাভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং রহিয়াছে বলিয়াই এই অনন্ত "ঠেলাঠেলির" মধ্যেও অতি ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে অতি বৃহৎ সৌরজগৎ

সকলেই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ গন্তব্য পথ খুঁজিয়া লইয়া চলিতে সমর্থ। প্রত্যেক বস্তুই যেমন বিভিন্ন গুণ-সম্পন্ন, আবার তেমনি অনেক বস্তুই অনেক বস্তুর সদৃশ। সদৃশতাবর্জ্জিত বিভিন্নতা আমরা দেখিতে পাই না। বিভিন্নতাবর্জ্জিত সাদৃশ্যও আমাদের নয়নগোচর হয় না। দুইটি আম্রফল, দুইটি মনুষ্য—বিসদৃশ হইয়াও সদৃশ, সদৃশ হইয়াও বিসদৃশ। সদৃশতার অভ্যন্তরে বিসদৃশতা ও বিসদৃশতার অভ্যন্তরে সদৃশতা আমরা সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ করি। বিসদৃশতার অভ্যন্তরে সদৃশতা রহিয়াছে বলিয়াই জগৎ চলিতেছে। আমরাও ক্ষুদ্র মানব জীবনরক্ষাপূর্ব্বক গন্তব্য পথে চলিতে সমর্থ হইতেছি। স্থূলতঃ, বিসদৃশ দ্রব্যের মধ্যে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়। একটি আতাফল ও একখণ্ড প্রস্তরের সাদৃশ্য দর্শনে নিউটনের দিব্যজ্ঞানের আভাস হয়। জলনিমগ্ন স্বশরীরের অনায়াসে ভাসমান অবস্থার সহিত অপর ভাসমান দ্রব্যের সাদৃশ্য-অনুভূতিই আর্কিমিডিসের জ্ঞান-বিকাশের হেতু। সাধারণ মনুষ্য, যাহারা আপন-আপন সঙ্কীর্ণ জীবনপথে চলিয়া যায় ও যাহাদের পথের এদিক-ওদিক অথবা অধিকদূর অগ্রপশ্চাৎ দর্শন করিবার প্রয়োজন বা অবকাশ থাকে না—তাহারা তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী দ্রব্যসমূহের মধ্যে জীবনধারণের জন্য আবশ্যক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য মাত্র জানিতে পারিয়াই সন্তুষ্ট। দৃশ্যতঃ, সদৃশ পদার্থের মধ্যে কোন বৈসাদৃশ্য গুপ্ত রহিয়াছে কি না, অথবা কোন বিসদৃশ পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য গুপ্ত রহিয়াছে কি না, তাহা দেখিবার তাহাদের প্রয়োজন, অবকাশ বা সামর্থ্য নাই; অথবা প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহাদের জীবন-যাত্রার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই ভাবিয়া তাহারা উহা প্রণিধান করিয়া দেখিতে উদাসীন। ইষ্টকখণ্ড ও অম্রফলকে ঊর্দ্ধ হইতে ভূতলে পতিত হইতে সকল মনুষ্যই পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল এবং অনেকেই জানিত যে দুইটিই ভারি বস্তু। কিন্তু আম্র ও প্রস্তরখণ্ড এই দুই বিসদৃশ

দ্রব্যের মধ্যে মহানুভব নিউটন যে সাদৃশ্য অবলোকন করিলেন, তৎপূর্ব্বে তাহা আর কেহ অবলোকন করে নাই। অপরদিকে, একটি লঘু পালক প্রস্তরখণ্ড বা আম্রফলের ন্যায় ভূতলে পতিত হয় কি না—এই অসদৃশ দ্রব্যের মধ্যে কোন নিগূঢ় সাদৃশ্য আছে কি না—নিউটনের পূর্ব্বে কেহ তাহা জানিবার প্রয়াস পায় নাই। এইরূপ কত অসংখ্য দ্রব্য—যাহা বিজাতীয় ও বিসদৃশ বলিয়া লোকে জানিত, তাহা এক্ষণে স্বজাতীয় ও সদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। বানর ও মনুষ্য, এমন কি বানর অপেক্ষাও নীচভাবাপন্ন পশু ও সৃষ্ট-জীবের রাজা মনুষ্য, এত বিসদৃশ হইয়াও সদৃশ ও এক জাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। দীর্ঘকায় বংশদণ্ডের সহিত তোমার চরণদলিত দূর্ব্বাঙ্কুর, তোমার খাদ্য, জীবনোপায় ধান্য গোধুমের সহিত চটকাদির আহার্য্য তৃণাদির সাদৃশ্য সহজ-সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ইহা হইতে এই অনুমান হয় যে, এমন অনেক দ্রব্য রহিয়াছে, যাহাদিগকে আমরা ভাল করিয়া দেখি নাই বলিয়াই অপর জিনিষ হইতে পৃথক অথবা এক মনে করি। ঐ সকল বস্তুকে ভাল করিয়া দেখিলে উহাদের একত্ব বা পৃথকত্ব বোধগম্য হইয়া থাকে। লোষ্ট্র ও আম্রফল নিশ্চিতই পৃথক বস্তু। প্রথমটির আস্বাদনে আমাদের জিহ্বার তৃপ্তি হয় না, অথবা উহা বৃক্ষোপরি ফুল হইতে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া অচিরদিনে ফলাকারে পরিণত হয় না। কিন্তু এই বৈষম্য সত্ত্বেও উহারা দুইই মূলতঃ এক; কারণ বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে, রূপ রস গন্ধ ইত্যাদি ব্যতিরিক্ত উভয় দ্রব্যেরই আরও বহুসংখ্যক গুণ রহিয়াছে; আমাদের প্রয়োজন মত যখন যে গুণটি আবশ্যক, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি; কিন্তু আমাদের প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনে দ্রব্যদ্বয়ের প্রকৃত একত্ব বা পৃথকত্বের কিছু হানি হয় না। যে গুণ বা ক্রিয়া আজ প্রয়োজনে আইসে, এতাবৎ অজ্ঞাত গুণবিশেষ কা'ল তাহা অপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজনে আসিতে পারে; অথবা এ

অপ্রকাশ্য গুণ-বিশেষের জন্য উহা একবারেই অপ্রয়োজনীয় বোধ হইতে পারে। এই প্রকারে বিষ অমৃত হইতেছে ও অমৃত বিষ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

পথের পথিকও, বাহ্যতঃ পৃথক বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য অবলোকন করিয়া এক মনে করিয়া না লইলে পথ চলিতে সক্ষম হয় না। যে কূপের জল পান করিয়া সে পূর্ব্বে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছ, সেই কূপের সেই সময়ের সেই জল পুনরায় পাওয়া অসম্ভব। যে অন্ন ভোজন করিয়া সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছ, আর সে অন্ন পাইবার সম্ভাবনা কোথায়? নূতন অন্ন নানা প্রকারে পৃথক হইলেও অন্ন; নূতন পানীয় পূর্ব্ব পানীয় হইতে পৃথক হইলেও পানীয়— এই বিশ্বাস জীবনধারণের মূল। বাহ্যতঃ পৃথক হইলেও বৃক্ষমাত্রেই বৃক্ষ, ফল মাত্রেই ফল, পানীয়মাত্রেই পানীয়। তদ্রূপ, বাহ্যতঃ সদৃশ হইলেও একটী ফল প্রাণধারক, অপরটি হয় ত প্রাণসংহারক।

দুই বা ততোধিক বস্তুর মূলতঃ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ঐ বস্তুগুলিকে "এক" করিয়া লই। এই একীকরণের পর সদৃশগুণাতিরিক্ত অন্য গুণ আমরা তত গ্রাহ্য করি না। আম্র বলিলেই আমরা কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক গুণ উহাতে আছে বলিয়া বিশ্বাস করি ও সেই বিশ্বাস-অনুযায়ী কার্য্য করি। আমরা জানি আম্র খাইলেই আমাদের ক্ষুধা শান্তি ও মিষ্টরসাস্বাদ হইবে—উহার বর্ণ, আকৃতি ও অন্যান্য গুণ যাহাই হউক না কেন। আবার, আমাদের দেশজাত নহে, অপরিচিত, অন্য কোন ফল---যাহার সহিত আম্রের দৃশ্যতঃ কোন সাদৃশ্য লক্ষ্য করিতেছি না, এরূপ ফল খাইতে আমাদের মনে দ্বিধা উপস্থিত হইবে। কারণ, যে গুণ আম্রমাত্রেই প্রত্যক্ষ করি বলিয়া বিনা সঙ্কোচে আম্র ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করি, এই অপরিচিত ফলে সেই গুণের অভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু যদি আমরা আরও ভাল করিয়া নূতন ফলটিকে প্রত্যক্ষ

করি, যদি সূক্ষ্মদর্শন দ্বারা উহার অন্তর্নিহিত গুণাবলির সহিত আমাদের সুপরিচিত আম্রফলের গুণাবলির একত্ব উপলব্ধি করি, তাহা হইলে নূতনেও পুরাতন দেখিতে পাইব ও দৃশ্যতঃ বিভিন্ন ধর্ম্মযুক্ত বস্তুদ্বয়কে "এক" করিয়া লইতে পারিব। প্রথমতঃ একটি আম্র জানিলাম; তাহার পর ঐ আম্রটির সহিত উহার সদৃশ অন্য আম্রের "একতা" অনুভব করিলাম; ক্রমে বর্ণ, আকার ইত্যাদির বিভিন্নতা সত্ত্বেও আম্রমাত্রই "এক" করিয়া লইলাম। পরে আম্রের সহিত আম্রাতিরিক্ত ফলের "একতা" আমাদের অনুভূত হইল। এই প্রকারে ফলমাত্রের সহিত আমাদের অন্যান্য খাদ্যবস্তুর একতা প্রতিপন্ন হইতেছে। দুগ্ধ এবং আম্রফল কত পৃথক; কিন্তু এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, খাদ্যের হিসাবে উভয়ের মধ্যে এমন সাদৃশ্য অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, এত বিভিন্ন গুণসম্পন্ন দ্রব্যদ্বয়ও আমরা এক করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করি না। একটী আম্রফলকে বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় মানবের খাদ্যবস্তুর সাধারণ গুণের উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়; কিন্তু আম্রটির সহজবোধ্য কয়েকটি মাত্র গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না। প্রত্যক্ষ ও তদতিরিক্ত গুণাবলির বিশেষ পরীক্ষা করতঃ বিসদৃশ গুণসকল ত্যাগ পূর্ব্বক সদৃশ গুণসমূহ গ্রহণ করিতে পারিলে এই একটি ফলের মধ্যে যাবতীয় মনুষ্য-খাদ্য ফলের গুণ বর্ত্তমান আছে, দেখিতে পাইব। তখন আম্রকে মানব-খাদ্য বলিব ও অপর খাদ্যের সহিত "এক" করিয়া লইব। এইরূপ জ্ঞান "বিজ্ঞান" বলিয়া অভিহিত। সাধারণ মনুষ্যের জ্ঞান হইতে ইহার জাতি পৃথক নহে। জ্ঞান একই। বৈসাদৃশ্যে সাদৃশ্য-জ্ঞান সকল জ্ঞানেরই প্রকৃত মূর্ত্তি। বিভিন্ন বস্তুর একীকরণ জ্ঞানের ব্যাপার। এই একীকরণ যখন বিশেষ প্রযত্ন, পর্য্যবেক্ষণ ও অনুধাবন দ্বারা বিশদভাবে ব্যক্ত হয়, তখনই সেই সাধারণজ্ঞান 'বিজ্ঞান' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দৃশ্যতঃ এই জগৎ স্বতন্ত্র অসংখ্য দ্রব্যজাত-পূর্ণ! এখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দৃশ্যতঃ বিভিন্ন-গুণ-যুক্ত বহুদূরান্তবর্ত্তী দ্রব্যজাতের অভ্যন্তরেও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে ও সেই সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়া আমরা কত দৃশ্যতঃ বিভিন্ন-গুণাবলম্বী বস্তুকে "এক" করিয়া লইয়াছি ও লইতেছি; এমন কি স্পর্দ্ধা করি যে, জগতের জড়-চেতন প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্য মূলতঃ এক—আমরা ইহা বুঝি ও বুঝাইতে পারি। যদি কতকগুলি দ্রব্য মূলতঃ এক হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই এক ধর্ম্মাবলম্বী। যে গুণ বা ধর্ম্ম একটিতে প্রত্যক্ষ করিতেছি, অপরটিতেও তাহা প্রত্যক্ষ করিব। একপাত্র জলে তরলতা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা জানিয়াছি যে, জলমাত্রেই তরলতা বিদ্যমান। জলমাত্রের এই সাধারণ প্রকৃতিগত স্বধর্ম্মের বিশদজ্ঞান বিজ্ঞান; এবং বিশদভাষায় এই বিজ্ঞান সন্নিবেশিত হইলে উহাকে প্রকৃতির অন্যতম "নিয়ম" বলা হইয়া থাকে। এখন দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীর কোন বস্তুই একেবারে সম্পূর্ণরূপে নূতন নহে। কোন বস্তুই স্বতন্ত্র নহে; প্রত্যেকেই পরতন্ত্র; অন্যথা, প্রত্যেক বস্তুই নিয়মের অধীন। এই নিয়মাবলীর আবিষ্কার "বিজ্ঞানের" কার্য্য। বিজ্ঞানবিৎ সাধারণ লোকের উপর সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিয়া চলেন; কারণ, যেখানে সাধারণ লোকে বিশৃঙ্খলামাত্র দর্শন করে, তিনি তথায় সুশৃঙ্খলা দেখেন; সাধারণ লোকে যেখানে মাত্র স্বাতন্ত্র্য প্রত্যক্ষ করে, তিনি সেখানে পারতন্ত্র্য এবং সাধারণ লোকে যেখানে কোলাহল ও গণ্ডগোল মাত্র শ্রবণ করে, তিনি সেখানে নিয়মবদ্ধ সুসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া থাকেন।

জগতে কোন বস্তুই নিরালম্ব নহে। ঐ বৃক্ষটি ধরিত্রীর উপর দণ্ডায়মান। এ আশ্রয় না থাকিলে বৃক্ষটি থাকিতে পারিত না। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ইহা দ্বারা বৃক্ষটির জীবন ভূগর্ভস্থ জলকণাসমূহের উপর নির্ভর করিতেছে।

সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম রসবাহী মূলদ্বারা বৃক্ষটি ঐ জলকণাসমূহকে খুঁজিয়া লইয়া প্রাণধারণ করিতেছে; পত্র দ্বারা অদৃশ্য উপায়ে বায়ুমণ্ডল হইতে বাষ্প আকর্ষণ করিয়া নিজ শরীরের পুষ্টিসাধন করিতেছে। আলোক ও উত্তাপ ব্যতিরেকে বৃক্ষের জীবনরক্ষা হইতে পারে না। অতএব এই বৃক্ষটি যে মস্তক উন্নত করিয়া স্বাধীনভাবে গর্ব্বের সহিত দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহা প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য বহু বস্তুর উপর নিজের শরীররক্ষার জন্য এবং পোষণের জন্য নির্ভর করিতেছে। সুদূর সূর্য্যমণ্ডলের তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত ও গভীর তমোময় ভূগর্ভের রস-সঞ্চারের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত ইহার জীবন অচ্ছেদ্যভাবে সংবদ্ধ রহিয়াছে। এই সম্বন্ধগুলি অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ক্ষুদ্রতম বালুকা-কণাটিও এই জগতের অগণিত সূক্ষ্ম-স্থূল পদার্থের সহিত শৃঙ্খলিত হইয়া রহিয়াছে। সাধারণতঃ, জীবন-যাপনের জন্য মোটামুটি কয়েকটি মাত্র বস্তুর মধ্যগত সম্বন্ধ-জ্ঞান যথেষ্ট মনে করিয়া থাকি। বিজ্ঞান তাহার প্রশস্ততর ও গভীরতর দৃষ্টিতে সাধারণ মনুষ্যের অগোচর সাদৃশ্য উপলব্ধি করতঃ অননুভূতপূর্ব্ব, এমন কি অচিন্ত্যপূর্ব্ব সম্বন্ধসকল নির্ণয় করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত। তাহার অভ্যন্তরস্থ ব্যাপার ও দ্রব্যজাত অসীম। ক্ষুদ্র মানবজ্ঞান এই অনন্ত ব্যাপার ও পদার্থগুলিকে আয়ত্ত করিতে সম্যক অসমর্থ। দিনের পর যতই দিন অতিবাহিত হইতেছে, জগতের বৈচিত্র্য ও অসীমতা মানবনয়নে ততই বর্দ্ধিত হইতেছে। দুর্ব্বলচিত্ত আমরা বাধ্য হইয়া এই অনন্ত অসীম ব্যাপারসকলের দ্বারা পীড়িত হইয়া প্রত্যেকে এক একটি খণ্ডজগৎ নিজ জীবনের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়া লইতেছি। যে সকল ধীমান্ ব্যক্তি ঐ নিজ ক্ষুদ্র জীবনের গণ্ডীর বাহিরে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারাও অনন্ত অসীমকে আয়ত্ত করা অসম্ভব জানিয়া অভিভূত হইয়া পড়েন। তথাপি ক্ষুদ্র ঐহিক জীবনের সীমার মধ্যে আমাদের মন আবদ্ধ থাকিতে

চায় না। সেইজন্য জ্ঞান-বিস্তারের পিপাসা এবং বহু বিজ্ঞানের উৎপত্তি। ব্যক্তি-বিশেষের প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুসারে এই অনন্ত জগৎ নানা ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, সমগ্র জগতের অনন্ত বস্তু, অনন্ত ক্রিয়া, অনন্ত গুণ এক বা দুই জীবনে কোন মানব কখন নিজ বুদ্ধি দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারে নাই বা পারিবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এক একটি বস্তু কত অনন্ত শক্তির ও অনন্ত গুণের আধার। সমগ্র জাগতিক বস্তু দূরে থাক্, ইহার এক অংশেরও সম্যক গুণক্রিয়া ও সম্বন্ধনির্ণয় অনন্ত সময় ও অনন্ত শক্তিসাপেক্ষ বলিয়া মনে হয়। যদি বিশেষ সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে কতক পরিমাণে নিজের মত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিতে সমর্থ হই, হয় ত তাহা হইলে আমাদের জ্ঞানপিপাসা কতক পরিমাণে নিবৃত্ত হইবে। প্রাণিজগৎকে উদ্ভিদ-জগৎ হইতে পৃথক করিয়া, কেহ উদ্ভিদতত্ত্ব, কেহ প্রাণতত্ত্ব নির্ণয়ে ব্যাপৃত হই। কেহ বা মানব-ইতিহাস, কেহ বা স্থূল পদার্থ, কেহ বা জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী লইয়া নিজ নিজ মন ও শক্তি উহাদের তথ্যনির্ণয়ে নিয়োজিত করিয়া জ্ঞানপিপাসা শান্ত করিতে ব্যস্ত। সাদৃশ্য ও বৈষম্যের বিশেষ-গ্রহণ সকল প্রকার জ্ঞানের মূল-স্বরূপ। যত প্রকার তরু-গুল্ম-তৃণ বর্ত্তমান রহিয়াছে বা ছিল, তাহাদের সংখ্যা অনন্ত; প্রকার ও গুণের ভিন্নতারও ইয়ত্তা নাই। সাদৃশ্য ও বৈষম্য অবলম্বন করিয়া এই সমুদয় আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির ধারণোপযোগী করিতে না পারিলে আমাদের মনের শান্তি হয় না। সেইজন্য ব্যক্তি ছাড়িয়া দিয়া আমরা জাতির আশ্রয় লই। বৈষম্যের স্থানে সাম্যের স্থাপনা করি। বৃহৎকে ক্ষুদ্র করিয়া নিজ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে স্থান দিতে যত্নশীল হই। এই প্রকারে উদ্ভিদ-বিদ্যা নামে একটি বিশেষ বিজ্ঞানের উৎপত্তি; এবং এই প্রকারে প্রাণীবিদ্যা, ভূবিদ্যা, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ইতিহাস, গণিত ইত্যাদি বহু বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে।

কোন একটি বিশেষ বিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু ও ব্যাপারসকলের মধ্যে পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য ও বৈষম্যের পর্য্যবেক্ষণ বিজ্ঞানের প্রধান কার্য্য। এই পর্য্যবেক্ষণ অনেকস্থলে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যকারী যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত হয় না। আরও, পর্য্যবেক্ষণ নিখুঁত ও নির্ভুল করিতে হইলে এক বিশিষ্ট প্রথা অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়। মাত্র সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিজ শক্তি চালনা পূর্ব্বক তথ্যনির্ণয়ে যত্নশীল হইতে হয়। এই উপায় অবলম্বনে আমরা প্রকৃত সাদৃশ্য ও বৈষম্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া নানা বস্তুকে "এক" করিয়া লইতে সক্ষম হই। একেবারে সকল বস্তুকে এক করা সম্ভব হইলেও সহজ নয়। সেইজন্য প্রথম অবস্থাতে আলোচ্য দ্রব্যগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লই। পরে আরও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা উহাদের মধ্যে সাদৃশ্য নিরূপণ করিয়া প্রোক্ত শ্রেণীগুলির সংখ্যা কম করিয়া আমাদের জ্ঞান অধিকতর বিস্তৃত করি। জ্ঞানবিস্তারের জন্য এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর সাদৃশ্য নির্ব্বাচন প্রচুর নহে। উপরে লিখিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক বস্তু অপর বহু বস্তুর সহিত নিকট ও দূরভাবে সম্বদ্ধ। যে সম্বন্ধ আমার হস্তস্থিত জল ও অম্লজান অজ্ঞানের মধ্যে রহিয়াছে, অন্য জলও ঐ দুই বাষ্পের সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। অর্থাৎ জলমাত্রই এই দুই বাষ্পের বিশেষ সংমিশ্রণে উৎপন্ন—যতক্ষণ আমার জ্ঞান এতদূর বিস্তৃত না হইল, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত জল ও কথিত বাষ্পদ্বয়ের সম্বন্ধ সর্ব্বকাল, দেশ ও ক্ষেত্রে বর্ত্তমান, এই জ্ঞান আমার না হইল, ততক্ষণ আমার বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান হইল না। এইরূপ একটিমাত্র জ্ঞান লইয়াও বিজ্ঞান-শরীর গঠিত হয় না। পদার্থ-বিজ্ঞানের বিষয় মাত্র জল নহে। অন্যান্য অনেক পদার্থ ইহার অন্তর্ভুক্ত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সকল আলোচ্য বস্তুর মধ্যে এইরূপ সাধারণ জ্ঞান স্থাপিত না হয়, ততক্ষণ বিজ্ঞানের ক্রিয়া অসমাপ্ত থাকে।

সুস্পষ্ট জ্ঞানের সহিত বিশদ ভাষা অঙ্গাঙ্গিভাবে সংলিপ্ত। যখনই সুস্পষ্ট জ্ঞানের বিকাশ হইল, তখনই দেখিবে উহা তদনুরূপ ভাষায় আকার ধারণ করিয়াছে। যে জ্ঞানের এ আকার নাই; সে জ্ঞান বিশদ জ্ঞান নহে। জড়পদার্থ মাত্রই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, ইহা একটি অতিবিস্তৃত জ্ঞান। যখন এতাদৃশ কিংবা ইহা অপেক্ষাও অল্পবিস্তৃত জ্ঞান উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশিত হয়, তখন উহাকে প্রকৃতির নিয়ম বলা হয়। এই সকল নিয়ম বস্তুবর্গের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশ করে। জগতের অংশবিশেষের মধ্যে সুসংস্থাপিত নিয়মাবলীর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ উপযুক্ত শব্দের আকার ধারণপূর্ব্বক বিশেষ বিজ্ঞানের শরীর-গঠন করে।

বিজ্ঞান দ্বারা দ্রব্যের তথ্য-নির্ণয় করিতে হইলে, মাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। ধর্ম্ম বা সংস্কারের দোহাইও কার্য্যকরী হইবে না। শাস্ত্র, ধর্ম্ম, সমাজ-গত প্রথা ও সংস্কার, নিজের লাভালাভ ও ভালমন্দ সকল একদিকে রাখিয়া, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষাধিষ্ঠিত অনুমানের সাহায্যমাত্র অবলম্বন করিয়া তথ্য-নির্ণয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। কেবল সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিব। সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকলই সত্যের নিকট অবনত-মস্তক —ইহাই বৈজ্ঞানিকের মূলমন্ত্র।

উল্লিখিত উপায়ে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান মনুষ্যকে ইতর জন্তু হইতে, সভ্যকে অসভ্য হইতে পৃথক করিয়া দিতেছে। বর্ত্তমান যুগে প্রকৃতির উপর মনুষ্যের প্রাধান্যলাভের এই বিজ্ঞানই একমাত্র কারণ। শুষ্ক কাষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। শুষ্ক কাষ্ঠ ও অগ্নির মধ্যে এই সম্বন্ধ আছে জানি বলিয়াই কাষ্ঠের সাহায্যে, প্রয়োজন হইলে, অগ্নি উৎপাদন করিতে পারিব—এই বিশ্বাস আমার হইয়াছে; এবং আমি, প্রয়োজনমত, এই উপায়ে যাহারা অগ্নি উৎপাদন করিতে পারে না, তাহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি। অম্লজানবাষ্পের সহিত মানবের শ্বাসপ্রশ্বাসের

ও জীবনধারণের সম্বন্ধ অবগত হইয়াছি বলিয়া, প্রয়োজনবিশেষে, উক্ত বাষ্প-প্রয়োগদ্বারা মুমূর্ষুর জীবনরক্ষা করিতে সমর্থ হই। এক দ্রব্যের সহিত অপর দ্রব্যের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া উহাদ্বারা ভবিষ্যৎ নিরূপণ বিজ্ঞানের কার্য্য। জলের সহিত তৃষ্ণার সম্বন্ধ জানি বলিয়াই তৃষ্ণা পাইলে জল পান করিতে উদ্যত হই; অথবা অগ্নির সহিত তাপের সম্বন্ধ জানি বলিয়াই অগ্নির সাহায্যে বাষ্প প্রস্তুত করি। অগ্নি ও বাষ্প, জল ও তৃষ্ণা-নিবারণের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত জাগতিক দ্রব্য সকলের মধ্যে অপরাপর সম্বন্ধও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিশেষ-বিশেষ সম্বন্ধ অসীম। বিজ্ঞানবিদেরা সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধগুলিকে কয়েকটি সম্বন্ধে পরিণত করিয়াছেন। তন্মধ্যে কার্য্য-কারণসম্বন্ধই বিজ্ঞানের চক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। বস্তুমাত্রই কার্য্য বা কারণ। সকল কার্য্য-কারণই নিয়মের অধীন। কোন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ অবগত হইলে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই জানিতে সক্ষম হই। কার্য্যবস্তু এবং কারণবস্তুর মধ্যে পারম্পর্য্য-সম্বন্ধ। পূর্ব্বে কারণ, পশ্চাতে কার্য্য—একটির পর একটি। কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটি বিশ্বব্যাপী সম্বন্ধ জাগতিক বস্তুসকলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। দুইটী দ্রব্য বা বস্তু একই মুহূর্ত্তে ঘটিতে বা থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি আর একটির পরে না হইয়া দুইটিই একসঙ্গে বা যুগপৎ সংঘটিত হয়। এই সম্বন্ধকে যৌগপদ্য সম্বন্ধ বলা হয়। যাবতীয় বস্তু কাল ও দেশে প্রতিষ্ঠিত। বস্তুর পারম্পর্য্য লইয়া কাল, এবং যুগপৎ অবস্থান লইয়া দেশ। সুতরাং কোন সম্বন্ধই এই দুই সম্বন্ধ ব্যতীত থাকিতে পারে না। পরন্তু অপর যে কিছু সম্বন্ধ দ্রব্যসকলের মধ্যে রহিয়াছে, তাহাদিগকেও এই দুইটি সম্বন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা অসম্ভব নয়। বিজ্ঞান যৌগপদ্য সম্বন্ধের একটি বিশেষ রূপকে অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া থাকে—সেটি দ্রব্য ও গুণসম্বন্ধ।

জগৎ বলিতে সাধারণতঃ আমার চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষলতা, নদী পর্ব্বত, গ্রহ নক্ষত্রাদির সমষ্টিমাত্র বুঝিয়া থাকি। এই অনন্ত জগতের মধ্যে ক্ষুদ্র মানব বিন্দুমাত্র স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মানব সামান্য বালুকণার ক্ষুদ্রতম অংশ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। আমার গতি-বিধি আমার চতুর্দ্দিকস্থ দ্রব্যাদির মধ্যে। আমি যাহা খাই, যাহা করি, সকলই এই বিশাল জগতের বস্তু। আমি এই সকল বস্তু দর্শন করি, শ্রবণ করি, আঘ্রাণ করি, আস্বাদন করি এবং স্পর্শ করি। এই দর্শন-শ্রবণ ইত্যাদির বিষয় লইয়াই আমার জীবন। অর্জ্জিত রৌপ্যখণ্ড, স্বীয় পরিবারবর্গ, বন্ধু-বান্ধব, গৃহসজ্জাদি, পশু পক্ষী ভূমি ইত্যাদি লইয়াই আমার জীবন। আর আমিও এই সার্দ্ধ-তিন-হস্ত দীর্ঘ গৌরবর্ণ চক্ষু নাসিকা ইত্যাদিযুক্ত চলনশীল অপরের প্রত্যক্ষ বস্তু। এই জ্ঞান সাধারণ। সাধারণ মনুষ্য, ইহা ছাড়া অন্য কিছু আছে বা থাকিতে পারে বলিয়া মনে করে না। দৈবাৎ এতদ্ব্যতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞান হইলে উহা স্বপ্নবৎ প্রতীত হয়। প্রবুদ্ধ মানব প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু লইয়া ব্যাপৃত। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যও শরীরে কণ্টকবেধ-জনিত ক্লেশকে কথিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে স্থান দেয় না। রোষে অঙ্গ জর্জ্জরিত হইলে রোষের স্থান কোন অজানিত অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রদেশে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। মনুষ্যমাত্রেই এইপ্রকারে কতকগুলি ব্যাপারের অস্তিত্ব মানিয়া থাকে—যদিও ইহাদিগকে চোখে দেখা যায় না, বা কাণে শোনা যায় না, বা অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না। কিন্তু এই ব্যাপার-গুলির সংখ্যা কত, তাহাদের প্রকৃতিই বা কিরূপ, ইত্যাদি বিষয়ে অল্প লোকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ব্যাপারগুলি স্বভাবতঃই চঞ্চল। ইহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়—কষ্টসাধ্য ত বটেই। মানব-মন সহজেই উজ্জ্বল ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষণস্থায়ী অন্ধকারময় সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ, ইত্যাদির

প্রতি সহজে ধাবিত হয় না। সেইজন্য মানব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলির আলোচনাতে সর্ব্বপ্রথমে ব্যাপৃত থাকে। ঐ সকল বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র লভ্য এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া ধারণা হয়।

কিন্তু, কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই অনিন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপারগুলিও সংখ্যায় বড় কম নহে। এমন কি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সহিতই একটি অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। সূর্য্যালোকের সহিত সূর্য্যালোকের জ্ঞান ও তজ্জনিত সুখ-দুঃখ সংশ্লিষ্ট। কণ্টকের সহিত তজ্জনিত বেদনা সংযুক্ত। এইরূপে প্রত্যেক বস্তুর সহিতই এক একটি অন্য ব্যাপারের সংস্রব রহিয়াছে। যদি তাহাই হইল, তবে এই সকল ব্যাপার লইয়া আর একটি প্রকাণ্ড জগৎ রহিয়াছে কি?

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সহিত এই অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারের সংস্রব আছে সত্য, কিন্তু একের সহিত অপরের কোন সাদৃশ্য নাই। কণ্টকবেধের সহিত তজ্জনিত বেদনার সংস্রব আছে, কিন্তু বেদনাটি কোন প্রকারেই কণ্টকের সদৃশ নহে। তাহা হইলে আমাদিগকে বুঝিতে হইল যে, এই বৃহৎ পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া আর একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডও উহারই সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। ইহার ঘটনাবলী আমরা যদিও ইন্দ্রিয়দ্বারা জানিতে পারি না, তথাপি কি জানি কি উপায়ে প্রত্যক্ষ করিতেছি। শুধু তাহাই নহে; এই ক্ষুদ্র জগতের ব্যাপারগুলি আমাদের সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন। বৃহৎ জগতের ব্যাপার সকলের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা আমরা এই ক্ষুদ্র জগতের ব্যাপার দ্বারাই পরিমাপ করিয়া থাকি।

তরু, গুল্ম, বৃক্ষ, লতা, পাহাড়, পর্ব্বত ইত্যাদি কত বড়, কত গুরু, তাহারা কোন্ দিকে বা কোথায় অবস্থিত—আমরা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারি; কিন্তু আমার হিংসা, স্নেহ বা কল্পনা ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, লঘু কি গুরু, ঊর্দ্ধে কি নিম্নে ইত্যাদি প্রশ্ন ইহাদের সম্বন্ধে উঠে না বা উঠিতে পারে না।

অতএব বৃহৎ জগতের সকল ব্যাপারেরই কাল ও দেশ রহিয়াছে; কিন্তু ক্ষুদ্র জগতের ব্যাপার সকলের কাল আছে কিন্তু দেশ নাই—নাই বলিয়াই ইহাকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা ক্ষুদ্র জগৎ নহে—ইহার বিস্তার বৃহৎ জগৎ অপেক্ষাও অধিক। ইহার ঘটনাবলীও বৃহৎ জগতের ঘটনাবলী অপেক্ষা সংখ্যায় বা বৈচিত্র্যে কম নহে। সুখ—সুখের অনন্ত প্রকার, দুঃখ—দুঃখের অনন্ত প্রকার; বুদ্ধি—বুদ্ধির অসীম রূপ; ইচ্ছা, দ্বেষ ইত্যাদি অসংখ্য ব্যাপার—ইহাদের বৈচিত্র্যও অনন্ত।

বৃহৎ জগৎকে বাহ্য বা জড়জগৎ এবং ক্ষুদ্র জগৎকে আন্তর বা মনোজগৎ বলা হয়। জড়জগতের কাষ্ঠ, লৌহ ইত্যাদি দ্রব্য হইতে মনোজগতের লোভ, অহঙ্কার, ভক্তি, কল্পনা ইত্যাদি ব্যাপারের আরও একটি চমৎকার বিশেষত্ব আছে। লোষ্ট্রখণ্ড বা কাষ্ঠখণ্ডের অবস্থা যেন আমাদের নিদ্রিত অবস্থার ন্যায়। আমাদের ন্যায় উহাদের জাগ্রৎ অবস্থা আছে বলিয়া সহজে অনুমিতি হয় না। আমরা রাগ, দ্বেষ, স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা প্রভৃতি আলোকে উদ্ভাসিত। উহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যদি থাকে, তবে তাহা তমসাচ্ছন্ন। আমাদের মনোজগতের ব্যাপার সকল চৈতন্যময়। একটির পর একটির উদয় হইতেছে। একটির পর একটির বিলয় হইতেছে। কিন্তু সকলগুলিই প্রকাশমান ও চৈতন্যময়।

বিজ্ঞান বাহ্যজগতের ব্যাপার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। যে বিজ্ঞান বাহ্যজগতের বস্তুসকলের পক্ষে সম্ভব, অন্তর্জগতের ব্যাপারসকলের পক্ষে সে বিজ্ঞান সম্ভব নহে বলিয়া এতাবৎকাল বিদ্বজ্জনগণের ধারণা ছিল। বিশেষভাবে ইন্দ্রিয়দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যকারী যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিয়া অনুমান প্রাকৃত-বিজ্ঞানের প্রধান উপায়। মানসিক ব্যাপারে এরূপ পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং অনুমান অসম্ভব; সুতরাং মনোবিজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে।

ইহা ছাড়া যে কার্য্য-কারণসম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া প্রাকৃত বিজ্ঞান জন্মলাভ হইতে এই সুস্পষ্ট দশা প্রাপ্ত হইয়াছে—সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতিতে সেই প্রকার কার্য্যকরণের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় নাই। উহাদের উদয়, বিলয় বা স্থিতি কোন সাধারণ নিয়মের অধীন নহে। প্রথমতঃ, মানসিক ব্যাপারসমূহের সম্যক দর্শন বা বিচার অতি দুরূহ; দ্বিতীয়তঃ, এই সমস্ত ব্যাপার কোন সাধারণ নিয়মের অধীন নহে—সুতরাং ঐ সকল ব্যাপারের কোন বিশেষ বিজ্ঞান হইতেই পারে না। মনকে একটিমাত্র বস্তু ধরিয়া লইলে ত কথাই নাই, কারণ, একটি পদার্থের আর বিজ্ঞান কি হইবে! তবে মনকে একটি প্রকাণ্ড জগৎ বলিয়া বুঝিলে অর্থাৎ লোভ, মোহ, ইচ্ছা, বিকল্প ইত্যাদি মনের ব্যাপার-সমষ্টিকে গ্রহণ করিলে বিচার্য্য হইতে পারে যে, এই মনোজগতের অন্তর্গত বস্তুসমূহের বিজ্ঞান সম্ভব কি না।

পুরাকালে দর্শন-শাস্ত্রের অন্যান্য বিষয়ের বিচারের সহিত মানসিক ব্যাপারেরও বিচার আনুষঙ্গিকভাবে হইত। সাধারণ মনুষ্য, পরস্পরের সহিত ব্যবহারে মানসিক ব্যাপারগুলিও যে নিয়মে বদ্ধ, তাহা স্বীকার করিয়া থাকে। বিনা দোষে তোমার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিলে তোমার রাগ হইবে, ইহা সকলেই জানে। তুমি একটি লোককে স্থল-বিশেষে দেখিয়াছ। সেই স্থানটি প্রত্যক্ষ করিলে বা উহার কথা মনে হইলে ঐ ব্যক্তিও তোমার স্মরণ-পথে উদিত হইবে, ইহা সকলেই স্বীকার করে। সুখের পর দুঃখ অতি তীব্র-ভাবে অনুভূত হয়, ইহাও সকলের অভিজ্ঞাত। অভ্যাসবলে কর্ম্ম সুগম হয়, ইহাও সাধারণ-প্রত্যক্ষ। এই প্রকার মানসিক ব্যাপারের নিয়মাবলী সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। অতএব বোধ হইতেছে যে, জড়-জগতের দ্রব্যজাতের ন্যায় মনোজগতের ব্যাপারগুলিও নিয়মের অধীন। যদিও ইন্দ্রিয়দ্বারা এ ব্যাপারগুলি আমাদের গোচর হয় না, তবুও উহাদিগকে আমরা জানিয়া থাকি; উহাদের প্রকৃতি, উদয়, স্থিতি ও বিলয়

প্রত্যক্ষ করি এবং অপরকে বাক্য দ্বারা জ্ঞাপন করি। সুতরাং জড়-বিজ্ঞানের জন্য আমাদের যে উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন, মানসিক ব্যাপারেও সে উপায় অবলম্বন করিতে পারি। এখানেও আমরা প্রত্যক্ষদর্শন ও তদধিষ্ঠিত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বিচিত্র, বিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক ব্যাপারগুলিকে এক করিয়া উহাদের নিয়মগুলি নির্দ্দেশ করিতে ও বিশদ ভাষায় ব্যক্ত করিতে সমর্থ।

প্রাকৃতবিজ্ঞান যন্ত্রাদির সাহায্যে ও অন্যান্য উপায়ে জড়পদার্থসমূহকে সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত করিয়া উহাদের গুহ্যতম আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহ আবিষ্কার পূর্ব্বক জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছে। একপাত্র জলকে কয়েকটি বাষ্পকণায় পরিণত করতঃ উহাকে আবার বিদ্যুৎ-সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া উহার মধ্যে অম্লজান ও অজ্জানের তিনটি কণার আবিষ্কার করা হইয়াছে। এই অম্লজান ও অজ্জান-কণার ক্ষুদ্রতম অংশকে একটি অণু বলা হইয়া থাকে। আরও বিশ্লেষণদ্বারা সপ্রমাণ হইবে যে, এই তথাকথিত অবিভাজ্য অণুটি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাঙ্গে একভাবাপন্ন একটিমাত্র গতিশীল পদার্থ নহে। সুখ-দুঃখাদি মানসিক ব্যাপারের এইরূপ বিভাগ ও বিশ্লেষণ সম্ভব হইলে জড়বিজ্ঞানের পার্শ্বে মনোবিজ্ঞান স্থান পাইতে পারে। কিন্তু কোন মানসিক ব্যাপারের এরূপ বিভাগ সম্ভব নহে। তুমি একটি জলকণাকে অন্য জলকণা হইতে পৃথক স্থানে রাখিতে পার, অথবা উহার উপাদানভূত বাষ্পদ্বয়কেও পৃথক স্থানে রক্ষা করিতে পার; কিন্তু তোমার ভক্তি ও স্নেহকে জলের ন্যায় খণ্ড-খণ্ড করিতে বা উহার উপাদানগুলিকে পৃথক করিয়া পৃথক স্থানে রক্ষা করিতে পার না; সুতরাং জড়পদার্থের যে সম্যক দর্শন ও বিচার সম্ভব, মানসিক ব্যাপারের তাহা সম্ভব নহে। বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণদ্বারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিস্তৃতি হয়। বিশ্লেষণদ্বারা বস্তুবিশেষের উপাদান সকল জ্ঞাত হইয়া অন্য বস্তুতে ঐ সকল উপাদান দেখিতে পাইলে

উভয় বস্তু সদৃশ বা এক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যদি মানসিক ব্যাপারের সংশ্লেষণ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে যে সংশ্লেষণ বিজ্ঞানের অন্যতম অবলম্বন তাহাও অসম্ভব হইবে। 'সত্য বটে, জড়পদার্থের ন্যায় মানসিক ব্যাপারের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ সম্ভব নহে—ইহার অংশ পৃথক করা যায় না—কিন্তু এক প্রকার সংশ্লেষণ আছে, যাহা মানসিক ব্যাপার এবং জড়পদার্থ—উভয়েই প্রযোজ্য। এই প্রকার সংশ্লেষণে দ্রব্যবিশেষের অংশসমূহকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিভিন্ন স্থানে রাখা হয় না। যেমন একটুক্‌রা চা-খড়িকে সম্মুখে রাখিয়া একবার উহার শ্বেতবর্ণ মাত্র মনোমধ্যে ধারণা করি—উহার অন্য কোন গুণে মনোনিবেশ করি না; আবার অপরক্ষণে উহার শ্বেতবর্ণটী একেবারে অন্তরালে রাখিয়া উহার গুরুত্বের দিকে মনোনিবেশ করি ও তৎপরক্ষণেই অন্য সকল গুণ হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার উপাদানমাত্র মনোমধ্যে ধারণা করি—বর্ণ হইতে গুরুত্ব বা গুরুত্ব ও বর্ণ হইতে উহার উপাদান-প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্ন করি না, কেবল বিভিন্ন মনোযোগের ক্রিয়ার দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ মুহূর্ত্তে পৃথক্-পৃথক্ গুণকে ধারণা করি; সেইরূপ কোন একটী মানসিক ব্যাপার, যথা, ভ্রাতৃস্নেহ বা ঈশ্বরভক্তি, মনোমধ্যে ধারণা করিয়া বিভিন্ন মনোযোগের ক্রিয়ার দ্বারা উহার ভিন্ন ভাব ও গুণকে ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে চিন্তা করিতে পারি। এইরূপ বিভাগ জড়পদার্থের অংশ-বিচ্ছেদ হইতে পৃথক্ হইলেও ইহার দ্বারা কোন সংযুক্ত বস্তুকে বিভক্ত করিয়া উহার পৃথক্ পৃথক্ গুণ ও ক্রিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এইরূপ বিশ্লেষণকে মানসিক বিশ্লেষণ বলা যাইতে পারে। এই বিশ্লেষণের সাহায্যে বিভিন্ন মনোবৃত্তির আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও উপাদান জ্ঞাত হইয়া পুনরায় মানসিক বৃত্তিসমূহের সংশ্লেষণ করিতে সমর্থ হই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সম্যক্ দর্শন, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, একীকরণ যেমন জড়জগতে সম্ভব, তেমনি অন্ততঃ

কতক পরিমাণে মনোজগতেও সম্ভব। উক্ত ক্রিয়াসকলের নিয়োগের তারতম্য অনুসারে অবশ্য বিজ্ঞানবিশেষের উন্নতিরও তারতম্য হইবে। এই জন্যই মনোবিজ্ঞান কিছুদূর মাত্র অগ্রসর হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। উহার কার্য্যাবলীও যেন প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল। সৌভাগ্যক্রমে বিজ্ঞানবিদেরা মনোরাজ্যের গুহ্যতম ব্যাপার পরিদর্শনের অন্য উপায় অবলম্বন করিতে সম্প্রতি সমর্থ হইয়াছেন। পরীক্ষার সাহায্য ব্যতীত কেবল পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা সম্যক্ জ্ঞানলাভ হয় না। জড়জগতে যে বিষয়গুলি আমরা ইচ্ছামত পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি, সেই সকল বিষয়েই আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট প্রসার ও গভীরতা লাভ করিয়াছে। আর যেখানে কেবল নিশ্চেষ্ট দর্শনের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে, বিজ্ঞান সেখানে তত অগ্রসর হইতে পারে নাই। নিজ শক্তি ও কার্য্যাবলীর দ্বারা প্রকৃতির গূঢ় তথ্যসমূহ জোর করিয়া বাহির করিয়া লইতে পারিলে জ্ঞানের প্রসার যেমন বৃদ্ধি পায়, নিশ্চেষ্টভাবে প্রকৃতির কৃপার উপর নির্ভর করিয়া চাহিয়া থাকিলে তেমন হয় না। মনোজগতের ব্যাপার ও তাহার উৎপত্তি, বিলয় বা উপাদান ইচ্ছামত পর্য্যবেক্ষণ করিবার উপায় নাই বলিলেই হয়।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সম্প্রতি বিজ্ঞানবিদেরা মনোজগতের ক্রিয়াসমূহের ইচ্ছামত পর্য্যবেক্ষণের এক উপায় হস্তগত করিয়াছেন। মনোবৃত্তির সহিত শরীরের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এমন কোন মানসিক ব্যাপার নাই, যাহা আমাদের শরীরের কোন-না-কোন অংশের ক্রিয়ার সহিত সম্বদ্ধ নহে। মনোমধ্যে ক্রোধের উদ্রেক হইলে চক্ষু রক্তবর্ণ, ওষ্ঠাধর কম্পিত ও হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়। ভক্তিরসের উদ্রেক হইলে চক্ষুর অন্তর্দৃষ্টি ও শরীরের মাংসপেশী সকল শিথিল হইয়া যায়। পক্ষান্তরে অঙ্গুলি কীটদষ্ট হইলে মনের মধ্যে যন্ত্রণার উদ্রেক হয় বা শরীর অবসন্ন

হইলে মনেরও অবসাদ ঘটিয়া থাকে। যদি শারীরিক ক্রিয়াগুলিকে যন্ত্রাদির সাহায্যে অথবা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের দ্বারা অথবা উভয় উপায়ে আয়ত্ত করিয়া ইচ্ছামত পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি, তাহা হইলে তত্তৎ ক্রিয়ার সহিত সম্বদ্ধ তত্তৎ মানসিক ব্যাপারগুলিকেও পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হইব। যে মানসিক বৃত্তি পূর্ব্বে একটী অবিভাজ্য বস্তুরূপে প্রতীয়মান হইত, শারীরিক ক্রিয়া বিশ্লেষণ করিয়া তাহার বিভিন্ন উপাদান বা বিভিন্ন গুণ পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া উহাকে একটী সংযুক্ত পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারিব। যে মানসিক ব্যাপারের উৎপত্তি ও বিলয় পৃথক্‌রূপে পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব হইত, উপরি উক্ত প্রকারে শারীরিক ক্রিয়ার ইচ্ছামত পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা উহার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব। মনোবৃত্তির সহিত আমাদের শরীরবৃত্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধহেতু শারীর বৃত্তি মাত্র জড়পদার্থের ক্রিয়া বলিয়া বিজ্ঞানবিদেরা মনোবৃত্তিগুলিকে ইচ্ছাধীন পর্য্যবেক্ষণের বিষয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে মনোবিজ্ঞান প্রাকৃত বিজ্ঞানের পার্শ্বে দাঁড়াইতে সমর্থ।
